বিদ্যাসাগর রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

ঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সম্পাদনা

অধ্যাপক দীপন চট্টোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

৩৬ কলেজ রো । কলকাতা : ৭০০০০৯

সূচীপত্র

ভূমিকা

বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর যে সাহিত্য সম্পর্কে আমরা সর্বদাই গৌরব প্রকাশ করে থাকি, তার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ বিষয় যে প্রবন্ধ ছিল তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অথচ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে আজ আমরা বাংলা সাহিত্যের যে বিষয়কে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধবলে মনে করতে পারি তা' যে প্রবন্ধ নয় এ কথাও সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। মাত্র একশ বছরের ব্যবধানেই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এ অবস্থা যে কেন সৃষ্ট হলো, তা গভীরভাবে বিচার করে দেখা আবশ্যক।

ধর্মালোচনার মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব হ'য়েছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকেরাই এদেশে বাংলা গদ্যভাষার প্রথম প্রবর্তক; এদেশে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই তাঁরা সর্বপ্রথম গদ্যভাষা অবলম্বন করেছিলেন এবং সেই সূত্রে খ্রীষ্টান ধর্মের মাহাত্ম্য ও হিন্দুধর্মের নিন্দা প্রচার করে গদ্যরচনা প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে হিন্দু-ধর্মের প্রতি বিদ্বেষমূলক যে মনোভাবই প্রকাশ পাক না কেন, বাংলা সাহিত্যে আধুনিক প্রবন্ধের প্রথম উন্মেষ দেখা দিল। এ সম্পর্কে আধুনিক প্রবন্ধ কথাটি উল্লেখ করবার বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। অনেকের বিশ্বাস, গদ্যভাষার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবন্ধের উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এ-কথা সত্য নয়। আমাদের দেশে মধ্যযুগেও প্রবন্ধ ছিল, তবে তা সেকালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পয়ার ছন্দে পদ্যে লেখা হতো। মধ্যযুগের পয়ার ছন্দই মধ্যযুগের গদ্য। এ যুগে গদ্যভাষায় আমরা সাহিত্যের যে-সব বিষয় রচনা করে থাকি তাদের প্রত্যেকটি বিষয়ই মধ্যযুগের পদ্যে পয়ার ছন্দে লেখা হতো। সুদীর্ঘ কাহিনী বর্ণনা করবার মতো যেমন একটি স্বচ্ছন্দ গতি পয়ার ছন্দের ছিল, তেমনই সূক্ষ্মতম দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণেও তার ক্ষমতা ছিল। তাই রামায়ন-মহাভারতের সুদীর্ঘ কাহিনী যেমন পয়ার ছন্দেই সেদিন বর্ণিত হয়েছে, তেমনই চৈতন্য-চরিতামৃতের মত দার্শনিক তত্ত্বমূলক প্রবন্ধধর্মী রচনাও পয়ার ছন্দেই রচিত হয়েছে। আজকের গদ্যভাষার সকল দায়িত্বই সেদিন একমাত্র পয়ার ছন্দে রচিত পদ্যভাষা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে। সেইজন্য আমরা মধ্যযুগে পদ্যে রচিত জীবনী, দার্শনিক প্রবন্ধ, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, ভ্রমণ বিবরণ, অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি সব কিছুই লাভ করেছি। গদ্যের অভাব সেদিন কোন দিক থেকেই সমাজ অনুভব করেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে এই বিষয় প্রকাশ করবার দায়িত্ব নব প্রবর্তিত গদ্যভাষাই গ্রহণ করেছে এবং গদ্যভাষার সন্ধান পাবার পর থেকেই

পয়ারের ব্যবহার লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে, তবে এ কথা সত্য, সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে চিন্তাধারারও যে ক্রমবিকাশ হচ্ছে সেই অনুযায়ী আধুনিক যুগে প্রবন্ধের নূতন নূতন বিষয়বস্তুরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারা রচিত হয়েছে, তাকেই আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ বলে নির্দেশ করা যায়।

এবার যে কথার সূত্র ধরে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম, তাতে ফিরে আসা যাক। ধর্মালোচনার ভিতর দিয়েই বাংলা গদ্যভাষার পথ তৈরী হয়েছিল, এবং গদ্যভাষার ভিতর দিয়েই প্রবন্ধ রচনায় নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। প্রবন্ধই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সন্তান। খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ গদ্যভাষা ও ধর্মপ্রচার বিষয়ক আলোচনার যে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, তা অনুসরণ ক'রে এ'দেশের লেখকগণও সেদিন অগ্রসর হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা তার মধ্যেই নিজস্ব একটি আদর্শের সন্ধান পেলেন এবং তারই বিকাশ করে ক্রমে আদর্শ সাহিত্যিক গদ্য-ভাষার প্রতিষ্ঠা করলেন।

খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদেরধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মবিষয়ক আলোচনার যে সূচনা হয়েছিল তার ধারা বহুদূর পর্যন্ত বিচিত্র পথে অগ্রসর হয়ে এসে বিগত শতাব্দীর ধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধ শাখাটিকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। প্রথমতঃ এই বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় সাহিত্যিক গুণ কিছুই ছিল না, একথা সত্য। কারণ খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক কিংবা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় এবং তাঁর সমসাময়িক লেখকগণ প্রধানতঃ ধর্মীয় বাগবিতণ্ডার মধ্যেই তাঁদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। তবে রামমোহনের রচনার মধ্যে সাহিত্যগুণের যে অভাবই থাক না কেন, প্রবন্ধের আরও যে কয়েকটি গুণ অর্থাৎ চিন্তার সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনার কৌশল, তাদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সেইজন্য রামমোহন রায়ই আধুনিক প্রবন্ধের সর্বপ্রথম স্রষ্টা বলে মনে করা যেতে পারে। রামমোহনের চরিত্রের একটি প্রধান গুণ ছিল এই যে, তিনি যুক্তিদ্বারা বিপক্ষকে পরাজিত করতেন; যুক্তি উপস্থাপনা বিষয়ে কেবলমাত্র তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিই সজাগ থাকতো তা নয়, তিনি শাস্ত্রীয় তথ্য দ্বারাও তাঁর যুক্তিকে অকাট্য করে তুলতেন। ভাষার সংযম রামমোহনের রচনার আর একটি প্রধান গুণ ছিল; তাও তাঁর প্রবন্ধকে বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রবন্ধের গুণান্বিত করেছে। একদিকে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ আর একদিকে রক্ষণশীল দেশীয় পণ্ডিতসমাজ যখন তাঁকে অসংযত কটুবাক্যদ্বারা সকল তথ্য এবং তত্ত্ব নির্বিচারে অবহেলা করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে চলেছিলেন, তখনও রামমোহন নিজের সংযত ভাষা এবং যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনার আশ্রয় নিয়েই উভয়পক্ষেরই

সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাতে তাঁর নিজের যেমন একটি চরিত্রগুণ প্রকাশ পেয়েছিল তেমনই বাংলা প্রবন্ধেরও একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল। প্রবন্ধের একটি প্রধান ধর্ম লেখকের আত্মপ্রত্যয়। বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত কেউ প্রবন্ধ রচনায় সার্থকতা লাভ করতে পারে না। বাংলা প্রবন্ধের পক্ষে একটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তার জন্মমুহূর্তেই বাঙ্গালী চরিত্রের মধ্যে বলিষ্ঠতম আত্মপ্রত্যয়শীল ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছিল, তিনি রামমোহন। তার ফলেই বাংলা প্রবন্ধরচনার মধ্য দিয়ে সেদিন থেকেই একটি বলিষ্ঠ আদর্শ স্থাপিত হয়েছিল। রামমোহনের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ উপলব্ধির সঙ্গে যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠ মননশীলতা সংযুক্ত হয়ে তাঁকে প্রবন্ধ রচনার যে অধিকার দিয়েছিল, তা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী-ব্যাপী ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচনার ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল। বাঙ্গালী চরিত্রে ভাব-প্রবণতা যত গভীরই থাক না কেন তার মধ্যে আরও একটি গুণ কখনও কখনও দেখা যায়, তা তার নৈয়ায়িক বুদ্ধি। সকল ভাব-প্রবণতাকে জয় করে নৈয়ায়িক বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়েই রামমোহন তাঁর ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেজন্য বাংলা গদ্যভাষায় প্রাথমিক অবস্থায় যে ত্রুটিই তাঁর রচনায় দেখা যাক না কেন, তার গঠন কৌশলের মধ্যে প্রায় কোন ত্রুটিই ছিল না। যে সাময়িক সাহিত্য প্রবন্ধরচনার প্রধান সহায়ক, রামমোহন খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের অনুকরণে বাংলাদেশে ভারতীয়দের মধ্যে তারও প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, সুতরাং একদিকে আদর্শ প্রবন্ধ রচনাব এবং অন্যদিকে তা প্রকাশ ও প্রচার করবার প্রণালী নির্দেশ করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভবিষ্যতের পথ তিনি বেঁধে দিয়ে গেলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিষয়বস্তু ছিল ধর্ম ও সমাজ। সাহিত্য তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল না। তাঁর রচনা প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত,—প্রথমতঃ ধর্ম ও তত্ত্বমূলক এবং দ্বিতীয়তঃ সামাজিক আচারমূলক। তাঁর নির্দেশিত বাংলা প্রবন্ধ রচনার এই দুইটি ধারাই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর প্রবন্ধ লেখকগণ আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ধর্মীয় ধারাটিকে সর্বপ্রথম যিনি সাহিত্যগুণান্বিত করেছিলেন, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং সামাজিক আচারমূলক ধারাটিকে যিনি সাহিত্যগুণান্বিত করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন রায়ের প্রবন্ধের মধ্যে যে সব গুণের অভাব ছিল, এই দুজনের রচনায় সে অভাব পূর্ণ হয়ে গেল। কেবলমাত্র তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং তথ্য উপস্থাপনাতেই যে প্রবন্ধের গুণ সীমাবদ্ধ নয়, তাতে সাহিত্যরসের স্পর্শদানও যে একান্ত আবশ্যক, দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র উভয়েই তা উপলব্ধি করে তাঁদের রচনাকে যথার্থই প্রবন্ধরূপে প্রথম সার্থকতা দান করলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা রূপেই দেবেন্দ্রনাথকে প্রথম গদ্যরচনার সংস্পর্শে

আসতে হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কেবল যে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে ধর্ম এবং তত্ত্ববিষয়ক আলোচনায় নিয়োজিত ছিল তাই নয়, তার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর সর্ববিষয়ক সাহিত্যিক মনীষারই বিকাশ দেখা দিয়েছিল। তার সঙ্গে প্রায় প্রথম থেকেই বাংলা সাহিত্যের দু-একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধকার এসে যুক্ত হলেন; তাঁরা অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রামমোহন রায় ধর্মীয় তত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার যে ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যস্থতায় এক সম্পূর্ণরূপে নূতন ধারা এসে যুক্ত হ'ল। তাঁর প্রধান কৃতিত্ব এই যে, বাংলা প্রবন্ধের সাহিত্য—ধর্ম রক্ষা করেও তিনি তার মধ্যে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানেব বিষয় আলোচনা করেছেন। সেইদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, তিনি বাঙ্গালীর বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসাধনার অগ্রদূত। সেই সূত্রেই সে যুগে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের তিনি ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। রামমোহন ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে সেদিন যে-প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগের দ্বারদেশে পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের তপস্যা কেবলমাত্র উনবিংশতি শতাব্দীর ধ্যানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অনাগত যুগের মধ্যেও তার সম্ভাবনা রেখে গিয়েছিল। অক্ষয়কুমারের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত কেবলমাত্র ধর্ম ও সমাজসংস্কার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু প্রবন্ধের ক্ষেত্র যে কত বিস্তৃত, তার বিষয়ের মধ্যে যে অন্তহীন বৈচিত্র্য আছে, তা আমরা তাঁর মধ্যেই প্রথম দেখতে পেলাম। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়ও যে সেই যুগের বাংলা গদ্যভাষার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবার যোগ্য ছিল, তা অক্ষয়কুমারই প্রথম প্রত্যক্ষ করালেন।

বাংলা সাহিত্যে রামমোহন ধর্মমূলক প্রবন্ধ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগেই সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত কবেছিলেন। তাঁর এই বিষয়ে প্রথম গ্রন্থ বাংলা সাহিত্য বিষয়ক না হলেও বাংলা সাহিত্য যার মধ্য থেকে প্রাণরস আহরণ করেছিল, সেই সংস্কৃত সাহিত্য অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল। কারণ, তখনও তৎকালীন বাংলা সাহিত্য অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করবার মত কোন উপকরণের সৃষ্টিই হয়নি।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধ-গ্রন্থের নাম 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'। বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে সাহিত্যের বিষয় অবলম্বন করে কোন প্রবন্ধ রচিত হয়নি। সুতরাং বিদ্যাসাগরের সামনে এই বিষয়ে কোন আদর্শই বর্তমান ছিল না; সে আদর্শ তিনি নিজেই স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উক্ত গ্রন্থখানি

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। তার ভিতর দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও তার লেখকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলেও সাহিত্য সমালোচনার যে পদ্ধতিটি তিনি তার মধ্যে প্রয়োগ করেছিলেন, তা' বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি নূতন দিক উন্মোচন করে দিয়ে গেল। রামমোহন কিংবা অক্ষয়কুমারের রচনার মধ্য দিয়ে এই ধারাটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

এই প্রবন্ধটির আরও একটি দিক ছিল। এ' যাবৎ সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে রস-সঙ্গত আলোচনা কেবলমাত্র বিদেশী পণ্ডিতগণই করে আসছিলেন ; দেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে গতানুগতিক প্রথায় টিকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য রচনারই কেবলমাত্র প্রচলন ছিল। কিন্তু এই দেশীয় ধারার ব্যতিক্রম করে ইংরাজ পণ্ডিতদিগের রস-সাহিত্য সমালোচনার ধারা অনুসরণ করে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম সাহিত্যমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি একসঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান এবং রস বিশ্লেষণের যে-প্রতিভা দেখিয়েছেন, তা বিদ্যাসাগর প্রতিভার একটি নূতন দিক দেখিয়ে দিয়েছে। এই গ্রন্থখানি ব্যতীতও বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এবং 'আত্মচরিত' তাঁর সাহিত্যগুণান্বিত মৌলিক রচনা।

বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারমূলক যে-প্রবন্ধ গ্রন্থগুলি রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে সাহিত্যগুণের স্পর্শ নেই, একথা বলা যেতে পারে না। বস্তুতঃ দেখা যায়, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র যুগেই সামগ্রিকভাবে প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নীরস বিতর্কমূলক প্রবন্ধ রচনার পরিবর্তে সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছে। এমন কি অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও সাহিত্যরসসিক্ত হয়ে উঠেছিল—কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যে নীরস হয়ে উঠেনি। বিশেষতঃ যে-বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়েই তাঁর অন্তর্নিহিত রসানুভূতির দুর্লভ পরিচয় ব্যক্ত করেছেন এবং তাঁর সংস্কৃত কাব্য-নাটক-কথাসাহিত্যের বাংলা অনুবাদের ভিতর দিয়েই তাঁর রচনাকে রসোজ্জ্বল করে নিয়েছিলেন, তাঁর সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ রচনাও যে সাহিত্যরসের স্পর্শহীন হবে, তা' কখনও সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর হৃদয়ের শাসনকে যতদূর স্বীকার করেছেন, মস্তিষ্কের শাসনকে তত স্বীকার করে নিতে পারেননি। তিনি রামমোহনের মত সুতীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী কিংবা নৈয়ায়িক ছিলেন না—তাঁর হৃদয় তাঁকে যে পথে নিয়ে যেত, সেই পথেই তিনি অগ্রসর হতেন এবং সেইপথে চলতে গিয়েই তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তিরও সন্ধান পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর চরিত্রের মধ্যেই সাহিত্যিক গুণ অন্তর্নিবিষ্ট হয়েছিল। সেইজন্য তাঁর হাতেই বাংলা প্রবন্ধ সর্বপ্রথম সাহিত্যের বারিবর্ষণে সুস্নিগ্ধ হয়েছিল—তা' কেবলমাত্র তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার পরিবর্তে তাঁর রচিত প্রবন্ধের সকল বিভাগকেই স্পর্শ

করেছিস। বিশেসতঃ সামাজিক সমস্যামূলক যে প্রবন্ধগুলো বিদ্যাসাগর রচনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকটির উৎস তাঁর হৃদয়ের মধ্যেই নিহিত ছিল। তাঁর প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধ তিনি হৃদয়ের দিক থেকেই বিচার করেছেন। হৃদয়েই রসের উৎস; সেইজন্য তার প্রত্যেকটি প্রবন্ধই তাঁর হৃদয়ের স্পর্শে সরস এবং সাহিত্য-গুণান্বিত হয়ে উঠেছে। কতকগুলো বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া বিদ্যাসাগর সামাজিক সমস্যামূলক নিম্ন-লিখিত প্রবন্ধগুলো রচনা করেন:—(১) 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৫) (২) 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' (১৮৫৫), (৩) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিয়ক বিচার' (১৮৭১), (৪) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার, দ্বিতীয় পুস্তক' (১৮৭৩)।

রামমোহনের ধর্মমূলক প্রবন্ধ রচনার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সামাজিক সমস্যামূলক প্রবন্ধের প্রধান পার্থক্য এই যে, রামমোহনের বিচার সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক ধারায় মস্তিষ্কের পথে স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিচার আবেগের পথে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে। রামমোহনের লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক ও ধর্মান্ধ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজ, বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য ছিল রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজেব কাছে যুক্তিতর্ক ও বিচারের কোন মূল্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের আবেকমূলক প্রবন্ধগুলোও সেদিন যে তার কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, তাও মনে করবার কোনও কারণ নেই। তবু বিদ্যাসাগরের পথ যে স্বতন্ত্র ছিল, তাই এখানে বক্তব্য।

বিদ্যাসাগরের স্বরচিত জীবন-চরিত বাংলা সাহিত্যে 'আত্মচরিত' রচনার পথ-প্রদর্শক। দুর্ভাগ্যেয় বিষয়, গ্রন্থটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। তবে 'আত্মচরিত' গ্রন্থটিকে প্রবন্ধ-গ্রন্থ বলা যায় না, কিংবা এ'র ভিতরে প্রবন্ধের কোন লক্ষণও নেই। প্রকৃতপক্ষে এই রচনা বিবৃতিমূলক (narrative); কিন্তু এই বিবরণ যে কেবলমাত্র নীরস তথ্য পরিবেশনের মধ্যেই স্বীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি, বরং তার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ জীবনের অনুভূতিতে সরল হয়ে উঠেছে, তা' সহজেই অনুভব করা যায়। বাংলা গদ্য-রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ জীবনের স্পর্শ ইতিপূর্বে আর অনুভব করা যায়নি।

বিদ্যাসাগরের 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' তাঁর শেষ বয়সের একটি শোকোচ্ছাস মূলক রচনা। রচনাটি বেদনারসের অভিব্যক্তিতে করুণ এবং অনুভূতির গভীরতায় সার্থক। এই রচনাটিও বিদ্যাসাগরের 'আত্মচরিত'-এর অংশ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর রচিত প্রবন্ধমালার মধ্যে তাঁর যে-প্রবন্ধটির কথা প্রথম উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', তা' বাংলা প্রাচীন সাহিত্য

সমালোচনার পথিকৃৎ, এবং এই ধারা অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থ রচনা করেছেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, তা, সর্বপ্রথম কালিদাস প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর তাঁর উক্ত রচনায় উদ্ধৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ধারা অনুসরণ করেই করুণরসের সার্থক নাট্যকার 'উত্তর-রামচরিত' রচয়িতা ভবভূতির আলোচনা করেছেন। সাহিত্য বিচারে বিদ্যাসাগরের যে একটি যুক্তিবাদী অথচ সরস মন সক্রিয় ছিল, তা' সংস্কৃত কবি-নাট্যকারদের নিরপেক্ষ আলোচনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

আমাদের দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত ভাষাব মূল্য নিতান্ত সীমিত; কেবলমাত্র সনাতন বাঁধাধরা পথেই তার রসাস্বাদন হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু চরিত্রের যে-শক্তিতে তিনি সংস্কারের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই শক্তি নিয়েই সংস্কৃত সাহিত্যেরও সর্ব সংস্কার-মুক্ত মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ আমাদের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যখন উপেক্ষা এবং অবহেলার বিষয় হয়েছে, তখন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর কি মূল্যায়ন করেছিলেন, তা' আমাদের জানতে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক।

বিদ্যাসাগর উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনের ভিতর দিয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীর লোক জ্ঞানলাভ করেছে। সংস্কৃত ভাষার যে এই বিষয়ে একটি বিশেষ মূল্য আছে, বিদ্যাসাগরের পূর্বে একথা স্বদেশে কিংবা বিদেশে তখন পর্যন্ত কেউ বলেননি। কারণ, পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক অনুশীলনের ভিতর দিয়ে তখন পর্যন্তও এ' কথা কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সবেমাত্র যে-অনুশীলন আরম্ভ হয়েছিল, বিদ্যাসাগর যে তার সংবাদ রাখতেন, বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে তা' একটি পরম বিস্ময়। বিদ্যাসাগরের এই প্রবন্ধ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়; জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স-মূলারের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ তার আট বছর পর প্রকাশিত হয়।* তবে এ' কথা সত্য, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় সঙ্কলনের জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত যখন দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে রত্নরাজি আহরণ করছিলেন, তাঁর সহকর্মী বিদ্যাসাগরও তখন এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে ছিলেন না। তবে অক্ষয়কুমার দত্ত যেমন তাঁর সংগৃহীত বিশ্ববিদ্যার উপকরণসমূহ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙ্গালীকে উপহার দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন, বিদ্যাসাগর জাতীয় জীবনে তাদের মূল্য এবং প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করেছিলেন।

*Friedrich Maxmueller (1823-1900): *The Science of Language*-2 vols. London, 1861 and 1863—সম্পাদক।

ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা সত্বেও বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা অনুশীলনেরও যে কি প্রয়োজন, তা' যত গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনভাবে সেদিন আর তা' কেউ করেননি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ অনুশীলনের কল্যাণেই আমাদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। কারণ, তিনি যথার্থই মনে করেছেন, 'সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা এই মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব, ইহা কোন মতে সম্ভাবিত নহে।' সেইজন্য বিদ্যাসাগর স্বয়ং সহজে সংস্কৃত শিক্ষার বিধান নিজেই রচনা করে দিয়েছিলেন। কারণ, তাঁর সমসাময়িক কালে সংস্কৃত শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তা যেমন প্রাচীন তেমনই অনাবশ্যক হয়ে পড়েছিল; তিনি তার একটি নূতন পদ্ধতি রচনা করে দিয়ে সংস্কৃত শিক্ষার পথ সেদিন সুগম করে দিয়েছিলেন। সেইজন্য সংস্কৃত শিক্ষা আরও একশত বছরের অধিক কাল ধরে অগ্রসর হয়ে এসেছে। রামমোহন প্রবন্ধ রচনার যে ধারার সূত্রপাত করেছিলেন, তা প্রধানতঃ উনবিংশতি শতাব্দী অতিক্রম করে বিংশতি শতাব্দীর সিংহদ্বার অতিক্রম করে যেতে পারেনি। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যে ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক আচারমূলক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায়। তার একটি প্রধান কারণ এই যে, সে-যুগে স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বাঙালী জাতীয় চেতনায় উদবুদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সমাজের পরিবর্তে দেশমাতৃকার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। তখন থেকেই দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার একটি নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতি দেশের অতীত ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক উপকরণের পুনরুদ্ধার সাধনে ব্রতী হয়েছিল। তারই প্রেরণা বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে একটি নূতন শক্তি সঞ্চার করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যতদিন পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ততদিন স্বরচিত সঙ্গীতে ও প্রবন্ধে এই আন্দোলনের প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক প্রবন্ধরচনার আদর্শে উদবুদ্ধ হয়ে সেদিন বাংলা প্রবন্ধরচনার ধারাকে যাঁরা পরিপুষ্ট করতে অগ্রসর হয়ে এলেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি কেবলমাত্র দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি অনুসরণ করলেন না, পূর্ববর্তী যুগে অক্ষয়কুমার দত্ত যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার প্রবর্তন করেছিলেন, তার ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুললেন। বিংশতি শতাব্দীর প্রধান বিষয় বিজ্ঞান; ধর্ম এবং সমাজ এ-যুগের প্রথম থেকেই গৌণ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার ধারাটি স্থাপন করে বাংলা প্রবন্ধ রচনায় যুগের দাবিকে স্বীকার করে নিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা প্রধানতঃ ছিল আবেগমূলক। সুতরাং তা দীর্ঘকাল স্থায়িত্বলাভ করতে পারল না। আন্দোলনের বেগ স্তিমিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধারাটির গতিও স্তিমিত হয়ে পড়ল। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম থেকেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি স্থাপন করেছিলেন, বিংশতি শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে সেই ধারাটি বিকাশ লাভ করবে, তাই আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রামেন্দ্র-সুন্দরের অন্তর্দৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার কৌশল নিয়ে সেদিন কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। সেইজন্য তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গেই বিংশতি শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটির সৃষ্টি হয়েছিল, তা লুপ্ত হয়ে গেল। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে আমাদের দেশের যাঁরা কৃতি বৈজ্ঞানিক, তাঁরা বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে কেবল-মাত্র ইংরেজীতেই তাঁদের গ্রন্থাদি রচনা করে এসেছিলেন। তার ফলে রামেন্দ্রসুন্দরের পরবর্তিকালে খ্যাতনামা কোন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের রচিত বাংলা প্রবন্ধ লিখিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক আচার আলোচনায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য যেভাবে পুষ্টিলাভ করেছিল, বিংশতি শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্য সেভাবে সমৃদ্ধিলাত করতে পারেনি। অথচ বিংশতি শতাব্দীতে বিজ্ঞানচর্চা যদি বাংলা ভাষার মাধ্যমে না হয়, তাহলে এ যুগে প্রবন্ধ সাহিত্যের পুষ্টিলাভ সম্ভব হবে না। কারণ এ যুগের বিষয়ই বিজ্ঞান, ধর্ম কিংবা সমাজ নয়। উনবিংশতি শতাব্দীর তুলনায় বিংশতি শতাব্দীতে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অবনতির এটি বিশেষ কারণ বলে মনে হতে পারে। বিজ্ঞানচর্চা যদি আমাদের দেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে এখনও শুরু না হয়, তবে বিজ্ঞান শিক্ষা কেবলমাত্র যেমন মুষ্টিমেয় ইংরেজী শিক্ষিতের অধিকারভুক্ত হয়ে থাকবে, তেমনই বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যেরও কোন পুষ্টি হতে পারবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর প্রবন্ধ রচনার ধারাকে যিনি সর্বাধিক পুষ্ট করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। চৌদ্দ খণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলীর মধ্যে পাঁচটি সুবৃহৎ খণ্ডই রবীন্দ্রণাথের প্রবন্ধের সংগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-জীবনের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিককাল প্রবন্ধ রচনাতেই ব্যয় করেছেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার উত্তরসাধক কেউ নেই। একদিক দিয়ে ভাবপ্রবণতা, অন্যদিকে মননশীলতা, উভয়ের সঙ্গে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সংযোগে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ হয়ে আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায়, কথাসাহিত্য ও কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্র অনুসারীর অস্তিত্ব আছে, প্রবন্ধ সাহিত্যে তা নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার একমাত্র উত্তরসাধক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অকালে প্রাণত্যাগ করার ফলে তাঁর ধারা অধিকদূর অগ্রসর হতে

পারেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ রচনার যে একটি সুস্পষ্ট ধারা নির্দেশ করেছিলেন, সে পথে বহু অভ্যাগতের পদরেখা পড়বার অবকাশ ছিল। কেবলমাত্র যুগ-পরিবর্তনের ফলে এবং তজ্জাতীয় প্রতিভার অভাবে সে পথচিহ্ন ইতিমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তার পুনরুদ্ধারের আর কোন আশা নেই। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ রচনার যে একটি নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও কেবলমাত্র তাঁর নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-সাধকহীন তাঁরও ধারাটি লুপ্ত হয়ে গেছে। ইতিপূর্বেও আমরা দেখেছি, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে কোনো উত্তরসাধক রেখে যেতে পারেননি। কিন্তু আমরা দেখেছি, রামমোহন প্রবন্ধ রচনার যে ধারা স্থাপন করেছিলেন, তা উনবিংশ শতাব্দীর সীমারেখা অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ বাংলা প্রবন্ধ ক্রমেই আত্ম-অনুভূতিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রধানতঃ তথ্য এবং তত্ত্বনির্ভর প্রবন্ধ রচনা করেছেন বলে তাঁরা যেমন উত্তরসাধক রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ক্রমাগত একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি-কেন্দ্রিক হবার ফলে তা উত্তরসাধক না রেখেই লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রবন্ধের ভিতর ব্যক্তির বিশিষ্ট সত্তাটি যত মূর্ত হয়ে ওঠে, গোষ্ঠীর সত্তা তত প্রকাশ পায় না। সেইজন্য ব্যক্তির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ভাবধারারও অবলুপ্তি ঘটে। সার্থক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে উত্তরসাধক আশা করা যায় না। তাই রবীন্দ্রনাথের যেমন কোন উত্তরসাধক নেই, বিদ্যাসাগরেরও নেই।

১২ই এপ্রিল, ১৯৮৩

প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সম্পাদকের কলম

মানুষের চরণচিহ্নে পথহীন প্রান্তরের বুকে একদিন গ'ড়ে ওঠে পথ—সেই পথের চির পথিক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

অবশেষে 'বিদ্যাসাগর রচনাবলীর' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। অভিনন্দন বিদগ্ধ পাঠকবৃন্দকে, আর সম্ভাষণ তাঁদের, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে একে সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। এই প্রকাশনার মাধ্যমে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হলো।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ধূমকেতুর মত নয়—ধ্রুবতারার মতই। শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমাজ সচেতক মহাপুরুষের সমস্ত সাহিত্যকর্ম দিয়েই প্রথম খণ্ডের সূচিকা নিরূপিত হয়েছে। উত্তর খণ্ডগুলি যথাসময়েই পাঠকের দরবারে উপস্থাপিত করা হবে। বিদ্যাসাগরের প্রতিটি রচনা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রেখে রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো। প্রতিটি বাঙালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিশেষ ঋণী; কারণ জীবনের ঊষালগ্নে প্রত্যেকেরই 'বর্ণপরিচয়ের' নান্দীপাঠ করতে হয়েছে। বাঙলা গদ্যসাহিত্যের নতুন পথরেখা এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে।

'রঁন্যাসাঁ'-র রঙ্গমঞ্চে নতুন আলোলিকা উদিত হয়। হঠাৎ নতুন যুগ আসে কোনও উন্মাদ ছন্দে, এক আকস্মিকের ডঙ্কা বাজিয়ে, প্রত্যাশার ভীরু প্রার্থনা নয়, বিজয়ের অনিবার্য প্রতিশ্রুতি নিয়ে। যুগস্রষ্টার আগ্নেয় আবির্ভাবের পেছনে ছিল, সেই যুগের সাহিত্যে মিইয়ে পড়া হালছাড়া বিলাপকে দুর্বোধ বাণীর তীব্রতায় উচ্চকিত ক'রে তোলার সচেতন বিদ্রোহী প্রেরণা। যুগান্তরের আগন্তুক সাহিত্যস্রষ্টা তাই বিধাতার বার্তা বয়ে এনে কালের রুদ্ধদ্বারে পাঠালেন চিরদিনের প্রলয়-আহ্বান।

যুগসন্ধিক্ষণের মাহেন্দ্রলগ্নে উল্কার মত জাতীয় দিগন্তে আবির্ভূত হন: যুগপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি নিজেই একটা যুগ। সেদিন তার দুর্লক্ষ্য অক্ষরের অনধিগম্যতায় প্রবীণ নীতিবিদদের হতবুদ্ধি ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র নবীনতায় অপরিচিতের জয় ঘোষণা করেছিলেন। সেদিন সচেতন পাঠকের অনুমান করতে দেরী হয়নি, মহা কালেশ্বরের সামনে দুরূহ উত্তর দিতে গিয়ে নিরুত্তর নতশিরে যাঁদের যুগের প্রয়োজনে বিদায় নিতে হয়েছিল, তাঁরা কেউই বিদ্যাসাগরের অনুরাগীর দল নয়, বিদ্যাসাগর-বিদ্রোহীরই দল। নতুন যুগের অন্ধকার মিলিয়ে গেল—এল নতুন আলোর দীপশিখা।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রীঃতে মঙ্গলবার বেলা দুপুরে পৃথিবীর আলো প্রথম

দেখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরসিংহের সিংহশিশু সিংহরাশিতে পূর্ণচন্দ্র নিয়ে মেদিনীপুর আলোকিত করেন। শুধু বাংলায় নয়, সারা বিশ্বে তখন নতুন যুগের প্রাতঃকাল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক। ১৭৮৭-তে প্রথম পৃথিবীর লৌহপোত সৃষ্টি হয়। এরপর ১৮২১-তে প্রথম বাষ্পীয় পোত তার লৌহদণ্ড নিয়ে যাত্রা করে। Lawis Mumford তাঁর 'Technics & Civilization'-এ বলেছেন: 'The first iron ship was built in 1787 and the first iron steam-ship in 1821.'

যুগস্রষ্টা বিদ্যাসাগর যখন তাঁর ইহজীবনের যাত্রা শুরু করলেন, তখন বাষ্পীয় লৌহপোত সাগরের উজান ছেড়ে অজানার অভিযানে তার পথরেখার যাত্রাপথটি আরও সুগম করে তুলেছে। এটি ক্রমেই হলো গতিশীল। এই বাষ্পীয় লৌহপোত সেই শিল্প বিপ্লবের প্রথম পথিকের প্রতীকে আমাদের বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র এই নতুন গতিশীল যুগ-পথের প্রথম পথিক। এদেশের স্থাবর মনে য়ুরোপের জঙ্গম শক্তির দ্যোতনা এখানেই নতুন উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয়। এদেশের স্থিতিশীল সমাজে তিনিই প্রথম এক গতিশীল বাষ্পীয় লৌহপোত। এজন্য উভয়ের আবির্ভাব যেন একই সময়ে। উভয়ের লৌহ-কঠিন-বজ্র-কঠিন গতিপথরেখাও তাই একইভাবে এগিয়ে গেছে। উত্তরকালে তিনি তাঁর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের সেই আশ্চর্য লৌহদণ্ডটির দুর্জয় সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করেছেন তাঁর স্মরণীয় আত্মচরিতের অন্তরালে। আর স্মরণ করেছেন পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে; আর তাঁর জীবনপ্রভাতে সবচেয়ে প্রেরণাদাত্রী মাতা শ্রীযুক্তা ভগবতী দেবীকে; মাকে শ্রদ্ধা করেছেন বলেই নারীমুক্তি আন্দোলনে নতুন যুগের সূর্যবীজ বপন করেছিলেন অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে। একটি যুগাবসান এইভাবে যাত্রা করল নতুন যুগান্তরের দিকে।

প্রাচ্য বন্দরে প্রতীচ্য ঢেউ উদ্বেলিত হল। পশ্চিম সাগরতীরের লবণাক্ত জল কল্লোল শাণিত ব্যঙ্গের বাঁধ দিয়ে আটকাবার প্রচেষ্টা চলল। কিন্তু, য়ুরোপীয় শিক্ষা পেয়ে একদল মানুষ জাতীয় ঐতিহ্যকে নস্যাৎ ক'রে জীর্ণ বসনের মত পরিত্যাগ করেছিল, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বিপক্ষে ছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের ফল্গুধারায় তিনি স্নাত হয়েছিলেন। যুগপ্রভাতে প্রথমেই তিনি প্রাচীন গলিত সংস্কারের বিপক্ষে জেহাদ ঘোষণা করলেন। নতুন সংস্কারের সৃষ্টিময়তায় তিনি সচেষ্ট হলেন। জীবন সম্পর্কে উদার সহানুভূতি ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার তথ্যানুসন্ধানে বিদ্যাসাগর দ্বিতীয়রহিত। অবশ্য সবার ওপরে প্রবল পৌরুষ ও ক্ষাত্রবীর্য বিদ্যাসাগরের চলার পথে পরম সহায়ক হয়। পেলবতার সঙ্গে কঠোরতার সেতুবন্ধন হয়েছে গঙ্গা যমুনার মতই। সামাজিকানার রঙ্গালয়ে পুষ্পকোমল ও বজ্রকঠিন বক্ষে বেদনাশল্য বহন ক'রে দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেন যুগপুরুষ করুণাঘন বিদ্যাসাগর এক সুদক্ষ অভিনেতার মতই।

রবীন্দ্রনাথ 'বিদ্যাসাগর চরিতে' সঙ্গতকারণেই বলেছিলেন: "নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তার জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইবে।" এই অখণ্ড ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রাক্-বিদ্যাসাগর অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায় ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যেই বিকশিত হয়নি। সমাজ চেতনা, যদিচ, সামাজিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়, তা হলে সমাজ বিজ্ঞানীর চোখে বলা যায় যে, সামাজিক ব্যক্তিত্ব ও এক ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের মেলবন্ধনে এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর তারই প্রদীপ্ত প্রতীক। মাইকেল মধুসূদন দত্তই এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর চরিত্র প্রসঙ্গে সুন্দর দু'টি উক্তি যুগপৎভাবে করেছেন—(ক) 'The genius and wisdom of an ancient Sage', (খ) 'the energy of an Englishman'—তবু, সুপ্রাচীন ঋষিদের প্রজ্ঞা আর ইংরেজীর প্রাণশক্তি নিয়েই বিদ্যাসাগর অদ্বিতীয় প্রতিভা হতে পারতেন না; যদি না আত্মমর্যাদাজ্ঞান মানবতাবোধ ও জাগতিকচেতনার ত্রিবেণী সঙ্গম হত তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্যের মধ্যে। তাই সে-যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে যুগ প্রতিভূ হয়েছিলেন। বাংলা ভাষার তিনি যথার্থ শিল্পী, অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যতায় তিনি ভাস্বর, পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা সংস্কৃতির সেতুবন্ধক তিনি। এক নতুন পথরেখায় নতুন যুগকেই তিনি স্রষ্টার মত সৃষ্টি করেছেন বলেই বিদ্যাসাগর মানুষের সভ্যতার পথপ্রান্তে চিরকালেই পথিক, চিরকালের পথ-প্রদর্শক। অপদার্থ অসার বাঙালী সমাজে এমন সারবান মহামহিম এক উত্তুঙ্গ দেবদারুর আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হলো তা' সত্যিই বিশেষভাবে চিন্তার কথা। যে সদ্‌গুণের কিছু কিছু একমাত্র স্বাধীনচেতা য়ুরোপীয়দের মধ্যে দেখা যায় তা তাঁর মধ্যে আশ্চর্য-ভাবেই প্রতিফলিত হয়েছিল। অথচ, তিনি মনেপ্রাণে প্রকৃত বাঙালীই ছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতায় জীবনধারা বহমান, যার ধারাবাহিকতায় শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভ পদার্পন, নবন্যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্রাশ্রিত শক্তিসাধনার ক্রমবিকাশ; লোকযান, আউল-বাউল, সাঁইগুরু, কর্তাভজা, মুর্শিদা, মারফতি, ঢপকীর্তন ইত্যাদি প্রতীকী রহস্য সাধনার বিচিত্র অনুশীলন—তারই সঙ্গে উনিশ শতকের কৌলিক মেলবন্ধন, তার সঙ্গেই রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্রের নাড়ীর যোগ। সেকথা ভুললে বিদ্যাসাগরকে ভিন্ন গ্রহের এক আগন্তুক বলেই মনে হবে। বাংলা গদ্যের বনিয়াদ সংগঠনে তিনি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন।

প্রাক্-বিদ্যাসাগর অধ্যায়ে, ১৫৫৫ খ্রীঃতে 'মহারাজা নরনারায়ণের পত্র', ১৭৪৩-এ মানোএল দ্য আসুম্প্‌সাঁওর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', দোম আণ্টনিয় দ্য রোজারিয়োর 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ,' উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১), মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) বা রাজা রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর, ১৮২৩ খ্রীঃতে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' বা নকশাধর্মী রচনায় ১৮৫২ খ্রীঃতে প্রকাশিত মিস ক্যাথারিন মুলেন্সের "ফুলমণি

ও করুণার বিবরণী' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই ১৮৫৪ খ্রীঃতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' এবং তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয় সংস্কৃতবহুল গদ্যের প্রতীকতায়। ১৮৫৮তে চলতি বাংলার রূপকে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

'প্যারীচাঁদ মিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যের এক সীমানায় আছে কাদম্বরী, অন্য সীমানায় আছে, আলালের ঘরেরর দুলাল।" আশ্চর্যের বিষয়, 'শকুন্তলার' উর্ধ্বে 'কাদম্বরী'-কে স্থান দেওয়া হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবশিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র বা দীনবন্ধু মিত্র রক্ষণশীলতার জন্য যেখানেই সুযোগ পেয়েছিলেন সেখানেই বিদ্যাসাগরকে পরোক্ষ ভাবে আঘাত করেছিলেন। যেমন 'বিষবৃক্ষে'—'যে পণ্ডিত বিধবার বিবাহ দেন, সে যদি পণ্ডিত হয় তবে মূর্খ কে ?' বা 'নীলদর্পণে'—'ছিঃ ছিঃ সেই সাগর যে নাড়ের বিয়ে দেয়'—ইত্যাদি প্রণিধানযোগ্য। ১৮৭২ খ্রীঃতে 'বঙ্গদর্শনে' লেখার জন্য সব সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানান হয়, বাদ পড়েন শুধু বিদ্যাসাগর। এও এক বিস্ময়কর ঘটনা। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের অন্যতম কথাকার। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বর্ণপরিচয়ে'র প্রথম ভাগে লিংখছিলেন: 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। বিদ্যাসাগরের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই তাঁর গদ্যরীতি ব্যর্থতার মরুবালুরাশিতে বিলীন হয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে সেকথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে গেছেন: "সেদিন পড়িতেছি। জল পড়ে পাতা নড়ে। আমার জীবনে এইটেই আদি কবির প্রথম কবিতা।" রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ খ্রীঃর 'সহজ পাঠে'র মধ্যে 'বর্ণপরিচয়ের' প্রভাব অস্বীকার করতে পারেননি। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়ের' সাতরঙা ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটা বিকশিত হয়েছিল, আজও তা বর্ণে বর্ণে কিরণপাত ক'রে উদ্ভাসিত হচ্ছে সাহিত্য ও শিক্ষার দিগন্তে।

শোনা যায়, অমুদ্রিত 'বাসুদেব চরিত' বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রথম সাহিত্যকীর্তি। বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রথম (১) 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে শিশুদের জন্য গল্প সঙ্কলন প্রকাশ করেন ১৮৪৭ খ্রীঃতে। এরপর (২) 'বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ' ১৮৪৮তে লেখেন। (৩) জীবনচরিত লিখেছিলেন ১৮৪৯ খ্রীঃতে। (৪) শিশুপাঠ্য 'বোধোদয় ১৮৫১-তে তিনি রচনা করেন। (৫) 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'-ও এই একই সময় প্রকাশিত হয়। (৬) ঋতুপাঠের তিনটি ভাগও তিনি এই সালেই কর্মব্যস্ততায় লেখেন। (৭) 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-তে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ১৮৫৩ খ্রীঃতে। (৮) 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-ও এই সালে আত্মপ্রকাশ করে। (৯) মহাকবি কালিদাসের 'শকুন্তলার' ভাবানুবাদ ১৮৫৪ খ্রীঃতে এক যুগান্তর আনয়ন করে। (১০) 'বর্ণপরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে, (১১) 'সীতার বনবাস' ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত' ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুসরণে সুচারুভাবে প্রকাশিত হয় এবং সাহিত্য মহলে বিশেষ সমালোচনাও দেখা দেয় 'কান্নার জোলাপ' বিশেষণে, (১২) 'ভ্রান্তিবিলাস' গ্রন্থটি ১৮৬৯তে শেক্সপীয়রের

'দি কমেডি অব এরর'-এর ভাবানুবাদে তাঁর জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে সাধারণ পাঠক সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে, বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহের ওপর তাঁর আলোচিত নিবন্ধগুলি বিশেষ বিতর্কের সূচনা করে, 'কথামালা' থেকে 'শব্দমঞ্জরী' শিশুপাঠ্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। তাঁর দু'টি অসম্পূর্ণ রচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত' বা 'ভূগোলখগোল বর্ণনম্' তাঁর পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত করেন। প্রথম গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, কিন্তু অসম্পূর্ণ ব'লে শূন্যতার হাহাকারে বিদগ্ধ চিত্তে ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যের শিল্পরীতি সত্যিই বিশেষভাবে বুদ্ধি-বিদগ্ধ রসসমৃদ্ধ পাঠকের কাছে আবেদন এনেছে। (ক) তিনি তাঁর গদ্যে শিল্পীর বেদনা ও সংযম শাসন ক'রে সংস্কৃত শব্দকৈতবকে 'কলানৈপুণ্যের' মধ্যে উদ্বোধন করেন। (খ) সুন্দর, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন ও সংযত করে বিদ্যাসাগর তাঁর সাহিত্যের গতিবৈচিত্র্য আনেন, এতে সৃষ্টির আকার বেষ্টনীবদ্ধ হয়। (গ) অনাবশ্যক সমাসের আড়ম্বর থেকে মুক্ত করে আবশ্যক সমাস রচনা করেন এবং 'দূরান্বয় দোষ' স্খালন করেন সুচারুভাবে। (ঘ) গদ্যের মধ্যে তিনি ধ্বনিসামঞ্জস্য আনেন, কারণ এই ধ্বনিতরঙ্গে ভাষার শিল্পিত রূপ সুন্দর হয়, এতে অবশ্য পল্লবিত বাক্য প্রোৎসাহিত হয়, (ঙ) তিনি গদ্যরীতির মধ্যে 'অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোতের' কল্লোল উদ্বেলিত ক'রে এক অভিনব সৃষ্টিময়তায় স্মরণীয় হন, (চ) এই গদ্য-ছন্দ বাইরে তিনি স্পষ্ট করেননি, অথচ অন্তরে তা স্পষ্ট রীতিতে মুক্তগতি করে সৃষ্টিকৌশল চঞ্চলিত করেন। (ছ) স্থান বিশেষে কিছু অচলিত শব্দ সৃষ্টি হলেও, তা' পাঠকের বিরক্তি সে যুগের সাহিত্যে উৎপাদন করেনি। (জ) সৌম্য ও সরল শব্দ চয়নও বিপরীতক্রমে সাহিত্যে আনয়ন ক'রে গদ্যক্ষেত্রে ভাববিপ্লব আনলেও বুদ্ধি অপেক্ষা কয়েকস্থানে আবেগই প্রতীয়মান হয়। (ঝ) বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন; পূর্বে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন-এর প্রচলন ছিল না, এটি বাংলা গদ্য ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, সন্দেহ নেই। (ঞ) বাংলা গদ্যের প্রথম অনির্বচনীয় রস, সঞ্চার করেন এবং গদ্যরীতির মধ্যে একটি ক্লাসিক সুরতরঙ্গের অনুরণন শব্দিত করেছেন, (ট) বাংলা গদ্যের 'যথার্থ শিল্পী' রূপে বাক্যের দৈর্ঘ্য নিরূপণে সুমিতিহীনতা প্রয়োগ করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, কারণ সাহিত্যের শিল্পচেতনা অপেক্ষা সামাজিকানা তাঁর কাছে বেশ দূরান্বয় সাধন করেছিল। (ঠ) সবশেষে বলা যায় যে, বাংলার উচ্ছৃঙ্খল গদ্য সৈন্যকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক অতি বিশিষ্ট সাহিত্য সেনাপতি-রূপে সুবিভক্ত করে কার্যকুশলতা করে নতুন গদ্যরীতির রাজসিংহাসন বিজয় করে নতুন কীর্তির জয় পতাকা উড়িয়ে দেন মহাকালের সুপবনে।

'শকুন্তলা'-র প্রকাশকাল: ২৫শে অগ্রহায়ণ সংবৎ ১৯১১ ডিসেম্বর, ১৮৫৪ সাল। গ্যয়টে এই প্রসঙ্গে বলেন রবীন্দ্র চিন্তাচেতনায়: "তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, মর্ত্য এবং স্বর্গ যদি কেহ একাধারে পাইতে চায় তবে শকুন্তলার মধ্যে তাহা পাওয়া যাইবে।" এটি খণ্ডকাব্য আর দৃশ্যকাব্যের ত্রিবেণী রচনা করেছে। কালিদাসের কাব্য-স্রোতধারাকে এই বিদ্যাসাগর সাহিত্য ভগীরথের মতই বাংলা সাহিত্যের স্রোতাবর্ত্তে আনয়ন করে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেন। তবে, আদিরসাত্মক অংশগুলি তিনি বর্জন করেন। এগুলি মূলতঃ ছাত্রপাঠ্যগ্রন্থ বলে।

রাজা দুষ্মন্তের তীব্র শর নিক্ষেপে পশ্চাতে প্রবল হিংসায় ইন্দ্রিয় রিরংসার নগ্ন প্রতীকতা প্রতীয়মান হয়। হরিণীর পলায়নে শকুন্তলার নারীহৃদয়ের, পুরুষের কামনা থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা দেখা যায়। শার্দুল ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় হরিণীর বুকে। নারীপুরুষের দ্বৈত চিত্র এখানে চিরন্তনভাবেই কাব্যের ক্যানভাসে বর্ণাঢ্য হয়েছে। উনিশ শতকেও এই চিত্র বাংলার ভাগ্যাকাশে উদিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর স্বপ্নালুভাবে অবলোকন করেন। নারীচরিত্রের চরম স্খলন হয়, আর পুরুষ বহুবিবাহের ছলে তাদের আশক্তিকেই চিহ্নিত করে। 'শকুন্তলার মধ্যে বিদ্যাসাগর সমাজ-উদ্ধারের জন্য এবং নীতিবোধ সুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অকারণআদিরসাত্মক কালিদাসের রচনাগুলি বাদ দেন। এগুলির বর্জনের কারণ, এই শ্লোকগুলির অধিক প্রচারে সমাজ ব্যভিচারে গিয়ে সামাজিক অবনতি আনবে।

'কালিদাস গ্রন্থাবলী'-র মূল অনুবাদক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৩০৮) পৃঃ ৫৪১-৪২তে উল্লিখিত আছে যে: "শকুন্তলা: অনসূয়ে, আমার পরিধান বল্কল অত্যন্ত আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছে, অতএব, তুমি তাহা শিথিল করিয়া দাও। অনসূয়া শিথিল করিয়া বাঁধিয়া দিল। প্রিয়ংবদা (সহাস্যে), সখি, এই বিষয়ে তুমি পয়োধর বিস্তারের হেতুভূত আপন যৌবনারম্ভের প্রতি তিরস্কার কর। রাজা দুষ্মন্তের স্বগতোক্তি: পীনোন্নত স্তনযুগল আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার কান্তির পুষ্টিসাধন হইয়া উঠিতেছে না।"

বিদ্যাসাগরের তর্জমায় এর উল্লেখ নেই। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে কালিদাস যেখানে সচেষ্ট, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে অসামান্য সংযম নিয়েছেন। এতে গোঁড়ামি নেই, আছে শালীতা, যা উনিশ শতকের আধুনিকানার সূত্র। এখানে বিদ্যাসাগর বর্ণনা করেন: "ইহারা আশ্রমবাসিনী, ইহারা যেরূপ রূপবতী রমণী, আমার অন্তপুরে নাই। এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা। মহর্ষি অতি অবিবেচক, এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরিধান করাইয়াছেন। বল্কল পরিধান করিয়াও যারপরনাই মনোহারিণী হইয়াছেন।" (বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার, পৃঃ ৬৭ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে সামান্য সুযোগই কালিদাস

শকুন্তলার বক্ষ ও উরুর বর্ণনা করেন 'করভোরু' বলে; বিদ্যাসাগরের প্রজ্ঞা ও মনীষায় 'শকুন্তলা'র মধ্যে মুখচুম্বনের প্রচেষ্টা করেননি; 'শকুন্তলা'য় আছে প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের এক কৌতুকপূর্ণ বাক্যবিনিময়। অথচ, কালিদাসের রচনায় নির্জনে শকুন্তলাকে দুষ্মন্ত 'রসোঽস্মি' বলে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন।

'সীতার বনবাসের' প্রকাশকাল ১লা বৈশাখ, সংবৎ ১৯১৭ অর্থাৎ এপ্রিল, ১৮৬০ খ্রী:। দুষ্মন্তের কামনার শরে শকুন্তলার প্রেমজীবনে যে ক্ষতস্থান হয়, বিদ্যাসাগর তাতেই শান্তির প্রলেপ দিয়েছেন। কিন্তু শকুন্তলার কামনাকে তীব্রভাবে নিন্দা করে, নীতির নন্দনকাননে স্পষ্টতর করেন; অথচ বিধবা নারীর কামনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুগনায়ক বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ' আন্দোলনের উদ্বোধন করেছিলেন। আবার, বিধবা বিবাহ হলে যদিচ সামাজিক অত্যাচার হয়, এজন্যই ভারতীয় আদর্শের প্রাণপ্রতিমা সীতাকে 'সীতার বনবাসে' অঙ্কিত করলেন। আবার শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে কণ্বমুনির মুখ দিয়ে দাম্পত্য জীবন ও স্বামীর গৃহে নারীর ভূমিকা প্রসঙ্গে অসাধারণ অধ্যায় সংযোজন করেন। কারণ, শকুন্তলা বিলাপ করেই বলেন: "স্ত্রীসংস্থানং চাপ্‌সরস্তীর্থমারাদ্ উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম্।"

শ্রীকণ্ঠ পদলাঞ্ছন ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' ও বাংলার জাতীয় কবি কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণের' ভাবানুবাদে 'সীতার বনবাস' রচনা করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। কিন্তু বনবাস দিয়ে গ্রন্থটি শেষ না হলেও, 'সীতার বনবাস' কেন নামকরণ বিদ্যাসাগর করেছিলেন, তা বোঝা যায়নি। বিদ্যাসাগর হয়ত ভেবেছিলেন, সীতার পাতাল প্রবেশ বোধহয় বনবাসেরই নামান্তর। নতুন গবেষণায় জানা যায়, 'সোমপ্রকাশ' অনুসারে, ১৯১৮ সংবতের ১লা বৈশাখ: ১৮৬০ খ্রী: অ: = ১২৬৭ বঙ্গাব্দে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়ে তাঁর জীবিতকালেই পঁচিশবার মুদ্রিত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। 'উত্তররাম-চরিতে' আছে:

"স্নেহং দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমহি।
আরাধনায় লোকানং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা"

(প্রথম অঙ্ক, ১২শ শ্লোক)

—'বিদ্যাসাগর রচনাবলী' (তৃতীয়, পৃ: ১৩৭)-তে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুবাদ:—"যদি প্রজালোকের সর্বাঙ্গীণ অনুরঞ্জনের জন্য, আমার স্নেহ, দয়া, বা সুখভোগ বিসর্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না।"

মাইকেল মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিশুদ্ধ সারস্বত ইচ্ছায় বিদ্যাসাগর আবির্ভূত না হলেও, অনুবাদ অনেকটা ক্ল্যাসিক পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে কোথাও

কোথাও তিনি মৌলিক রচনার মত রূপ ও রসচর্বণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। বাংলা গদ্যের এই দুর্লভ লক্ষণ কিছু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়—বেশীটা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা লাভ করে। গদ্যের ছন্দের দোলন (Cadence) এবং ভাব, যতি (Sense Pause) অব্যাহত রেখে তালে তালে ধ্বনি স্পন্দন সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের নিজস্ব শিল্পরীতি।

উইলিয়াম শেক্সপীয়রের 'দি কমেডি অব এরর' একটি অপরিণত রচনা। কাহিনীর জন্য লাতিন নাট্যকার প্লটারস্-এর কাছে লেখক ঋণী। যমজ ভাইকে নিয়ে বিভ্রান্তি এই নাট্যাংশের মূল বিষয়বিন্যাস। ফলে বিভ্রান্তি যত বেশী হয়েছে, কৌতুকসঞ্চারী-ভাবও তত সুদূরপ্রসারী হয়েছে। হাস্যবিমুখ বাঙালীকে বিদ্যাসাগর হাসাতে চেয়েছেন ; ফলে অনুবাদক বিদ্যাসাগর মূল নাট্যকার প্রসঙ্গ ছুঁয়ে গেছেন, আর সাহিত্য প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। মূল নাটকে আছে : "Antipholus of Ephesus : Are you three wife : You might have come before...Adriona : Your wife, sir Knave! go get you from the door"—আর এর তর্জমায় বিদ্যাসাগর বলেছেন : "চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরজীব বলিলেন : বলি গিন্নি! আজকার একি কাণ্ড! চন্দ্রপ্রভা কোপে প্রজ্বলিত হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা,.. রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছ।" নাট্যকারের প্রতি শ্রদ্ধা অক্ষুন্ন রেখেও বোধহয় অনুবাদে এই স্বাধীনতাটুকু বাংলার শ্যামাশ্রীমণ্ডিত মৃত্তিকায় সূর্যবীজ স্থাপনের জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ নিঃসন্দেহে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেওয়া সমীচীন। এখানেই তিনি প্রথম নতুন গদ্যের সার্থক রূপায়ণ করেন। আর এজন্যই বইটির আর একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন বর্তমান।

মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস 'মহাভারতের' মহান স্রষ্টা রূপে চিহ্নিত। 'মহাভারতম্'-র আদি পর্বের ৬২টি অধ্যায়ের পরিপূর্ণরূপটি ১৮৪৮ খ্রীঃ থেকে ১৮৫২ খ্রীঃ অবধি চার বছরের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগর কর্তৃক তর্জমায় প্রস্তুত হয়েছিল। বেদব্যাসের রচনায় আছে : "লোমহর্ষণ পুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতের্দ্বাদশবার্ষিকো সত্রে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর তর্জমায় লিখেছিলেন : "কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।" এইটি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ অনুবাদ করেছিলেন : "কোনও সময়ে লোমহর্ষণের পুত্র পুরাণশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতিধর সৌতি বিনয়ে অবনত হইয়া, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে ব্রতচারী ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।" 'সীতার বনবাস' লেখার পরিপূরকরূপে 'রামের রাজ্যাভিষেক' বিদ্যাসাগরের সাহিত্যপ্রতিভার আর একটি দিকচিহ্ন অঙ্কিত করে। বইটি ১৮৬৯ খ্রীঃতে

প্রকাশিত হয়। মহাভারত ও রামায়ণের ওপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল—তা এর মধ্যে প্রকাশিত হয়। সময় সীমায় রামায়ণ প্রসঙ্গ তিনি পরে লিখেছিলেন, পূর্বাহ্ণেই মহাভারত তাঁকে নতুন পথের আলোকশিখা উদ্ভাসিত করেছিল। 'রামের রাজ্যাভিষেক'-এর ভাষা নিদর্শন: "অদ্য অধিবাস, কল্য রাম রাজা হইবেন, এই সংবাদ সর্বতঃ সঞ্চারিত হইবা মাত্র, সমস্ত অযোধ্যা নগর শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি ও আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।" এই দুই গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনার মৌলিকত্ব প্রকাশিত হয়েছে। আর 'সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে' ক্ল্যাসিক সাহিত্য গ্রন্থের প্রতি শুধুই শ্রদ্ধা নয়, সাহিত্য সমালোচনার নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেন।

বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যগ্রন্থের নাম: 'বাসুদেব চরিত'। হেনরি সারজেন্ট অনুসরণে এটি লিখলেও এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি। ১৮৪৯ খ্রীঃতে তিনি 'জীবন চরিত' রচনা করেন। এখানে একে একে স্থান পান: কোপার্নিকাস্, গালিলিয়ো, নিউটন, হার্শেল, গ্রোমাস্, লিনিয়াস, ডুবাল, উইলিয়াম জোনস, টমাস্ জেঙ্কিনস্ ইত্যাদি বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তিরা। এটি বালপাঠ্য বলে বিবেচিত হলেও, এর ভাষা বালক-বালিকার বোধগম্য বিশেষ হয়নি। জীবনচরিত লিখতে গিয়ে বিদ্যাসাগর হঠাৎ আত্মচরিত লিখতে শুরু করেন। বিদ্যাসাগরের অসম্পূর্ণ জীবনচরিত বাংলা গদ্যসাহিত্যের আর এক স্মরণীয় সৃষ্টি, সন্দেহ নেই।

যিনি নিজেই সকলের কাছে দয়ার পাত্র—সেখানে তিনি সকলকে দয়া ক'রে দয়ার সাগর রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই 'আত্মচরিতে' বিদ্যাসাগর চরিত্রের বিশেষ দিকটিই ফুটে ওঠে। প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর অসামান্য আত্মমর্যাদা জ্ঞান অক্ষুণ্ণ ছিল। অন্যায়ের প্রতি যেন এক দুর্নিবার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে 'বজ্রাদপি কঠোরাণী মৃদুনী কুসুমাদপি' রূপে প্রকাশ করেন। রামজয় তর্কভূষণ, ভগবতী দেবী আর রাইমণি চরিত্রত্রয় সত্যই মনে রাখার মত। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছিলেন: "যাহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্য তাহাকে দরিদ্র করিতে পারে না।" আর, 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' বিদ্যাসাগরের শেষজীবনের আর এক শোক উচ্ছ্বাস মাত্র।

বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখেই বিদ্যাসাগর বাংলাদেশের জীবনচিত্র অঙ্কন করতে মহৎ সাধনায় ব্রতী হলেন! এর উৎসমূলে ছিল—জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান বিরোচিত "Out Lines of the History of Bengal for the use of youths in India"—যা তদানীন্তন সমাজের একটি দলিল বিশেষ। 'বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ লেখেন পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন; আর বিদ্যাসাগর 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' দ্বিতীয়ভাগ রচনা করেন ১৮৪৮ খ্রীঃতে। কিন্তু ন্যায়রত্নের ইতিহাসের প্রথম ভাগ

মুদ্রিত হয় ১৮৫৯ খ্রীঃ-তে। এর আগে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম্‌', ফেলিকস কেরী 'ব্রিটেনের বিবরণী' পিয়ারসনের 'প্রাচীন ইতিহাসসমুচ্চয়'-তে বাংলাদেশের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস রচিত হয়। বিদ্যাসাগর ভূমিকায় বলেছিলেন : "অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয়ের অধিকার সমাপ্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।" রামগতি ন্যায়রত্ন প্রথম ভাগে বাংলার ইতিবৃত্তের যে অর্ধবৃত্ত রচনা করেন, তাই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতীয় ভাগে আর এক বৃত্ত সম্পূর্ণ রচনা ক'রে বাঙালীর জাতীয় জীবনীকাররূপে চিরদিনই শ্রদ্ধার কুসুম অর্জন করেছেন। অজ্ঞতার নিশ্চিন্ত বিজ্ঞতায় অনেকেরই ধারণা, কৃষকবিপ্লব বা নীলকর আন্দোলনে তাঁর নীরবতা বিস্ময়কর। কিন্তু সমাজবিপ্লব ও সাহিত্যের ভাববিপ্লবের স্রষ্টা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সর্বত্রগামী হওয়া সম্ভব নয়। তবু তিনি অনন্য।

যুগপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চারিত্রমূর্তির পরিচয় তাঁর রচনারীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। 'বিদ্যাসাগরের রচনাবলী' এক অনন্য সম্পদ। জাতীয় জীবনে নতুন আলোর দিশারী। 'প্রথম রচনাবলী'-র পরিকল্পনা করে অসামান্য গ্রন্থের সম্পাদনা করেছিলেন প্রয়াত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস। ভূমিকা লিখেছিলেন জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তারপর সাহিত্যিক অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'বিদ্যাসাগর রচনা সম্ভার' প্রকাশ করেছিলেন সুন্দর ভূমিকা সহ। তারপরই দেবকুমার বসুর সম্পাদনায় ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকায় রচনাবলীর চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। কিছুদিন আগে সাহিত্যিক গোপাল হালদারের সম্পাদনায় 'বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু, এর সবগুলি বর্তমানে অমুদ্রিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বর্তমান সংস্করণের মূল্যবান ভূমিকা লিখে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। পূর্বসূরীদের পথনির্দেশেই দুরূহ 'বিদ্যাসাগর রচনাবলীর' সম্পাদনায় ব্রতী হয়েছি। অনুপ্রেরণা দিয়েছেন সবচেয়ে বেশী—'অগ্রগতি'-র অগ্রপথিক আশু চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বিদ্যাসাগর রচনাবলীর' প্রকাশক শ্রীবিজয় দাস ও বিশেষ ক'রে শ্রীঅজয় দাসকে অভিনন্দন জানাতে হয়, শুধু শুষ্ক অভিনন্দন দিয়ে এঁদের বিব্রত করা উচিত নয়। আর বলতে চাই না তাঁর কথা, যিনি পূর্ণিমার মতই সদা উদ্ভাসিতা।

এই রচনাবলী প্রসঙ্গে কারুর কিছু বক্তব্য থাকলে, তিনি প্রকাশকের ঠিকানায় তা' জানাতে পারেন। সনমস্কার,

১লা বৈশাখ, ১৩৯০
প্রধান অধ্যাপক। বাঙলা সাহিত্য শাখা,
বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ। কলিকাতা-৬

দীপন চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

শকুন্তলা

ভূমিকা

ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল সংস্কৃত ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূলগ্রন্থের অলৌকিকচমৎকারিত্বসন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাঁহারা অভিজ্ঞানশকুন্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাঁহারা অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিবেন; এবং, সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কত শত বার, আমায় তিরস্কার করিবেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কালিদাসের ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঠকবর্গ! বিনীত বচনে আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলের উৎকর্ষপরীক্ষা না করেন।

কলিকাতা। সংস্কৃত কলেজ।
২৫এ অগ্রহায়ণ। সংবৎ ১৯১১।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

শকুন্তলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

অতি পূর্ব্ব কালে, ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ করিল। রাজা রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞা দিলেন, মৃগের পশ্চাৎ রথচালন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল।

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মৃগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না, বধ করিবেন না। সারথি, শুনিয়া অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে, নিষেধ করিতেছেন। রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণমাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায় রশ্মি সংযত করিয়া রথের বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল।

এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! এ আশ্রমমৃগ, বধ করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্রসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মৃগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে। শরাসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শস্ত্র আর্ত্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধের প্রহারের নিমিত্ত নহে।

রাজা, লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ, সংহিত শরের প্রতিসংহরণ পূর্ব্বক, প্রণাম করিলেন। তপস্বীরা, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্য তদুপযুক্তই বটে! প্রার্থনা করি, আপনকার পুত্রলাভ

হউক, এবং সেই পুত্র এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন রাজা প্রণাম করিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিলাম।

অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ! ঐ মালিনী নদীর তীরে, আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কার্য্যক্ষতি না হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা কেমন নির্বিঘ্নে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকার ভুজবলে ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত হইতেছে। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, মহর্ষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীরা কহিলেন, না মহারাজ! তিনি আশ্রমে নাই; এইমাত্র, স্বীয় তনয়া শকুন্তলার হস্তে অতিথিসৎকারের ভারার্পণ করিয়া, তদীয় দুর্দৈবশান্তির নিমিত্ত, সোমতীর্থ, প্রস্থান করিলেন। রাজা কহিলেন, মহর্ষি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। আমি, অবিলম্বে, তদীয় তপোবন দর্শন করিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।

রাজা সারথিকে কহিলেন, সূত! রথচালন কর, তপোবনদর্শন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র করিব। সারথি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্বার রথচালন করিল। রাজা কিয়ৎ দূর গমন ও ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, সূত! কেহ কহিয়া দিতেছে না, তথাপি তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেখ! কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে, তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুদীফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; ঐ দেখ, কুশভূমিতে হরিণশিশু সকল, নিঃশঙ্ক চিত্তে, চরিয়া বেড়াইতেছে; এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন।

রাজা, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, সূত! আশ্রমের উৎপীড়ন হওয়া উচিত নহে; অতএব, এই খানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর, তিনি স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সূত! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য; অতএব, শরাসন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া, রাজা সেই সমস্ত সূতহস্তে ন্যস্ত করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আজ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব আশ্রমবাসীদিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, উহাদিগকে ভাল করিয়া বিশ্রাম করাও। সারথিকে এই আদেশ দিয়া, রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন।

তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, তদীয় বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ, শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে ; ঈদৃশ স্থানে মাদৃশ জনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই হইতে পারে। মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রিয়সখি! এ দিকে, এ দিকে ; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে, যেন স্ত্রীলোকের আলাপ শুনা যাইতেছে ; কিন্তু বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইল।

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজা দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্প-বয়স্কা তপস্বিকন্যা, অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আসিতেছেন। রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, ইহারা আশ্রমবাসিনী ; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্য্যগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল। এই বলিয়া, তরুতলে দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা, অনিমিষ নয়নে, তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাতে কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। দেখ, তুমি নবমালিকাকুসুমকোমলা, তথাপি তোমায় আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি অনসূয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, এমন নয় ; আমাদেরও ইহাদের উপর সহোদরস্নেহ আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! গ্রীষ্মকালে যে সকল বৃক্ষের কুসুম হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে, যাহাদের কুসুমের সময় অতীত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগের সেচন করি। অনন্তর, সকলে মিলিয়া, সেই সমস্ত বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন।

রাজা, দেখিয়া শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক ; এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কল পরাইয়াছেন। অথবা, যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবলযোগেও বিলক্ষণ

শোভা পায়; যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্কসম্পর্কেও সাতিশয় শোভমান হয়; সেইরূপ, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, বল্কল পরিধান করিয়াও, যার পর নাই, মনোহারিণী হইয়াছেন। যাহাদের আকার স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্য্যে সুশোভিত, তাহাদের কি না অলঙ্কারের কার্য্য করে।

শকুন্তলা, জলসেচন করিতে করিতে, সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে, সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ হইতেছে, যেন সহকার, অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে, অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি, সহকারতরুতলে গিয়া, দণ্ডায়মানা হইলেন। তখন, প্রিয়ংবদা পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি! ঐ খানে খানিক থাক। শকুন্তলা জিজ্ঞাসিলেন, কেন সখি? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবর্ত্তিনী হওয়াতে, যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল। শকুন্তলা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই জন্যেই তোমায় সকলে প্রিয়ংবদা বলে।

রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাসশ্রবণে, সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে কেন না, শকুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার সম্পূর্ণ আবির্ভাব বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত আর, নব যৌবন, বিকসিত কুসুমরাশির ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

অনসূয়া কহিলেন, শকুন্তলে! দেখ, দেখ, তুমি যে নবমালিকার বন-তোষিণী নাম রাখিয়াছ, সে, স্বয়ংবরা হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, বনতোষিণীর নিকটে গিয়া, সহর্ষ মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনসূয়ে! দেখ, ইহাদের উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা, বিকসিত নব কুসুমে সুশোভিতা হইয়াছে আর সহকারও ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে, প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে অনসূয়াকে কহিলেন, অনসূয়ে! কি জন্যে শকুন্তলা সর্ব্বদাই বনতোষিণীকে উৎসুক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনসূয়া কহিলেন, না সখি! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, যে, বনতোষিণী যেমন সহকারের সহিত সমাগতা হইয়াছে, আমিও যেন সেইরূপ আপন অনুরূপ বর পাই। শকুন্তলা বলিলেন, এটি তোমার আপনার মনের কথা।

শকুন্তলা, এই বলিয়া, অনতিদূরবর্ত্তিনী মাধবীলতার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্র পর্য্যন্ত মুকুল নির্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! আমিও তোমায় এক প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রদর্শিত করিয়া, কহিলেন, এ তোমার মনগড়া কথা, আমি শুনিতে চাই না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, না সখি! আমি পরিহাস করিতেছি না। পিতার মুখে শুনিয়াছি, তাই বলিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম, এ তোমারই শুভসূচক। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, অনসূয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে! এইজন্যেই শকুন্তলা মাধবীলতায়, এতাদৃশ যত্ন সহকারে, জলসেচন ও উহার প্রতি এতাদৃশ স্নেহ-প্রদর্শন করে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয় মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সতত সস্নেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

এই বলিয়া শকুন্তলা মাধবীলতায় জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন। এক মধুকর মাধবীলতার অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেচ করিবামাত্র, মাধবীলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিকসিত কুসুম ভ্রমে, শকুন্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। শকুন্তলা করপল্লবসঞ্চালন দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। দুর্বৃত্ত মধুকর তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্ গুন্ করিয়া অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন শকুন্তলা একান্ত অধীরা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর, দুর্বৃত্ত মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে। তখন উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর রাজারাই তপোবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উত্তরোত্তর ভ্রমর অধিকতর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ, এই দুর্বৃত্ত কোনও মতে নিবৃত্ত হইতেছে না আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া দুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি আপদ্! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। সখি! পরিত্রাণ কর। তখন তাঁহারা পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি, দুষ্মন্তকে স্মরণ কর, তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন।

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু রাজা বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি করি। অথবা, অতিথিভাবে উপস্থিত হইয়া অভয় প্রদান

করি। এই স্থির করিয়া, রাজা, সত্বর গমনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত ভূর্ভুবিদিগের শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য মুগ্ধস্বভাবা তপস্বিকন্যাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করে?

তপস্বিকন্যারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে, অনসূয়া কহিলেন, না মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্টঘটনা হয় নাই। তবে কি জানেন, এক মধুকর আমাদের প্রিয়সখি শকুন্তলাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়াছিল; তাহাতেই ইনি কিছু হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে? শকুন্তলা লজ্জায় জড়ীভূতা ও নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। অনসূয়া, শকুন্তলাকে উত্তরদানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, হাঁ মহাশয়! নির্বিঘ্নে তপস্যাকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে; এক্ষণে অতিথিবিশেষের সমাগমলাভ দ্বারা, সবিশেষ সম্পন্ন হইল। প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি! যাও, যাও, শীঘ্র কুটীর হইতে অর্ঘ্যপাত্র লইয়া আইস; জল আনিবার প্রয়োজন নাই, এই কলসে যে জল আছে, তাহাতেই প্রক্ষালনক্রিয়া সম্পন্ন হইবেক। রাজা কহিলেন, না, না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না। মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই আতিথ্যক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তখন অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! তবে এই শীতল সপ্তপর্ণবেদীতে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। রাজা কহিলেন, তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম কর। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি শকুন্তলে! অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত; এস, আমরাও বসি। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে? এই বলিয়া তিনি, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন। রাজা তাপসকন্যাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদের সমান রূপ, সমান বয়স, সমান ব্যবসায়; সেই নিমিত্ত তোমাদের সৌহৃদ্য সাতিশয় রমণীয় হইয়াছে। প্রিয়ংবদা, রাজার অগোচরে অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! এ ব্যক্তি কে? দেখ, কেমন সৌম্যমূর্ত্তি, কেমন গম্ভীরাকৃতি, কেমন প্রভাবশালী; একান্ত অপরিচিত হইয়াও, মধুর আলাপ দ্বারা, চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায়, প্রতীতি জন্মাইতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও এ বিষয়ে

কৌতূহল জন্মিয়াছে, ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনকার মধুর আলাপ শ্রবণে সাহসিনী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি, আপনি কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্ দেশকেই বা সম্প্রতি আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তেই বা, এরূপ সুকুমার হইয়াও, তপোবনদর্শনপরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্তলা, শুনিয়া, মনকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যে জন্যে ব্যাকুল হইতেছ, অনসূয়া সেই বিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতেছে।

রাজা শুনিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি রূপে আত্ম-পরিচয় দি; যথার্থ পরিচয় দিলে, সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ তিনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! আমি এই রাজ্যের ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসঙ্গে এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। অনসূয়া কহিলেন, অদ্য তপস্বীদিগের বড় সৌভাগ্য; মহাশয়ের সমাগমে তাঁহারা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেক। এইরূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল। কিন্তু, পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই চিত্ত চঞ্চল হইল এবং উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে, শকুন্তলাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাকিতেন, জীবন-সর্ব্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুন্তলা, শুনিয়া, কৃত্রিম কোপ-প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা কিছু মনে করিয়া এই কথা বলিতেছ; আমি তোমাদের কথা শুনিতে চাই না।

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন,আমি তোমাদের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছা করি। তাঁহারা কহিলেন, মহাশয়! আপনকার এ অভ্যর্থনা অনুগ্রহবিশেষ; যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, মহর্ষি কণ্ব কৌমারব্রহ্মচারী, ধর্ম্মচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত; জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই। অথচ, তোমাদের সহচরী তাঁহার তনয়া; ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজার এই জিজ্ঞাসা শুনিয়া, অনসূয়া কহিলেন, মহাশয়! আমরা প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। শুনিয়া থাকিবেন, বিশ্বামিত্র নামে এক অতি প্রভাবশালী রাজর্ষি আছেন। তিনি,

একদা, গোমতী নদীর তীরে, অতিকঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজর্ষির সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত, মেনকানাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। মেনকা, তদীয় তপস্যাস্থানে উপস্থিত হইয়া, মায়াজাল বিস্তৃত করিলে. মহর্ষির সমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা সখীর জনক ও জননী। নির্দয়া মেনকা; সদ্যঃপ্রসূতা তনয়াকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী সেই বিজন বনে অনাথা পড়িয়া রহিলেন। এক শকুন্ত, কোনও অনির্ব্বচনীয় কারণে, স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পক্ষপুট দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক আমাদের সখীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। দৈবযোগে. তাত কণ্ব, পর্য্যটন ক্রমে, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হইল। তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় তনয়ার ন্যায়, লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং, প্রথমে শকুন্ত পালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত, নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

রাজা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে; নতুবা, মানবীতে কি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে কখনও জ্যোতির্ম্ময় বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্রমুখী লইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা হাস্যমুখে, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে, বোধ হইতেছে, যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন! শকুন্তলা, রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদাকে লক্ষ্য করিয়া, ভ্রূভঙ্গী ও অঙ্গুলিসঞ্চালন দ্বারা তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাজা কহিলেন, বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছ; তোমাদের সখীর বিষয়ে, আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। প্রিয়ংবদা কহিলেন, আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? যাহা ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা কহিলেন, আমার জিজ্ঞাস্য এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্য্যন্ত মাত্র তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া চলিবেন, অথবা, যাবজ্জীবন, হরিণীগণ সহবাসে, কালহরণ করিবেন। প্রিয়ংবদা কহিলেন; তাত কণ্ব সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, অনুরূপ পাত্র না পাইলে শকুন্তলার বিবাহ দিবেন না। রাজা শুনিয়া, নিরতিশয় হর্ষিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভাবনীয় নহে। হৃদয়! আশ্বাসিত হও, এক্ষণে সংশয়ের নিরাকরণ হইয়াছে; এ সুখস্পর্শ শীতল রত্ন; ইহাকে প্রদীপ্ত অগ্নি ভাবিয়া আর শঙ্কিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

শকুন্তলা কৃত্রিম কোপদর্শন করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে ! আমি চলিলাম : আর আমি এখানে থাকিব না। অনসূয়া কহিলেন, সখি ! কি নিমিত্তে? শকুন্তলা বলিলেন, দেখ, প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে ; আমি আর্য্যা গৌতমীর নিকটে গিয়া এই সকল কথা বলিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি ! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত পরিচর্য্যা করা হয় নাই। বিশেষতঃ, আজ তোমার উপর অতিথিপরিচর্য্যার ভার আছে। অতএব, ইঁহারে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। শকুন্তলা, কিছু না বলিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি ! তুমি যাইতে পাইবে না ; আমার এক কলসী জল ধার ; আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব ! শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, ঋণপরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন। তখন রাজা প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, তাপসকন্যে ! তোমায় সখী বৃক্ষসেচন দ্বারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন ; আর উঁহাকে, পল্বল হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা উচিত হয় না। আমি তোমার সখীকে ঋণমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া, রাজা, স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া, জলকলসের মূল্যস্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, অঙ্গুরীয় রাজকীয় নামাক্ষরে অঙ্কিত দেখিয়া, চকিত হইয়া, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অঙ্গুরীতে দুষ্মন্তনাম মুদ্রিত আছে, অর্পণসময়ে রাজার তাহা মনে ছিল না। এক্ষণে, তিনি, আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা দর্শনে সাবধান হইয়া কহিলেন, রাজকীয় নামাক্ষর দেখিয়া তোমরা অন্যথা ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ ; রাজা আমায়, প্রসাদচিহ্নস্বরূপ, এই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছেন। প্রিয়ংবদা, রাজার ছল বুঝিতে পারিয়া, সহাস্য বদনে কহিলেন, মহাশয় ! তবে এই অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিবিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে ; আপনার কথাতেই ইনি ঋণে মুক্ত হইলেন ; পরে, ঈষৎ হাসিয়া, শকুন্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন, সখি শকুন্তলে ! এই মহাশয়, অথবা মহারাজ, তোমায় ঋণে মুক্ত করিলেন ; এক্ষণে, ইচ্ছা হয়, যাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে ; অনন্তর, প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি যাই, না যাই, তোমার কি ?

রাজা, শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ইঁহার প্রতি যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পারিতেছি

না। অথবা, আর সন্দেহের বিষয় কি? আমার সহিত কথা কহিতেছে না; অথচ, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্ত হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিতেছে; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া লইতেছে; অথচ, অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না। অন্তঃকরণে অনুরাগসঞ্চার না হইলে, কামিনীদিগের কদাচ এরূপ ভাব হয় না।

রাজা ও তাপসকন্যাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে, এমন সময়ে, সহসা, অনতিদূরে, অতি মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল, এবং কেহ কহিতে লাগিল, হে তপস্বিগণ! মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত, সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে, তপোবন সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা, আশ্রমস্থ প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থে, সত্বর ও যত্নবান্ হও; বিশেষতঃ, এক আরণ্য হস্তী, রাজার রথদর্শনে নিরতিশয় চকিত হইযা, তপস্যার মূর্তিমান বিঘ্নস্বরূপ, ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে।

তাপসকন্যারা শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আপদ্! অনুযায়ী লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, তপোবনের পীড়া জন্মাইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে, সত্বর নিবারণ করা আবশ্যক। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, মহারাজ! আরণ্য গজের উল্লেখ শুনিয়া আমরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি; অনুমতি করুন, কুটীরে যাই। রাজা ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, তোমরা কুটীরে যাও; আমিও তপোবনের পীড়াপরীহারের নিমিত্ত চলিলাম। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন, মহারাজ! যেন পুনরায় আপনার দর্শন পাই। সমুচিত অতিথিসৎকার করা হয় নাই; এজন্য, আমরা অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। রাজা কহিলেন, না, না; তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ হইয়াছে।

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পা চলিয়া, ছল করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! কুশাগ্র দ্বারা পদতল ক্ষত হইয়াছে; এজন্য, আমি শীঘ্র চলিতে পারিতেছি না; আর আমার বল্কল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া লই। এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলা, সতৃষ্ণ নয়নে, রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া, আর আমার নগরগমনে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অতএব, তপোবনের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশিত করি; কি আশ্চর্য্য! আমি, কোনও মতেই, আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মৃগয়ায় আগমনকালে, স্বীয় প্রিয়বয়স্য মাধব্যনামক ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কালযাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী ও সুখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র ক্লেশ হইলে, তাহাদের একান্ত অসহ্য হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষবিধ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেন। অরণ্যে যে সকল সুখভোগের সম্পর্ক ছিল না; প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়া উঠিয়াছিল।

এক দিবস, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মাধব্য মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দুল, এই করিয়া, মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও বননদী সকল শুষ্কপ্রায় হইয়া আইসে; যে অল্পপ্রমাণ জল থাকে, তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে, অতিশয় কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ; তাহাও প্রত্যহ প্রভূতরূপ পাক করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত অশ্ব-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে যে, রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়, কিন্তু, ব্যাধগণের বনগমনকোলাহলে, অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়। ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস, আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, রাজা, একাকী, এক মৃগের অনুসরণক্রমে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ, শকুন্তলানাম্নী এক তাপসকন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি নগরগমনের কথা আর মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই, রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল; এক বারও চক্ষু মুদি নাই।

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজা, মৃগয়ার বেশধারণ পূর্ব্বক, তৎকালোচিত সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই

দিকে আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন, বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি; তাহা হইলেও, যদি আজ বিশ্রাম করিতে পাই। এই বলিয়া, মাধব্য, ভগ্নকলেবরের ন্যায়, একান্ত বিকল হইয়া রহিলেন; পরে রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, বয়স্য! আমার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আছে; হস্ত প্রসারিত করি, এমন ক্ষমতা নাই; অতএব, কেবল বাক্য দ্বারাই আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! তোমার শরীর এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন, কেন হইল কি আবার; স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়া দিয়া, অশ্রুপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজা কহিলেন, বয়স্য! বুঝিতে পারিলাম না, স্পষ্ট করিয়া বল। মাধব্য কহিলেন, নদীতীরবর্ত্তী বেতস যে কুব্জভাব অবলম্বন করে, সে কি স্বেচ্ছা বশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদীর বেগপ্রভাবে? রাজা কহিলেন, নদীর বেগ তাহার কারণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের। রাজা কহিলেন, সে কেমন? মাধব্য কহিলেন, আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে, রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, বনচরের ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক, নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে। আমি ব্রাহ্মণের সন্তান, সর্ব্বদা, তোমার সঙ্গে সঙ্গে, মৃগের অন্বেষণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, অন্ততঃ, এক দিনের মত, আমায় বিশ্রাম করিতে দাও।

রাজা, মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ ত এইরূপ কহিতেছে; আমারও, শকুন্তলাদর্শন অবধি, মৃগয়া বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি না; তাহাদের মঞ্জুল নয়ন নয়নগোচর হইলে, শকুন্তলার অলৌকিকবিভ্রম-বিলাসশালী নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য, রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন, ইনি আর কিছু ভাবিতে লাগিলেন, আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। রাজা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, না হে না, আমি অন্য কিছু ভাবিতেছি না, সুহৃদ্বাক্য লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায় আজ মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব্য, শ্রবণমাত্র, যার পর নাই আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া, চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন, রাজা কহিলেন, বয়স্য! যাইও না, আমার কিছু কথা আছে। মাধব্য, কি কথা বল বলিয়া, শ্রবণোন্মুখ হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোনও অনয়াসসাধ্য কর্ম্মে

আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন, বুঝিয়াছি, আর বলিতে হইবেক না, মিষ্টান্নভক্ষণে; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটে, অনায়াসেই সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পারিব। রাজা কহিলেন, না হে না, আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, রাজা সেনাপতিকে আনিবার নিমিত্ত আদেশ দিলে।

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছেন কেন, মৃগয়ায় চলুন। রাজা কহিলেন, আজ মাধব্য মৃগয়ার দোষকীর্ত্তন করিয়া আমায় নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেনাপতি, রাজার অগোচরে, অনুচ্চ স্বরে মাধব্যকে কহিলেন, সখে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি কিয়ৎ ক্ষণ প্রভুর চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করি; অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও কখন কি না বলে? মৃগয়া অপকারী কি উপকারী, মহারাজই বিবেচনা করুন না কেন। দেখুন, প্রথমতঃ, স্থূলতা ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্ম্মণ্য হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তুগণের মনের গতি কিরূপ হয়, তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; আর, চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া আইসে; মহারাজ! যদি চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয়, ধনুর্দ্ধরের পক্ষে অধিক শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে? যাহারা মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণ্য করে, তাহারা নিতান্ত অর্বাচীন; বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ, এরূপ উপকার, আর কিসে আছে? মাধব্য শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অরে নরাধম! ক্ষান্ত হ' আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না; আজ উনি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুই, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন, নরনাসিকালোলুপ ভল্লুকের মুখে পড়িবি।

উভয়ের এইরূপ বিবাদারম্ভ দেখিয়া, রাজা সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা আশ্রমসমীপে আছি; এজন্য, তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না। অদ্য মহিষেরা নিপানে অবগাহন করিয়া নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক; হরিণগণ তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া রোমন্থ অভ্যাস করুক; বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তাভক্ষণ করুক; আর, আমার শরাসনও বিশ্রামলাভ করুক। সেনাপতি কহিলেন, মহারাজের যেমন অভিরুচি। রাজা কহিলেন, তবে যে সমস্ত মৃগয়াসহচর অগ্রেই বনপ্রস্থান করিয়াছে, তাহাদিগকে

ফিরাইয়া আন; আর, সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে সবিশেষ সতর্ক করিয়া দাও, যেন তাহারা কোনও ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

সেনাপতি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, নিষ্ক্রান্ত হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়াসহচরদিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে, তাহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য, সন্নিহিত লতামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া, শীতল শিলাতলে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে উভয়ে নির্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা মাধব্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই; কারণ দর্শনীয় বস্তুই দেখ নাই। মাধব্য কহিলেন, কেন তুমি ত আমার সম্মুখে রহিয়াছ। রাজা কহিলেন, তা নয় হে, আমি আশ্রমললামভূতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, এ কি বয়স্য! তপস্বিকন্যার অভিলাষ! রাজা কহিলেন, বয়স্য! পুরুবংশীয়েরা এরূপ দুরাচার নহে যে, পরিহার্য্য বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। তুমি জান না, শকুন্তলা মেনকাগর্ভসম্ভূতা, রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তনয়া; তপস্বীর আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছে এই মাত্র, বস্তুতঃ তপস্বিকন্যা নহে।

মাধব্য, শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, যেমন, পিণ্ডখর্জ্জুর ভক্ষণ করিয়া, রসনা মিষ্ট রসে অভিভূত হইলে, তিন্তিলীভক্ষণে স্পৃহা হয়; সেইরূপ, স্ত্রীরত্নভোগ পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন, না বয়স্য! তুমি তাকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত এরূপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি; যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে, সে বস্তু অবশ্যই রমণীয়। রাজা কহিলেন, বয়স্য! অধিক আর কি বলিব, তার শরীর মনে করিলে, মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা, প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবনদান করিয়াছেন; অথবা, মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রী সকল সঙ্কলিত করিয়া, মনে মনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলির যথাস্থানে বিন্যাস পূর্ব্বক, মনে মনেই তাহার শরীরনির্মাণ করিয়াছেন; হস্ত দ্বারা নির্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ মার্দ্দব ও রূপলাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্নসৃষ্টি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! বুঝিলাম, শকুন্তলা যাবতীয় রূপবতীদিগের পরাভবস্থান। রাজা কহিলেন, তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুম স্বরূপ, নখাঘাতবর্জ্জিত নব পল্লব স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড ফল স্বরূপ; জানি না, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্মল রূপের ভোগ আছে।

রাজার মুখে শকুন্তলার এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে শীঘ্র তাহাকে হস্তগত কর; দেখিও, যেন, তোমার ভাবিতে চিন্তিতে, এরূপ অমূলভরূপনিধান কন্যানিধান কোনও অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়। রাজা কহিলেন, শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীনা; বিশেষতঃ, কুলপতি কণ্ব এক্ষণে আশ্রমে নাই। মাধব্য কহিলেন, ভাল বয়স্য! তোমায় এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তোমার উপর তার অনুরাগ কেমন? রাজা কহিলেন, বয়স্য! তপস্বিকন্যার স্বাভাবতঃ অপ্রগল্‌ভস্বভাবা; তথাপি, তাহার আকারে ও ইঙ্গিতে, আমার প্রতি তদীয় অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে —যত ক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা কয় নাই; কিন্তু, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্তা হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, কিন্তু অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়া থাকে নাই। আবার, প্রস্থানকালে, কতিপয় পদ মাত্র গমন করিয়া কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল, চলিতে পারি না, এই বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; আর, কুরবকশাখায় বল্কল লাগিয়াছে, এই বলিয়া, বল্কলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, আমার দিকে মুখ ভিরাইয়া, সতৃষ্ণ নয়নে, বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এ সকল অনুরাগের লক্ষণ বই আর কি হইতে পারে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তবে তোমার মনোরথসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। ভাগ্যক্রমে, তপোবন তোমার উপবন হইয়া উঠিল। রাজা কহিলেন, বয়স্য! কোনও কোনও তপস্বীরা আমায় চিনিতে পারিয়াছেন। বল দেখি, এখন কি ছলে কিছু দিন তপোবনে থাকি। মাধব্য কহিলেন, কেন অন্য ছলের প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়ে তপস্বীদিগকে বল, আমি রাজস্ব আদায় করিতে আসিয়াছি; যাবৎ তোমরা রাজস্ব না দিবে, তাবৎ আমি তপোবনে থাকিব। রাজা কহিলেন, তপস্বীরা, সামান্য প্রজার ন্যায়, রাজস্ব দেন না, তাঁহারা অন্যবিধ রাজস্ব দিয়া থাকেন; তাঁহারা যে রাজস্ব দেন, তাহা রত্নরাশি অপেক্ষাও প্রার্থনীয়। দেখ, সামান্য প্রজারা রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয়, তাহা বিনশ্বর; কিন্তু তপস্বীরা তপস্যার ষষ্ঠাংশস্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন।

রাজা ও মাধব্য, উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে; এমন সময়ে দ্বারবান্ আসিয়া কহিল, মহারাজ! তপোবন হইতে দুই ঋষিকুমার আসিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, অবিলম্বে লইয়া আইস। তদনুসারে, ঋষিকুমারেরা, রাজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, আশীর্বাদ করিলেন। রাজা আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক

প্রণাম করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, তপস্বীরা কি আজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছেন, বলুন। ঋষিকুমারেরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া, তপস্বীরা মহারাজকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, মহর্ষি আশ্রমে নাই, এই নিমিত্ত, নিশাচরেরা যজ্ঞের বিঘ্ন জন্মাইতেছে; অতএব, আপনাকে, তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত, এই স্থানে থাকিয়া, তপোবনের উপদ্রবনিবারণ করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, তপস্বীদিগের এই আদেশ অনুগৃহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গলহস্ত। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, সারথিকে রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া, ঋষিকুমারদিগকে কহিলেন, আপনারা প্রস্থান করুন; আমি যথাকালে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। ঋষিকুমারেরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! না হইবেক কেন? আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকার এই ব্যবহার তাহার উপযুক্তই বটে। বিপদ্‌গ্রস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত।

এই বলিয়া, আশীর্বাদ করিয়া, ঋষিকুমারেরা প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধব্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! যদি তোমার শকুন্তলাদর্শনে কৌতুহল থাকে, আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য কহিলেন, তোমার মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া দেখিতে অতিশয় অভিলাষ হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে, নিশাচরের নাম শুনিয়া, সে অভিলাষ এক বারে গিয়াছে। রাজা শুনিয়া,ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভয় কি, আমার নিকটে থাকিবে। মাধব্য কহিলেন, তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, দ্বারপাল আসিয়া কহিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়, কিন্তু, বৃদ্ধা মহিষীর বার্ত্তা লইয়া করভক এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। রাজা কহিলেন, উহারে অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইস। অনন্তর, করভক রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! বৃদ্ধা দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন, আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্রত আছে; সেই দিবস, মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

এ দিকে তপস্বীদিগের কার্য্য, ও দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লঙ্ঘনীয় এই নিমিত্ত, কর্ত্তব্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া, রাজা নিতান্ত আকুলচিত্ত হইলেন, এবং মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! বিষম সঙ্কটে পড়িলাম; কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। মাধব্য পরিহাস করিয়া কহিলেন, কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য

সত্যই, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, সখে! মা তোমায় পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়াছেন: তুমি রাজধানী ফিরিয়া যাও, এবং জননীর পুত্রকার্য্য সম্পন্ন কর। তাঁহাকে কহিবে, তপস্বীদিগের কার্য্যে সাতিশয় ব্যস্ত আছি, এজন্য যাইতে পারিলাম না। মাধব্য; ভাল, আমি চলিলাম; কিন্তু তুমি যেন আমায় নিশাচরভয়ে কাতর মনে করিও না; এই বলিয়া কহিলেন এখন আমি রাজার অনুজ হইলাম: অতএব, রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা করি। রাজা কহিলেন, আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে, তপোবনের উৎপীড়ন হইতে পারে, অতএব, সমুদয় অনুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আজ আমি যথার্থ যুবরাজ হইলাম।

এইরূপে মাধব্যের রাজধানীপ্রতিগমন অবধারিত হইল, রাজার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইল, এ অতি চপলস্বভাব; হয় ত, শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রকাশ করিবেক, ইহার উপায় করি: অথবা এই বলিয়া বিদায় করি, এই স্থির করিয়া, তিনি মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন, বয়স্য! ঋষিরা, কয়েক দিনের জন্য, তপোবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত রহিলাম; নতুবা, যথার্থ ই আমি শকুন্তলালাভে অভিলাষী হইয়াছি, এরূপ ভাবিও না। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার নিকট শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাসমাত্র; তুমি যেন, যথার্থ ভাবিয়া, একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তার সন্দেহ কি; আমি এক বারও তোমার ঐ সকল কথা যথার্থ মনে করি নাই।

অনন্তর, রাজা তপস্বীদিগের যজ্ঞবিঘ্ননিবারণার্থে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং মাধব্যও, যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমস্ত আনুযাত্রিক সঙ্গে লইয়া, রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপস্বিকার্য্যের অনুরোধে তপোবনে অবস্থিতি করিলেন; কিন্তু, দিন যামিনী, কেবল শকুন্তলাচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল, ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই, তাঁহার মনের সুখ ছিল না। কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে গেলে, শকুন্তলাকে দেখিতে পাইবেন, নিয়ত এই অনুধ্যান ও এই অনুসন্ধান। কিন্তু, পাছে তপোবনবাসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন, এই আশঙ্কায়, তিনি সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন।

এক দিন, মধ্যাহ্ন কালে, রাজা, নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন. শকুন্তলার দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমার প্রাণরক্ষার উপায় নাই। কিন্তু, তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমায় রাজধানীপ্রতিগমনের অনুমতি করিবেন, তখন আমার কি দশা হইবেক; কি রূপে তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, এখন কোথায় গেলে শকুন্তলাকে দেখিতে পাই! বোধ করি, প্রিয়া মালিনীতীরবর্ত্তী শীতল লতামণ্ডপে আতপকাল অতিবাহিত করিতেছেন; সেই খানে যাই, তাঁহারে দেখিতে পাইব। এই বলিয়া তিনি, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে, সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলাও, রাজদর্শনদিবস অবধি দুঃসহ বিরহবেদনায়, সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার, কোনও অংশে কোনও প্রভেদ ছিল না। সে দিবস, শকুন্তলা সাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা তাঁহাকে মালিনীতীরবর্ত্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন, তন্মধ্যবর্ত্তী শীতল শিলাতলে, নব পল্লব ও জলার্দ্র নলিনীদল প্রভৃতি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিলেন; এবং তাহাতে শয়ন করাইয়া, অশেষ প্রকারে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

রাজা, ক্রমে ক্রমে, সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে, শকুন্তলাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া;

যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আঃ! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রিয়ারে দেখিলাম। ইহারা তিন সখীতে কি কথোপকথন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ শ্রবণ ও অবলোকন করি। এই বলিয়া, রাজা, উৎসুক মনে শ্রবণ, ও সতৃষ্ণ নয়নে অবলোকন, করিতে লাগিলেন।

শকুন্তলার শরীরসন্তাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শীতল সলিলার্দ্র নলিনীদল লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বায়ুসঞ্চালন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, সখি শকুন্তলে! কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার সুখজনক বোধ হইতেছে; শকুন্তলা কহিলেন, সখি! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে, শুনিয়া,সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া,পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা, দুষ্মন্তচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন। রাজা, শুনিয়া, ও শকুন্তলার অবস্থা দেখিয়া, মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন; ইহাকে আজ নিরতিশয় অসুস্থশরীরা দেখিতেছি। কিন্তু, কি কারণে ইনি এরূপ অসুস্থা হইয়াছেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ ইহার ঈদৃশ অসুখ, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে ইহারও তাহাই। অথবা, এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই। গ্রীষ্মদোষে কামিনীগণের এরূপ অবস্থা কোনও মতেই সম্ভাবিত নহে।

প্রিয়ংবদা, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি! সেই রাজর্ষির প্রথম দর্শন অবধিই, শকুন্তলা কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ঐ কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে নাই? অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমারও ঐ আশঙ্কাই হয়; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রিয়সখি! তোমার শরীরের গ্লানি উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে; অতএব, আমরা তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাই। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! কি বলিবে, বল। তখন অনসূয়া কহিলেন, তোমার মনের কথা কি, আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না; কিন্তু, ইতিহাসকথায় বিরহী জনের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, বোধ হয়, তোমারও যেন সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত অসুখ হইয়াছে, বল; প্রকৃত রূপে রোগনির্ণয় না হইলে, প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমার অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়া ভালই বলিতেছে; কেন আপনার মনের বেদনা গোপন করিয়া রাখ? দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইতেছ।

দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে ; কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

রাজা, অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছেন ; শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে। কিন্তু, কি চমৎকার ! এ অবস্থায় দেখিয়াও, আমার মনের ও নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ হইতেছে।

অবশেষে, শকুন্তলা, মনে ব্যথা আর গোপন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সখি ! যদি তোমাদের কাছে না বলিব, আর কার কাছেই বলিব ; কিন্তু, মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়া, তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি ! এই নিমিত্তই ত আমরা এত আগ্রহ করিতেছি। তুমি কি জান না, আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও, দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

এই সময়ে, রাজা শঙ্কিত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি আপন মনের বেদনা ব্যক্ত করিবেন। প্রথমদর্শনদিবসে, প্রস্থানকালে, সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করাতে, অনুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছিল ; তথাপি, এখন কি বলিবেন, এই ভয়ে অভিভূত ও কাতর হইতেছি।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি ! যে অবধি আমি সেই রাজর্ষিকে নয়নগোচর করিয়াছি—এই মাত্র কহিয়া, লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন, আর বলিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি ! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি ? শকুন্তলা কহিলেন, সেই অবধি, তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া, তিনি, বিষণ্ণ বদনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, সখি ! সৌভাগ্যক্রমে তুমি অনুরূপ পাত্রেই অনুরাগিণী হইয়াছ ; অথবা, মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্ জলাশয়ে প্রবেশ করিবেক ?

রাজা, শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, যা শুনিবার, তা শুনিলাম ; এত দিনের পর আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল।

শকুন্তলা কহিলেন, সখি ! আর আমি যাতনা সহ্য করিতে পারি না ; এখন প্রাণবিয়োগ হইলেই পরিত্রাণ হয়। প্রিয়ংবদা, শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, শকুন্তলার অগোচরে, অনসূয়াকে কহিলেন, সখি ! আর ইহাকে

সান্ত্বনা করিয়া ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই; আমার মতে, আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নয়; ত্বরায় কোনও উপায় করা আবশ্যক। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! যাহাতে, অবিলম্বে, অথচ গোপনে, শকুন্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয়, এমন কি উপায়, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! গোপনের জন্যেই ভাবনা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয়। অনসূয়া কহিলেন, কি জন্যে, বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, কেন, তুমি কি দেখ নাই, সেই রাজর্ষিও, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, দিন দিন দুর্ব্বল ও কৃশ হইতেছেন?

রাজা, শুনিয়া, স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যথার্থই এরূপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর অন্তরতাপে তাপিত হইয়া, আমার শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; এবং দুর্বল ও কৃশও যৎপরোনাস্তি হইয়াছি।

প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে! শকুন্তলার প্রণয়পত্রিকা করা যাউক; সেই পত্রিকা, আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া, নির্ম্মাল্যচ্ছলে, রাজর্ষির হস্তে দিয়া আসিব। অনসূয়া কহিলেন, সখি! এ অতি উত্তম পরামর্শ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয়, তাই কর। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত একখানি প্রণয়পত্র রচনা কর। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! রচনা করিতেছি; কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন, এই ভয়ে, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

রাজা, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! তুমি, যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই, তোমার সমাগমের নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছে; তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না, রত্নেরই অন্বেষণ সকলে করিয়া থাকে।

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও, শকুন্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, কহিলেন, অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন্ ব্যক্তি আতপত্র দ্বারা শরৎকালীন জ্যোৎস্নার নিবারণ করিয়া থাকে? শকুন্তলা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, সখি! রচনা করিয়াছি, কিন্তু লিখনসামগ্রী কিছুই নাই, কিসে লিখি, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই পদ্মপত্রে লিখ।

লিখন সমাপন করিয়া শকুন্তলা সখীদিগকে কহিলেন, ভাল, শুন দেখি, সঙ্গত হয়েছে কি না। তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—হে নির্দ্দয়! তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি, তোমাতে

একান্ত অনুরাগিণী হইয়া, নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি;—এই মাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া, রাজা সহসা শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, সুন্দরি! তুমি সন্তাপিত হইতেছ, যথার্থ বটে; কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি হর্ষিত হইলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পরম সমাদরে, স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া, বসিবার সংবর্দ্ধনা করিলেন। শকুন্তলাও, নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন রাজা শকুন্তলাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! গাত্রোত্থান করিবার প্রয়োজন নাই; তোমার দর্শনেই আমার সম্পূর্ণ সংবর্দ্ধনলাভ হইয়াছে। বিশেষতঃ, তোমার শরীরে যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোনও মতেই শয্যা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সখীরা রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুন্তলা, লজ্জায় সাতিশয় জড়ীভূতা হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যাঁহার জন্যে তত উতলা হইয়াছিলে, এখন, তাঁহারে দেখিয়া, এত কাতর হইতেছ কেন? রাজা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আজ আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থ দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এখন সুস্থ হইবেন। শকুন্তলা লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন।

অনসূয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিতে পাই, রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্তু সকলেই প্রেয়সী হয় না; অতএব, আমরা যেন, সখীর নিমিত্ত, অবশেষে মনোদুঃখ না পাই। রাজা কহিলেন, যথার্থ বটে, রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে। কিন্তু, আমি অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, তোমাদের সখীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব হইবেন। তখন অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তলা কহিলেন, সখি! আমরা মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া কত কথা, কহিয়াছি; ক্ষমা প্রার্থনা কর। সখীরা হাস্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে সেই ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, অন্যের কি দায়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! যদি কিছু বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেক; পরোক্ষে কে কি না বলে। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন, অনসূয়ে! মৃগশাবকটি উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধ করি, আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে;

আমি উহাকে উহার মার কাছে দিয়া আসি। তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহারে ধরিতে পারিবে না; চল, আমিও যাই। এই বলিয়া, উভয়ে প্রস্থানোন্মুখী হইলেন। শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা দুজনেই আমায় ফেলিয়া চলিলে, আমি একাকিনী রহিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে রাখিয়া গেলাম! এই বলিয়া, হাসিতে হাসিতে, উভয়ে লতামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীরা চলিয়া গেল, এই বলিয়া, উৎকণ্ঠিতার ন্যায় হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! সখীদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে রহিয়াছি; যখন যে আদেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবেক। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মাননীয় ব্যক্তি, এ দুঃখিনীকে অকারণে অপরাধিনী করেন কেন? এই বলিয়া, শয্যা হইতে উঠিয়া শকুন্তলা গমনোন্মুখী হইলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! এ কি কর; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল অতি উত্তাপের সময়; এ অবস্থায়, এ সময়ে, লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। এই বলিয়া, হস্তে ধরিয়া, রাজা নিবারণ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই; তুমি জান না, আমি আপনার বশ নই। রাজা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া শকুন্তলার হাত ছাড়িয়া দিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবের তিরস্কার করিতেছি। রাজা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার করিতেছ কেন? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমায় পরের অধীন করিয়া পরের গুণে মোহিত করে কেন?

এই বলিয়া, শকুন্তলা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা পুনরায় শকুন্তলার হস্তে ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ! কি কর, ইতস্ততঃ ঋষিরা ভ্রমণ করিতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি গুরুজনের ভয় করিতেছ কেন? ভগবান কণ্ব কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না। শত শত রাজর্ষিকন্যারা, গুরুজনের অগোচরে, গান্ধর্ব্ব বিধানে, অপরূপ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছেন, এবং তাঁহাদের গুরুজনেরাও, পরিশেষে সবিশেষ অবগত হইয়া সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন। শকুন্তলা, মহারাজ! এই সম্ভাষণমাত্র-

পরিচিতি ব্যক্তিকে ভুলিবেন না, এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া, চলিয়া গেলেন। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে না। শকুন্তলা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমার পা উঠিতেছে না। যাহা হউক, কিয়ৎ ক্ষণ অন্তরালে থাকিয়া ইহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া, লতাবিতানে আবৃতশরীরা হইয়া, শকুন্তলা কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন।

রাজা একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমা বই আর জানি না; কিন্তু তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হইয়া আমায় এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন। পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন, আর প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি ফল? এই বলিয়া তিনি তথা হইতে চলিয়া যান, এমন সময়ে, শকুন্তলার মৃণালবলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন; এবং পরম সমাদরে বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক, কৃতার্থম্মন্য চিত্তে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয়, অচেতন হইয়াও, এই দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না। শকুন্তলা, ইহা শুনিয়া, আর বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই বা যাই; অথবা মৃণালবলয়ের ছল করিয়া যাই; এই বলিয়া, পুনর্ব্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। রাজা দর্শনমাত্র হর্ষসাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন, এই যে আমার জীবিতেশ্বরী আসিয়াছেন! বুঝিলাম, দেবতারা আমার পরিতাপ শুনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনরায় প্রিয়ারে দেখিতে পাইলাম। চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপ্রার্থনা করিল; অমনি নব জলধর হইতে শীতল সলিলধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

শকুন্তলা রাজার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্দ্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে, আমি মৃণালবলয় লইতে আসিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন, যদি তুমি আমার যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তবেই তোমার মৃণালবলয় তোমায় দি, নতুবা দিব না। শকুন্তলা অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাজা কহিলেন, আইস, এই শিলাতলে বসিয়া পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা, শকুন্তলার হস্ত লইয়া, মৃণালবলয় পরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! সত্বর হও, সত্বর হও। রাজা, আর্য্যপুত্রসম্ভাষণ শ্রবণে

যৎপরোনাস্তি প্রীত প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা স্বামীকেই আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করিয়া থাকে; বুঝি আমায় মনোরথ পূর্ণ হইল। অনন্তর, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! মৃণালবলয়ের সন্ধি সম্যক্ সংশ্লিষ্ট হইতেছে না; যদি তোমার মত হয়, প্রকারান্তরে সংযোজন করিয়া পরাই। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তোমার যা অভিরুচি।

রাজা, নানা ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মৃণালবলয় পরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে। শকুন্তলা কহিলেন, দেখিব কি, আমার নয়নে কর্ণোৎপলরেণু পতিত হইয়াছে, এজন্য দেখিতে পাইতেছি না। রাজা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার অনুমতি হয়, ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। শকুন্তলা কহিলেন, তাহা হইলে অতিশয় উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমায় অত দূর বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! অবিশ্বাসের বিষয় কি, নূতন ভৃত্য কি কখনও প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে? শকুন্তলা কহিলেন, ঐ অতিভক্তিই অবিশ্বাসের কারণ। অনন্তর রাজা, শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া, তাঁহার মুখকমল উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা, সুন্দরি! শঙ্কা কি, এই বলিয়া, শকুন্তলার নয়নে ফুংকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শকুন্তলা কহিলেন, তোমায় আর পরিশ্রম করিতে হইবে না; আমার নয়ন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে; আর কোনও অসুখ নাই। মহারাজ! আমি অতিশয় লজ্জিত হইতেছি; তুমি আমার এত উপকার করিলে; আমি তোমার কোনও প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। রাজা কহিলেন, সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই? আমি যে তোমার সুরভি মুখকমলের আঘ্রাণ পাইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট পুরস্কার হইয়াছে; মধুকর কমলের আঘ্রাণমাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, সন্তুষ্ট হইয়াই বা কি করে।

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, চক্রবাকবধূ! রজনী উপস্থিত; এই সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও; এই শব্দ শকুন্তলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। শকুন্তলা, সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার পিতৃষসা আর্য্যা গৌতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন; এই

নিমিত্তই, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, চক্রবাক ও চক্রবাকীর ছলে, আমাদিগকে সাবধান করিতেছে; তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত ও অন্তর্হিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম, যেন পুনরায় দেখা হয়, এই বলিয়া, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া, শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং শকুন্তলার শরীরে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! শুনিলাম, আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি। তখন গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া শকুন্তলার সর্ব্ব শরীরে, সেচন করিয়া, কহিলেন, বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক। অনন্তর, লতামণ্ডপে, অনসূয়া অথবা প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র, মালিনীতে জল আনিতে গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে, এস কুটীরে যাই। শকুন্তলা অগত্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। রাজাও, আর আমি প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। পরিশেষে, গান্ধর্ব্ব বিধানে শকুন্তলার পাণিগ্রহণসমাধান পূর্ব্বক, ধর্ম্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া রাজা নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজা দুষ্মন্ত প্রস্থান করিলে পর, এক দিন, অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন, সখি! শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিধানে আপন অনুরূপ পতি পাইয়াছে বটে; কিন্তু আমার এই ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা নগরে গিয়া অন্তঃপুর-বাসিনীদিগের সমাগমে শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! সে আশঙ্কা করিও না; তেমন আকৃতি কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা আসিয়া, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কি বলেন। অনসূয়া কহিলেন, সখি! আমার বোধ হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না; এ তাঁহার অনভিমত কর্ম্ম হয় নাই। কেন না, তিনি প্রথম অবধি এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিযাছিলেন, গুণবান্ পাত্রে কন্যাপ্রদান করিব; যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল, তাহা হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকার্য হইলেন। সুতরাং, ইহাতে তাঁহার রোষ বা অসন্তোষের বিষয় কি। উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরের কিঞ্চিৎ দূরে পুষ্পচয়ন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, শকুন্তলা, অতিথিপরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়া, একাকিনী কুটীর-দ্বারে উপবিষ্টা আছেন; দৈবযোগে, দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া, তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন- আমি অতিথি। শকুন্তলা, রাজার চিন্তায় নিতান্ত মগ্ন হইয়া, এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন, সুতরাং দুর্ব্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন না। দুর্ব্বাসা অবজ্ঞাদর্শনে রোষবশ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! তুই অতিথির অবমাননা করিলি। তুই, যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আমায় অবজ্ঞা করিলি—আমি অভিশাপ দিতেছি—স্মরণ করাইয়া দিলেও, সে তোরে স্মরণ করিবেক না।

প্রিয়ংবদা, শুনিতে পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ ঘটিল। শূন্যহৃদয়া শকুন্তলা কোনও পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই বলিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া প্রিয়ংবদা কহিতে লাগিলেন, সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ব্বাসা, ইহার কথায় কথায় কোপ; ঐ দেখ, শাপ দিয়া রোষভরে সত্বর প্রস্থান করিতেছেন। অনসূয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! বৃথা আক্ষেপ করিলে আর কি হইবেক বল। শীঘ্র

গিয়া পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন ; আমিও, এই অবকাশে, কুটীরে গিয়া পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা দুর্ব্বাসার পশ্চাৎ ধাবমানা হইলেন ! অনসূয়া কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনসূয়া কুটীরে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই. প্রিয়ংবদা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন সখি ! জানই ত, দুর্ব্বাসা স্বভাবতঃ অতি কুটিলহৃদয় ; তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন ; তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম, নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন চরণে ধরিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে ? কৃপা করিয়া তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অন্যথা হইবার নহে ; তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক ; এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। অনসূয়া কহিলেন, ভাল, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজর্ষি, প্রস্থানকালে শকুন্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছেন। অতএব, শকুন্তলার হস্তেই শকুন্তলার শাপমোচনের উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, ঐ অঙ্গুরীয় দেখাইলেই তাঁহার স্মরণ হইবেক। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে কুটীরাভিমুখে চলিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণে, তাঁহারা কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শকুন্তলা. করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া, স্পন্দহীনা, মুদ্রিতনয়না, চিত্রার্পিতার ন্যায়, উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনসূয়ে ! দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে ; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে ? অনসূয়া কহিলেন, সখি ! এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে কর্ণান্তর করা হইবেক না ; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাঁচিবেক না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি ! তুমি কি পাগল হয়েছ ? এ কথাও কি শকুন্তলাকে শুনাতে হয় ? কোন্ ব্যক্তি উষ্ণ সলিলে নবমালিকার সেচন করে ?

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি কণ্ব সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিন তিনি অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া হোমকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে এই দৈববাণী হইল—মহর্ষে। রাজা দুষ্মন্ত. মৃগয়া উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া, শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, এবং শকুন্তলাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন। মহর্ষি, এইরূপে শকুন্তলাই পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র

রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ সৎ পাত্রের হস্তগতা হইয়াছে। অনন্তর তিনি প্রফুল্ল বদনে শকুন্তলার নিকটে গিয়া, সাতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎসে! তোমার পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্থির করিয়াছি, অবিলম্বে, দুই শিষ্য ও গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমায় পতিসন্নিধানে পাঠাইয়া দিব। অনন্তর, তদীয় আদেশ ক্রমে শকুন্তলার প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাগিল।

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী, এবং শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত নামে দুই শিষ্য, শকুন্তলার সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা যথাসম্ভব বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহর্ষি শোকাকুল হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য শকুন্তলা যাইবেক বলিয়া, আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে। নয়ন অনবরত বাষ্পবারিতে পরিপূরিত হইতেছে, কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্‌শক্তিরহিত হইতেছি, জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চর্য্য! আমি বনবাসী, স্নেহ বশতঃ আমারও ঈদৃশ বৈধব্য উপস্থিত হইতেছে, না জানি, সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, স্নেহ অতি বিষম বস্তু! অনন্তর, তিনি শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন; বৎসে! বেলা হইতেছে, প্রস্থান কর; আর অনর্থ কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া, তপোবনতরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের জলসেচন না করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন না; যিনি, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও স্নেহ বশতঃ, কদাচ তোমাদের পল্লবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুসুমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে, যাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না, অদ্য সেই শকুন্তলা পতিগৃহে যাইতেছেন, তোমরা সকলে অনুমোদন কর।

অনন্তর, সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। শকুন্তলা গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া; প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে; কিন্তু, তপোবন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা ঘটিতেছে, দেখ!—জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হরিণগণ, আহারবিহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, স্থির হইয়া

রহিয়াছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়ূরী, নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখ হইয়া রহিয়াছে; কোকিলগণ, আম্রমুকুলের রসাস্বাদে বিমুখ হইয়া; নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইয়াছে, ও গুন্ গুন্ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে।

কণ্ব কহিলেন, বৎসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তলা কহিলেন, তাত! বনতোষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোষিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোষিণি! শাখাবাহু দ্বারা আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর; আজ অবধি আমি দূরবর্ত্তিনী হইলাম। অনন্তর, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, সখি! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাঁহারা কহিলেন, সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল। এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে।

এক পূর্ণগর্ভা হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, শকুন্তলা কণ্বকে কহিলেন, তাত! এই হরিণী নির্বিঘ্নে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ দিবে, ভুলিবে না বল। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! আমি কখনই ভুলিব না।

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্ব্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুলীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে। শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছা! আর আমার সঙ্গে আইস কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন হইলে আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অতঃপর পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। এই বলিয়া, শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কণ্ব কহিলেন, বৎসে! শান্ত হও, অশ্রুবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া চল, উচ্চ নীচ না দেখিয়া পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগিতেছে।

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, শার্ঙ্গরব কণ্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই স্থলেই, যাহা বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন। কণ্ব কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদনুসারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, কণ্ব, কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া, শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, বৎস! তুমি, শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহারে আমার এই আবেদন জানাইবে—আমরা বনবাসী, তপস্যায় কালযাপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আর, শকুন্তলা বন্ধুবর্গের অগোচরে স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, অন্যান্য সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, শকুন্তলাতেও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে; আমাদের এই পর্য্যন্ত প্রার্থনা; ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়া দিবার নয়।

মহর্ষি, শার্ঙ্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দ্দেশ করিয়া, শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! এক্ষণে তোমাদেরও কিছু উপদেশ দিব; আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি পতিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে; সপত্নীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগর্ব্বে গর্ব্বিত হইবে না; স্বামী কার্কশ্যপ্রদর্শন করিলেও রোষবশা ও প্রতিকূলচারিণী হইবে না; মহিলারা এরূপ ব্যবহারিণী হইলেই গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকস্বরূপ। ইহা কহিয়া বলিলেন, দেখ, গৌতমীই বা কি বলেন। গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়া দিতে হইবেক? পরে শকুন্তলাকে কহিলেন, বাছা! উনি যে গুলি বলিলেন, সকল মনে রাখিও।

এইরূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, কণ্ব শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! আমরা আর অধিক দূর যাইব না; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর। শকুন্তলা অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদাও কি এই খান হইতে ফিরিয়া যাইবেক? ইহারা সে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক। কণ্ব কহিলেন, না বৎসে! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; অতএব, সে পর্য্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদগদ স্বরে কহিলেন, তাত! তোমায় না দেখিয়া, সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে, তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে

লাগিল। তখন কণ্ব অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন, বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিবার অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, তাত! আবার কত দিনে এই তপোবনে আসিব? কণ্ব কহিলেন, বৎসে! সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী হইয়া, এবং অপ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পিত দেখিয়া, পতি সমভিব্যাহারে পুনরায় এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আসিবে।

শকুন্তলাকে এইরূপ শোকাকুলা দেখিয়া গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর কেন, ক্ষান্ত হও, যাইবার বেলা বহিয়া যায়; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়া লও; আর বিলম্ব করা হয় না। তখন শকুন্তলা সখীদের নিকটে গিয়া কহিলেন, সখি! তোমরা উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সখীরা শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা শীঘ্র চিনিতে না পারেন, তাঁহাকে তদীয় স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল। তোমাদের কথা শুনিয়া আমায় হৃৎকম্প হইতেছে। সখীরা কহিলেন, না সখি। ভীত হইও না; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দুষ্যন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। কণ্ব, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, এক দৃষ্টিতে শকুন্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলা দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনসূয়ে! প্রিয়ংবদে! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছেন, এক্ষণে, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া মহর্ষি আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। যাইতে যাইতে, মহর্ষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যর্পিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্রূপ, অদ্য আমি শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক দিন, রাজা দুষ্মন্ত, রাজকার্য্যসমাধানান্তে, একান্তে আসীন হইয়া, প্রিয়বয়স্য মাধব্যের সহিত কথোপকথনরসে কালযাপন করিতেছেন; এমন সময়ে, হংসপদিকা নামে এক পরিচারিকা, সঙ্গীতশালায়, অতি মধুর স্বরে, এই ভাবের গান করিতে লাগিল, অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয়প্রদর্শন করিয়া, এখন, কমলমধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহারে এক বারে বিস্মৃত হইল কেন?

হংসপদিকার গীতি শ্রবণগোচর হইবামাত্র, রাজা অকস্মাৎ যৎপরোনাস্তি উন্মনাঃ হইলেন; কিন্তু, কি নিমিত্ত উন্মনাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এমন আকুল হইতেছে? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু, প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না। অথবা, মনুষ্য, সর্ব্ব প্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

রাজা মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের সন্দেশ লইয়া আসিয়াছেন; কি আজ্ঞা হয়। রাজা তপস্বিশব্দ শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপস্বীদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সৎকার করিয়া, অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইসেন; আমিও ইত্যবকাশে তপস্বীদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি।

এই আদেশ প্রদান পূর্ব্বক কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাজা অগ্নিগৃহে গিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষি প্রেরণ করিলেন? কি তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কি কোনও দুরাত্মা তাঁহাদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, আমার মন অতিশয় আকুল হইতেছে। পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে, ধর্ম্মারণ্যবাসী ঋষিরা মহারাজের অধিকারে নির্বিঘ্নে ও নিরাকুল চিত্তে তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন;

এই হেতু, প্রীত হইয়া, মহারাজকে ধন্তবাদ দিতে ও আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন।

এবম্প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে সোমরাত, তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া, উপস্থিত হইলেন। রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহাদের উপস্থিতির প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন, ঐ দেখুন, সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, নরপতিদিগেব এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে সাতিশয় প্রীত হইতে হয়, এবং সবিশেষ প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথবা ইহার বিচিত্র কি—তরুগণ ফলিত হইলে ফলভরে অবনত হইয়া থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নম্র ভাব অবলম্বন করে; সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমৃদ্ধিশালী হইলে তাঁহারা অনুদ্ধতস্বভাব হয়েন।

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া গৌতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডানি চোক নাচিতেছে কেন? গৌতমী কহিলেন, বৎসে! শঙ্কিতা হইও না, পতিকুলদেবতারা তোমাব মঙ্গল কবিবেন। যাহা হউক, শকুন্তলা তদবধি মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও নিরতিশয় আকুলহৃদয়া হইলেন।

রাজা শকুন্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন? পার্শ্ববর্ত্তিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমিও দেখিয়া অবধি নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী কখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। রাজা কহিলেন, ও কথা ছাড়িয়া দাও; পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা লইয়া আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নহে! এ দিকে, শকুন্তলা আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? আর্য্যপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

তাপসেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া হস্ত তুলিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া ঋষিদিগকে আসনপরিগ্রহ করিতে কহিলেন। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা

করিলেন, কেমন, নির্বিঘ্নে তপস্যা সম্পন্ন হইতেছে? ঋষিরা কহিলেন, মহারাজ! আপনি শাসনকর্ত্তা থাকিতে, ধর্ম্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবির্ভাব হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া কহিলেন, অদ্য আমার রাজশব্দ সার্থক হইল। পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কণ্বের কুশল? ঋষিরা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! মহর্ষি সর্ব্বাংশেই কুশলী।

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আমাদের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন,—মহর্ষি কহিয়াছেন, আপনি আমার অনুপস্থিতি-কালে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান করিয়াছি; আপনি সর্ব্বাংশে আমার শকুন্তলার যোগ্য পাত্র; এক্ষণে আপনকার সহধর্ম্মিণী অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন, গ্রহণ করুন। গৌতমীও কহিলেন, মহারাজ! আমি কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই। শকুন্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নাই; তুমিও তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই; তোমরা পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ, তাহাতে অন্যের কথা কহিবার কি আছে?

শকুন্তলা, মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আর্য্যপুত্র এখন কি বলেন! রাজা দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলা-পরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন; সুতরাং, শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন,এ আবার কি উপস্থিত! শকুন্তলা এক বারে ম্রিয়মাণা হইলেন। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! লৌকিক ব্যবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, আপনি এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, পরিণীতা নারী যদিও সর্ব্বাংশে সাধুশীলা হয়, সে নিয়ত পিতৃকুলবাসিনী হইলে, লোকে নানা কথা কহিয়া থাকে; এই নিমিত্ত, সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে।

রাজা কহিলেন, কই, আমি ত ইহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া, বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন! হৃদয় যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে। শার্ঙ্গরব, রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ত্ততার আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন; অন্যে অন্যায় করিলে আপনি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,

রাজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্য্যের অপলাপে প্রবৃত্ত হইলে ধর্ম্মদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজা কহিলেন, আপনি আমায় এত অভদ্র স্থির করিতেছেন কেন? শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়, তাহাদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে। রাজা কহিলেন, আপনি অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন; আমি কোনও ক্রমে এরূপ ভর্ৎসনার যোগ্য নহি।

এইরূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুন্তলাকে লজ্জায় অবনতমুখী দেখিয়া, গৌতমী শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে! লজ্জিত হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে মহারাজ তোমায় চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া দিলেন। রাজা তথাপি চিনিতে পারিলেন না; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সংশয়ারূঢ় হইয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজা কহিলেন, মহাশয়! কি করি বলুন; অনেক ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া কোনও ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না! সুতরাং, কি প্রকারে ইঁহাকে ভার্য্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি; বিশেষতঃ, ইঁনি এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন।

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্ব্বনাশ! এক বারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইয়া, অশেষ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিব বলিয়া, যত আশা করিয়াছিলাম সমুদয় এক কালে নির্ম্মূল হইল। শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! বিবেচনা করুন, মহর্ষি কেমন মহানুভাবতা প্রদর্শন করিয়াছেন! আপনি, তাঁহার অগোচরে, তাঁহার অনুমতিনিরপেক্ষ হইয়া, তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাহাতে রোষপ্রকাশ বা অসন্তোষপ্রদর্শন না করিয়া বিলক্ষণ সন্তোষপ্রদর্শন করিয়াছেন, এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যারে আপনকার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। এক্ষণে, প্রত্যাখ্যান করিয়া তাদৃশ সদাশয় মহানুভাবের অবমাননা করা, মহারাজের কোনও মতেই কর্ত্তব্য নহে। আপনি স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করুন।

শারদ্বত শার্ঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতস্বভাব ছিলেন; তিনি কহিলেন, অহে শার্ঙ্গরব! স্থির হও, আর তোমার বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারিত করিবার প্রয়োজন নাই; আমি এক কথায় সকল বিষয়ে শেষ করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া,

তিনি শকুন্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, শকুন্তলে! আমাদের যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ বলিতেছেন; এক্ষণে তোমার যাহা বলিবার থাকে, বল, এবং যাহাতে উহার প্রতীতি জন্মে, তাহা কর। তখন শকুন্তলা অতি মৃদু স্বরে কহিলেন, যখন তাদৃশ অনুরাগ এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন আমি পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব; কিন্তু আত্ম-শোধনের নিমিত্ত কিছু বলা আবশ্যক। এই বলিয়া, আর্য্যপুত্র! এই মাত্র সম্ভাষণ করিয়া, শকুন্তলা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর কহিলেন, যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আর আর্য্যপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করা উচিত হইতেছে না। এইরূপ বলিয়া তিনি কহিলেন, পৌরব! আমি সরলহৃদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানি না। তৎকালে তপোবনে তাদৃশী অমায়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্ম্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে এরূপ দুর্বাক্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নয়।

রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, ঋষিতনয়ে! যেমন বর্ষা কালের নদী তীরতরুকে পতিত ও আপন প্রবাহকে পঙ্কিল করে, তেমনই তুমিও আমায় পতিত ও আপন কুলকে কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি তুমি যথার্থ ই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইয়া তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। রাজা কহিলেন, এ উত্তম কল্প; কই, কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও। শকুন্তলা রাজদত্ত অঙ্গুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে, ব্যস্ত হইয়া অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন, অঞ্চলের কোণে অঙ্গুরীয় নাই। তখন তিনি বিষণ্ণা ও ম্লানবদনা হইয়া গৌতমীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। গৌতমী কহিলেন, বোধ হয়, আল্লা বাঁধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার সময় পড়িয়া গিয়াছে।

রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, স্ত্রীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতি, এই যে কথা প্রসিদ্ধ আছে, ইহা তাহার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

শকুন্তলা রাজার এইরূপ ভাব দর্শনে ম্রিয়মাণা হইয়া কহিলেন, আমি দৈবের প্রতিকূলতা বশতঃ অঙ্গুরীয়প্রদর্শন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোনও কথা বলিতেছি যে, তাহা শুনিলে, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবশ্যই তোমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইবেক। রাজা কহিলেন, এক্ষণে শুনা আবশ্যক; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে চাও, বল। শকুন্তলা কহিলেন, মনে করিয়া দেখ, এক দিন তুমি ও আমি দুজনে নবমালিকামণ্ডপে বসিয়া ছিলাম।

তোমার হস্তে একটি জলপূর্ণ পদ্মপত্রের ঠোঙা ছিল। ইহা কহিয়া শকুন্তলা রাজার মুখ পানে তাকাইলে, রাজা কহিলেন, ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শকুন্তলা কহিলেন, সেই সময়ে আমার কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহারে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া সে তোমার নিকটে আসিল না; পরে, আমি হস্তে করিলে, আমার নিকটে আসিয়া অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমরা দুজনেই জঙ্গলা, এজন্য ও তোমার নিকটে গেল। রাজা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্ত্রস্বরূপ। গৌতমী শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিত, প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। রাজা কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধতাপসি! প্রবঞ্চনা স্ত্রীজাতির সভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয় না; মানুষের ত কথাই নাই, পশু পক্ষীদিগেরও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না, অথচ কোকিলারা, কেমন কৌশল করিয়া স্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বারা, প্রতিপালিত করিয়া লয়। শকুন্তলা রুষ্টা হইয়া কহিলেন, অনার্য্য তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন, তাপসকন্যে! দুষ্মন্ত গোপনে কোনও কর্ম্ম করে না; যখন যাহা করিয়াছে, সমস্তই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই, কেহ বলুক দেখি, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। শকুন্তলা কহিলেন, তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রতিপন্ন করিলে। পুরুবংশীয়েরা অতি উদারস্বভাব, এই বিশ্বাস করিয়া, যখন আমি মধুমুখ হলাহলহৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এরূপ ঘটিবেক, ইহা চিচিত্র নহে। এই বলিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া শকুন্তলা রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কর্ম্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া, করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শত্রুতাতে পর্য্যবসিত হয়। শার্ঙ্গরবের তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার উপর অকারণে এরূপ দোষারোপ করিতেছেন? শার্ঙ্গরব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই, তাহার কথা অপ্রমাণ; আর, যাহারা পর-

প্রতারণা বিদ্যা বলিয়া শিক্ষা করে তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবেক? তখন রাজা শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, মহাশয়! আপনি বড় যথার্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম, প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, ইঁহার সঙ্গে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ হইবেক? শার্ঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, নিপাত! রাজা কহিলেন, পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে, এ কথা অশ্রদ্ধেয়।

এইরূপে উভয়ের বিবাদারম্ভ দেখিয়া শারদ্বত কহিলেন, শার্ঙ্গরব! আর উত্তরোত্তর বাক্‌ছলের প্রয়োজন নাই; আমরা গুরুনিয়োগের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে ফিরিয়া যাই, চল। এই বলিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ইনি তোমার পত্নী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। এই বলিয়া, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, ও গৌতমী, তিন জনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন।

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, ইনি ত আমার এই করিলেন; তোমরাও আমায় ফেলিয়া চলিলে; আমার কি গতি হইবেক; এই বলিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া কহিলেন, বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের সঙ্গে আসিতেছে; দেখ, রাজা প্রত্যাখ্যান করিলেন, এখানে থাকিয়া আর কি করিবেক, বল। আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক। শার্ঙ্গরব শুনিয়া সরোষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন শার্ঙ্গরব শকুন্তলাকে কহিলেন, দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থ সেরূপ হও, তাহা হইলে, তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে; তাত কণ্ব আর তোমার মুখাবলোকন করিবেন না। আর, যদি তুমি আপনাকে পতিব্রতা বলিয়া জান, তাহা হইলে, পতিগৃহে থাকিয়া দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। অতএব, এই খানেই থাক, আমরা চলিলাম।

তপস্বীদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, রাজা শার্ঙ্গরবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি উঁহাকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছেন কেন? পুরুবংশীয়েরা প্রাণান্তেও পরবনিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় না; চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করিয়া থাকেন। তখন শার্ঙ্গরব কহিলেন, মহারাজ! আপনি পরকীয় মহিলার আশঙ্কা করিয়া অধর্ম্মভয়ে শকুন্তলাপরিগ্রহে পরাঙ্মুখ হইতেছেন; কিন্তু ইহাও অসম্ভাবনীয় নহে, আপনি

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া, রাজা পার্শ্বোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, বলুন। আমিই পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছি. অথবা এই স্ত্রীলোক মিথ্যা বলিতেছেন; এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্ত্রীস্পর্শপাতকী হই।

পুরোহিত শুনিয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। রাজা কহিলেন, কি, আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন, ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, এ কথা বলি কেন? সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন, আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত হইবেন। যদি মুনি-দৌহিত্র সেইরূপ হয়, ইহারে গ্রহণ করিবেন; নতুবা ইঁহার পিতৃসমীপগমন স্থিরই রহিল। রাজা কহিলেন, যাহা আপনাদের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন, তবে আমি ইঁহাকে প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার আলয়ে লইয়া রাখি। পরে, তিনি শকুন্তলাকে বলিলেন, বৎসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুন্তলা, পৃথিবি! বিদীর্ণ হও, আমি প্রবেশ করি; আর আমি এ প্রাণ রাখিব না; এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুন্তলার বিষয় অনন্য মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কি আশ্চর্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই আকুল বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কি হইল! কি হইল! বলিয়া, পার্শ্ববর্ত্তিনী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত, সহসা রাজসমীপে আসিয়া, বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন মহারাজ! বড় এক অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, অপ্সরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টের দোষকীর্ত্তন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ স্ত্রীবেশে সহসা আবির্ভূত হইয়া তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যাহা প্রত্যাখাত হইয়াছে, সে বিষয়ের আর প্রয়োজন নাই; আপনি আবাসে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুন্তলাবৃত্তান্ত লইয়া নিতান্ত আকুলহৃদয় হইয়াছিলেন; এজন্য, অবিলম্বে সভাভঙ্গ করিয়া শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নদীতে স্নান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয় শকুন্তলার অঞ্চলকোণ হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। পতিত হইবামাত্র এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। সেই মৎস্য, কতিপয় দিবসের পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল। ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় করিবার মানসে, ঐ মৎস্যকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে, তদীয় উদর মধ্যে অঙ্গুরীয় দেখিতে পাইল। ঐ অঙ্গুরীয় লইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, সে এক মণিকারের আপণে বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুরীয় রাজনামাঙ্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর স্থির করিয়া, নগরপালের নিকট সংবাদ দিল। নগরপাল আসিয়া ধীবরকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিল এবং জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল? ধীবর কহিল, মহাশয়! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই বেটা যদি চোর নহিস্, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি? যদি চুরি করিস্ নাই, রাজা কি সুব্রাহ্মণ দেখিয়া তোরে দান করিয়াছেন?

এই বলিয়া নগরপাল চৌকিদারকে হুকুম দিলে, চৌকিদার ধীবরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকীদার! আমি চোর নহি আমায় মার কেন? আমি কেমন করিয়া এই আঙ্‌টি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া সে কহিল, আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করি। নগরপাল শুনিয়া কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল, মর্ বেটা আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্। ধীবর কহিল, আজ সকালে আমি শচীতীর্থে জাল ফেলিয়াছিলাম। একটা রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা কাটিয়া উহার পেটের ভিতরে এই আঙ্‌টি দেখিতে পাইলাম। তার পর, এই দোকানে আসিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আমায় ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি না; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন; আমি চুরি করি নাই।

নগরপাল শুনিয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিল, অঙ্গুরীয়ে আমিষগন্ধ নির্গত হইতেছে। তখন সে সন্দিহান হইয়া চৌকিদারকে কহিল, তুই এ বেটাকে এই খানে সাবধানে বসাইয়া রাখ্। আমি রাজবাটীতে গিয়া এই বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি। রাজা শুনিয়া যেরূপ অনুমতি করেন। এই বলিয়া নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়া রাজভবনে গমন করিল; এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরে প্রত্যা-

গত হইয়া চৌকীদারকে কহিল, অরে ! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নয়। অঙ্গুরীয়প্রাপ্তি বিষয়ে ও যাহা কহিয়াছে, বোধ হইতেছে, তাহাব কিছুই মিথ্যা নহে। আর, রাজা উহারে অঙ্গুরীয়তুল্য এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই বলিয়া পুরস্কার দিয়া নগরপাল ধীবরকে বিদায় দিল, এবং চৌকিদারকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র, শকুন্তলাবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বাজার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। তখন তিনি, নিরতিশয় কাতর হইয়া, যৎপরো-নাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং, শকুন্তলার পুনদর্শন বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া, সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন। আহাব, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি এক বারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুন্তলাব চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, তিনি সর্ব্বদাই ম্লান ও বিষণ্ণ বদনে কালযাপন করিতে লাগিলেন ; লোকমাত্রের সহিত বাক্যালাপ এক কালে রহিত হইল ; কোনও ব্যক্তির, কোনও কারণে, রাজসন্নিধানে গতিবিধি এক বারে প্রতিষিদ্ধ হইয়া গেল। কেবল প্রিয় বয়স্য মাধব্য সর্ব্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। মাধব্য সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত, নয়নযুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে থাকিত।

এক দিবস, রাজার চিত্তবিনোদনার্থে, মাধব্য তাঁহাকে প্রমোদবনে লইয়া গেলেন। উভয়ে শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন. ভাল বয়স্য ! যদি তুমি তপোবনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে তিনি উপস্থিত হইলে, প্রত্যাখ্যান করিলে কেন ? রাজা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বয়স্য ! ও কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর ? রাজ-ধানী প্রত্যাগমন করিয়া আমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত একবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্মৃত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে দিবস প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু, আমার কেমন মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, কিছুই স্মরণ হইল না। তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া, কতই দুর্বাক্য কহিয়াছি, কতই অবমাননা করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রু-জলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিল ; বাক্‌শক্তিরহিতের ন্যায় হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; অনন্তর, মাধব্যকে কহিলেন, ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়া-ছিলাম ; তোমায় ত সমুদায় বলিয়াছিলাম ; তুমি কেন কথাপ্রসঙ্গেও কোনও দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপিত কর নাই ? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে ?

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! আমার দোষ নাই; সমুদয় কহিয়া পরিশেষে তুমি বলিয়াছিলে, শকুন্তলাসংক্রান্ত যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই পরিহাসমাত্র, বাস্তবিক নহে। আমিও নিতান্ত নির্বোধ; তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম; এই নিমিত্ত, কখনও সে বিষয়ের উল্লেখ করি নাই। বিশেষতঃ প্রত্যাখ্যানদিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না; থাকিলে, যাহা শুনিয়াছিলাম, আবশ্যক বোধ হইলে বলিতে পারিতাম। রাজা, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে কহিলেন, বয়স্য! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এই বলিয়া তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত হইলেন। তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়া তোমার উচিত নহে। দেখ, সৎপুরুষেরা শোকের ও মোহের বশীভূত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। যদি উভয়ই বায়ুভরে বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষে ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? তুমি গম্ভীরস্বভাব, ধৈর্য্য অবলম্বন ও শোকাবেগ সংবরণ কর।

প্রিয় বয়স্যের প্রবোধবাণী শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অবোধ নহি; কিন্তু, মন আমার কোনও ক্রমে প্রবোধ মানিতেছে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া, প্রস্থানকালে, সাতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমার দিকে যে বারংবার বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার বক্ষঃস্থলে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমি তৎকালে তাঁহার প্রতি যে ক্রূরের ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। মরিলেও আমার এ দুঃখ যাবে না।

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাসপ্রদানার্থে কহিলেন, বয়স্য! অত কাতর হইও না, কিছুদিন পরে পুনরায় শকুন্তলার সহিত নিঃসন্দেহ তোমার সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন, বয়স্য! আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আর সে আশা করি না। এ দেহধারণে, আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। ফলকথা এই, এ জন্মের মত আমার সকল সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে। নতুবা, তৎকালে আমার তেমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! কোনও বিষয়েই নিতান্ত হতাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? দেখ, এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আসিবেক, কাহার মনে ছিল।

ইহা শুনিয়া, অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, অঙ্গুরীয় ! তুমিও আমার মত হতভাগ্য, নতুবা, প্রিয়ার কমনীয় কোমল অঙ্গুলীতে স্থান পাইয়া, কি নিমিত্ত সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে? মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি কি উপলক্ষে তাঁহার অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছিলে? রাজা কহিলেন, রাজধানীপ্রত্যাগমন সময়ে, প্রিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! কত দিন আমায় নিকটে লইয়া যাইবে? তখন আমি এই অঙ্গুরীয় তাঁহার কোমল অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিয়া কহিলাম, প্রিয়ে! তুমি প্রতিদিন আমার নামের এক একটি অক্ষর গণিবে, গণনাও সমাপ্ত হইবেক, আমার লোক আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেক। প্রিয়ার নিকট সরল হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু মোহান্ধ হইয়া, এক বারেই বিস্মৃত হই।

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া রোহিত মৎস্যের উদরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, শচীতীর্থে স্নান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে সলিলে পতিত হইয়াছিল। মাধব্য কহিলেন, হাঁ সম্ভব বটে, সলিলে পতিত হইলে রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে। রাজা অঙ্গুরীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি এই অঙ্গুরীয়ের যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া কহিলেন, অরে অঙ্গুরীয়! প্রিয়ার কোমল করপল্লব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোর কি লাভ হইল, বল্। অথবা তোরে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ, অচেতন ব্যক্তি কখনও গুণগ্রহণ করিতে পারে না; নতুবা, আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়ারে পরিত্যাগ করিলাম? এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমায় অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছি, অনুতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; দর্শন দিয়া প্রাণরক্ষা কর।'

রাজা শোকাকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে চতুরিকা-নাম্নী পরিচারিকা এক চিত্রফলক আনিয়া দিল। রাজা চিত্তবিনোদনার্থে ঐ চিত্রফলকে স্বহস্তে শকুন্তলার প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন। মাধব্য দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, বয়স্য! তুমি চিত্রফলকে কি অসাধারণ নৈপুণ্যপ্রদর্শন করিয়াছ! দেখিয়া কোনও মতে চিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ লাবণ্যের মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ পাইতেছে! রাজা কহিলেন, সখে! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত আমার চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাঁহারে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তুষ্ট হইতে

না। তাঁহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মাত্র এই চিত্রফলকে আবির্ভূত হইয়াছে। এই বলিয়া পরিচারিকাকে কহিলেন, চতুরিকে! বর্ত্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস; অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে।

এই বলিয়া চতুরিকাকে বিদায় করিয়া রাজা মাধব্যকে কহিলেন, সখে! আমি, স্বাদুশীতলনির্মলজলপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসার শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি; প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! চিত্রফলকে আর কি লিখিবে? রাজা কহিলেন, তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যে রূপে হরিণগণকে তপোবনে স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনী নদীতে কেলি করিতে দেখিয়াছিলাম. সে সমুদয়ও চিত্রিত করিব; আর, প্রথম দর্শনের দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম, তাহাও লিখিব।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র দিল। রাজা পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ণ হইলে কেন; রাজা কহিলেন, বয়স্য! ধনমিত্র নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার। এই নিমিত্ত অমাত্য আমায় তদীয় সমুদয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বয়স্য! নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয়! নামলোপ হইল, বংশলোপ হইল, এবং বহু যত্নে বহু কষ্টে বহু কালে উপার্জ্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক।

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া মাধব্য কহিলেন, বয়স্য! তুমি অকারণে এত পরিতাপ কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে, তুমি অবশ্যই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিবে। রাজা কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমায় মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার পুত্রমুখনিরীক্ষণের আশা নাই।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা অপুত্রতানিবন্ধন শোকের সংবরণ পূর্ব্বক প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভার্য্যা আছে; তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ত্বা থাকিতে পারে; অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী কহিল, মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেষ্ঠীর কন্যা ধনমিত্রের এক ভার্য্যা। শুনিয়াছি, শ্রেষ্ঠীকন্যা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক।

এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত পুনরায় শকুন্তলাসংক্রান্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রসারথি মাতলি দেবরথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা, দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া, মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাসা পুরঃসর আসনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন। মাতলি আসনপরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন, নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কালনেমির সন্তান দুর্জ্জয় নামে দুর্দান্ত দানবগণ দেবতাদিগের বিষম শত্রু হইয়া উঠিয়াছে; কতিপয় দিবসের নিমিত্ত দেবলোকে গিয়া আপনাকে দুর্জ্জয় দানবদলের দমন করিতে হইবেক। রাজা কহিলেন, দেবরাজের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম. পরে মাধব্যকে কহিলেন, বয়স্য! অমাত্যকে বল, আমি কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত দেবকার্য্যে ব্যাপৃত হইলাম; আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তিনি একাকী সমস্ত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করুন।

এই বলিয়া সসজ্জ হইয়া রাজা ইন্দ্ররথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজা দানবজয়কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্য্যসমাধানের পর. মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমনকালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন, আমি আপনাকে সেই সৎকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া মনে মনে অতিশয় সঙ্কুচিত হই! মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া সঙ্কুচিত হন; দেবরাজও স্বকৃত সৎকারকে মহারাজকৃত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন, দেবরাজসারথে! এমন কথা বলিও না; বিদায় দিবার সময় দেবরাজ যে সৎকার করিয়া থাকেন, তাহা মাদৃশ জনের মনোরথেরও অগোচর। দেখ, সমবেত সর্ব্ব দেব সমক্ষে অর্দ্ধাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে মন্দারমালা অর্পণ করেন। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি সময়ে সময়ে দানবজয় করিয়া দেবরাজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা অধিক বোধ করি না। বিবেচনা করিতে গেলে, আজ কাল মহারাজের ভুজবলেই দেবলোক নিরুপদ্রব রহিয়াছে। রাজা কহিলেন. আমি যে অনায়াসে দেবরাজের আদেশ সম্পন্ন করিতে পারি, সে দেবরাজেরই মহিমা; নিযুক্তেরা প্রভুর প্রভাবেই মহৎ মহৎ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিয়া উঠে। যদি সূর্যদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, তাহা হইলে, অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন? তখন মাতলি সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিনয় সদ্‌গুণের শোভাসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই বিলক্ষণ বর্ত্তিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া, কিয়ৎ দূর আগমন করিয়া, রাজা মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! ঐ যে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বত স্বর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্ব্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! ও হেমকূট পর্ব্বত, কিন্নর ও অপ্সরাদিগের বাসভূমি; তপস্বীদিগের তপস্যাসিদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্থান; ভগবান্ কশ্যপ ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ

করিয়া যাইব ; এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণে চলিয়া যাওয়া অবিধেয়। তুমি রথ স্থির কর, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ হইতেছি।

মাতলি রথ স্থির করিলেন। রাজা, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবরাজসারথে! এই পর্ব্বতের কোন্ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষির আশ্রম অধিকদূরবর্ত্তী নহে ; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়ৎ দূর গমন করিয়া, এক ঋষিকুমারকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন? ঋষিকুমার কহিলেন, এক্ষণে তিনি নিজপত্নী অদিতিকে ও অন্যান্য ঋষিপত্নীদিগকে পতিব্রতাধর্ম্ম শ্রবণ করাইতেছেন। তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি এখন তাঁহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন, মহারাজ! আপনি, এই অশোক বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা করুন ; আমি মহর্ষির নিকট আপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করিতেছি। এই বলিয়া মাতলি প্রস্থান করিলেন।

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন তিনি নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে হস্ত! আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই ; তুমি কি নিমত্ত বৃথা স্পন্দিত হইতেছ? রাজা মনে মনে এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, বৎস! এত উদ্ধত হও কেন, এই শব্দ রাজার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে ; এখানে যাবতীয় জীব জন্তু স্থানমাহাত্ম্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে না ; এমন স্থানে কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে? যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইল।

এইরূপ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা শব্দানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু সিংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিয়া অতিশয় উৎপীড়ন করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্বাচনীয় মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে ; সিংহশিশু অবিকৃত চিত্তে সেই অত্যাচার সহ্য করিতেছে। অনন্তর, তিনি কিঞ্চিৎ

নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহপরিপূর্ণ চিত্তে কহিতে লাগিলেন, আপন ঔরষে পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্নেহরসে আর্দ্র হয়, এই শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা, আমি পুত্রহীন বলিয়া এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশুকে দেখিয়া আমার মনে এরূপ স্নেহরসের আবির্ভাব হইতেছে।

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে, তাপসীরা কহিতে লাগিলেন, বৎসে! এই সকল জন্তুকে আমরা আপন সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও; ও আপন জননীর নিকটে যাউক। আর, যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমায় জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া সিংহশাবকের উপর অধিকতর উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাপসীরা ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধ্য বুঝিয়া প্রলোভনার্থে কহিলেন বৎসে! তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমায় একটি ভাল খেলনা দিব।

রাজা. এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদের অতি নিকটে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু, সহসা তাঁহাদের সম্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া সস্নেহ নয়নে সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সেই বালক, কই কি খেলনা দিবে দাও বলিয়া, হস্ত-প্রসারণ করিল। রাজা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হস্তে চক্রবর্ত্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। তাপসীদের সঙ্গে কোনও খেলনা ছিল না; সুতরাং, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, তোমরা খেলনা দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর তাপসীকে কহিলেন, সখি! ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়; কুটীরে মাটির ময়ূর আছে, ত্বরায় লইয়া আইস। তাপসী মৃণ্ময় ময়ূরের আনয়নার্থ কুটীরে গমন করিলেন।

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত আমার মন এমন উৎসুক হইতেছে! পরের পুত্র, দেখিলে মনে এত স্নেহদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্র সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া

যখন ইহার মুখচুম্বন করে; হাস্য করিলে যখন ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধবিনির্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে; তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়! আমি অতি হতভাগ্য। সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া সর্ব্ব শরীর শীতল করিব; এবং পুত্রের অর্দ্ধবিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব; এবং অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্মূল হইয়া গিয়াছে।

ময়ূরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া কুপিত হইয়া বালক কহিল, এখনও ময়ূর দিলে না, তবে আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুটিকে অতিশয় বলপ্রকাশ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু তদীয় হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুটিকে কোনও মতে মুক্ত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এমন সময়ে এখানে কোনও ঋষি-কুমার নাই যে ছাড়াইয়া দেয়। এই বলিয়া পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নিরীহ সিংহশিশুকে এই দুর্দ্দান্ত বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া, সেই বালককে ঋষিপুত্রবোধে তদনুরূপ সম্বোধন করিয়া; কহিলেন, অহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবনবিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ঋষিকুমার নয়। রাজা কহিলেন, বালকের আকার দেখিয়া বোধ হইতেছে ঋষিকুমার নয়; কিন্তু, এ স্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্ভাবনা নাই এজন্য আমি এরূপ বোধ করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাজা সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরকীয় পুত্রের গাত্র স্পর্শ করিয়া আমার এরূপ সুখানুভব হইতেছে; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পর্শ করিয়া কি অনুপম সুখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না।

বালক নিতান্ত দুর্দ্দান্ত হইয়াও রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভাব হইল, ইহা দেখিয়া; এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, ঐ বালক ঋষিকুমার নহে, ইহা অবগত হইয়া, তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এই বালক যদি ঋষিকুমার না হয়, কোন্ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন, মহাশয়! এ পুরুবংশীয়! রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম। পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে তাঁহারা, প্রথমতঃ সাংসারিক সুখভোগ সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সস্ত্রীক হইয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন।

পরে রাজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; তবে এই বালক কি সংযোগে এখানে আসিল? তাপসী কহিলেন ইহার জননী অপ্সরাসম্বন্ধে এখানে আসিয়া এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন; পুরুবংশ ও অপ্সরাসম্বন্ধ, এই দুই কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে পুনর্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহ, হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক।

এই বলিয়া তিনি তাপসীকে পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন, এই বালক পুরুবংশীয় কোন্ ব্যক্তির পুত্র? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয়! কে সেই ধর্ম্মপত্নীপরিত্যাগী পাপাত্মার নামকীর্ত্তন করিবেক? রাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এ কথা আমাদেরই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেই এক কালে সকল সন্দেহ দূর হইবেক; অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। আমি যখন মোহান্ধ হইয়া স্বহস্তে আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক, অতএব ও কথায় আর কাজ নাই।

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে অপরা তাপসী কুটীর হইতে মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ। এই বাক্যে শকুন্তলাশব্দ শ্রবণ করিয়া বালক কহিল, কই আমার মা কোথায়? তখন তাপসী কহিলেন, না বৎস! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনার কাহাকেও দেখে নাই; নিয়ত জননীর নিকটেই থাকে; এই নিমিত্ত নিতান্ত মাতৃবৎসল। শকুন্তলা বণ্যশব্দে জননীর নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা।

সমুদায় শ্রবণগোচর করিয়া রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীরও নাম শকুন্তলা? কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে! এই সকল কথা শুনিয়া আমার আশাই বা না জন্মিবেক কেন? অথবা আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়াছি; এজন্য নামসাদৃশ্য শ্রবণে মনে মনে বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি; এরূপ নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে।

শকুন্তলা অনেক ক্ষণ অবধি পুত্রকে দেখেন নাই, এ নিমিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা, বিরহকৃশা মলিনবেশা শকুন্তলাকে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নয়নযুগলে প্রবল বেগে জলধারা বহিতে লাগিল; বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, একটিও

কথা কহিতে পারিলেন না। শকুন্তলাও, অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিয়া, স্থির নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্প-বারিতে পরিপ্লুত হইয়া আসিল। বালক, শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসিল, মা! ও কে, ওকে দেখে তুই কাঁদিস্ কেন? তখন শকুন্তলা গদ্গদ বচনে কহিলেন, বাছা! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাজা মনের আবেগসংবরণ করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার নয়। তৎকালে আমার মতিচ্ছন্ন ঘটিয়াছিল, তাহাতেই অবমাননা পূর্ব্বক তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। কয়েক দিবস পরেই, সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে উপনীত হইয়াছিল; তদবধি আমি কি অসুখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। পুনরায় তোমার দর্শন পাইব, আমার সে আশা ছিল না। এক্ষণে তুমি প্রত্যাখ্যানদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

রাজা এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে শকুন্তলা অস্তব্যস্তে রাজার হস্তে ধরিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! উঠ, উঠ; তোমার দোষ কি; সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, তাহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে শকুন্তলার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! প্রত্যাখ্যান কালে তোমার নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম; পরে সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়া দিয়া সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া তিনি স্বহস্তে শকুন্তলার চক্ষের জল মুছিয়া দিলেন। শকুন্তলার শোকসাগর আরও উথলিয়া উঠিল; প্রবল প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর দুঃখাবেগের সংবরণ করিয়া শকুন্তলা রাজাকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! তুমি যে এই দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল না। কি রূপে আমি পুনর্ব্বার তোমার স্মৃতিপথে উপনীত হইলাম, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তখন রাজা কহিলেন প্রিয়ে! তৎকালে তুমি আমায় যে অঙ্গুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিবস পরে উহা আমার হস্তে পড়িলে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলীস্থিত সেই অঙ্গুরীয় দেখাইয়া, পুনর্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই; ওই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে কহিলেন, মহারাজ! এত দিনের পর আপনি যে ধর্ম্মপত্নীর সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। ভগবান্ কশ্যপও শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে আশ্রমে গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন রাজা শকুন্তলাকে কহিলেন, প্রিয়ে! চল, আজ উভয়ে এক সমভিব্যাহারে ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা কহিলেন, আর্য্যপুত্র! ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকটে যাইতে পারিব না। তখন রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়া দোষাবহ নহে। চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই।

এই বলিয়া রাজা শকুন্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্যপের নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, ভগবান্ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন, তখন সস্ত্রীক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ, বৎস! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর, এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন; অনন্তর শকুন্তলাকে কহিলেন, বৎসে! তোমার স্বামী ইন্দ্রসদৃশ, পুত্র জয়ন্তসদৃশ; তোমায় অন্য আর কি আশীর্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও। এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া কশ্যপ উভয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ণ বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহর্ষি কণ্বের পালিত তনয়া। মৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় তপোবনে উপস্থিত হইয়া আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে, ইঁনি যৎকালে রাজধানীতে নীত হন, তখন আমার এরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে, ইঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। চিনিতে না পারিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহর্ষি কণ্বের নিকট, যার পর নাই, অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আর, যাহাতে ভগবান্ কণ্ব আমার উপর অক্রোধ হন, আপনাকে তাহারও উপায় করিতে হইবেক।

কশ্যপ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সে জন্য তুমি কুণ্ঠিত হইও না। এ বিষয়ে তোমার অণুমাত্র অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি সেই স্মৃতিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া তিনি শকুন্তলাকে কহিলেন বৎসে! রাজা তপোবন হইতে স্বীয় রাজধানী প্রতিগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া কুটীরে উপবিষ্ট ছিলে। সেই সময়ে দুর্ব্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এক কালে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ছিলে,

সুতরাং তাঁহার সৎকার বা সংবৰ্দ্ধনা করা হয় নাই। তিনি কুপিত হইয়া তোমায় এই শাপ দিয়া চলিয়া যান, তুই যার চিন্তায় মগ্ন হইয়া অতিথির অবমাননা করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক না। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। তোমার সখীরা শুনিতে পাইয়া তাঁহার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় করিলেন। তখন তিনি কহিলেন, এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, বৎস! দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই তোমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তুমি ইঁহাকে চিনিতে পার নাই। শকুন্তলার সখীর অনুনয়বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া দুর্ব্বাসা অভিজ্ঞানদর্শনকে শাপমোচনের উপায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত অঙ্গুরীয়দর্শনমাত্র শকুন্তলাবৃত্তান্ত পুনর্বার তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়।

দুর্ব্বাসার শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া রাজা কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছিল; নতুবা, আর্য্যপুত্র এমন সরলহৃদয় হইয়া কেন আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? দুর্ব্বাসার শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এই জন্যেই তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, সখীরাও যত্ন পূর্ব্বক আর্য্যপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজ ভাগ্যে এই কথা শুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে আর্য্যপুত্র অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া ক্ষোভ থাকিত।

পরে কশ্যপ রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং সকল ভুবনের ভর্ত্তা হইয়া উত্তর কালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। তখন রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি না সম্ভবিতে পারে? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কণ্ব ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক। তদানুসারে, কশ্যপ দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কণ্ব ও মেনকার নিকট সংবাদপ্রাদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বৎস! বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ; অতএব, আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান কর। তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া, প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সস্ত্রীক সপুত্র রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

———

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

সীতার বনবাস

ভূমিকা

সীতার বনবাস প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ ভবভূতিপ্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদ সকল পুস্তকবিশেষ হইতে পরিগৃহীত নহে, রামায়ণের উত্তর কাণ্ড অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত হইয়াছে। ঈদৃশ করুণরসোদ্বোধক বিষয় যে রূপে সঙ্কলিত হওয়া উচিত, এই পুস্তকে সেরূপ হওয়া সম্ভাবনীয় নহে; সুতরাং, সহৃদয় লোকে পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি, সীতার বনবাস, কিঞ্চিৎ অংশেও, পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই, আমি চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ। সংবৎ ১৯১৭।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

সীতার বনবাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে, স্বল্প সময়েই সমস্ত কোশলরাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ, তদীয় অধিকারকালে প্রজালোকের সর্ব্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্যসঞ্চার ঘটিয়াছিল, ভূমণ্ডলে কোনও কালে কোনও রাজার শাসনসময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, যথাকালে, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, অবহিত চিত্তে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন; অবশিষ্ট সময় ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ার সহবাসসুখে অতিবাহিত হইত।

কালক্রমে জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে রামের ও রাম-জননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দেখিব, এই মনের উল্লাসে স্ব স্ব আবাসে অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল।

কিয়ৎ দিন পরে, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিলেন। রাজা রামচন্দ্র, পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইলেন। এই সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এজন্য তিনি, এবং তদনুরোধে রাম ও লক্ষ্মণ, নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে পারিলেন না; কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে জামাতৃযজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারাও, পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে কোনও মতে সম্মত ছিলেন না; কেবল, জামাতৃকৃত নিমন্ত্রণের উল্লঙ্ঘন সর্ব্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায় নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক যজ্ঞদর্শনে গমন করেন।

কতিপয় দিবস পূর্ব্বে, রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। তিনি, কৌশল্যাপ্রভৃতি নিমন্ত্রণগমনের অব্যবহিত পরেই, মিথিলায় প্রতিগমন করিলেন। প্রথমতঃ শশ্রূজনবিরহ, তৎপরেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুল হইলেন। পূর্ণ গর্ভ অবস্থায় শোকা-মোহাদি দ্বারা অভিভূত হইলে, অনিষ্টপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা; এজন্য রামচন্দ্র, সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক, সীতার সান্ত্বনার নিমিত্ত সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিত করিতে লাগিলেন।

এক দিবস, রামচন্দ্র জানকীসমীপে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে, প্রতীহারী আসিয়া বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া অষ্টাবক্র মুনি আসিয়াছেন। রাম ও জানকী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তাঁহাকে ত্বরায় এই স্থানে আন। প্রতীহারী, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক, পুনর্বার অষ্টাবক্র সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। অষ্টাবক্র, দীর্ঘায়ুরস্তু বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাম ও জানকী প্রণাম করিয়া বসিতে আসনপ্রদান করিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ ঋষিশৃঙ্গের কুশল? তাঁহার যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে? সীতাও জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, আমার গুরুজন ও আর্য্যা শান্তা সকলে কুশলে আছেন? তাঁহারা আমাদিগকে মনে করেন, না এক বারেই ভুলিয়া গিয়াছেন।

অষ্টাবক্র, সকলের কুশলবার্ত্তাবিজ্ঞাপন করিয়া, সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক জানকীকে বলিলেন, দেবি! ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী তোমায় প্রসব করিয়াছেন; সাক্ষাৎ প্রজাপতি রাজা জনক তোমার পিতা; তুমি সর্ব্বপ্রধান রাজকুলের বধূ হইয়াছ; তোমার বিষয়ে আর কোনও প্রার্থয়িতব্য দেখিতেছি না; অহোরাত্র এইমাত্র প্রার্থনা করিতেছি তুমি বীরপ্রসবিনী হও। সীতা শুনিয়া লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিতা হইলেন। রাম যার পর নাই হর্ষিত হইয়া বলিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব যখন এরূপ আশীর্বাদ করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমাদের মনোরথসম্পন্ন হইবেক। অনন্তর, অষ্টাবক্র রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! ভগবতী অরুন্ধতী দেবী, বৃদ্ধ মহিষীগণ, ও কল্যাণিনী শান্তা ভূয়োভূয়ঃ বলিয়াছেন, সীতা দেবী যখন যে অভিলাষ করিবেন, যেন তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হয়। রাম বলিলেন, আপনি তাঁহাদিগকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবেন, ইনি যখন যে অভিলাষ করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইতেছে; সে বিষয়ে আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আলস্য বা ঔদাস্য নাই।

অনন্তর, অষ্টাবক্র বলিলেন, দেবি জানকি! ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন, বৎসে! তুমি পূর্ণগর্ভা, এজন্য তোমায় আনিতে পারি নাই, তন্নিমিত্ত আমি যেন তোমার বিরাগভাজন না হই; আর রাম ও লক্ষ্মণকে তোমার চিত্তবিনোদনার্থে রাখিতে হইয়াছে; আরব্ধ যজ্ঞ সমাপিত হইলেই, আমরা সকলে অযোধ্যায় গিয়া তোমার ক্রোড়দেশ এক বারে নব কুমারে সুশোভিত দেখিব। রাম শুনিয়া স্মিতমুখ ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া

অষ্টাবক্রকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আমার প্রতি কোনও আদেশ করিয়াছেন? অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ বশিষ্ঠ দেব আপনারে বলিয়াছেন, বৎস! জামাতৃযজ্ঞে রুদ্ধ হইয়া, আমাদিগকে কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবেক। তুমি বালক, অল্প দিন মাত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। প্রজারঞ্জনকার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিবে, প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন। রাম বলিলেন, আমি ভগবানের এই আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম, তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সর্ব্বদাই আমার শিরোধার্য্য। আপনি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইয়া বলিবেন, যদি প্রজালোকের সর্ব্বাঙ্গীন অনুরঞ্জনের জন্য আমায় স্নেহ, দয়া, বা সুখভোগে বিসর্জ্জন দিতে হয়, অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়াপরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি কিছুমাত্র কাতর হইব না। তিনি যেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ থাকেন; আমি প্রজারঞ্জনকার্য্যে ক্ষণ কালের জন্যেও অলস বা অনবহিত নহি। সীতা শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, এরূপ না হইলেই বা আর্য্যপুত্র রঘুকুলধুরন্ধর হইবেন কেন?

অনন্তর, রামচন্দ্র সন্নিহিত পরিচারকের প্রতি অষ্টাবক্রকে বিশ্রাম করাইবার আদেশপ্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র সমুচিত সম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া বিশ্রমার্থ প্রস্থান করিলে, রাম ও জানকী পুনরায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ আসিয়া বলিলেন, আর্য্য! আমি এক চিত্রকরকে আপনকার চরিত্র চিত্রিত করিতে বলিয়াছিলাম, সে এই আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে, অবলোকন করুন। রাম বলিলেন, বৎস! দেবী দুর্ম্মনায়মানা হইলে, কিরূপে তাঁহার চিত্তবিনোদন করিতে হয়, তাহা তুমিই বিলক্ষণ জান; তা জিজ্ঞাসা করি, এই চিত্রপটে কি পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা জানকীর অগ্নিপরিশুদ্ধিকাণ্ড পর্য্যন্ত।

রাম শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৎস! তুমি আমার সমক্ষে আর ও কথা মুখে আনিও না; ও কথা শুনিলে অথবা মনে হইলে, আমি সাতিশয় কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই। কি আক্ষেপের বিষয়! যিনি জন্মপরিগ্রহ করাতে জগৎ পবিত্র হইয়াছে, তাঁহাকেও আবার অন্য পাবন দ্বারা পূত করিতে হইয়াছিল। হায়, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত! সীতা বলিলেন, নাথ! সে সকল কথা মনে করিয়া আপনি অকারণে ক্ষুব্ধ হইতেছেন কেন? আপনি তৎকালে সদ্বিবেচনার কর্ম্মই করিয়াছিলেন; সেরূপ না করিলে চিরনির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্কস্পর্শ হইত, এবং আমারও অপবাদবিমোচন হইত না। সীতার

বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রামচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে ! আর ও কথায় কাজ নাই ; এস আলেখ্য দেখি।

সকলে আলেখ্যদর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। সীতা কিয়ৎ ক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চারণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আলেখ্যের উপরিভাগে ঐ সমস্ত কি চিত্রিত রহিয়াছে ? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! ও সকল সমন্ত্রক জৃম্ভক অস্ত্র। ব্রহ্মাদি প্রাচীন গুরুগণ, বেদরক্ষার নিমিত্ত, দীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া ঐ সকল তপোময় তেজঃপুঞ্জ পরম অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গুরুপরম্পরায় ভগবান্ কৃশাশ্বের নিকট সমাগত হইলে, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট হইতে ঐ সমস্ত মহাস্ত্র পাইয়াছিলেন। পরম কৃপালু রাজর্ষি, সবিশেষে কৃপাদর্শন পূর্ব্বক, তাড়কানিধনকালে আমায় তৎসমুদয় দিয়াছিলেন। তদবধি উহারা আমার অধিকারে আছে, তোমার পুত্র হইলে তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবেক।

লক্ষ্মণ বলিলেন দেবি! এ দিকে মিথিলাবৃত্তান্তে দৃষ্টিপাত করুন। সীতা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, তাই ত, ঠিক্ যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলিত করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আ মরি মরি, কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে। আবার, এ দিকে বিবাহকালীন সভা! সেই সভায় তোমরা চারি ভাই, তৎকালোচিত বেশ ভূষায় অলঙ্কৃত হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছ। চিত্র দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সেই প্রদেশে ও সেই সময়ে বিদ্যমান রহিয়াছি। শুনিয়া, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ বলিয়াছ, যখন মহর্ষি শতানন্দ তোমার কমনীয় কোমল করপল্লব আমার করে সমর্পিত করিয়াছিলেন, যেন সেই সময় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চিত্রপটের স্থলান্তরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণ বলিলেন, এই আর্য্যা, এই আর্য্যা মাণ্ডবী, এই বধূ শ্রুতকীর্ত্তি ; কিন্তু তিনি লজ্জাবশতঃ উর্ম্মিলার উল্লেখ করিলেন না। সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্যমুখে উর্ম্মিলার দিকে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এ দিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে ? লক্ষ্মণ কোনও উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি! দেখুন দেখুন, হরশরাসনের ভঙ্গবার্ত্তাশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া, ক্ষত্রিয়কুলান্তকারী ভগবান্ ভৃগুনন্দন আমাদের অযোধ্যাগমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন ; আর, এ দিকে দেখুন, ভুবনবিজয়ী আর্য্য তাঁহার দর্পসংহার করিবার নিমিত্ত শরাশনে শরসন্ধান করিয়াছেন। রাম আত্মপ্রশংসাবাদশ্রবণে অতিশয় লজ্জিত হইতেন, তজ্জন্য বলিলেন, লক্ষ্মণ! এই চিত্রে আর আর

নানা দর্শনীয় আছে, ঐ অংশ লইয়া আন্দোলন করিতেছ কেন? সীতা রামবাক্যশ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এমন না হইলে, সংসারের লোকে একবাক্য হইয়া আপনার এত প্রশংসা করিবেক কেন?

তৎপরেই অযোধ্যাপ্রবেশকালীন চিত্র নেত্রপথে পতিত হওয়াতে, রাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে বলিতে লাগিলেন, আমরা বিবাহ করিয়া আসিলে, কত উৎসবে দিনপাত হইয়াছিল; পিতৃদেবের কতই আমোদ কতই আহ্লাদ; মাতৃদেবীরা অভিনব বধূদিগকে পাইয়া কেমন আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন; সতত, তাহাদের প্রতি কতই যত্ন, কতই বা মমতাপ্রদর্শন, করিতেন, রাজভবন নিরন্তর আহ্লাদময় ও উৎসবপূর্ণ হইয়াছিল। হায়! সে সকল কি আহ্লাদের, কি উৎসবের, দিনই গিয়াছে। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! এই মন্থরা। রাম, মন্থরার নামশ্রবণে অন্তঃকরণে বিরক্ত হইয়া, কোনও উত্তর না দিয়া অন্য দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে! দেখ দেখ, শৃঙ্গবের নগরে যে তাপসতরু তলে পরম বন্ধু নিষাদপতির সহিত সমাগম হইয়াছিল, উহা কেমন সুন্দর চিত্রিত হইযাছে।

সীতা দেখিয়া হর্ষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নাথ! এ দিকে জটাবন্ধন ও বল্কলধারণ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে, দেখুন। লক্ষ্মণ আক্ষেপপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বৃদ্ধবয়সে পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে বাস করেন; কিন্তু আর্য্যকে বাল্যকালেই কঠোর আরণ্য ব্রত অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, তিনি রামকে বলিলেন আর্য্য! মহর্ষি ভরদ্বাজ, আমাদিগকে চিত্রকূটে যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, যাহার কথা বলিয়াছিলেন, এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ। তখন সীতা বলিলেন, কেমন নাথ! এই প্রদেশের কথা মনে হয়? রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব? এই স্থলে তুমি, পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়া, আমার বক্ষঃস্থলে মস্তক দিয়া নিদ্রা গিয়াছিলে।

সীতা অন্য দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এ দিকে আমাদের দক্ষিণারণ্যপ্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এই স্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে-আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া আতপনিবারণ করিয়া-ছিলেন। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন; গৃহস্থগণ, বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক, সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রামসুখসেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য!

এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকা প্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবল বেগে গমন করিতেছে। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার স্মরণ হয়, এই স্থানে কেমন মনের সুখে ছিলাম। আমরা কুটীরে থাকিতাম; লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া আহারোপযোগী ফল মূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; গোদাবরীতীরে মৃদু মন্দ গমনে ভ্রমণ করিয়া, আমারা প্রাহ্ণে ও অপরাহ্ণে শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের সেবন করিতাম। হায়! তেমন অবস্থায় থাকিয়াও কেমন সুখে সময় অতিবাহিত হইয়াছিল।

লক্ষ্মণ আলেখ্যের অপর অংশে অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! এই পঞ্চবটী, এই শূর্পণখা। মুগ্ধস্বভাবা সীতা, যেন যথার্থই পূর্ব্ব অবস্থা উপস্থিত হইল, এইরূপ ভাবিয়া, ম্লান বদনে বলিলেন, হা নাথ! এই পর্য্যন্তই দেখা শুনা শেষ হইল। রাম হাস্যমুখে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, অয়ি বিয়োগ-কাতরে! এ চিত্রপট, বাস্তবিক পঞ্চবটী অথবা পাপীয়সী শূর্পণখা নহে। লক্ষ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য্য! চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্তান্ত বর্ত্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দুরাচার মারীচ হিরণ্ময় মৃগের আকৃতিধারণ করিয়া যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল, যদিও সম্পূর্ণ বৈরনির্যাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলে মর্ম্মবেদনাপ্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্য্য মানবসমাগমশূন্য জনস্থান ভূভাগে বিকলচিত্ত হইয়া যেরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হায়! এ অভাগিনীর জন্যে আর্য্যপুত্রকে কতই ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে রামেরও নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! চিত্র দেখিয়া আপনি এত শোকাভিভূত হইতেছেন কেন? রাম বলিলেন, বৎস! তৎকালে আমার যে বিষম অবস্থা ঘটিয়াছিল, যদি বৈরনির্যাতনসঙ্কল্প অনুক্ষণ অন্তঃকরণে জাগরূক না থাকিত, তাহা হইলে, আমি কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিতাম না। চিত্রদর্শনে সেই অবস্থার স্মরণ হওয়াতে বোধ হইল, যেন আমার হৃদয়ের গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। তুমি সকলই স্বচক্ষে দেখিয়াছ; এখন অনভিজ্ঞের মত কথা বলিতেছ কেন?

লক্ষ্মণ শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইলেন; এবং, বিষয়ান্তরের সংঘটন দ্বারা রামের চিত্তবৃত্তির ভাবান্তরসম্পাদন আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বলিলেন, আর্য্য! এ দিকে দণ্ডকারণ্যভূভাগ দৃষ্টিগোচর করুন; এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ কবন্ধ রাক্ষসের বাস ছিল; এ দিকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে মতঙ্গমুনির আশ্রম; এই সেই সিদ্ধ শবরী শ্রমণা! এই এ দিকে পম্পা সরোবর। রাম পম্পাশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সীতাকে বলিলেন প্রিয়ে! পম্পা পরম রমণীয় সরোবর; আমি তোমার অন্বেষণ করিতে করিতে পম্পাতীরে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, প্রফুল্ল কমল সকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া সরোবরের নিরতিশয় শোভাসম্পাদন করিতেছে; উহাদের সৌরভে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া রহিয়াছে; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন গুন স্বরে গান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; হংস, সারস প্রভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ মনের আনন্দে নির্ম্মল সলিলে কেলি করিতেছে। তৎকালে আমার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনির্গত হইতেছিল; সুতরাং সরোবরের শোভার সম্যক্ অনুভব করিতে পারি নাই; এক ধারা নির্গত ও অপর ধারা উদ্গত হইবার মধ্যে মুহূর্ত্ত মাত্র নয়নের যে অবকাশ পাইয়াছিলাম, তাহাতেই কেবল এক এক বার অস্পষ্ট অবলোকন করিয়াছিলাম।

সীতা, চিত্রপটের আর এক অংশে দৃষ্টিযোজনা করিয়া, লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ঐ যে পর্ব্বতে কুসুমিত কদম্বতরুর শাখায় ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্য্যপুত্র তরুতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি গলদশ্রু নয়নে উঁহারে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! ঐ পর্ব্বতের নাম মাল্যবান; মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান: দেখুন, নব জলধরমণ্ডলের সহযোগে শিখরদেশে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে। এই স্থানে আর্য্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়া, পূর্ব্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে, রাম একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া বলিলেন, বৎস! বিরত হও; বিরত হও; আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না; শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উথলিয়া উঠিতেছে; জানকীর বিরহ পুনরায় নবীভাব অবলম্বন করিতেছে। এই সময়ে সীতার আলস্যলক্ষণ অবির্ভূত হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্য! আর চরিত্রদর্শনের প্রয়োজন নাই; আর্য্যা জানকীর ক্লান্তি বোধ হইয়াছে। এক্ষণে উঁহার বিশ্রাম-সুখসেবা আবশ্যক; আমি প্রস্থান করি, আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুন।

এই বলিয়া বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীতা রামকে বলিলেন,

নাথ! চিত্র দেখিতে দেখিতে, আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। রাম বলিলেন, প্রিয়ে! কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার মুনিপত্নীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথীসলিলে অবগাহন করিব। সীতার অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস। এই মাত্র গুরুজন আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। অতএব, গমনের উপযোগী আয়োজন কর; কল্য প্রভাতেই ইনি অভিলষিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন। সীতা সাতিশয় হর্ষিত হইয়া বলিলেন, নাথ! আপনিও সঙ্গে যাবেন। রাম বলিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক। আমি কি তোমায় নয়নের অন্তরাল করিয়া এক মুহূর্তেও সুস্থ হৃদয়ে থাকিতে পারিব? তৎপরে সীতা সস্মিত মুখে লক্ষ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক। তিনি, যে আজ্ঞা বলিয়া, গমনের উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

লক্ষ্মণ নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, রাম ও সীতা বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কুচিত ভাবে অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সীতার নিদ্রাকর্ষণের উপক্রম হইল। তখন রাম বলিলেন, প্রিয়ে! যদি ক্লান্তিবোধ হইয়া থাকে, আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পিত করিয়া ক্ষণ কাল বিশ্রাম কর। সীতা কোমল বাহুবল্লী দ্বারা রামের গলদেশ অবলম্বন করিলে, তিনি অনির্বচনীয় স্পর্শসুখের অনুভব করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার বাহুলতার স্পর্শে, আমার সর্ব্ব শরীরে যেন অমৃতধারার বর্ষণ হইতেছে, ইন্দ্রিয় সকল অভূতপূর্ব্ব রসাবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে; অকস্মাৎ আমার নিদ্রাবেশ, কি মোহাবেশ, উপস্থিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সীতা, রামমুখবিনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণ-গোচর করিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, নাথ! আপনি চিরানুকুল ও স্থিরপ্রসাদ। যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে। প্রার্থনা এই, যেন চির দিন এইরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ থাকে।

সীতার মৃদু মধুর মোহন বাক্য কর্ণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার কথা শুনিলে, শরীর শীতল হয়, কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হয়, অন্তঃকরণের সজীবতা সম্পাদিত হয়। সীতা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, নাথ! এই নিমিত্তই সকলে আপনাকে প্রিয়ংবদ বলে। যাহা হউক, অবশেষে এ অভাগিনীর যে এত সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এই বলিয়া, সীতা শয়নের নিমিত্ত উৎসুক হইলে, রাম বলিলেন, প্রিয়ে! এখানে অন্যবিধ শয্যার সঙ্গতি নাই; অতএব, হে অনন্য-সাধারণ রামবাহু, বিবাহসময় অবধি, কি গৃহে, কি বনে, কি শৈশবে, কি যৌবনে, উপধানস্থানীয় হইয়া আসিয়াছে, আজও সেই তোমার উপধানকার্য্য সম্পন্ন করুক। এই বলিয়া, রাম বাহু প্রসারিত করিলেন; সীতা তদুপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইলেন।

রাম স্নেহভরে কিয়ৎ ক্ষণ সীতার মুখনিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! যখনই প্রিয়ার বদনসুধাকরে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে

আপ্লুত হয়। ফলতঃ, ইনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, নয়নের রসাঞ্জনরূপিণী, ইঁহার স্পর্শ চন্দনরসে অভিষেকস্বরূপ; বাহুলতা, কণ্ঠদেশে বিনিবেশিত হইলে, শীতল মসৃণ মৌক্তিক হারের কার্য্য করে। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার সকলই অলৌকিকপ্রীতপ্রদ। রাম মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে সীতা নিদ্রাবেশে বলিয়া উঠিলেন, হা নাথ! কোথায় রহিলে।

সীতার স্বপ্নভাষিত শ্রবণগোচর করিয়া রাম বলিতে লাগিলেন, কি চমৎকার! চিত্রদর্শনে প্রিয়ার অন্তঃকরণে যে অতীত বিরহভাবনার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই স্বপ্নে অস্তিত্বপরিগ্রহ করিয়া যাতনাপ্রদান করিতেছে। এই বলিয়া, সীতার গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিতে করিতে, রাম প্রেমভরে প্রফুল্লকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! অকৃত্রিম প্রেম কি পরম পদার্থ। কি সুখ, কি দুঃখ, কি সম্পত্তি, কি বিপত্তি, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, সকল অবস্থাতেই একরূপ ও অবিকৃত। ঈদৃশ প্রণয়সুখের অধিকারী হওয়া অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এরূপ প্রণয় জগতে নিতান্ত বিরল ও একান্ত দুর্লভ; যদি এত বিরল ও এত দুর্লভ না হইত, সংসারে সুখের সীমা থাকিত না।

রামের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই, প্রতীহারী সম্মুখে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! দুর্ম্মুখ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়। দুর্ম্মুখ অন্তঃপুরচারী অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য। রাম, নূতন রাজ্যশাসন বিষয়ে প্রজাগণের অভিপ্রায় অবগত হইবার নিমিত্ত, তাহাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সে প্রতিদিন প্রচ্ছন্ন ভাবে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিত, এবং যে দিন যাহা জানিতে পারিত, রামের গোচর করিয়া যাইত। এক্ষণে উহাকে সমাগত শুনিয়া রাম প্রতিহারীকে বলিলেন, ত্বরায় উহারে আমার নিকটে আসিতে বল। দুর্ম্মুখ আসিয়া প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। রাম তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে দুর্ম্মুখ! আজ কি জানিতে পারিয়াছ, বল? দুর্ম্মুখ বলিল, মহারাজ! কি পৌরগণ, কি জানপদগণ, সকলেই বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে আছি।

এই কথা শুনিয়া রাম বলিলেন, তুমি প্রতিদিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোনও দোষকীর্ত্তন করিয়া থাকে, বল তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত্নবান হই; আমি স্তুতিবাদশ্রবণবাসনায় তোমায় অনুসন্ধান করিতে পাঠাই নাই। দুর্ম্মুখ অন্য অন্য দিন স্তুতিবাদ মাত্র শুনিয়া আসিত, সুতরাং যাহা শুনিত, তাহাই অকপটে রামের নিকটে জানাইত। সে দিবস

সীতাসংক্রান্ত দোষকীর্ত্তন শুনিয়া, অপ্রিয়সংবাদপ্রদান অনুচিত, এই বিবেচনায় গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে রাম দোষকীর্ত্তনকথার উল্লেখ করিবা মাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে, কথঞ্চিৎ বুদ্ধি স্থির করিয়া. শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, না মহারাজ! আমি কোনও দোষকীর্ত্তন শুনিতে পাই নাই। সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে; কিন্তু তাহার আকারপ্রকারদর্শনে রামের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় চলচিত্ত হইয়া আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, তুমি অবশ্যই দোষকীর্ত্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন? কি শুনিয়াছ বল বিলম্ব করিও না; না বলিলে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব, এবং এ জন্মে আর তোমায় মুখাবলোকন করিব না।

রামের নির্ব্বন্ধাতিশয়দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া দুর্ম্মুখ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি কি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম? কি রূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব? আমি অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্য্যের ভারগ্রহণ করিব কেন? কিন্তু যখন, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, ভারগ্রহণ করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকটে অকপটে প্রকৃত কথাই বলা উচিত। এই স্থির করিয়া সে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিল, মহারাজ! যদি আমায় সকল কথা যথার্থ বলিতে হয়, আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গৃহান্তরে চলুন; আমি সে সকল কথা প্রাণান্তেও এখানে বলিতে পারিব না। রাম শুনিবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, সীতার জাগরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; আস্তে আস্তে আপন হস্ত হইতে তাঁহার মস্তক নামাইলেন, এবং দুর্ম্মুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া সত্বর সন্নিহিত গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

এইরূপে গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া, রাম সাতিশয় ব্যগ্রতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক দুর্ম্মুখকে বলিলেন, বিলম্ব করিও না, কি শুনিয়াছ, বিশেষ করিয়া বল; তোমার আকার প্রকার দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। সে বলিল, মহারাজ! যে সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াছি, তাহা মহারাজের নিকট বলিতে হইবেক এই মনে করিয়া আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু যখন, পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনা না করিয়া, ওরূপ কার্য্যের ভার লইয়াছি, তখন অবশ্যই বলিতে হইবেক। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, নিবেদন করিতেছি, আমার অপরাধগ্রহণ করিবেন না। মহারাজ! প্রায় সকলেই একবাক্য হইয়া অশেষ প্রকারে সুখ্যাতি করিয়া বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে বাস করিতেছি; কোনও রাজা কোশল দেশে শাসনের

এরূপ সুপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেহ কেহ রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া থাকে। তাহারা বলে, আমাদের রাজার চিত্ত বড় নির্বিকার, একাকিনী সীতা এত কাল রাবণগৃহে রহিলেন; তিনি তাহাতে কোনও দ্বৈধ বা দোষবোধ না করিয়া অনায়াসে তাঁহারে গৃহে আনিলেন। অতঃপর আমাদের গৃহে স্ত্রীলোকদিগের চরিত্রে দোষ ঘটিলে, তাহাদের শাসন করা সহজ হইবেক না; শাসন করিতে গেলে, তাহারা রাজমহিষীর উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে নিরুত্তর করিবেক। অথবা, রাজা ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা; তিনি যে ধর্ম্ম অনুসারে চলিবেন, আমরা প্রজা, আমাদিগকেও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মহারাজ! যাহা শুনিয়াছিলাম, অবিকল নিবেদন করিলাম, আমাব অপরাধমার্জ্জনা করিবেন। হা বিধাতঃ! এত দিনের পর তুমি আমার দুর্ম্মুখনাম অন্বর্থ করিয়া দিলে। এই বলিয়া বিদায় লইয়া রোদন করিতে করিতে দুর্ম্মুখ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দুর্ম্মুখমুখে সীতাসংক্রান্ত অপবাদবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়া, রাম হা হতোঽস্মি বলিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে আকুল বচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হায়, কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হওয়া ভাল ছিল। কি জন্যে এখনও জীবিত রহিয়াছি? আমি নিতান্ত হতভাগ্য, নতুবা কি নিমিত্তে উপস্থিত রাজ্যাধিকারে বিসর্জন দিয়া আমায় বনবাস আশ্রয় করিতে হইয়াছিল? কি নিমিত্তেই দুর্বৃত্ত দশানন, পঞ্চবটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণপ্রিয়া জানকীরে লইয়া গিয়া, নির্ম্মল রঘুকুল অভূতপূর্ব্ব অপবাদে দূষিত করিয়াছিল? কি নিমিত্তেই বা সেই অপবাদ, অদ্ভুত উপায় দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে অপসারিত হইয়াও, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ পুনর্বার নবীভূত হইয়া সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবেক? সর্ব্বথা, আমার জন্মগ্রহণ ও শরীরধারণ দুঃখভোগের নিমিত্তেই নিরূপিত হইয়াছিল। এখন কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এই লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে, অমূলক বলিয়া, এই অপবাদে উপেক্ষা-প্রদর্শন করি, অথবা, এ জন্মের মত নিরপরাধা জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়া কুলের কলঙ্কবিমোচন করি; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কেহ কখনও আমার মত উভয় সঙ্কটে পড়ে না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অধোদৃষ্টিতে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, অথবা এ বিষয়ে আর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনার প্রয়োজন নাই। যখন রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়াছি,

সর্ব্বোপায়ে লোকরঞ্জন করাই আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও প্রধান ধর্ম্ম ; সুতরাং, জানকীরেই বিসর্জ্জন দিতে হইল। হা হত বিধে! তোমার মনে এই ছিল। এই বলিয়া রাম মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে চেতনাসঞ্চার হইলে, রাম নিতান্ত করুণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, যদি আর আমার চেতা না হইত, আমার পক্ষে সর্ব্বাংশ শ্রেয়স্কর হইত; নিরাপরাধা জানকীরে বিসর্জ্জন দিয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইত না। এই মাত্র অষ্টাবক্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যদি লোকরঞ্জনের অনুরোধে জানকীরও বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাও করিব। এরূপ ঘটিবেক বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞাবাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল! হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্যবাসসহচরি! পরিণামে তোমার যে এরূপ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের হস্তে পড়িয়াছিলে যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগ্যে সুখভোগ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুবোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে ; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধম ; নতুবা বিনা অপরাধে তোমায় বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাই। আর বাঁচিয়া ফল কি ; আমার জীবিতপ্রয়োজন পর্য্যবসিত হইয়াছে ; জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্য প্রায় প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ বলিতে বলিতে একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পমানকলেবর হইয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন. অনন্তর, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হায়! কি হইল বলিয়া, নিরতিশয় কাতর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হা মাতঃ! হা তাত! জনক! হা দেবি বসুন্ধরে ; হা ভগবতি অরুন্ধতি! হা কুলগুরো বশিষ্ঠ! হা ভগবন্ বিশ্বামিত্র! হা পিয়বন্ধো বিভীষণ! হা পরমোপকারিন্ সখে সুগ্রীব! হা বৎসঅঞ্জনাহৃদয়নন্দন! তোমরা কোথায় রহিয়াছ, কিছুই জানিতে পারিতেছি না ; এখানে দুরাত্মা রাম তোমাদের সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছে। অথবা আর আমি তাদৃশ মহাত্মাদিগের নামগ্রহণে অধিকারী নহি ; আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদের পাপস্পর্শ হইবেক। আমি যখন সরল-হৃদয়া, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীরে, নিতান্ত নিরপরাধা জানিয়াও, অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা মহাপাতকী আর কে আছে? হা রামময়জীবিতে। পাষাণময় নৃশংস রাম হইতে পরিণামে

তোমার যে এরূপ দুর্গতি ঘটিবেক, তাহা তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই। নিঃসন্দেহ রামের হৃদয় বজ্রলেপময়, নতুবা এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমায় ঈদৃশ কঠিনহৃদয় করিয়াছেন; তাহা না হইলে, অনায়াসে এরূপ নৃশংস কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিব কেন!

এই বলিয়া গলদশ্রু নয়নে বিশ্রামভবনে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাম নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক সাতিশয় করুণ স্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! হতভাগ্য রাম এ জন্মের মত বিদায় লইতেছে। এই বলিয়া দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধহৃদয় হইয়া রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যনিরূপণের নিমিত্তে মন্ত্রভবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাম মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন, তিন জনকে সত্বর উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ডাকিয়া পাঠাইলেন। দিবাবসান সময়ে আর্য্য জনকতনয়াসহবাসে কালযাপন করেন, ঈদৃশ সময়ে মন্ত্রভবনে গমন করিয়া অকস্মাৎ আমাদিগের আহ্বান করিলেন কেন, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ভরত প্রভৃতি সাতিশয় সন্দিহান ও আকুলহৃদয় হইলেন, এবং মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে করিতে সত্বরগমনে মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, রাম করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একাকী উপবিষ্ট আছেন, মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। অগ্রজের তাদৃশী দশা দৃষ্টিগোচর করিয়া অনুজেরা বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং কি কারণে তিনি এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অতি বিষম অনিষ্টসঙ্ঘটনের আশঙ্কা করিয়া, তিন জনের মধ্যে, কাহারও এরূপ সাহস হইল না যে, কারণজিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, তাঁহারাও তিন জনে, ঘোরতর বিপৎপাত স্থির করিয়া, এবং রামের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম, উচ্ছলিত শোকাবেগের কথঞ্চিৎ সংবরণ ও নয়নের অশ্রুধারামার্জ্জন করিয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুজদিগকে সম্মুখদেশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা আসনে উপবেশন করিয়া কাতর ভাবে রামচন্দ্রের নিতান্ত নিষ্প্রভ মুখচন্দ্রে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রামের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাঁহারাও যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারি বিমোচিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, লক্ষ্মণ, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বিনয়পূর্ণ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্য! আপনকার এই অবস্থা দেখিয়া আমরা ম্রিয়মাণ হইয়াছি। ভবদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, অবশ্যই কোনও অপ্রতিবিধেয় অনিষ্টসঙ্ঘটন হইয়াছে। গভীর জলধি কখনও অল্প কারণে আকুলিত হয় না; সামান্য বায়ুবেগের প্রভাবে হিমাচল কদাচ বিচলিত হইতে

পারে না। অতএব, কি কারণে আপনি এরূপ কাতরভাবাপন্ন হইয়াছেন, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করুন। আপনকার মুখারবিন্দ সায়ংকালের কমল অপেক্ষাও ম্লান ও প্রভাতসময়ের শশধর অপেক্ষাও নিষ্প্রভ লক্ষিত হইতেছে। ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, রামচন্দ্র অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্ব্বক, দুর্বহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎস ভরত! বৎস লক্ষ্মণ! বৎশ শত্রুঘ্ন! তোমরা আমার জীবন, তোমরা আমার সর্ব্বস্ব ধন, তোমাদের নিমিত্তই আমি দুর্বহ রাজ্যভারের দুঃসহ বহনক্লেশ সহ্য করিতেছি। হিতসাধনে বা অহিতনিবারণে তোমারাই আমার প্রধান সহায়। আমি বিষম বিপদে পড়িয়াছি, এবং সেই বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের অভিপ্রায়ে তোমাদিগকে অসময়ে সমবেত করিয়াছি। আপতিত অনিষ্টের নিবারণোপায় একমাত্র আছে। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে সেই উপায় অবলম্বন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ করিয়াছি। তোমার অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর; সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত তোমাদের গোচর করিয়া, সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা উপস্থিত বিপৎপাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলেন, এবং পুনর্বার প্রবল বেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনুজেরা তদ্দর্শনে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আর্য্যের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশ্যই অতি বিষম অনর্থপাত ঘটিয়াছে; না জানি কি সর্ব্বনাশের কথাই বলিবেন। কিন্তু, অনুভবশক্তি দ্বারা কিছুরই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, শ্রবণের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহারা একান্ত আকুল হৃদয়ে তদীয় বদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন।

রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! শ্রবণ কর; আমাদের পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশে যে মহানুভাব নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাপালন, ও অশেষবিধ অলৌকিক কর্ম্মসমুদয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা এই পরম পবিত্র রাজবংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। আমার মত হতভাগ্য আর নাই; আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সেই চিরপবিত্র ত্রিলোকবিখ্যাত বংশকে দুষ্পরিহর কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিয়াছি। লক্ষ্মণ! তোমার কিছুই অবিদিত নাই।

যৎকালে আমরা তিন জনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করি, দুর্বৃত্ত দশানন আমাদের অনুপস্থিতিকালে বল পূর্ব্বক সীতারে আপন আলয়ে লইয়া যায়। সীতা একাকিনী সেই দুর্বৃত্তের আলয়ে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করেন। অবশেষে আমরা সুগ্রীবের সহায়তায় দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধান করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করি। আমি সেই একাকিনী পরগৃহবাসিনী সীতারে লইয়া গৃহে রাখিয়াছি; ইহাতে পৌরগণ ও জনাপদবর্গ অসন্তোষপ্রদর্শন ও কলঙ্ককীর্ত্তন করিতেছে। এজন্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, জানকীরে আর গৃহে রাখিব না। সর্ব্ব প্রযত্নে প্রজারঞ্জন রাজার পরম ধর্ম্ম। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারি, নিতান্ত অনার্য্যের ন্যায় বৃথা জীবনধারণের ফল কি বল। এক্ষণে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদন কর; তাহা হইলে আমি উপস্থিত সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ পাই।

অগ্রজের এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া অনুজেরা যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন; এবং ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অধোমুখে মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেন। পরিশেষে লক্ষ্মণ অতি কাতর স্বরে বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আপনি যখন যে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমরা কখনও তাহাতে বিরুক্তি বা আপত্তি করি নাই; এক্ষণেও আমরা আপনকার আজ্ঞাপ্রতিরোধে প্রবৃত্ত নহি। কিন্তু আপনকার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আমাদের প্রাণপ্রয়াণের উপক্রম হইয়াছে। আমরা যে আপনকার নিকটে আসিয়া এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিব, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে আমাদের অন্তঃকরণে সে আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, যদি অনুমতিপ্রদান করেন, নিবেদন করি।

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া রাম বলিলেন, বৎস! যা বলিতে ইচ্ছা হয়, সচ্ছন্দে বল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা জানকী একাকিনী রাবণগৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, যথার্থ বটে; এবং রাবণও অতি দুর্বৃত্ত, তাহার কোনও সংশয় নাই। কিন্তু, দুরাচারের সমুচিত শাস্তিবিধানের পর আর্য্যা আপনকার সম্মুখে আনীত হইলে, আপনি লোকাপবাদ ভয়ে প্রথমতঃ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; পরে, অলৌকিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি শুদ্ধচারিণী বলিয়া নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইলে, তাঁহারে গৃহে আনিয়াছেন। সে পরীক্ষাও সর্ব্ব জন সমক্ষে সমাহিত হইয়াছিল। আমরা উভয়ে, আমাদের সমস্ত সেনা ও সেনাপতিগণ, এবং যাবতীয় দেবগণ, দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ পরীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই সাধুবাদপ্রদান পূর্ব্বক

আর্য্যা একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহারে আর পরগৃহবাসনিবন্ধন অপবাদে দূষিত করিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব, আপনি কি কারণে এক্ষণে এরূপ বিষম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অমূলক লোকাপবাদ শুনিয়া ভাবদৃশ মহানুভাবদিগের বিচলিত হওয়া উচিত নহে। সামান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিবেচনা নাই। তাহাদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অতি সামান্য; যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাই বলে; এবং যাহা শুনে, সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা না করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া তাহাতেই বিশ্বাস করে। তাহাদের কথায় আস্থা করিতে গেলে সংসারযাত্রা সম্পন্ন হয় না। আর্য্যা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে, অন্ততঃ আমি যত দূর জানি, আপনকার অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় নাই; এবং, অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি আপন শুদ্ধচারিতার যে অসংশয়িত পরিচয়প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, আর্য্যাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলে লোকে আমাদিগকে নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিবেক; এবং ধর্ম্মতঃ বিবেচনা করিতে গেলে আমাদিগকে দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবেক। অতএব, আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যাবধারণ করুন। আমরা আপনকার একান্ত আজ্ঞাবহ; যে আজ্ঞা করিবেন, তাহাই অসন্দিহান চিত্তে শিরোধার্য্য করিব।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ বিরত হইলেন। রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, বৎস! সীতা যে একান্ত শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই; সামান্য লোকে যে কোনও বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়া, যাহা শুনে, বা যাহা তাহাদের মনে উদিত হয়, তাহাতেই বিশ্বাস করে ও তাহারই আন্দোলন করে, তাহাও বিলক্ষণ জানি। কিন্তু, এ বিষয়ে প্রজাদিগের কিছু মাত্র দোষ নাই; আমাদের অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই এই বিষম সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে। যদি আমরা অযোধ্যায় আসিয়া সমবেত পৌরগণ ও জানপদবর্গ সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে তৎসংক্রান্ত সকল সংশয় অপসারিত হইত। সীতা অলৌকিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় শুদ্ধচারিতার অসংশয়িত পরিচয়প্রদান করিয়াছেন বটে; কিন্তু সেই পরীক্ষার যথার্থতা বিষয়ে প্রজালোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। বোধ করি, অনেকে পরীক্ষাব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ অবগত নহে। সুতরাং, সীতার

চরিত্র বিষয়ে তাহাদের সংশয় দূর হয় নাই। বিশেষতঃ, রাবণের চরিত্র ও বহু কাল একাকিনী সীতার তদীয় আলয়ে অবস্থান, এ দুই বিষয়ের বিবেচনা করিলে, সীতার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতএব, আমি প্রজাদিগকে কোনও অংশে দোষ দিতে পারি না। আমারই অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ এই উপদ্রব উপস্থিত হইতেছে। আমি যদি রাজ্যের ভারগ্রহণ না করিতাম, এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রজারঞ্জনপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ না হইতাম, তাহা হইলে, অমূলক লোকাপবাদে অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়া নিরুদ্বেগে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতাম। যদি রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে জীবনধারণের ফল কি? দেখ, প্রজালোকে, সীতা অসতী বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে সেই সিদ্ধান্ত অপসারিত করা কোন মতে সম্ভাবিত নহে। সুতরাং সীতাকে গৃহে রাখিলে, তাহারা আমারে অসতীসংসর্গী বলিয়া ঘৃণা করিবেক। যাবজ্জীবন ঘৃণাস্পদ হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রাণত্যাগে পরাঙ্মুখ নহি; তোমরা আমার প্রাণাধিক; যদি ঐ অনুরোধে তোমাদিগেরও সংসর্গপরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি; সে বিবেচনায় সীতাপরিত্যাগ তাদৃশ দুরূহ ব্যাপার নহে। অতএব, তোমরা যত বল না কেন, ও যত অন্যায় হউক না কেন, আমি সীতাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া কুলের কলঙ্কবিমোচন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। যদি তোমাদের আমার উপর দয়া ও স্নেহ থাকে, এ বিষয়ে আর আপত্তি উত্থাপিত করিও না। হয় সীতাপরিত্যাগ, নয় প্রাণপরিত্যাগ করিব, ইহার একতর পক্ষ স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে।

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে অবনত বদনে মৌনবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! অন্তঃকরণ হইতে সকল ক্ষোভ দূর করিয়া আমার আদেশপ্রতিপালন কর। ইতঃপূর্ব্বেই, সীতা তপোবনদর্শনের অভিলাষ করিয়াছেন; সেই ব্যপদেশে তুমি তাঁহারে লইয়া গিয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আইস; তাহা হইলে আমার প্রীতিসম্পাদন করা হয়। এ বিষয়ে আপত্তি করিলে আমি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইব। তুমি কখনও আমার আজ্ঞালঙ্ঘন কর নাই। অতএব, বৎস! কল্য প্রভাতেই মদীয় আদেশের অনুযায়ী কার্য্য করিবে, কোনও মতে অন্যথা করিবে না। আর আমার সবিশেষ অনুরোধ এই, আমি যে তাঁহারে এ জন্মের মত বিসর্জন দিলাম, ভাগীরথী পার হইবার পূর্ব্বে

জানকী যেন কোনও অংশে এ বিষয়ের কিছু জানিতে না পারেন। তোমার হৃদয় কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ, এই নিমিত্ত তোমায় সাবধান করিয়া দিলাম।

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তিন জনে, জানকীর পরিত্যাগ বিষয়ে তাঁহাকে তদ্রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া, আপত্তিকরণে বিরত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাম সকলকে বিদায় দিয়া বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলেন। চারি জনেরই যার পর নাই অসুখে রজনীযাপন হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পর দিন প্রভাত হইবা মাত্র লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে বলিলেন, সারথে! অবিলম্বে রথ প্রস্তুত করিয়া আন; আর্য্যা জানকী তপোবনদর্শনে গমন করিবেন। সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তি মাত্র, রথ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ জানকীর বাসভবনে গমন করিয়া দেখিলেন, তিনি, তপোবন-গমনের উপযোগী সমস্ত আয়োজন করিয়া, প্রস্তুত হইয়া রথের প্রতীক্ষা করিতেছেন। লক্ষ্মণ সন্নিহিত হইয়া, আর্য্যে! অভিবাদন করি, এই বলিয়া প্রণাম করিলেন। সীতা, বৎস! চিরজীবী ও চিরসুখী হও, এই বলিয়া, অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! রথ প্রস্তুতপ্রায়, প্রস্থানের অধিক বিলম্ব নাই। সীতা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, বৎস! অদ্য প্রভাতে তপোবনদর্শনে যাইব, এই আনন্দে আমি রাত্রিতে নিদ্রা যাই নাই; সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি; রথ উপস্থিত হইলেই আরোহণ করি। আমি মনে করিয়া-ছিলাম, আর্য্যপুত্র এমন সময়ে আমার তপোবনগমনে আপত্তি করিবেন; তাহা না করিয়া, প্রসন্ন মনে অনুমোদন করাতে, আমি কত প্রীতিলাভ করিয়াছি, বলিতে পারি না। বোধ হয়, আমি জন্মান্তরে অনেক তপস্যা করিয়াছিলাম; সেই তপস্যার বলে এমন অনুকূল পতি পাইয়াছি; আর্য্য-পুত্রের মত অনুকূল পতি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতার কথা মনে হইলে, আমার সৌভাগ্যগর্ব্ব হইয়া থাকে। আমি দেবতাদের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিয়া থাকি যদি পুনরায় নারীজন্ম হয়, যেন আর্য্যপুত্রকে পতি পাই। এই বলিয়া সীতা প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে বলিলেন, বৎস! বনবাসকালে মুনিপত্নীদের সহিত আমার নিরতিশয় প্রণয় হইয়াছিল; তাঁহাদিগকে দিবার নিমিত্ত এই সমস্ত বিচিত্র বসন ও মহামূল্য আভরণ লইয়াছি।

এই বলিয়া সীতা সমুদায় লক্ষ্মণকে দেখাইতেছেন, এমন সময়ে প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, সুমন্ত্র রথ প্রস্তুত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়াছেন। সীতা তপোবনদর্শনে যাইবার নিমিত্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া, সমুদয় দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রথে

আরোহণ করিলেন। অনধিক সময়েই, রথ অযোধ্যা হইতে বিনির্গত হইয়া জনপদে প্রবিষ্ট হইল। সীতা, নয়নের ও মনের প্রীতিপ্রদ প্রদেশ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রীত মনে বলিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমি যে এই সকল মনোহর প্রদেশ দেখিতেছি, ইহা কেবল আর্য্যপুত্রের প্রসাদের ফল; তিনি প্রসন্ন মনে অনুমোদন না করিলে, আমার ভাগ্যে এ প্রীতিলাভ ঘটিয়া উঠিত না। আমি যেমন আহ্লাদ করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তিনিও তেমনই অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ, মুগ্ধস্বভাবা সীতার হর্ষাতিশয় দেখিয়া, এবং, অবশেষে রামচন্দ্র কিরূপ অনুকূলতাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া মনে মনে ম্রিয়মাণ হইলেন; অতি কষ্টে উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিলেন, এবং অনেক যত্নে ভাবগোপন করিয়া সীতার ন্যায় হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ দূর গমন করিলে পর, সীতা সহসা ম্লানবদনা হইয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! এত ক্ষণ আমি মনের আনন্দে আসিতেছিলাম; কিন্তু সহসা আমার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। দক্ষিণ নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে; সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে; অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হইতেছে; পৃথিবী শূন্যময় দেখিতেছি। অকস্মাৎ এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও অসুখের আবির্ভাব হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি আর্য্যপুত্র কেমন আছেন; হয় তাঁহার কোনও অশুভঘটনা হইয়াছে, নয় প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নের কোনও অনিষ্ট ঘটিয়াছে; কিংবা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতেই কোনও অশুভ সংবাদ আসিয়াছে; তথায় গুরুজন কে কেমন আছেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, কোনও প্রকার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই; নতুবা, এমন আনন্দের সময় এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য ও অসুখসঞ্চার উপস্থিত হইবেক কেন? বৎস! কি নিমিত্ত এরূপ হইতেছে বল; আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আর আমার তপোবনদর্শন অভিলাষ হইতেছে না; আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনই অযোধ্যায় ফিরিয়া যাই। ভাল, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আর্য্যপুত্র সঙ্গে আসিবেন বলিয়াছিলেন; তাঁহার আসা হইল না কেন? রথে উঠিবার সময় আহ্লাদে তোমায় সে কথা জিজ্ঞাসিতে ভুলিয়াছিলাম। তাঁহার না আসাতে আমার মনে নানা সন্দেহ হইতেছে। বৎস! কি করি বল; আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমেই প্রবল হইতেছে। রাবণ হরণ করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্ব ক্ষণে ঠিক এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল; আবার কি সেইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবেক? না জানি, কি

সর্ব্বনাশই ঘটিবেক। এক বার মনে হইতেছে, তপোবনদর্শনে না আসিলে ভাল হইত; আর্য্যপুত্রের নিকটে থাকিলে কখনও এরূপ অসুখ উপস্থিত হইত না। এক এক বার মনে হইতেছে আর আমি এ জন্মে আর্য্যপুত্রকে দেখিতে পাইব না।

সীতার এইরূপ চিত্তচাঞ্চল্য দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও শোকাকুল হইলেন; কিন্তু, অতি কষ্টে ভাবগোপন করিয়া শুষ্ক মুখে বিকৃত স্বরে বলিলেন, আর্য্যে! আপনি কাতর হইবেন না। রঘুকুল-দেবতারা আমাদের মঙ্গল করিবেন। বোধ হয়, সকলকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন কেহ নিকটে নাই, এজন্যই আপনকার এই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে। আপনি অস্থির হইবেন না; কিয়ৎ ক্ষণ পরেই উহার নিবৃত্তি হইবেক। মধ্যে মধ্যে সকলেরই চিত্তবৈকল্য ঘটিয়া থাকে। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, সকল সময়ে এক ভাবে থাকে না। আপনি অত উৎকণ্ঠিত হইবেন না।

সীতা, লক্ষ্মণের মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য দর্শনে অধিকতর কাতর হইয়া, জিজ্ঞসা করিলেন, বৎস! তোমার ভাব দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। আমি কখনও তোমার মুখ এরূপ ম্লান দেখি নাই। যদি কোনও অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, স্পষ্ট কবিয়া বল। বলি, আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত? কল্য অপরাহ্ণের পর আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এত ক্ষণ এত অসুখ থাকিত না। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না. আপনার উৎকণ্ঠ ও অসুখ দেখিয়া আমিও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম ও অসুখবোধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই আপনি আমার মুখশোষ ও স্বরবৈলক্ষণ্য লক্ষিত করিয়াছেন, নতুবা বাস্তবিক তাহা নহে, উহা মনে করিয়া, আপনি বিরুদ্ধ ভাবনা উপস্থিত করিবেন না। যত ভাবিবেন, যত আন্দোলন করিবেন, ততই উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তাঁহাদের রথ গোমতীতীরে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে, সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ কমলিনীনায়ক অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংসময়ে গোমতীতীর পরম রমণীয় হইয়া উঠে। তৎকালে তথায় অতি অসুস্থচিত্ত ব্যক্তিও সুস্থচিত্ত ও অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। সৌভাগ্য ক্রমে সীতারও উপস্থিত আন্তরিক অসুখের সম্পূর্ণ অপসারণ হইল। লক্ষ্মণ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। জানকী পথশ্রমে, বিশেষতঃ মনের উৎকণ্ঠায়, সাতিশয় ক্লান্ত

হইয়াছিলেন; সুতরাং, ত্বরায় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি যতক্ষণ জাগরিত ছিলেন, লক্ষ্মণ সতর্ক হইয়া তাঁহাকে নানা মনোহর কথায় এরূপ ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন, যে, তিনি অন্য কোনও দিকে মনঃসংযোগ করিবার অবকাশ পান নাই। ফলতঃ, দিবাভাগে জানকীর যেরূপ অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, রজনীতে তাহার আর কোনও লক্ষণ ছিল না।

প্রভাত হইবা মাত্র, তাঁহারা গোমতীতীর হইতে প্রস্থান করিলেন। সীতা, বামে ও দক্ষিণে, পরম রমণীয় প্রদেশ সকল নয়নগোচর করিয়া, যার পর নাই প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব দিন তাঁহার যেরূপ উৎকণ্ঠা ও অসুখসঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কোনও লক্ষণ লক্ষিত হইল না।

অবশেষে রথ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইল। ভাগীরথীর অপর পারে লইয়া গিয়া সীতাকে এ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণের শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আর তিনি ভাবগোপন বা অশ্রুবেগসংবরণ করিতে পারিলেন না। সীতা দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! কি কারণে তোমার এরূপ ভাব উপস্থিত হইল, বল। তখন লক্ষ্মণ নয়নের অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, আর্য্যে! আপনি ব্যাকুল হইবেন না! বহু কালের পর ভাগীরথীর দর্শনলাভ করিয়া, আমার অন্তঃকরণে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহাতেই অকস্মাৎ আমার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কপিলশাপে ভস্মাবশেষ হইয়াছিলেন; ভগীরথ কত কষ্টে গঙ্গা দেবীকে ভূমণ্ডলে আনিয়া তাঁহাদের উদ্ধারসাধন করেন। বোধ হয়, তাহাই ভাগীরথীদর্শনে স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে এরূপ চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইয়াছিল। সীতা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা ও নিতান্ত সরলহৃদয়া; লক্ষ্মণের এই তাৎপর্য্যব্যাখ্যাতেই সন্তুষ্ট হইলেন; এবং, গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, লক্ষ্মণকে বারংবার তাহার উদ্যোগ করিতে বলিতে লাগিলেন; কিন্তু, গঙ্গা পার হইলেই যে, দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তখন পর্য্যন্ত কিছু মাত্র বুঝিতে পারিলেন না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই তরণীর সংযোগ হইল। লক্ষ্মণ, সুমন্ত্রকে সেই স্থানে রথ রাখিতে বলিয়া, সীতাকে তরণীতে আরোহণ করাইলেন, এবং কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই তাঁহারে ভাগীরথীর অপর পারে উত্তীর্ণ করিলেন। সীতা, তপোবন দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তদভিমুখে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলেন। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যে! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন; আমার

কিছু বক্তব্য আছে, এই স্থানে নিবেদন করিব। এই বলিয়া তিনি অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতা চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কিছু বলিবে বলিয়া, এত ব্যাকুল হইলে কেন? কি বলিবে ত্বরায় বল; তোমার ভাবান্তর দেখিয়া আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। তুমি কি আসিবার সময় আর্য্যপুত্রের কোনও অশুভঘটনা শুনিয়াছ, না অন্য কোনও সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; কি হইয়াছে, শীঘ্র বল? তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, দেবি! বলিব কি, আমার বাক্যনিঃসরণ হইতেছে না, আর্য্যের আজ্ঞাবহ হইয়া আমার অদৃষ্টে যে এরূপ ঘটিবেক,তাহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইলে আমি সৌভাগ্যজ্ঞান করিতাম। যদি মৃত্যু অপেক্ষা কোনও অধিকতর দুর্ঘটনা থাকে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ছিল, তাহা হইলে, আজ আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিতে হইত না। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল। এই বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইয়া লক্ষ্মণ হাহাকার করিতে লাগিলেন।

সীতা, লক্ষ্মণের ঈদৃশ অভাবিত ভাবান্তর উপস্থিত দেখিযা, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন, অনন্তর, হস্তধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অঞ্চল দ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিয়া দিলেন; এবং, তিনি কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে, কাতর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস। কি কারণে তুমি এত ব্যাকুল হইলে? কি জন্যেই বা তুমি মৃত্যুকামনা করিলে? তোমায় একান্ত বিকলচিত্ত দেখিতেছি; অল্প কারণে তুমি কখনই এত আকুল ও এত অস্থির হও নাই। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই? তুমি তদ্গতপ্রাণ; তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, এই জন্যই কল্য অপরাহ্ণে আমার তাদৃশ চিত্তবৈকল্য ঘটিয়াছিল। যাহা হয়, ত্বরায় বলিয়া আমার জীবনদান কর, আমার যাতনার একশেষ হইতেছে। ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, না হইলে, এমন সময়ে তুমি এত ব্যাকুল হইতে না।

সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দর্শনে, লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হইতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্যনিঃসরণ রহিত হইয়া গেল। যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, অবশেষে অবশ্যই বলিতে হইবেক, এই ভাবিয়া, লক্ষ্মণ বলিবার নিমিত্ত বারংবার

চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ক্রমে, তাঁহার মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহাকে এতাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, সীতা তাঁহার হস্তে ধরিয়া, ব্যাকুল চিত্তে কাতর বচনে বারংবার এই অনুরোধ করিতে লাগিলেন বৎস! আর বিলম্ব করিও না; আর্য্যপুত্র যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা, যত নিষ্ঠুর হউক না কেন, ত্বরায় বল; তুমি কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইও না; আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে বল। তোমার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমারই কপাল ভাঙিয়াছে। কি হইয়াছে, ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না; আমি আর এক মূহূর্ত্তে এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না; যাহা হয় বলিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোনও অমঙ্গল ঘটে নাই। যদি তিনি কুশলে থাকেন, আমার আর যে সর্ব্বনাশ ঘটুক না কেন, আমি তাহাতে তত কাতর হইব না। আমার মাথা খাও, তোমায় আর্য্যপুত্রের দোহাই, শীঘ্র বল; আর বিলম্ব করিলে তুমি অধিক ক্ষণ আমায় জীবিত দেখিতে পাইবে না। যদি যাতনা দিয়া আমার প্রাণবধ করা তোমার অভিপ্রেত না হয়, তবে ত্বরায় বল, আর বিলম্ব করিও না।

সীতার এইরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া লক্ষ্মণ ভাবিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। তখন অনেক যত্নে চিত্তের অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যসম্পাদন করিয়া, অতি কষ্টে বাক্যনিঃসরণ করিলেন; বলিলেন, আর্য্যে! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন; সেই কারণে, পৌরগণ ও জনাপদবর্গ, আপনকার চরিত্র বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদকীর্ত্তন করিয়া থাকে। আর্য্য ইহা অবগত হইয়া এক বারে স্নেহ, দয়া, ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদমোচনের নিমিত্ত আপনকার মায়াপরিত্যাগ করিয়াছেন; আমায় এই আদেশ দিয়াছেন, তুমি তপোবনদর্শনের ছলে লইয়া গিয়া, বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া আসিবে। এই সেই বাল্মীকির আশ্রম।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতাও, শ্রবণ মাত্র গতচেতনা হইয়া, বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি অনেক যত্নে জানকীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। জানকী চেতনালাভ করিয়া, উন্মত্তার ন্যায় স্থির নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ, হতবুদ্ধির ন্যায়, চিত্রার্পিতের প্রায়, অধোবদনে, গলদশ্রু নয়নে, দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; ঘন ঘন

নিশ্বাস বহিতে লাগিল ; সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, সীতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত চেষ্টা পাইলেন ; কিন্তু, কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, তাহার কিছু দেখিতে না পাইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে পর, সীতা চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া বলিলেন, লক্ষ্মণ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ, নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে, বল? বুঝিলাম, যাবজ্জীবন দুঃখ-ভোগের নিমিত্তই আমার নারীজন্ম হইয়াছিল। বৎস! অবশেষে আমার যে এ অবস্থা ঘটিবেক, তাহা কাহার মনে ছিল। বহু কালের পর আর্য্যপুত্রের সহিত সমাগম হইলে, ভাবিয়াছিলাম, বুঝি এই অবধি দুঃখের অবসান হইল। কিন্তু, বিধাতা যে আমার কপালে সহস্রগুণ অধিক দুঃখ লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। হায় রে বিধাতা! তোর মনে কি এতই ছিল।

এই বলিতে বলিতে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ বাক্যনিঃসরণ করিতে পারিলেন না ; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, লক্ষ্মণ! নিষ্ঠুর বিধাতা আমার কপালে এত দুঃখভোগ লিখিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, বিধাতার অপরাধ কি ; সকলেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করে। আমি জন্মান্তরে যেরূপ কর্ম্ম করিয়া-ছিলাম, এ জন্মে সেইরূপ ফলভোগ করিতেছি। বোধ করি, পূর্ব্ব জন্মে কোনও পতিপ্রাণা কামিনীকে পতিবিয়োজিতা করিয়াছিলাম ; সেই মহাপাপেই আজ আমার এই দুরবস্থা ঘটিল, নতুবা আর্য্যপুত্রের হৃদয় স্নেহ, দয়া, ও মমতায় পরিপূর্ণ ; আমিও যে একান্ত পতিপ্রাণা ও শুদ্ধচারিণী, তাহাও তিনি বিলক্ষণ জানেন ; তথাপি যে এমন সময়ে আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, সে কেবল আমার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ। বৎস! আমি বনবাসে কাতর নহি। আর্য্যপুত্রের সহবাসে, বহু কাল, বনবাসে ছিলাম ; তাহাতে এক দিন, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার অন্তঃকরণে দুঃখের লেশ মাত্র ছিল না। আর্য্যপুত্রসহবাসে যাবজ্জীবন বনবাসে থাকিলেও, আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইত না। সে যাহা হউক, আমার অন্তঃকরণে এই দুঃখ হইতেছে, আর্য্যপুত্র কি অপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, মুনিপত্নীরা জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর দিব। তাঁহারা আর্য্যপুত্রকে করুণাসাগর বলিয়া জানেন ; আমি প্রকৃত কারণ

বলিলে, তাঁহারা কখনই বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহারা ভাবিবেন, আমি কোনও গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহাতেই তিনি আমায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। বৎস! বলিতে কি, যদি অন্তঃসত্ত্বা না হইতাম, এই মুহূর্ত্তে, তোমার সমক্ষে, জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম। আর আমার জীবনধারণের ফল কি বল? এমন অবস্থাতেও কি প্রাণ রাখিতে হয়? আমি আশ্চর্য্যবোধ করিতেছি, আর্য্যপুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়াও, আমার প্রাণবিয়োগ ঘটিতেছে না। বোধ করি,আমার মত কঠিন প্রাণ কারও নাই; নতুবা, এখনও নির্গত হইতেছে না কেন? অথবা, বিধাতা আমায় চিরদুঃখিনী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; প্রাণত্যাগ হইলে, তাঁহার সে সঙ্কল্প বিফল হইয়া যায়; এজন্তই জীবিত রহিয়াছি।

এইরূপ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে করিতে সীতা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হায় কি হইল বলিয়া, পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। সুশীল লক্ষ্মণ, দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত কাতর ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় বাষ্পবারিমোচন করিতে লাগিলেন; এবং রামচন্দ্রের অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব লোকানুরাগপ্রিয়তাই এই অভূতপূর্ব্ব ভয়ানক অনর্থের মূল, এই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যদি ইতঃপূর্ব্বে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে এই লোকবিগর্হিত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত বিষম কাণ্ড দেখিতে হইত না। আমি আর্য্যের অজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত হইয়া, অতি অসৎ কর্ম্মই করিয়াছি। আমার মত পাষণ্ড ও পাষাণহৃদয় আর নাই; নতুবা,এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণ করিব কেন? কেমন করিয়া, এমন সরলহৃদয়, শুদ্ধচারিণী, পতিপ্রাণা কামিনীকে এরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনাইলাম? যদি, আর্য্যের আদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া, আমায় এ জন্মের মত তাঁহার বিরাগভাজন ও জন্মান্তরে নিরয়গামী হইতে হইত, তাহাও আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর ছিল। সর্ব্বথা আমি অতি অসৎ কর্ম্মই করিয়াছি। হা বিধাতঃ! কেন তুমি আমায় এরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ডের ভারগ্রহণে প্রবৃত্তি দিয়াছিলে? হা কঠিন হৃদয়! তুমি এখনও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হা কঠিন প্রাণ! তুমি এখনও প্রস্থান করিতেছ না কেন? হা দগ্ধ কলেবর! তুমি এখনও সর্ব্ব অবয়বে বিশীর্ণ হইতেছ না কেন? আর আমি আর্য্যার এ অবস্থা দেখিতে পারি না। হা আর্য্য! তুমি যে এমন কঠিন-হৃদয়, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। যদি তোমার মনে এতই ছিল, তবে আর্য্যার উদ্ধারসাধনে তত সচেষ্ট হইবার কি প্রয়োজন ছিল? দশানন হরণ

করিয়া লইয়া গেলে পর, উন্মত্ত ও হতচেতন হইয়া, হাহাকার করিয়া বেড়াইবারই বা কি আবশ্যকতা ছিল? তুমি অবশেষে এই করিবে বলিয়া, কি আমরা লঙ্কাসমরের দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলাম? যাহা হউক, তোমার মত নির্দয় ও নৃশংস ভূমণ্ডলে নাই।

কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ ও রামচন্দ্রের ভৎর্সনা করিয়া, লক্ষ্মণ উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ পূর্ব্বক সীতার চৈতন্যসম্পাদনে সযত্ন হইলেন। চেতনা-সঞ্চার হইলে, সীতা, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া, স্নেহভরে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! ধৈর্য্য অবলম্বন কর; আর বিলাপ ও পরিতাপ করিও না। সকলই অদৃষ্টাধীন; আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহাই ঘটিয়াছে; তুমি আর সে জন্য কাতর হইও না; শোকসংবরণ কর। আমার ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও। তিনি আমায় বনবাস দিয়া কাতর ও অস্থির হইয়াছেন, সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার শোকের নিবারণ ও চিত্তের স্থিরতা হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হইবে; তাঁহাকে বলিবে, আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া, ক্ষোভ করিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি সদ্বিবেচনার কার্য্যই করিয়াছেন। প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম; আমায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি রাজধর্ম্মপ্রতিপালন করিয়াছেন। আমি তাঁহার মন জানি; তিনি যে কেবল লোকাপবাদের ভয়ে এই কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তিনি যেন শোকশূন্য ও ক্ষোভ-শূন্য হইয়া প্রশস্ত মনে প্রজাপালনে নিয়ত ব্যাপৃত থাকেন। তাঁহার চরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, যদিও আমি লোকাপবাদভয়ে, অযোধ্যা হইতে নির্বাসিত হইলাম, যেন তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে এক বারে অপসারিত না হই। আমি তপোবনে থাকিয়া এই উদ্দেশে ঐকান্তিক চিত্তে তপস্যা করিব, যেন জন্মান্তরেও তিনি আমার পতি হন। আর, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিবে, যদিও ভার্য্যাভাবে আমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কিন্তু যেন সামান্য প্রজা বলিয়া গণ্য করেন। তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর; যেখানে থাকি, তাঁহার অধিকারবহির্ভূত নই।

এই বলিয়া একান্ত শোকাকুল হইয়া সীতা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, নিতান্ত কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, আমি সে জন্যে তত কাতর নহি, পাছে আর্য্যপুত্রের মনে ক্লেশ হয়, সেই ভাবনাতেই আমি অস্থির হইতেছি। তাঁহাকে বিনয় করিয়া বলিবে, তিনি যেন শোকসংবরণ করিয়া ত্বরায় সুস্থচিত্ত হন।

আমার ক্লেশের একশেষ হইয়াছে, যথার্থ বটে ; কিন্তু, সে জন্যে, আমি তাঁহাকে অণুমাত্র দোষ দিব না ; আমার যেমন অদৃষ্ট, তেমনই ঘটিয়াছে ; তজ্জন্য তিনি যেন ক্ষোভ না করেন। বৎস ! তোমায় আমার অনুরোধ এই, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবে, ক্ষণ কালের নিমিত্তেও তাঁহারে একাকী থাকিতে দিবে না ; একাকী থাকিলেই তাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখ বাড়িবেক। তিনি ভাল থাকিলেই আমার ভাল। যাহাতে তিনি সুখে থাকেন, সে বিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে। এই বলিয়া, লক্ষ্মণের হস্তে ধরিয়া, সীতা বাষ্পপরিপ্লুত লোচনে করুণ বচনে বলিলেন, তুমি আমার নিকট শপথ করিয়া বল, এ বিষয়ে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। তপোবনে থাকিয়া, যদি লোকমুখে শুনিতে পাই, আর্য্যপুত্র কুশলে আছেন, তাহা হইলেই আমার সকল দুঃখ দূর হইবেক।

এই বলিতে বলিতে সীতার নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদীয় পতিপরায়ণতার সম্পূর্ণপ্রমাণপূর্ণ বচনপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া, লক্ষ্মণের শোকপ্রবাহ প্রবল বেগে প্রোচ্ছলিত হইয়া উঠিল ; নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সীতা সান্ত্বনাবাক্যে লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! শোকাবেগসংবরণ করিয়া, ত্বরায় তুমি আর্য্যপুত্রের নিকটে যাও, আর বিলম্ব করিও না। বারংবার এইরূপ বলিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বিদায় দিবার নিমিত্ত নিরতিশয় ব্যস্ত হইলেন। লক্ষ্মণ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সন্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং গলদশ্রু লোচনে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন, আর্য্যে ! আপনি পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছেন, আমি আর্য্যের একান্ত আজ্ঞাবহ, যখন যে আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তৎপ্রতিপালনে প্রবৃত্ত হই। প্রাণান্তস্বীকার করিয়াও অগ্রজের আজ্ঞা প্রতি-পালন করা অনুজের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। আমি সেই অনুজধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া আর্য্যের এই বিষম আজ্ঞার প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমি যে পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম করিবার ভারগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিলাম। প্রার্থনা এই, আমার উপর আপনকার যে অপরিসীম স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তাহার যেন বৈলক্ষণ্য না হয়। আর, আর্য্যের আদেশ অনুসারে, এরূপ নৃশংস আচরণ করিয়া, আমি যে বিষম অপরাধ করিলাম, কৃপা করিয়া আমার সেই অপরাধের মার্জ্জনা করিবেন।

লক্ষ্মণকে এইরূপ শোকাভিভূত দেখিয়া, সীতা বলিলেন, বৎস ! তোমার অপরাধ কি ? তুমি কেন অকারণে এত কাতর হইতেছ ও পরিতাপ করিতেছ ? তোমার উপর রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কথা দূরে থাকুক, আমি কায়মনোবাক্যে দেবতাদের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করিব, যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই ; তুমি চিরজীবী হও। তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্যপুত্রের চরণে আমার প্রণাম জানাইবে। ভরত, শত্রুঘ্ন, ও আমার ভগিনীদিগকে স্নেহসম্ভাষণ বলিবে ; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে,

তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদিত করিবে। বৎস! তোমায় আর একটি কথা বলিয়া দি। আমি চিরদুঃখিনী, বিধাতা আমার অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই; সুতরাং, আমার যে সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি। কিন্তু এই করিও, যেন আমার ভগিনীগুলি কষ্ট না পায়। তাহারা আমার নিমিত্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইবেক; যাহাতে ত্বরায় তাহাদের শোক নিবৃত্তি হয়, সে বিষয়ে তোমরা তিন জনে সতত যত্ন করিও; তাহারা সুখে থাকিলেও, অনেক অংশে আমার দুঃখনিবারণ হইবেক। তাহাদিগকে বলিবে, আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি; আমার জন্যে শোকাকুল হইবার ও ক্লেশভোগ করিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, স্নেহভরে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া, সীতা লক্ষ্মণকে প্রস্থান করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ বাষ্পাকুল লোচনে ও শোকাকুল বচনে, আর্য্যে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক এই কথা বলিয়া, পুনরায় প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলেন। সীতা অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা অল্পক্ষণেই ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং, কিয়ৎ ক্ষণ নিস্পন্দ নয়নে জানকীর নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যত ক্ষণ সীতাকে দেখিতে পাওয়া গেল, লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; সীতাও চিত্রার্পিতপ্রায় রথে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইল। তখন লক্ষ্মণ, আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও, রথ নয়নপথবহির্ভূত হইবামাত্র, যূথবিরহিত কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সীতার ক্রন্দনশব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, সন্নিহিত ঋষিকুমারেরা শব্দ অনুসারে ক্রন্দনস্থানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, এক অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কামিনী, হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া, অশেষবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন। দেখিয়া, তাঁহাদের কোমল হৃদয়ে যার পর নাই কারুণ্যরস আবির্ভূত হইল। তাঁহারা, ত্বরিত গমনে বাল্মীকিসমীপে উপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্র বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্। আমরা, ফল কুসুম কুশ সমিধ আহরণের নিমিত্ত, ভাগীরথীসন্নিহিত অটবীবিভাগে পর্য্যটন করিতেছিলাম; অকস্মাৎ, স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম, এবং ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরে দেখিতে পাইলাম, এক অলৌকিক রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণা কামিনী, নিতান্ত অনাথার ন্যায়, একান্ত কাতরা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন কমলা দেবী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। তিনি কে, কি কারণে রোদন করিতেছেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না; কিন্তু, তাঁহার কাতরভাবের অবলোকন ও বিলাপবাক্যের

আকর্ণন দ্বারা, আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমরা, সাহস করিয়া, তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। অবশেষে, আপনাকে সংবাদ দেওয়া উচিত বিবেচনায়, ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া, আপনার নিকটে আসিয়াছি। এক্ষণে যাহা বিহিত বোধ হয়, করুন।

মহর্ষি, ঋষিকুমারদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন; এবং, সীতার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, সস্নেহ সম্ভাষণ পুরঃসর, প্রশান্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন, বৎসে! বিলাপ করিও না; কি কারণে তুমি আমার তপোবনে আসিয়াছ, তোমার আসিবার পূর্ব্বেই, আমি তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি। তুমি মিথিলাধিপতি রাজা জনকের দুহিতা, কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ. এবং রাজাধিরাজ রামচন্দ্রের মহিষী। রামচন্দ্র, অমূলক লোকাপবাদ শ্রবণে, চলচিত্ত ও সদসৎ-পরিবেদনাবিহীন হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে, তোমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। সীতা, সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, নয়নের অশ্রুমার্জ্জন করিলেন; এবং, সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষিকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া, গললগ্ন বসনে তদীয় চরণে প্রণাম করিলেন। বাল্মীকি, রঘুকুলতিলক তনয় প্রসব কর, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, বৎসে! আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, আমার আশ্রমে চল, আমি আপন তনয়ার ন্যায় তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তথায় থাকিয়া তুমি কোনও বিষয়ে কোনও ক্লেশ পাইবে না। জনপদবাসীরা, বন, এই শব্দ শুনিলে ভয়াকুল হয়; কিন্তু তপোবনে ভয়ের কোনও সম্ভাবনা নাই। ঋষিদের তপস্যার প্রভাবে, হিংস্র জন্তুরাও, স্বভাবসিদ্ধ হিংসাপ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া, পরস্পর সৌহৃদ্য ভাবে কালহরণ করে। তপোবনের এরূপ মহিমা যে, স্বল্প কাল অবস্থিতি করিলেই চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়। তোমায় আসন্নপ্রসবা দেখিতেছি। প্রসবের পর, অপত্যসংস্কারবিধি যথাবিধি সমাহিত হইবেক, কোনও অংশে অঙ্গহীন হইবেক না। সমবয়স্কা মুনিকন্যারা তোমার সহচরী হইবেন; তাঁহাদের সহবাসে তোমার বিলক্ষণ চিত্তবিনোদন হইবেক। বিশেষতঃ তোমার পিতা আমার পরম বন্ধু; সুতরাং, আমার তপোবনে থাকিয়া তোমার পিতৃগৃহবাসের সকল সুখ সম্পন্ন হইবেক; আমি অপত্যনির্বিশেষে তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিব। অতএব, বৎসে! আর বিলম্ব করিও না, আমার অনুগামিনী হও।

এই বলিয়া, সীতারে সমভিব্যাহারে লইয়া মহর্ষি তপোবনে প্রবেশ করিলেন; এবং, সকল বিষয়ের সবিশেষ বলিয়া দিয়া, সমবয়স্কা মুনিকন্যাদের হস্তে সীতার ভারার্পণ করিলেন। মুনিকন্যারা তদীয়সমাগমলাভে পরম প্রীতি ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং, যাহাতে ত্বরায় তাঁহার চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন হয় সে বিষয়ে অশেষবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সীতাকে বনবাস দিয়া রাম যার পর নাই অধৈর্য্য ও শোকাভিভূত হইলেন ; এবং, আহার, বিহার, রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারে একবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অন্যের প্রবেশপ্রতিষেধ পূর্ব্বক একাকী আপন বাসভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি সীতাকে নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানিতেন ; এবং, পৃথিবীতে যত প্রিয় পদার্থ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ, উভয়ের এক মন, এক প্রাণ ; কেবল শরীর মাত্র বিভিন্ন ছিল। সীতা যেরূপ সাধুশীলা ও সরলান্তঃকরণা, রামও সর্ব্বাংশে তদনুরূপ ছিলেন ; সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা, পতিহিতৈষিণী, ও পতিসুখে সুখিনী ; রামও সেইরূপ সীতাগতপ্রাণ, সীতাহিতাকাঙ্ক্ষী ও সীতাসুখে সুখী ছিলেন। গৃহে রাজভোগে থাকিলে, তাঁহাদের যেরূপ সুখে সময় অতিবাহিত হইত, বনবাসে পরস্পর সন্নিধান বশতঃ বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে কালযাপন হইয়াছিল। বনবাস হইতে বিনিবৃত্ত হইলে, তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ও অনুরাগ শত গুণে প্রগাঢ় হইয়া উঠে। উভয়েই উভয়কে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে নয়নের অন্তরাল করিতে পরিতেন না। রাম, কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ; সুতরাং, সীতানির্ব্বাসনশোক তাঁহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল।

রামের আন্তরিক অসুখের সীমা ছিল না। কেনই আমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ; কেনই আমি বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম ; কেনই আমি পুনরায় রাজ্যের ভারগ্রহণ করিলাম ; কেনই আমি দুর্ম্মুখকে পৌরগণের ও জানপদবর্গের অভিপ্রায়-পরিজ্ঞানের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলাম ; কেনই আমি লক্ষ্মণের উপদেশ অনুসারে না চলিলাম ; কেনই আমি নিতান্ত নৃশংস হইয়া সীতারে বনবাস দিলাম ; কেনই আমি নিরতিশয় ক্লেশকর অকিঞ্চিৎকর রাজ্যভারে বিসর্জ্জন দিয়া সীতার সমভিব্যাহারী না হইলাম ; কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব ; কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব ; প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া অপেক্ষা আমার আত্মঘাতী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়ঃকল্প ছিল ; ইত্যাদি প্রকারে তিনি অহোরাত্র বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। দুঃসহ শোকানলে নিরন্তর জলিত হইয়া তাঁহার শরীর অল্প দিনের মধ্যেই অর্দ্ধাবশিষ্ট হইল।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে, লক্ষ্মণ, নিতান্ত দীনভাবাপন্ন মনে, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন; এবং, সর্ব্বাগ্রে রামচন্দ্রের বাসভবনে গমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, গলদশ্রু লোচনে, গদগদ বচনে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! দুরাত্মা লক্ষ্মণ আপনকার আজ্ঞাপ্রতিপালন করিয়া আসিল। রাম, অবলোকন ও আকর্ণন মাত্র, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। লক্ষ্মণ, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়াও, বহু যত্নে, তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ শূন্য নয়নে লক্ষ্মণের মুখনিরীক্ষণ করিয়া, হাহাকার ও অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি জানকীরে কোথায় রাখিয়া আসিলে; আমি তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব? আর যে যাতনা সহ্য হয় না; এই বলিয়া লক্ষ্মণের গলায় ধরিয়া, উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। উভয়েই অধৈর্য্য হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ বাষ্পবিসর্জ্জন করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ, অতি কষ্টে, স্বীয় শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, রামের সান্ত্বনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া লক্ষণের মুখে সীতাবিলাপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাবিয়া গেল; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল; কণ্ঠরোধ হইয়া তিনি বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া রহিলেন; এবং, পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপারের আলোচনা করিতে করিতে দুঃসহ শোকভার আর সহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ পুনরায় পরম যত্নে রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন করিলেন, এবং তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর্য্য যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহাতে এ জন্মে আর সুস্থচিত্ত হইতে পারিবেন না। শোকাপনোদনের কোনও উপায় দেখিতেছি না। যাহা হউক, সান্ত্বনার চেষ্টা করা আবশ্যক। তিনি এইরূপ আলোচনা করিয়া বিনয়পূর্ণ প্রণয়গর্ভ বচনে বলিলেন, আর্য্য! শোকে ও মোহে এরূপ অভিভূত হওয়া ভবাদৃশ মহানুভাবের পক্ষে কদাচ উচিত নহে। আপনি সকলই বুঝিতে পারেন। যাদৃশ বিধিনির্ব্বন্ধ ছিল, ঘটিয়াছে; নতুবা আপনি অকারণে, অথবা সামান্য কারণে, আর্য্যাকে বিসর্জ্জন দিবেন, ইহা কাহার মনে ছিল। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারে কিছুই চির দিনের জন্যে নহে। বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে; উন্নতি হইলেই পতন হয়; সংযোগ হইলেই বিয়োগ ঘটে; জীবন হইলেই মরণ হইয়া থাকে। এই চিরপরিচিত সংসারিক নিয়মের কোনও কালে অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমুদয়ের আলোচনা করিয়া,

আপনকার শোকসংবরণ করা উচিত। বিশেষতঃ, আপনি সকল লোকের হিতানুশাসন কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছেন; সে জন্তেও আপনকার শোকাভিভূত হওয়া বিধেয় নহে। প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ শোকের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবাদৃশ মহানুভাবদিগের একান্ত শোকাভিভূত হওয়া কদাচ উচিত হয় না। প্রাকৃত লোকেই শোকে ও মোহে বিচেতন হইয়া থাকে। অতএব, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; এবং, অন্তঃকরণ হইতে অকিঞ্চিৎকর শোককে নিষ্কাশিত করিয়া রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করুন। আর, আপনকার ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে আর্য্যারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। আর্য্যাকে গৃহে রাখিলে, প্রজালোকে বিরাগপ্রদর্শন করিবেক, কেবল এই আশঙ্কায় আপনি তাঁহাকে দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হইলে সে আশঙ্কার নিরাস হইতেছে না। সুতরাং, যে দোষের পরিহারমানসে আপনি ঈদৃশ দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন, সেই দোষ পূর্ব্ববৎ প্রবল রহিতেছে; আর্য্যার পরিত্যাগে কোনও ফলোদয় হইতেছে না। আর, ইহারও অনুধাবন করা আবশ্যক, আপনি যত দিন শোকাভিভূত থাকিবেন, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। প্রজাপালনকার্য্য উপেক্ষিত হইলে, রাজধর্ম্মপ্রতিপালন হয় না। অতএব, সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; আর অধিক শোক ও মনস্তাপ করা কোনও ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। অতীত বিষয়ের অনুশোচনায় কালহরণ করা সদ্বিবেচনার কার্য্য নয়।

লক্ষ্মণ এই বলিয়া বিরত হইলে, রাম কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, সস্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! তোমার উপদেশবাক্য শুনিয়া আমার জ্ঞানোদয় হইল। তুমি যথার্থ বলিয়াছ, আমি যে উদ্দেশে জানকীরে বনবাস দিয়া রাক্ষসের ন্যায় নিরতিশয় নৃশংস আচরণ করিলাম; এক্ষণে তাঁহার জন্তে শোকাকুল হইলে তাহা বিফল হইয়া যায়। বিশেষতঃ, শোকের ধর্ম্মই এই, তাহাতে অভিভূত হইলে, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইতে থাকে। শোকাভিভূত ব্যক্তি অভীষ্টলাভ করতে পারে না, কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা বশতঃ প্রত্যবায়গ্রস্ত হয়। অতএব, এই মুহূর্ত্ত অবধি আমি শোকসংবরণে যত্নবান হইলাম। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর আমি শোকে অভিভূত হইব না। প্রজালোকে, কোনও ক্রমে, আমায় শোকাভিভূত বোধ করিতে পারিবেক না। অমাত্যদিগকে বল, কল্য অবধি রীতিমত রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইব; তাঁহারা যেন যথাকালে সমস্ত আয়োজন করিয়া কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাকেন

এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনত বদনে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজত্ব কি বিষম অসুখের ও বিপদের আস্পদ। লোকে কি সুখভোগে লোভে রাজ্যাধিকার-লাভের কামনা করে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রাজ্যের ভারগ্রহণ করিয়া আমায় এ জন্মের মত সকল সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইল। যার পর নাই নৃশংস হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাসে দিলাম। এক্ষণে তাঁহার জন্যে যে অশ্রুপাত করিব, তাহাও পথ নাই। রাজত্বলাভে এই ফল দর্শিয়াছে যে আমাকে স্নেহ, দয়া, মমতা, ও ভদ্রতা বিসর্জ্জন দিতে হইল। উত্তরকালীন লোকেরা, নিতান্ত নৃশংস অথবা নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া, আমার গণনা ও কলঙ্কঘোষণা করিবেক।

এইরূপে আক্ষেপ করিয়া, রাম কিয়ৎ ক্ষণ পরে লক্ষ্মণকে বিদায় দিলেন; এবং, ধৈর্য্যাবলম্বন ও শোকাবেগসংবরণ পূর্ব্বক, পর দিন প্রভাত অবধি, যথানিয়মে রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে, তিনি রাজকার্য্যপর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন বটে; এবং লোকেও, বাহ্য আকার দর্শনে, বোধ করিতে লাগিল, রামচন্দ্র বড় ধৈর্য্যশীল, অনায়াসেই দুঃসহ শোকের সংবরণ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ নিরন্তর দুর্বিষহ শোকদহনে দগ্ধ হইতে লাগিল। নিতান্ত নিরপরাধে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, এই শোক ও ক্ষোভ, বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, তাঁহাকে সতত মর্ম্মবেদনাপ্রদান করিতে লাগিল। কেবল লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়ে, তিনি জানকীরে নির্বাসিত করেন; এক্ষণেও, কেবল সেই লোকবিরাগসংগ্রহের ভয়েই, বাহ্য আকারে শোকসংবরণ করিলেন। যৎকালে, তিনি নৃপাসনে আসীন হইয়া, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায়, স্থির চিত্তে রাজকার্য্যপর্য্যালোচনা করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বোধ করিত, ভূমণ্ডলে তাঁহার তুল্য ধৈর্য্যশালী পুরুষ আর নাই। কিন্তু, রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেই, তিনি যৎপরোনাস্তি বিকলচিত্ত হইতেন। লক্ষ্মণ সদা সন্নিহিত থাকিতেন, এবং সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু, লক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে, তাঁহার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত। ফলতঃ, তিনি, কেবল হাহাকার, বাষ্পমোচন, আত্মভর্ৎসন, ও সীতার গুণকীর্ত্তন করিয়া, বিশ্রামসময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে দুর্নিবার সীতাবিবাসন-শোকে একান্ত আক্রান্ত হইয়া, তিনি দিন দিন কৃশ, মলিন, দুর্ব্বল, ও সর্ব্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, রাজকার্য্য ব্যতীত, আর

কোনও বিষয়েই তাঁহার প্রবৃত্তি ও উৎসাহ রহিল না।

এ দিকে, কিয়ৎ দিন পরে, জানকী দুই যমল কুমার প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি, যথাবিধানে জাতকর্ম্মপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। মুনিতনয়ারা, সীতার সন্তানপ্রসব দর্শনে, যার পর নাই হর্ষপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত আশ্রমে অতি মহান্ আনন্দকোলাহল হইতে লাগিল। সীতা দুঃসহ প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় ছিলেন। তিনি অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্যলাভ করিলে, মুনিতনয়ারা উল্লসিত মনে প্রীতিপূর্ণ বচনে বলিলেন, জানকি! আজ বড় আনন্দের দিন; সৌভাগ্যক্রমে তুমি পরম সুন্দর কুমারযুগল প্রসব করিয়াছ। সীতা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র প্রফুল্ল ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন; কিন্তু, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শোকভরে নিতান্ত অভিভূত হইয়া, অবিরল ধারায় অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মুনিকন্যারা সস্নেহ সম্ভাষণ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি জানকি! এমন আনন্দের সময় শোকাকুল হইলে কেন? বাষ্পভরে জানকীর কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এজন্য তিনি কিয়ৎ ক্ষণ কোনও উত্তর করিতে পারিলেন না; অনন্তর, উচ্ছলিত শোকাবেগের কিঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বলিলেন, অয়ি প্রিয়সখীগণ! তোমরা কি কিছুই জান না যে, আমি এমন আনন্দের সময় কি জন্যে শোকাকুল হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেছ? পুত্রপ্রসব করিলে স্ত্রীলোকের আহ্লাদের একশেষ হয়, যথার্থ বটে; কিন্তু কেমন অবস্থায়, আমার সেই আহ্লাদের সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমার যে এ জন্মের মত, সকল সুখ, সকল সাধ, সকল আহ্লাদ ফুরাইয়া গিয়াছে। যদি এই হতভাগ্যেরা আমার গর্ভে না থাকিত, তাহা হইলে, যে মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ পরিত্যাগবাক্য শুনাইলেন, সেই মুহূর্ত্তে আমি জাহ্নবীজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতাম; অথবা, অন্য কোনও প্রকারে, আত্মঘাতিনী হইতাম। আমায় কি আবার প্রাণ রাখিতে হয়, না লোকালয়ে মুখ দেখাইতে হয়।

এই বলিয়া, একান্ত শোকভারাক্রান্ত হইয়া, জানকী অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুনিকন্যারা, সীতার ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ বিলাপবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ বচনে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়সখি! শোকাবেগের সংবরণ কর, যাহা যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে, কিন্তু, অধিক দিন তোমায় এ অবস্থায় কালযাপন করিতে হইবেক না। রাজা রামচন্দ্রের বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, তাহাতেই তিনি, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, ঈদৃশ অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছেন। আমরা পিতার মুখে শুনিয়াছি, তুমি অচিরে পরিগৃহীতা হইবে, অতএব শোকসংবরণ কর। মুনিতনয়াদিগের সান্ত্বনাবাদ শ্রবণে, সীতার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল

তদ্দর্শনে মুনিতনয়াদিগের কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইল, তাঁহারাও শোকাভিভূত হইয়া প্রভূত বাষ্পবারিবিমোচন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সম্ভঃপ্রসূত বালকেরা রোদন করিয়া উঠিল। স্নেহের এমনই মহিমা ও মোহিনী শক্তি যে, তাহাদের ক্রন্দনশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, জানকী এক কালে সকল শোক বিস্মৃত হইলেন, এবং স্নেহভরে তাহাদের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

কুমারেরা, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায়, দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, জননীর নয়নের ও মনের অনির্ব্বচনীয় আনন্দসম্পাদন করিতে লাগিল। যখন তাহারা আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া আহ্বান করিত; যখন তাহাদের সন্নিবেশিতমুক্তাকলাপসদৃশ দন্তগুলির দৃষ্টিগোচর হইত; যখন তাহাদের অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পরা তাঁহারা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত; যখন তিনি তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাহাদের মুখচুম্বন করিতেন; তখন তিনি সকল শোক বিস্মৃত হইতেন; তাঁহারা সর্ব্ব শরীর অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় শীতল, ও নয়নযুগল আনন্দাশ্রুসলিলে পরিপ্লুত হইত।

কুশ ও লব পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, মহর্ষি বাল্মীকি, তাহাদের চূড়াকর্ম্মসম্পাদন করিয়া বিদ্যারম্ভ করাইলেন। বালকেরা, অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা, ও প্রতিভার প্রভাবে অল্প কাল মধ্যেই বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে বাল্মীকি, রাবণবধ পর্য্যন্ত লোকোত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া, রামায়ণ নামে বহুবিস্তৃত মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথম, তিনি সেই অমৃতরসবর্ষী অপূর্ব্ব মহাকাব্য রামচন্দ্রের পুত্রদিগকে অধ্যয়ন করাইলেন। তাহারা স্বল্প সময়েই সেই বিচিত্র গ্রন্থ আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করিল; এবং সীতার সমক্ষে মধুর স্বরে আবৃত্তি করিয়া তাঁহার শোকনিবৃত্তি করিতে লাগিল। একাদশ বর্ষে মহর্ষি তাহাদের উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন করিয়া বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বালকেরা, সংবৎসর কালেই, সমগ্র বেদশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকারলাভ করিল!

কুশ ও লবের বয়ঃক্রম পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর হইল; কিন্তু তাহারা কে, এ পর্য্যন্ত তাহারা তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। তাহারা ঋষিকুমার ও তাহাদের জননী ঋষিপত্নী, তাহাদের এই সংস্কার জন্মিয়াছিল। ফলতঃ জানকী যে ভাবে তপোবনে কালযাপন করিতেন; তাঁহাকে দেখিলে, কেহ ঋষিপত্নী ব্যতীত আর কিছুই বোধ করিতে পারিত না, এবং তাহাদেরও দুই সহদরের আচার ও অনুষ্ঠান নয়নগোচর করিলে, ঋষিকুমার ব্যতিরিক্ত অন্তবিধ বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহারা জানকীকে জননী বলিয়া জানিত, কিন্তু তিনি যে মিথিলাধিপতির তনয়া, অথবা কোশলাধিপতির মহিষী, তাহা জানিতে পারে নাই। বাল্মীকি, যত্ন পূর্ব্বক, এই বিষয়ে তাহাদের বোধবিষয় হইতে সঙ্গোপিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তপোবনবাসীদিগকে

এরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, কেহ ভ্রমক্রমেও তাহাদের সমক্ষে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিত না, আর, সীতাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনিও যেন, কোনও ক্রমে, তনয়দিগের নিকট আত্মপরিচয়প্রদান না করেন, তদনুসারে সীতাও তাহাদের নিকট কখনও স্বসংক্রান্ত কোনও কথার উল্লেখ করেন নাই। তাহারা রামায়ণে রামের ও সীতার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিল. কিন্তু তাহাদের জননী যে জনকনন্দিনী, অথবা রামের সহধর্ম্মিণী, তাহা জানিতে পারে নাই, সুতরাং, ঐ মহাকাব্যে নিজ জনক জননীর বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এইরূপে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত কুশ ও লব আত্মস্বরূপপরিজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে অনধিকারী ছিল।

জননীর অনির্ব্বাচনীয়স্নেহসহকৃত প্রযত্ন ব্যতিরেকে যত দিন পর্য্যন্ত সন্তানের জীবনরক্ষা সম্ভাবিত নয়, তাবৎ কাল জানকী. সর্ব্বাশোকবিস্মরণ পূর্ব্বক, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কুশ ও লবের লালন পালনে ব্যাপৃত ছিলেন। তাহাদের শৈশবকাল অতিক্রান্ত হইলে, মাতৃযত্নের তাদৃশী অপেক্ষা রহিল না। তখন তিনি, তাহাদের বিষয়ে এক প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া, ঋষিপত্নীদিগের ন্যায় তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন-মঙ্গলকামনাই তদীয় তপস্যার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও রাম নিতান্ত নিরপরাধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তথাপি, এক ক্ষণের জন্যে সীতার অন্তঃকরণে তাঁর প্রতি রোষ বা বিরাগের উদয় হয় নাই। তিনি যে দুস্তর শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার নিজের ভাগ্যদোষেই ঘটিয়াছে, এই বিবেচনা করিতেন; ভ্রমক্রমেও ভাবিতেন না যে সে বিষয়ে রামচন্দ্রের কোনও অংশে কিছুমাত্র দোষ আছে। বস্তুতঃ, রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার যেরূপ অবিচলিত ভক্তি ও ঐকান্তিক অনুরক্তি ছিল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তিনি দেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে নিয়ত এই প্রার্থনা করিতেন, যেন রামচন্দ্র কুশলে থাকেন, এবং জন্মান্তরে, তিনি যেন রামচন্দ্রেরই সহধর্ম্মিণী হয়েন। তিনি দিবাভাগে তপস্যাকার্য্যে ব্যাপৃত ও সখীভাবাপন্ন ঋষিকন্যাগণে পরিবৃত থাকিয়া কথঞ্চিৎ কালযাপন করিতেন। কিন্তু যামিনীযোগে একাকিনী হইলেই তাঁহার দুর্নিবার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিত। তিনি কেবল রামচন্দ্রের চিন্তায় মগ্ন হইয়া ও অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া যামিনীযাপন করিতেন। ফলকথা এই, সীতা যেরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, তাহাতে অকাতরে বিরহযাতনা সহ্য করিতে পারিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। কালসহকারে, সকলেরই শোক শিথিল হইয়া যায়; কিন্তু জানকীর শোক সর্ব্ব ক্ষণ নবীভাবাপন্ন ছিল। এইরূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর দুর্বিষহশোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দাহ হওয়াতে, জানকীর অলৌকিক রূপ ও লাবণ্য এক কালে অন্তর্হিত, এবং কলেবর চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বশিষ্ঠ, জাবালি, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিবর্গের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। বশিষ্ঠদেব শ্রবণমাত্র সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ। উত্তম সঙ্কল্প করিয়াছেন। আপনি সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি; অখণ্ড ভূমণ্ডলে যেরূপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, পূর্ব্বতন কোনও নরপতি সেরূপ করিতে পারেন নাই। রামরাজ্যে প্রজালোকে যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছে, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। রাজ্যভার-গ্রহণ করিয়া যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তাহার কিছুই অসম্পাদিত রাখেন নাই; রাজকর্ত্তব্যের মধ্যে অশ্বমেধ মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা সম্পাদিত হইলেই আপনকার রাজাধিকার আর কোনও অংশে অঙ্গহীন থাকে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এ বিষয়ে মহারাজের নিকট প্রস্তাব করিব। যাহা হউক, যখন মহারাজ স্বয়ং সেই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যুক্ত হইয়াছেন, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা বিধেয় নহে, অবিলম্বে তদুপযোগী আয়োজনের আদেশপ্রদান করুন।

বশিষ্ঠদেব বিরত হইবা মাত্র রামচন্দ্র পার্শ্বোপবিষ্ট অনুজদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, ভ্রাতৃগণ! ইনি যাহা বলিলেন, শ্রবণ করিলে; এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই কর্ত্তব্যনিরূপণ করি। আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুজেরা তৎক্ষণাৎ আন্তরিক অনুমোদনপ্রদর্শন করিলেন। তখন রাম বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, ভগবন্! যখন আমার অভিলাষ আপনাদের অভিমত ও অনুজদিগের অনুমোদিত হইতেছে, তখন আর তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতাবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এক্ষণে আমার বাসনা এই, নৈমিষারণ্যে অভিপ্রেত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। নৈমিষারণ্য পরম পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র। এ বিষয়ে আপনকার কি অনুমতি হয়? বশিষ্ঠদেব তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর, রামচন্দ্র অনুজদিগকে বলিলেন, দেখ, যখন কর্ত্তব্য স্থির হইল, তখন আর অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তোমরা সত্বর সমস্ত আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত, ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর। সদয়নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সমস্ত নগরে ও জনপদে এ বিষয়ের ঘোষণা করিয়া দাও। লঙ্কাসমরসহায়

সুহৃদ্বর্গের পরম সমাদরে আহ্বান কর; তাঁহারা আমাদের যথার্থ বন্ধু, আমাদের জন্যে অকাতরে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন ; তাঁহারা আসিলে আমি পরম সুখী হইব। এতদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ঋষিদিগের নিমন্ত্রণ কর ; তাঁহারা যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন করিলে আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ভরত! তুমি অবিলম্বে নৈমিষক্ষেত্রে গিয়া যজ্ঞভূমিনির্ম্মাণের উদ্যোগ কর। লক্ষ্মণ! তুমি আবশ্যক সমস্ত দ্রব্যের যথোচিত আয়োজন করিয়া তৎসমুদয় সত্বর তথায় পাঠাইয়া দাও। দেখ, যজ্ঞ দেখিবার নিমিত্তে নৈমিষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইবেক ; অতএব, যত্ন পূর্ব্বক সমস্ত বিষয়ের এরূপ আয়োজন করিবে, যেন কোনও বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন কাহারও কোনও অংশে ক্লেশ বা অসুবিধা না ঘটে। তুমি সকল বিষয়ে পারদর্শী ; তোমায় অধিক উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া রাম বিরত হইলে, বশিষ্ঠদেব বলিলেন, মহারাজ! সকল বিষয়েরই উচিতাধিক আয়োজন হইবেক, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি এক বিষয়ের একান্ত অসঙ্গতি দেখিতেছি। তখন রাম বলিলেন, আপনি কোন বিষয়ে অসঙ্গতির আশঙ্কা করিতেছেন, বলুন। বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রকারেরা বলেন, সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অতএব, জিজ্ঞাসা করি, সে বিষয়ের কি ব্যবস্থা হইবেক। শ্রবণ মাত্র রামের মুখকমল ম্লান ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন ; অনন্তর, দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক নয়নের অশ্রু-মার্জ্জন ও উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া বলিলেন, ভগবন্! ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে আমার উদ্বোধ মাত্র হয় নাই ; এক্ষণে কি কর্ত্তব্য উপদেশ করুন। বশিষ্ঠদেব অনেক ক্ষণ একাগ্র চিত্তে চিন্তা করিয়া বলিলেন, মহারাজ! পুনরায় দারপরিগ্রহ ব্যতিরেকে আর কোনও উপায় দেখিতেছি না।

বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সকলেই এক কালে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাম নিতান্ত সীতাগতপ্রাণ ; কেবল লোকবিরাগসংগ্রহভয়ে সীতাকে বনবাস দিয়া জীবন্মৃত হইয়া ছিলেন। তাঁহার প্রতি রামের যে অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, এ পর্য্যন্ত তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। সীতার মোহিনী মূর্ত্তি অহোরাত্র তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি যে উপস্থিত কার্য্যের অনুরোধে পুনরায় দারপরিগ্রহে সম্মত হইবেন, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, বশিষ্ঠদেব

দারপরিগ্রহ বিষয়ে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সে বিষয়ে ঐকান্তিকী অনিচ্ছা প্রদর্শিত করিয়া, মৌন ভাবে অবনত বদনে অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর, বহুবিধ বাদানুবাদের পর, সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি সমভিব্যাহারে যজ্ঞ সম্পন্ন করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া মীমাংসিত হইল।

এইরূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ভরত সর্ব্বাগ্রে নৈমিষক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন; এবং সমুচিত স্থানে যজ্ঞভূমির নিরূপণ করিয়া, অনুরূপ অন্তরে, পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে, এক এক শ্রেণীর লোকের জন্যে, তাহাদের অবস্থোচিত অবস্থিতিস্থান নির্ম্মিত করাইলেন। লক্ষ্মণও, অনতিবিলম্বে, অশেষবিধ অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী ও শয্যা যান প্রভৃতির সমাধান করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে পাঠাইয়া অনন্তর, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া যথাবিধানে যজ্ঞীয় অশ্বের মোচন পূর্ব্বক, মাতৃগণ ও অপরাপর পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে সসৈন্য নৈমিষারণ্য-প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরেই, নিমন্ত্রিতগণের সমাগম হইতে লাগিল। শত শত নৃপতি, বহুবিধ মহামূল্য উপহার লইয়া, অনুচরগণ ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিলেন; সহস্র সহস্র ঋষি, যজ্ঞদর্শন-মানসে, ক্রমে ক্রমে নৈমিষে আগমন করিতে লাগিলেন; অসংখ্য নগরবাসী ও জনপদবাসীরাও সমাগত হইলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিগণের পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিলেন; বিভিষণ ঋষিগণের কিঙ্করকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সুগ্রীব অপরাপর নিমন্ত্রিতবর্গের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত রহিলেন।

এ দিকে, মহর্ষি বাল্মিকী, সীতার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এবং কুশ ও লবের বয়ঃক্রম দ্বাদশবৎসরপূর্ণ দেখিয়া, মনে মনে সর্ব্বদা এই আন্দোলন করেন যে, সীতার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না; আর, কুশ ও লব রাজাধিরাজতনয় হইয়া যাবজ্জীবন তপোবনে কালযাপন করিবেক, ইহাও কোনও মতে উচিত নহে; তাহাদের ধনুর্ব্বেদ ও রাজধর্ম্ম, এ উভয়ের শিক্ষার সময় বহিয়া যাইতেছে। অতএব, যাহাতে সপুত্রা সীতা পুনরায় পরিগৃহীতা হন, আশু তাহার কোনও উপায় উদ্ভাবিত করা আবশ্যক। অথবা, অন্য উপায় উদ্ভাবিত করিবার প্রয়োজন কি! শিষ্য দ্বারা সংবাদ দিয়া রামচন্দ্রকে আমার আশ্রমে আনাইয়া, অথবা স্বয়ং রাজধানীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সপুত্রা সীতার পরিগ্রহপ্রার্থনা করি। রামচন্দ্র অবশ্যই আমার অনুরোধরক্ষা করিবেন। এই

স্থির করিয়া ক্ষণ কাল মৌন ভাবে থাকিয়া, মহর্ষি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত লোকানুরাগপ্রিয়; কেবল লোকবিরাগ-সংগ্রহের ভয়ে পূর্ণগর্ভা অবস্থায় নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এখন আমার কথায় তাঁহারে সহজে গৃহে লইবেন, তাহাও সম্পূর্ণ সন্দেহস্থল; যাহা হউক, কোনও সংবাদ না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কোনও মতে উচিত কল্প হইতেছে না। এই দুই বালক উত্তর কালে অবশ্যই কোশলসিংহাসনে অধিরোহণ করিবেক। এই সময়ে, পিতৃসমীপে নীত হইয়া রাজনীতি বিষয়ে বিধি পূর্ব্বক উপদিষ্ট না হইলে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহে একান্ত অপটু ও রাজমর্য্যাদা-রক্ষণে নিতান্ত অক্ষম হইবেক। বিশেষতঃ, রাজা রামচন্দ্র, আমি কোশল হিতসাধনে যত্নবিহীন বলিয়া, অনুযোগ করিতে পারেন। অতএব, এ বিষয়ে আর উপেক্ষা বা কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। রামচন্দ্রের নিকট সকল বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ পাঠান উচিত। অথবা, এক বারেই তাঁহার নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া, বশিষ্ঠ বা লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য; তাঁহারাই বা কিরূপ বলেন, দেখা আবশ্যক।

এক দিন মহর্ষি, সায়ংসন্ধ্যা ও সন্ধ্যাকালীন হোমবিধির সমাধান করিয়া, আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, একাকী এই চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময়ে এক রাজভৃত্য আসিয়া রামনামাঙ্কিত নিমন্ত্রণপত্র তদীয় হস্তে সমর্পিত করিল। মহর্ষি পত্র পাঠ করিয়া পরমপ্রীতিপ্রদর্শন পূর্ব্বক সেই লোককে বিশ্রাম করিবার নিমিত্তে বিদায় দিলেন এবং এক শিষ্যের উপর তাহার আহারাদিসমাধানের ভারপ্রদান করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, দৈব অনুকূল হইয়া তাহার সিদ্ধির বিলক্ষণ উপায় করিয়া দিলেন। এক্ষণে বিনা প্রার্থনায় কার্য্যসাধন করিতে পারিব। কুশ ও লবকে শিষ্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া যাই। রামের ও উহাদের দুই সহোদরের আকৃতিগত যেরূপ সৌসাদৃশ্য, দেখিলেই সকলে উহাদিগকে তাঁহার তনয় বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, আর, অবলোকন মাত্র, রামেও হৃদয় নিঃসন্দেহ দ্রবীভূত হইবেক; এবং, তাহা হইলেই, আমার অভিপ্রেতসিদ্ধির পথ স্বতঃ পরিষ্কৃত হইয়া আসিবেক।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মহর্ষি জানকীর কুটীরে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছেন; কল্য প্রত্যুষে প্রস্থান করিব; মানস করিয়াছি, অপরাপর শিষ্যের ন্যায়, তোমার পুত্রদিগকেও যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। সীতা

তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন। মহর্ষি, স্বীয় কুটীরে প্রতিগমন করিয়া, শিষ্যদিগকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিয়া দিলেন, এবং কুশ ও লবকে বলিলেন, দেখ, এ পর্য্যন্ত জনপদের কোনও ব্যাপার তোমাদের নয়নগোচর হয় নাই। রামায়ণনায়ক রাজা রামচন্দ্র অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছি, তোমাদিগকে যজ্ঞদর্শনে লইয়া যাইব। তোমাদের যজ্ঞদর্শন ও আনুষঙ্গিক রাজদর্শন সম্পন্ন হইবেক; এবং তথায় যে অসংখ্য জনপদবাসী লোক সমবেত হইবেক, তাহাদিগকে দেখিয়া, তোমরা, অনেক অংশে লৌকিক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবে। তাহারা দুই সহোদরে, রামায়ণে রামের অলৌকিক গুণপরম্পরায় প্রকৃষ্ট ও প্রচুর পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সর্ব্বাংশে অদ্বিতীয় পুরুষ বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিল; তাঁহাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিব, এই ভাবিয়া, তাহাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। এতদ্ব্যতিরিক্ত, যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ও নানাদেশীয় বিভিন্নপ্রকার অসংখ্য লোকের একত্র সমাগম নয়নগোচর করিব, এই কৌতূহলও বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিল।

বাল্মীকির মুখে রামের নাম শুনিয়া, সীতার শোকানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুজল নির্গলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, তাঁহার অন্তঃকরণে সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত, রাম সীতাগতপ্রাণ বলিয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; আর, তিনি ইহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই, রাম তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবার্ত্তা শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, রাম আবার বিবাহ করিয়াছেন, এই ভাবিয়া, তিনি এক বারে ম্রিয়মাণ হইলেন। যে সীতা অকাতরে পরিত্যাগদুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন; রাম পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই ক্ষোভ, সেই সীতার পক্ষে, একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি মনে ভাবিতেন, যদিও নিতান্ত নিরপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, কিন্তু আমার উপর তাঁহার যেরূপ অবিচলিত স্নেহ ও ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, কোনও অংশে তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই; এক্ষণে স্থির করিলেন, যখন পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্নেহের ও অনুরাগের অন্যথাভাব ঘটিয়াছে।

সীতা নিতান্ত আকুল চিত্তে, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে কুশ ও লব তদীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল, মা! মহর্ষি বলিলেন, কল্য আমাদিগকে রাজা রামচন্দ্রের যজ্ঞদর্শনার্থে লইয়া যাইবেন। যে লোক নিমন্ত্রণপত্র আনিয়া

ছিল, আমরা কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া, রাজা রামচন্দ্রের বিষয়ে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম, রাজা রামচন্দ্রের সকলই অলৌকিক কাণ্ড। কিন্তু মা! এক বিষয়ে আমরা যার পর নাই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছি। রামায়ণ পড়িয়া তাঁহার উপর আমাদের যে প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভক্তি সহস্র গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কথায় কথায় শুনিলাম, রাজা প্রজারঞ্জনের অনুরোধে নিজ প্রেয়সী মহিষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে বুঝি রাজা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, নতুবা যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে সহধর্ম্মিণী কে হইবেক। সে বলিল, যজ্ঞসমাধানের জন্যে বশিষ্ঠদেব পুনরায় দারপরিগ্রহের নিমিত্তে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা তাহাতে কোনও ক্রমে সম্মত হন নাই; সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই প্রতিকৃতি সহধর্ম্মিণীর কার্য্যনির্ব্বাহ করিবেক। দেখ মা! এমন মহাপুরুষ কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামচন্দ্র রাজধর্ম্মপ্রতিপালনে যেমন যত্নশীল, দাম্পত্যধর্ম্ম-প্রতিপালনেও তদনুরূপ যত্নশীল। আমরা ইতিহাসগ্রন্থে, অনেক অনেক রাজার ও অনেক অনেক মহাপুরুষের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি; কিন্তু কেহই, কোনও অংশে, রাজা রামচন্দ্রের সমকক্ষ নহেন। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে প্রেয়সীর পরিত্যাগ ও সেই প্রেয়সীর স্নেহের অনুরোধে যাবজ্জীবন, দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া কালহরণ করা, এ উভয়ই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। যাহা হউক, মা! রামায়ণ পড়িয়া অবধি, আমাদের নিতান্ত বাসনা ছিল, এক বার রাজা রামচন্দ্রের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিব, এক্ষণে সেই বাসনা পূর্ণ হইবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে, অনুমতি কর, আমরা মহর্ষির সহিত রামদর্শনে যাই। সীতা অনুমতিপ্রদান করিলেন, তাহারাও দুই সহোদরে, সাতিশয় হর্ষিত হইয়া, মহর্ষিসমীপে গমন করিল।

রামচন্দ্র পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, এই আশঙ্কা জন্মিয়া, যে অতি-বিষম বিষাদবিষে সীতার সর্ব্ব শরীর আচ্ছন্ন হইয়াছিল, হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতির কথা শ্রবণগোচর করিয়া, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত, এবং তদীয় চিরপ্রদীপ্ত শোকানল অনেক অংশে নির্ব্বাপিত হইল। তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে আনন্দবাষ্প বিগলিত হইতে লাগিল, এবং নির্ব্বাসনের ক্ষোভ তিরোহিত হইয়া, তদীয় হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবির্ভূত হইল।

পর দিন, প্রভাত হইবামাত্র, মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ, লব ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে নৈমিষপ্রস্থান করিলেন। দ্বিতীয় দিবস, অপরাহ্ণ সময়ে, তথায়

উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠদেব, সাতিশয় সমাদরপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে ও তাঁহার শিষ্যদিগকে নির্দিষ্ট বাসস্থানে লইয়া গেলেন। কুশ ও লব দূর হইতে রামচন্দ্রকে লোচনগোচর করিয়া, চমৎকৃত ও পুলকিত হইল, এবং পরস্পর বলিতে লাগিল, দেখ ভাই! রামায়ণে রাজা রামচন্দ্রের যে সমস্ত অলৌকিক গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় ইঁহার আকারে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, দেখিলেই অলৌকিক গুণসমুদয়ের আধার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ইনি যেমন সৌম্যমূর্ত্তি, তেমনি গম্ভীরাকৃতি। গুরুদেব যেমন অলৌকিকবিত্বশক্তিসম্পন্ন, রাজা রামচন্দ্র তেমনিই অলৌকিকগুণসমুদয়ে পূর্ণ। বলিতে কি, এরূপ মহাপুরুষ নায়কস্থলে পরিগৃহীত না হইলে, মহর্ষির প্রণীত মহকোব্যের এত গৌরব হইত না। রাজা রামচন্দ্রের অলৌকিক গুণের পরিকীর্ত্তনে নিয়োজিত হওয়াতে, তদীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ সার্থকতা জন্মিয়াছে। যাহা হউক, এত দিনে আমরা নয়নের চরিতার্থলাভ করিলাম।

ক্রমে ক্রমে যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, নিরূপিত দিবসে, মহাসমারোহে সঙ্কল্পিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীন, দরিদ্র, ও অনাথ, পৃথক পৃথক্ প্রার্থনায় যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে লাগিল। অন্নার্থী অপর্য্যাপ্ত অন্ন, অর্থাভিলাষী প্রার্থনাধিক অর্থ, ভূমিকাঙ্ক্ষী আকাঙ্ক্ষাতিরিক্ত ভূমি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ফলতঃ, যে ব্যক্তি যে অভিলাষে আগমন করিতে লাগিল, আগমন মাত্র তাহার সে অভিলাষ পূর্ণ হইতে লাগিল। অনবরত চতুর্দিকে নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল। সকলেই মনোহর বেশ ভূষায় সুশোভিত। সকলেরই মুখে আমোদের ও আহ্লাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। কাহারও অন্তঃকরণে দুঃখের বা ক্ষোভের সঞ্চার আছে, এরূপ বোধ হইল না। যে সকল দীর্ঘজীবী রাজা, ঋষি, বা অন্যাদৃশ লোক যজ্ঞদর্শনে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমরা কখনও এরূপ যজ্ঞ দেখি নাই। অতীতবেদী ব্যক্তিরাও বলিতে লাগিলেন, কোন কালে, কোনও রাজা, ঈদৃশ সমৃদ্ধি ও সমারোহ সহকারে, যজ্ঞ করিতে পারেন নাই; রাজা রামচন্দ্রের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড।

এইরূপে, প্রত্যহ, মহাসমারোহে, যজ্ঞক্রিয়া হইতে লাগিল; এবং যাবতীয় নিমন্ত্রিতগণ, সভায় সমবেত হইয়া, যজ্ঞসংক্রান্ত সমৃদ্ধি ও সমারোহের আতিশয্যদর্শনে, নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এক দিন, মহর্ষি বাল্মীকি, বিরলে বসিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি যজ্ঞদর্শনে আসক্ত হইয়া, এত দিন বৃথা অতিবাহিত করিলাম ; এ পর্য্যন্ত, অভিপ্রেতসাধনের কোনও উপায় অবলম্বন করিলাম না। যাহা হউক, এক্ষণে কি প্রণালীতে কুশ ও লবকে রামচন্দ্রের দর্শনপথে পাতিত করি। উহাদের দুই সহোদরকে, সমভিব্যাহারে করিয়া, রাজসভায় লইয়া যাই, অথবা, রামচন্দ্রকে কৌশলক্রমে এখানে আনাই, এবং, বিরলে সকল বিষয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া, এবং কুশ ও লবের পরিচয় দিয়া, সীতার পরিগ্রহ-প্রার্থনা করি। মহর্ষি মনে মনে এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন, কুশ ও লবকে রামায়ণগান করিতে আদেশ করি। তাহারা স্থানে স্থানে গান করিয়া বেড়াইলে, ক্রমে রাজার গোচর হইবেক ; তখন তিনি অবশ্যই স্বীয় চরিতের শ্রবণমানসে উহাদিগকে স্বসমীপে নীত করিবেন, এবং তাহা হইলেই, বিনা প্রার্থনায়, আমার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবেক।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, মহর্ষি কুশ ও লবকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! তোমরা প্রতিদিন, সময়ে সময়ে, সমাহিত হইয়া, ঋষিগণের বাসকুটীরের সম্মুখে, নরপতিগণের পটমণ্ডপমণ্ডলীর পুরোভাগে, পৌরগণ ও জানপদবর্গের আবাসশ্রেণীর সমীপদেশে, এবং সভাভবনের অভিমুখভাগে, মনের অনুরাগে, বীণাসংযোগে রামায়ণগান করিবে। যদি রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার সম্মুখে গান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, তৎক্ষণাৎ গান করিতে আরম্ভ করিবে। আর, যত ক্ষণ তাঁহার নিকটে থাকিবে, কোনও প্রকারে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন বা অশিষ্ট ব্যবহার করিবে না। রাজা সকলের পিতৃস্থানীয় ; অতএব, তোমরা তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ পিতৃভক্তিপ্রদর্শন করিবে। যদি, সঙ্গীতশ্রবণে প্রীত হইয়া রাজা পুরস্কারস্বরূপ অর্থপ্রদানে উদ্যত হন, লোভবশ হইয়া কদাচ অর্থগ্রহণ করিবে না ; বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকারে নিস্পৃহতা দেখাইয়া অর্থগ্রহণে অসম্মতি-প্রদর্শন করিবে ; বলিবে, মহারাজ! আমরা বনবাসী, তপোবনে থাকিয়া ফল মূল খাইয়া প্রাণধারণ করি, আমাদের অর্থের প্রয়োজন নাই। আর, যদি রাজা তোমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, বলিবে আমরা বাল্মীকির শিষ্য।

এইরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া মহর্ষি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

অনন্তর, তাহারা দুই সহোদরে, তদীয় আদেশ ও উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া, বীণাসহযোগে মধুর স্বরে স্থানে স্থানে রামায়ণগান করিতে আরম্ভ করিল যে শুনিল, সেই মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিল। না হইবেই বা কেন? প্রথমতঃ, রামের চরিত্র অতি বিচিত্র ও পরম পবিত্র; দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকির রচনা অতি চমৎকারিণী ও যার পর নাই চিত্তহারিণী; তৃতীয়তঃ, কুশ ও লবের রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর হইলে সকলকেই মোহিত হইতে হয়; তাহাতে আবার তাহাদের স্বর এমন মধুর যে, উহার সহিত তুলনা করিলে, কোকিলের কলরব কর্কশ বোধ হয়; চতুর্থতঃ, বীণাযন্ত্রে তাহাদের যেরূপ অলৌকিক নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। যে সঙ্গীতে এ সমুদয়ের সমবায় থাকে, তাহা শুনিয়া কাহার চিত্ত অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে পূর্ণ না হয়।

কিঞ্চিৎ কাল পরেই অনেকেই রামের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! দুই সুকুমার ঋষিকুমার বীণাযন্ত্রসহযোগে আপনকার চরিত্রগান করিতেছে; যে শুনিতেছে সেই মোহিত হইতেছে। আমরা, জন্মাবচ্ছিন্নে, কখনও এমন মধুর সঙ্গীত শুনি নাই। তাহারা যমজ সহোদর। মহারাজ মানবকলেবরে কেহ কখনও এমন রূপের মাধুরী দেখে নাই। স্বরের মাধুরীর কথা অধিক আর কি বলিব, কিন্নরেরাও শুনিলে পরাভবস্বীকার করিবেক! আর, তাহারা যে কাব্যের গান করিতেছে, তাহা কাহার রচিত বলিতে পারি না; কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব ললিত রচনা কখনও শ্রবণগোচর করেন নাই। মহারাজ! আমাদের প্রার্থনা এই, তাহাদিগকে রাজসভায় আনাইয়া আপনকার সমক্ষে গান করিতে আদেশ করেন। আপনি তাহাদিগকে দেখিলে, ও তাহাদের গান শুনিলে, নিঃসন্দেহ, মোহিত হইবেন।

শ্রবণ মাত্র, রামের অন্তঃকরণে অতিপ্রভূত কৌতূহলরস সঞ্চারিত হইল। তখন তিনি, এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা, তাহাদের দুই সহোদরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা, রাজা আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, অতি বিনীত ভাবে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর করিবা মাত্র, রামের হৃদয়ে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল। প্রীতিরস, অথবা বিষাদবিষ, সহসা সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হইল, ইহার অবধারণ করিতে পারিলেন না; কিয়ৎ ক্ষণ, বিভ্রান্তচিত্তের ন্যায়, সেই দুই কুমারের উপর দৃষ্টিবিন্যাস করিয়া রহিলেন; এবং, অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইল কেন, তাহার অনুধাবন করিতে না পারিয়া, চিত্রার্পিতের প্রায়, উপবিষ্ট রহিলেন।

কুমারেরা, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, রামচন্দ্রের সংবর্দ্ধনা করিল; এবং, তদীয় আদেশ অনুসারে, সমুচিত প্রদেশে উপবেশন করিয়া, যথোচিত বিনয় ও নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে, জিজ্ঞাসা করিল, মহারাজ! কি জন্যে আমাদের আহ্বান করিয়াছেন? তাহারা সন্নিহিত হইলে, তদীয় কলেবরে নিজের ও জানকীর অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া, রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন; কিন্তু, তৎকালে রাজসভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল; এজন্যে, অতি কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্যসংবরণ করিয়া সম্পূর্ণ সপ্রতিভের ন্যায়, তাহাদিগকে বলিলেন, শুনিলাম, তোমরা অপূর্ব্ব গান করিতে পার; যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে তোমাদের প্রশংসা করিতেছেন। এজন্যে, আমিও তোমাদের সঙ্গীত শুনিবার মানস করিয়াছি। যদি তোমাদের অভিমত হয়, কিয়ৎ ক্ষণ গান করিয়া, আমার প্রীতিপ্রদান কর। তাহারা বলিল, মহারাজ! আমরা যে কাব্যের গান করিয়া থাকি, তাহা বহুবিস্তৃত; তাহাতে মহারাজের পবিত্র চরিত সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা, আপনকার সমক্ষে, ঐ কাব্যের কোন অংশের গান করিব, আদেশ করুন।

সেই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া অবধি, রামের চিত্ত এত চঞ্চল এবং সীতানির্ব্বাসনশোক এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, লোকলজ্জার ভয়ে আর ধৈর্য্য অবলম্বন করা অসাধ্য ভাবিয়া, তিনি সহসা সভাভঙ্গ করিয়া, বিজনপ্রদেশসেবনের নিমিত্ত, নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন; এজন্যে বলিলেন, অদ্য তোমরা ইচ্ছামত যে কোনও অংশের গান কর; কল্য প্রভাত অবধি, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া, তোমাদের মুখে সমস্ত কাব্যের গান শুনিব। তাহারা, যে আজ্ঞা, মহারাজ! বলিয়া, সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক, মোহিত হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। রাম, কবির পাণ্ডিত্য ও রচনার লালিত্য দর্শনে নিরতিশয় চমৎকৃত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কাব্য কাহার রচিত, কাহার নিকটেই বা তোমরা সঙ্গীতশিক্ষা করিয়াছ? তাহারা বলিল, মহারাজ! এই কাব্য ভগবান্ বাল্মীকির রচিত; আমরা তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকটেই সমস্ত শিক্ষা করিয়াছি। তখন রাম বলিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যে অদ্ভুত কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত করিয়াছেন। অল্প শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারা যায় না। আজ তোমাদের অনেক পরিশ্রম হইয়াছে; তোমাদিগকে আর অধিক কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না; এখন তোমরা

আবাসে গমন কর।

এই বলিয়া, তাহাদের দুই সহোদরকে বিদায় দিয়া, রাম সে দিবস সত্বর সভাভঙ্গ করিলেন; এবং বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই দুই কুমারকে নয়নগোচর করিয়া আমার অন্তঃকরণ এত আকুল হইল কেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপন সন্তান দেখিলে, লোকের চিত্তে যেরূপ স্নেহের ও বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয় বলিয়া শুনিতে পাই; আমারও, ইহাদিগকে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ হইতেছে। কিন্তু এরূপ হইবার কোনও কারণই দেখিতেছি না। ইহারা ঋষিকুমার; আর, যদিই বা ঋষিকুমার না হয়, তাহা হইলেই বা আমার সে আশা করিবার সম্ভাবনা কি। আমি যে অবস্থায় যেরূপে প্রিয়ারে বনবাস দিয়াছি, তাহাতে তিনি দুঃসহ শোকে ও অসহনীয় অপমানভরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, হয় তিনি আত্মঘাতিনী হইয়াছেন, নয় কোনও দুরন্ত হিংস্র জন্তু তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। তিনি যে তেমন অবস্থায়, প্রাণধারণে সমর্থ হইয়া, নির্বিঘ্নে সন্তানপ্রসব করিয়াছেন, এবং তাহাদের লালন পালন করিতে পারিয়াছেন, এরূপ আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র। আমি যেরূপ হতভাগ্য, তাহাতে এত সৌভাগ্য কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না।

এই বলিয়া, একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন; অনন্তর, শোকাবেগসংবরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু উহাদের আকার প্রকার দেখিলে ক্ষত্রিয়কুমার বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। অধিকন্তু, উহাদের কলেবরে আমার অবয়বের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে; আর অভিনিবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলে, সীতার অবয়বসৌসাদৃশ্য নিঃসংশয়িত রূপে প্রতীয়মান হইতে থাকে; ভ্রূ, নয়ন, নাসিকা, কর, চিবুক, ওষ্ঠ ও দন্তপংক্তিতে কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। এত সৌসাদৃশ্য কি আকস্মিক ঘটনা মাত্রে পর্য্যবসিত হইবেক? আর, ইহারা বলিল, বাল্মীকির তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছে, আমিও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলাম, সীতারে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিবে। হয় ত, মহর্ষি কারুণ্য বশতঃ সীতাকে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন; তথায় তিনি এই যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। লক্ষণ দেখিয়া সকলে এরূপ বোধ করিতেন, জানকী গর্ভযুগল-ধারণ করিয়াছেন। এ সকলের আলোচনা করিলে আমার আশা নিতান্ত দুরাশা বলিয়াও বোধ হয় না। অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া অনর্থক আপনাকে ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছি। যখন আমি, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায়

নিতান্ত নির্দ্দয় ও নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, তাদৃশী পতিপ্রাণা কামিনীরে, সম্পূর্ণ নিরপরাধে, বনবাস দিয়াছি, তখন আর সে সব আশা করা নিতান্ত মূঢ়ের কর্ম্ম। হা প্রিয়ে! তুমি তেমন সুশীলা ও সরলহৃদয়া হইয়া কেন এমন দুঃশীলের ও কুটিলহৃদয়ের হস্তে পড়িয়াছিলে। আমি যখন তোমায় নিতান্ত পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী জানিয়াও অনায়াসে বনবাস দিতে, এবং বনবাস দিয়া এ পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিতে পারিয়াছি, তখন আমা অপেক্ষা নৃশংস ও পাষাণহৃদয় আর কে আছে ?

এইরূপে আক্ষেপ করিতে করিতে দুর্দ্ধর শোকভরে অভিভূত হইয়া রাম বিচেতনপ্রায় হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বাল্মীকি সীতারে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সীতা তথায় এই দুই যমজ তনয় প্রসব করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ইহারা যে প্রকৃত ঋষিকুমার নহে, তাহার এক দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা অল্প দিন মাত্র উপনীত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন নহে। বোধ হয়, একাদশ বর্ষে উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছে। ক্ষত্রিয়কুমার না হইলে, এ বয়সে উপনয়ন হইবেক কেন ? প্রকৃত ঋষিকুমার হইলে, মহর্ষি অবশ্যই অষ্টম বর্ষে ইহাদের সংস্কারসম্পাদন করিতেন। ইহা ভিন্ন, উপনীত ঋষিকুমারদিগের যেরূপ বেশ হয়, ইহাদের বেশ সর্ব্বাংশে সেরূপ লক্ষিত হইতেছে না। যদি ইহারা ক্ষত্রিয়কুমার হয়, তাহা হইলে, ইহাদের সীতার সন্তান হওয়া যত সম্ভব, অন্যের সন্তান হওয়া তত সম্ভব বোধ হয় না; কারণ অন্য ক্ষত্রিয়সন্তানের তপোবনে প্রতিপালিত ও উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা কি ? আমার মত হতভাগ্য লোকের সন্তান না হইলে ইহাদের কদাচ এ অবস্থা ঘটিত না।

মনে মনে এইরূপ বিতর্ক ও আক্ষেপ করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, যদি প্রিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, এবং এই দুই কুমার আমার তনয় হয়, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হয়। প্রিয়া পুনরায় আমার নয়নের ও হৃদয়ের আনন্দদায়িনী হইবেন, ইহা ভাবিলেও, আমার সর্ব্ব শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। এই বলিয়া, যেন সীতার সহিত সমাগম অবধারিত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া, রাম বলিতে লাগিলেন, এই দীর্ঘ বিয়োগের পর যখন প্রথম সমাগম হইবেক, তখন, বোধ হয়, আমি আহ্লাদে অধৈর্য্য হইব; প্রিয়ারও আহ্লাদের একশেষ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমসমাগমসময়ে, উভয়েরই

আনন্দাশ্রুপ্রবাহ প্রবল বেগে বাহিত হইতে থাকিবেক। কিয়ৎ ক্ষণ এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া তিনি হর্ষবাষ্পবিসর্জ্জন করিলেন। পর ক্ষণেই এই চিন্তা উপস্থিত হইল, আমি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে প্রিয়ার সহিত সমাগম হইলে, কেমন করিয়া তাঁহারে এ মুখ দেখাইব। অথবা, তিনি যেরূপ সাধুশীলা ও সরলহৃদয়া, তাহাতে অনায়াসেই আমার অপরাধমার্জ্জনা করিবেন। আমি দেখিবামাত্র, তাঁহার চরণে ধরিয়া বিনীত বচনে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব। কিয়ৎ ক্ষণ পরেই আবার এই চিন্তা উপস্থিত হইল, পাছে প্রজালোকে বিরাগ-প্রদর্শন করে, এই আশঙ্কায় আমি প্রিয়ারে বনবাসে পাঠাইয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহারে গৃহে লই, তাহা হইলে, পুনরায় সেই আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে। এত কাল আপনাকে ও প্রিয়াকে দুঃসহ বিরহযাতনায় যে দগ্ধ করিলাম, সে সকলই বিফল হইয়া যায়।

এই বলিয়া নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাম কিয়ৎ ক্ষণ অপ্রসন্ন মনে অবস্থিত রহিলেন; অনন্তর, সহসা উদ্ভূত রোষাবেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, আর আমি অমূলক লোকাপবাদে আস্থাপ্রদর্শন করিব না। অতঃপর প্রিয়ারে গৃহে লইলে যদি প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক; আর আমি তাহাদের ছন্দানুবৃত্তি করিতে পারিব না। আমি যথেষ্ট করিয়াছি। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কে কখন আমার ন্যায় আত্মবঞ্চন করিয়াছে। প্রথমেই প্রিয়ারে বনবাস দেওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমি অবশ্যই তাঁহারে গৃহে লইব। নিতান্ত না হয়, ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া প্রিয়াসমভিব্যাহারে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিব। প্রিয়াবিরহিত হইয়া রাজ্যভোগ অপেক্ষা, তাঁহার সমভিব্যাহারে বনবাস, আমার পক্ষে, সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর, তাহার সন্দেহ নাই।

রাম, আহার ও নিদ্রার পরিহার পূর্ব্বক, এইরূপ বহুবিধ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, রজনীযাপন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মহর্ষি বাল্মীকি, রামচরিত অবলম্বন করিয়া, অতি অদ্ভুত কাব্যের রচনা করিয়াছেন; তাঁহার দুই কোকিলকণ্ঠ তরুণবয়স্ক শিষ্য অতি মধুর স্বরে সেই কাব্যের গান করে; কল্য প্রভাতে তাহারা রাজসভায় গান করিবেক; এই সংবাদ নৈমিষাগত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত হইয়াছিলেন। রজনী অবসন্না হইবা মাত্র, কি ঋষিগণ, কি নৃপতিগণ, কি অপরাপর নিমন্ত্রিতগণ সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণলালসার বশবর্ত্তী হইয়া সাতিশয় ব্যগ্রচিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সে দিবসের সভায় সমারোহের সীমা ছিল না। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং সুগ্রীব, বিভীষণ আদি সুহৃদ্বর্গ তাঁহার বামে ও দক্ষিণে, যথাযোগ্য আসনে আসীন হইলেন। কৌশল্যা, কেকয়ী, সুমিত্রা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি প্রভৃতি রাজপরিবার, অরুন্ধতী প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ সমভিব্যাহারে, পৃথক স্থানে অবস্থিত হইলেন।

এইরূপে রাজসভায় সমবেত হইয়া, সমস্ত লোক অভিনব কাব্যের ও সুকুমার গায়কযুগলের কথা লইয়া আন্দোলন ও নিতান্ত উৎসুক চিত্তে তাহাদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি বাল্মীকি, কুশ ও লব সমভিব্যাহারে, সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দেখিবামাত্র সভামণ্ডলে মহান্ কোলাহল উত্থিত হইল। যাঁহারা পূর্ব্ব দিন কুশ ও লবকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বসমীপে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে তাহাদের দুই সহোদরকে দেখাইতে লাগিলেন। বাল্মীকি সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সভাস্থ সমস্ত লোকে এককালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মহর্ষি ও তাঁহার দুই শিষ্যের নিমিত্তে পৃথক্ স্থান স্থিরীকৃত ছিল, তাঁহারা তথায় উপবিষ্ট হইলেন। সকলেই, সঙ্গীতশ্রবণের নিমিত্তে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া, একান্ত উৎসুক চিত্তে, কখন আরম্ভ হয়, এই প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাল্মীকি সভার সর্ব্বাংশে নয়নসঞ্চারণ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! সকলেই শ্রবণেব নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছেন; অতএব অনুমতি করুন, সঙ্গীতের আরম্ভ হউক। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, কুশ ও লব বীণাযন্ত্রসহযোগে সঙ্গীতের আরম্ভ করিল। বাল্মীকি পূর্ব্বেই কুশ ও

লবকে শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন, রামায়ণের যে সকল অংশে রামের ও সীতার পরস্পর স্নেহ ও অনুরাগ বর্ণিত আছে, তোমরা অদ্য ঐ সকল অংশেরই গান করিবে। তদনুসারে তাহারা কিয়ৎ ক্ষণ গান করিবামাত্র, রামের হৃদয় দ্রবীভূত হইল; তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদের দুই সহোদরকে যত দেখিতে লাগিলেন, ততই তাহারা সীতার তনয় বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিতে লাগিল। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ইঁহারাও, তাহাদের কলেবরে রামের ও সীতার সৌসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া, মনে মনে নানা বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ইহা ব্যতিরিক্ত, সভাস্থ সমস্ত লোক একবাক্য হইয়া হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! এই দুই ঋষিকুমার যেন রামচন্দ্রের প্রতিকৃতি স্বরূপ; যদি বেশে ও বয়সে বৈষম্য না থাকিত, তাহা হইলে, রামে ও এই দুই ঋষিকুমারে কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইত না। বোধ হয় যেন রাম ও কুমারবয়স অবলম্বন পূর্ব্বক দুই মূর্ত্তি ধরিয়া, ঋষিকুমারের বেশপরিগ্রহ করিয়াছেন। এই বয়সে রামের যেরূপ আকৃতি ও রূপ লাবণ্যের যেরূপ মাধুরী ছিল, ইহাদের অবিকল সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। যাহা হউক, সভাস্থ সমস্ত লোক মোহিত ও নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া একতান মনে সঙ্গীতশ্রবণ ও অনিমিষ নয়নে তাহাদের রূপ-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস ! ইহাদিগকে সহস্র সুবর্ণ পুরস্কার দাও। তাহারা, শ্রবণ মাত্র, বিনয়নম্র বচনে বলিল, মহারাজ ! আমরা বনবাসী, বিলাসী বা ভোগাভিলাষী নহি; যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল মাত্র আহার ও বল্কল মাত্র পরিধান করিয়া কালযাপন করি; আমাদের সুবর্ণে প্রয়োজন কি। আমরা অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, আপনকার চরিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম; আজ আপনকার সমক্ষে তাহার পরিচয় দিয়া, আমাদের সেই যত্ন ও সেই পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইল। আপনি শ্রবণ করিয়া যে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমরা চরিতার্থ হইয়াছি। বালকদিগের এইরূপ প্রবীণতা ও বীতস্পৃহতা দর্শনে, সকলে একবারে চমৎকৃত হইলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া; কুশ ও লব সীতার তনয় বলিয়া, কৌশল্যার অন্তঃকরণে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। তখন তিনি, নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে, হা বৎসে জানকি ! ইহা বলিয়া, ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে একান্ত বিকলান্তঃকরণ হইয়া, অশেষ যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ সঙ্গীতশ্রবণ করিয়া

সকলেরই হৃদয়ে সীতার শোক এত প্রবল ভাবে উদ্ভূত হইয়া উঠিল যে, সকলেই নিতান্ত অস্থির হইলেন, এবং অবিরল ধারায় বাষ্পবারিবিমোচন ও মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কৌশল্যা নিরতিশয় অধীরা হইয়া উন্মত্তার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, ঐ দুই কুমারকে কেহ আমার নিকটে আনিয়া দাও; ক্রোড়ে লইয়া এক বার আমি উহাদের মুখচুম্বন করিব; উহারা আমার জানকীর তনয়; উহাদিগকে দেখিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে; হয় তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দাও, নয় আমি উহাদের নিকটে যাই; ক্রোড়ে লইয়া একবার উহাদের মুখচুম্বন করিলে, আমার জানকীশোকের অনেক নিবারণ হইবেক। ঐ দেখ না, উহাদের অবয়বে আমার রামের ও জানকীর সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। উহারা সভায় প্রবেশ করিবামাত্র যেন কেহ আমায় বলিয়া দিল, ঐ তোমার রামের দুই বংশধর আসিতেছে, সেই অবধি উহাদের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। আমি বার বৎসরে সীতাকে একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু উহাদিগকে দেখিয়া, আমার সীতাশোক পুনরায় নূতন হইয়া উঠিয়াছে। হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ, তোমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, অদ্যাপি জীবিত আছ, কি এই পাপিষ্ঠ নরলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছ, কিছুই জানি না। এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যা পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। সকলে, সযত্ন হইয়া, পুনরায় তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। তখন কৌশল্যা নিরতিশয় অধৈর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, এখনও তোমরা উহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দিলে না; না হয় কেহ এক বার, লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া. আমার নাম করিয়া বলুক; লক্ষ্মণ এখনই উহাদিগকে আনিয়া আমার ক্রোড়ে দিবেক।

কৌশল্যার এইরূপ অস্থিরতা ও কাতরতা দেখিয়া অরুন্ধতীর আদেশ অনুসারে সমীপবর্ত্তিনী প্রতীহারী লক্ষ্মণের নিকটে গিয়া সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, কৌশল্যার অভিপ্রায় তাঁহার গোচর করিল। লক্ষ্মণ, কৌশলক্রমে, সে দিবস সেই পর্য্যন্ত সঙ্গীতক্রিয়া রহিত করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন; এবং, কুশ ও লবকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা তাহাদের দুই সহোদরকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে বারংবার উভয়ের মুখচুম্বন করিলেন, এবং হা বৎসে জানকি! তুমি কোথায় রহিয়াছ; এই বলিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে, সুমিত্রা, ঊর্ম্মিলা প্রভৃতি সকলেই, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া অবিশ্রান্ত

অশ্রুপাত, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কুশ ও লব, এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, অবাক হইয়া রহিল।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, সন্দেহ-ভঞ্জনমানসে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও তোমাদের জনক জননীর নাম কি? তাহারা, অতি বিনীত ভাবে, স্বস্বনামকীর্ত্তন করিয়া বলিল, আমাদের পিতা কে, তাহা আমরা জানি না; এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে দেখি নাই; আমাদের জননী আছেন, তিনি তপস্বিনী; কিন্তু এক দিনও তাঁহার নাম শুনি নাই, কেহ আমাদিগকে বলিয়া দেয় নাই; আমরাও তাঁহাকে বা অন্য কাহাকেও কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। আমরা মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য; তাঁহার তপোবনে প্রতিপালিত হইয়াছি, এবং তাঁহারই নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি; আকুল চিত্তে এই সকল কথা শুনিয়া অনেক অংশে কৌশল্যার সংশয়াপনোদন হইল। কিন্তু, সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত না হইয়া, তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননীর আকৃতি কিরূপ? কুশ ও লব তদীয় আকৃতির যথাযথ বর্ণনা করিল। তখন তাহারা সীতার তনয় বলিয়া, এক কালে সকলের দৃঢ় নিশ্চয় হইল, এবং কৌশল্যা প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবারের শোকসিন্ধু অনিবার্য্য বেগে, উথলিয়া উঠিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কৌশল্যা কুশ ও লবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের জননী কেমন আছেন? তাহারা বলিল, তাঁহাকে সর্ব্বদাই জীবন্মৃতপ্রায় দেখিতে পাই; বিশেষতঃ, তিনি দিন দিন যেরূপ ক্ষীণ হইতেছেন, তাহাতে বোধ হয় অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই কথা বলিতে বলিতে তাহাদের দুই সহোদরের নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কুশ ও লবের এই সকল কথা শুনিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ রূপে সন্দেহভঞ্জন করিবার নিমিত্ত লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি এক বার মহর্ষি বাল্মীকিকে এই স্থানে আন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাল্মীকি লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে যথোচিত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম করিয়া, পরম সমাদরে আসনে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর কৌশল্যা কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনকার এই দুই শিষ্য কে, কৃপা করিয়া সবিশেষ বলুন। বাল্মীকি, যে দিন লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আই-সেন, সেই অবধি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নির্দিষ্ট করিয়া, রামের বিরহে সীতার যাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিলেন। সমুদয় শ্রবণগোচর

করিয়া সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কৌশল্যা, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, হা বৎসে জানকি! বিধাতা তোমার কপালে এত দুঃখ লিখিয়াছিলেন, এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, সীতা অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং কুশ ও লব তাঁহার তনয়, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সংশয় রহিল না।

এত দিনের পর আত্মপরিচয় পাইয়া কুশ ও লবের অন্তঃকরণে নানা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে লাগিল। বাল্মীকি তাহাদিগকে বলিলেন, বৎস কুশ! বৎস লব! পিতামহীদের ও পিতৃব্যপত্নীদিগের চরণবন্দনা কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ কৌশল্যা, কৈকয়ী, ও সুমিত্রার, এবং উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, তোমরা রামায়ণে লক্ষ্মণ নামে যে মহাপুরুষের গুণকীর্ত্তন পাঠ করিয়াছ, তিনি এই, ইনি তোমাদের তৃতীয় পিতৃব্য, এই বলিয়া লক্ষ্মণকে দেখাইয়া দিলেন। তাহারা, লক্ষ্মণ এই শব্দ কর্ণগোচর হইবামাত্র, বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে পাদ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে তাঁহার চরণে প্রণাম করিল।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ অতীত হইলে, কৌশল্যা লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি ত্বরায় রামকে ও বশিষ্ঠদেবকে এখানে আন। তদনুসারে লক্ষ্মণ, অল্পক্ষণ মধ্যে, রাম ও বশিষ্ঠদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কৌশল্যা বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে তাহাদের নিকট কুশ ও লবের প্রকৃত পরিচয় দিলেন, এবং সীতা যে তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিত আছেন, তাহাও বলিলেন। কুশ ও লবের বিষয়ে রামচন্দ্রের অন্তঃকরণে যে সংশয় ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইল। চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তিনি অপ্রমেয় বাৎসল্যভরে নিস্পন্দ নয়নে কুশ ও লবের মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, কৌশল্যা সপুত্রা সীতার পরিগ্রহের প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র মৌনালম্বন করিয়া রহিলেন। কৌশল্যা তদীয় মৌনাবস্থানকে সম্মতি-দান স্থির করিয়া সীতার আনয়নের নিমিত্তে বাল্মীকির নিকট প্রার্থনা করিলেন। বাল্মীকি অবিলম্বে বাস কুটীরে গমন করিয়া কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান সমভিব্যাহারে আপন এক শিষ্যকে পাঠাইলেন; বলিয়া দিলেন, তুমি জানকীরে এই যানে আরোহণ করাইয়া, আমার বাসকুটিরে লইয়া আসিবে।

ক্রমে ক্রমে, সমবেত নিমন্ত্রিতগণ অবগত হইলেন, রামায়ণগায়ক বাল্মীকি-শিষ্যেরা রাজতনয়; সীতাপরিত্যাগের পর, বাল্মীকির আশ্রমে তাহাদিগকে

প্রসব করিয়াছেন; তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা তাঁহারে গৃহে লইবেন; তাঁহার আনয়নের নিমিত্তে লোক প্রেরিত হইয়াছে। এই সংবাদে অনেকেই প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমাদের রাজা অতি অব্যবস্থিতচিত্ত; যদি জানকীরে পুনরায় গৃহে লইবেন, তবে পরিত্যাগ করিবার কি আবশ্যকতা ছিল? তখনও যে জানকী, এখনও সেই জানকী; তখনও যে কারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন সেই কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে; বড় লোকের রীতি চরিত্র বুঝা ভার।

সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে রাম একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই সকল কথা কর্ণপরম্পরায় তাঁহার কর্ণগোচর হইলে, পুনরায় চলচিত্ত হইলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে জানকীরে গৃহে লইলে, প্রজালোকে আর আপত্তির উত্থাপন করিবেক না। কিন্তু, অদ্যাপি তাহাদের হৃদয় হইতে সীতার চরিত্রসংক্রান্ত সংশয় অপনীত হয় নাই দেখিয়া, তিনি বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে রাম তাঁহাকে গৃহে লইবেন। রামের আদেশ অনুসারে, লক্ষ্মণ এই কথা বাল্মীকির গোচর করিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, বাল্মীকি অবিলম্বে রামচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সীতা যে সম্যক্ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। রামচন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! সীতার শুদ্ধচারিতা বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমি রাজ্যের ভার-গ্রহণ করিয়া নিতান্ত পরায়ত্ত হইয়াছি। আপনারাই উপদেশ দিয়া থাকেন, প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করাই রাজার পরম ধর্ম্ম; কোনও কারণে তাহাতে অণুমাত্র উপেক্ষাদর্শন করিলে ইহ লোকে অকীর্ত্তিভাজন ও পরলোক নিরয়গামী হইতে হয়। প্রজালোকের অন্তঃকরণে সীতার চরিত্র বিষয়ে বিষম সংশয় জন্মিয়া আছে; সে সংশয় অপসারিত না হইলে, আমি কি রূপে গ্রহণ করি, বলুন। আমি সীতার পরিত্যাগ দিবস অবধি সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি; কি রূপে এত দিন জীবিত রহিয়াছি বলিতে পারি না। নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই আমায় সীতারে নির্ব্বাসিত করিতে হইয়াছে। এক বার মনে করিয়াছিলাম, প্রজালোকে অসন্তুষ্ট হয়, হউক, আমি আর তাহাদের অনুরোধে সীতাগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু তাহাতে রাজধর্ম্মের প্রতিপালন হয় না; সুতরাং, সে বিষয়ে সাহস করিতে পারিলাম না। আর বার ভাবিয়াছিলাম, না হয়,

ভরতের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইব ; তাহা হইলে, আর আমার জানকীপরিগ্রহের কোনও প্রতিবন্ধক থাকিবেক না। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সে উপায় অবলম্বন করাও শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল না। আমি জানকীর প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ করিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দেহ ঘোরতর অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়াছি ; এ যাত্রা, আমি নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগে জীবনযাপন করিবার নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে যে বিষম মানসিক কষ্টে কালহরণ করিতেছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যদি এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ বোধ করি।

এই বলিয়া একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া রাম অনিবার্য বেগে বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ; কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিঞ্চিৎ শান্তচিত্ত হইয়া অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক, বিনয়বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া বাল্মীকিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনকার নিকটে আমার প্রার্থনা এই, সীতা উপস্থিত হইলে, আপনি তাঁহারে আপন সমভিব্যাহারে সভামণ্ডপে লইয়া যাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে সকলের সম্মতি জিজ্ঞাসিবেন। যদি তাঁহার পরিগ্রহ সর্ব্বসম্মত হয়, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিব। সর্ব্বসম্মত না হইলে, তাঁহাকে কোনও অসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা প্রজাবর্গের সন্দেহনিরাকরণ করিতে হইবেক। বাল্মীকি, অগত্যা সম্মত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে বাসসদনে প্রতিগমন করিলেন।

এ দিকে সীতা, কৌশল্যার প্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, এবং মহর্ষির প্রেরিত শিষ্যের মুখে তদীয় আদেশ শুনিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, বুঝি বিধি সদয় হইয়া, এত দিনের পর, আমার দুঃখের অবসান করিলেন। যখন ঠাকুরাণী শিবিকা পাঠাইয়াছেন, তখন আমি পুনরায় পরিগৃহীতা হইব, সন্দেহ নাই। বোধ হয়, এই জন্যেই আজ আমার বাম নয়ন অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। আমি আর্য্যপুত্রের স্নেহ, দয়া, ও মমতা জানি ; নিতান্ত অনায়ত্ত হওয়াতেই তিনি আমায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার বিরহে যেমন কাতর, তিনিও আমার বিরহে সেইরূপ কাতর, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমার প্রতি স্নেহের কোনও অংশে খর্ব্বতা ঘটিত, তাহা হইলে তিনি কখনই পুনরায় দারপরিগ্রহে বিমুখ হইতেন না। তিনি সহধর্ম্মিণীস্থলে আমার প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া, স্নেহের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, এবং আমার সকল শোকের ও সকল ক্ষোভের নিবারণ করিয়াছেন। পুনরায় যে আমার অদৃষ্টে আর্য্যপুত্রের সহবাসসুখ ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, আহ্লাদভরে জানকীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার শরীরে শতগুণ বলাধান ও চিত্তে অপরিমিত স্ফূর্ত্তির ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। পুনরায় পরিগৃহীতা হইলাম ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয়কন্দর অভূতপূর্ব্ব আনন্দপ্রবাহে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। আশার আশ্বাসনী শক্তির ইয়ত্তা নাই। তিনি আশার উপর নির্ভর করিয়া মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলেন। রামের সহিত সমাগম হইলে যে সকল ব্যাপার ঘটিতে পারে, তিনি তৎসমুদয় আপন চিত্তপটে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি এক বার বোধ করিলেন, যেন তিনি রামের সম্মুখে নীত হইয়াছেন, রাম লজ্জায় মুখ তুলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে পারিতেছেন না; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন রাম অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্নেহভরে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন, তিনি কথা কহিতেছেন না, অভিমান ভরে বদন বিরস করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন প্রথম-সমাগমক্ষণে উভয়েই জড়প্রায় হইয়া স্থির নয়নে উভয়ের বদননিরীক্ষণ করিতেছেন, এবং উভয়েরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন উভয়ে একাসনে উপবেশন করিয়া, পরস্পর দীর্ঘবিরহকালীন দুঃখের বর্ণনা করিতে করিতে, অপরিজ্ঞাত রূপে রজনীর অবসান হইয়া গেল; এক বার বোধ করিলেন যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের সম্মুখে নীত হইয়া তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলে তাঁহারা বাষ্পপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, এবং তাঁহাকে কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট দেখিয়া, শোকভরে কতই পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি শ্বশ্রূদিগের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার দেবরেরা তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে, আর্য্যে! প্রণাম করি, ইহা বলিয়া অভিবাদন করিলেন; এক বার বোধ করিলেন, যেন তাঁহার ভগিনীরা আসিয়া প্রণাম করিলেন, এবং দীর্ঘবিয়োগের পর পরস্পর-সন্দর্শনে শোকপ্রবাহ উচ্ছলিত হওয়াতে, সকলে মিলিয়া গলদশ্রু লোচনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; আর বার বোধ করিতে লাগিলেন, যেন হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত হইয়াছে; তিনি রামের বামে বসিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে সহধর্ম্মিণীকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন।

এইরূপ অনেকরূপ অনুভব করিতে করিতে আহ্লাদভরে পুলকিতকলেবরা হইয়া জানকী শিবিকায় আরোহণ করিলেন; এবং, পর দিবস সায়ং সময়ে, নৈমিষে উপনীতা হইলেন। বাল্মীকি বলিলেন, বৎসে! রাজা রামচন্দ্র

তোমার পুনর্গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। কল্য, যৎকালে, তিনি সভামণ্ডপে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ে, সর্ব্ব সমক্ষে, আমি তোমায় তাঁহার হস্তে সমর্পিত করিব। বাল্মীকির মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমি সীতার পরিগ্রহ-প্রার্থনা করিলে কোনও ব্যক্তি সাহস করিয়া সভামধ্যে অসম্মতিপ্রদর্শন করিতে পারিবেক না। এজন্য, তিনি, শুদ্ধচারিতার প্রমাণপ্রদর্শন আবশ্যক হইলেও হইতে পারে, একথার উল্লেখ মাত্র করিলেন না। অনন্তর জানকী বিরলে বসিয়া কুশ ও লবের মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্বীয় পরিগ্রহ বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে মুক্তসংশয়া হইলেন, এবং আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া প্রতি ক্ষণে প্রভাতপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; সমস্ত রাত্রি একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

রজনী অবসন্না হইল। মহর্ষি বাল্মীকি স্নান, আহ্নিক সমাপিত করিয়া সীতা, কুশ, লব, ও শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কাল মাত্রে পর্য্যবসিত দেখিয়া রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। অতিকষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগের সংবরণে সমর্থ হইলেন; এবং, না জানি আজ প্রজালোকে কিরূপ আচরণ করে, এই চিন্তায় আক্রান্ত হইয়া একান্ত আকুল হৃদয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সীতার অবস্থাদর্শনে অনেকেরই অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল। বাল্মীকি, আসনপরিগ্রহ না করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, এই সভায় নানাদেশীয় নরপতিগণ কোশল রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণ, এবং অপরাপর সহস্র সহস্র পৌরবর্গ ও জানপদগণ সমবেত হইয়াছ; তোমরা সকলেই অবগত আছ, রাজা রামচন্দ্র, অমূলকলোকাপবাদশ্রবণে চলচিত্ত হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে জানকীরে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তোমাদের সকলের নিকট আমার অনুরোধ এই, তাঁহার পরিগ্রহ বিষয়ে তোমরা প্রশস্ত মনে অনুমোদনপ্রদর্শন কর; জানকী যে সম্পূর্ণ শুদ্ধচারিণী, সে বিষয়ে মনুষ্যমাত্রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

ইহা বলিয়া, বাল্মীকি বিরত হইলে, সভ্যামণ্ডপে অতিমহান কোলাহল উত্থিত হইল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নরপতিগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ, দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, রাজা রামচন্দ্র সীতা দেবীর পুনরায় গ্রহণ করিলে, আমরা যার পর নাই পরিতোষলাভ করিব। কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্ত লোক অবনত বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাম এত ক্ষণ বিষম সংশয়ে কালযাপন

করিতেছিলেন; এক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সীতার পরিগ্রহ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি নাই। এ জন্তে তিনি নিতান্ত ম্লানবদন ও ম্রিয়মাণপ্রায় হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় স্থির নয়নে বাল্মীকির মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাল্মীকি অতিমাত্র হতোৎসাহ হইয়া উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, সীতাকে বলিলেন, বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়া আছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তঃকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মীকির দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতি ক্ষণেই পরীগ্রহপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণ মাত্র বজ্রাহতার প্রায় গতচেতনা হইয়া বাতাহত লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।

জননীর তাদৃশী দশা দেখিয়া অতিমাত্র কাতর হইয়া কুশ ও লব উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। রাম অতিমহতী লোকানুরাগপ্রিয়তার সহায়তায় এ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু সীতাকে ভূতলশায়িনী দেখিয়া, এবং কুশ ও লবের আর্ত্তনাদ শ্রবণগোচর করিয়া, অতিদীর্ঘনিশ্বাসভারপরিত্যাগ পূর্ব্বক, হা প্রেয়সি! বলিয়া, মূর্চ্ছিত ও সিংহাসন হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, হা বৎসে জানকি! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সীতার ভগিনীরাও দুঃসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায়! কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, সভাস্থ সমস্ত লোক, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া, চিত্রার্পিতপ্রায় উপবিষ্ট রহিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ, ও শত্রুঘ্ন, শোকে একান্ত অভিভূত হইয়াও, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক, রামচন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদনে তৎপর হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। বাল্মীকিও, সীতার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত, অশেষপ্রকারে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াস বিফল হইল। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরেই বুঝিতে পারিলেন, সীতা মানবলীলার সংবরণ করিয়াছেন।

সীতা নিতান্ত সুশীলা ও একান্ত সরলহৃদয়া ছিলেন; তাঁহার তুল্য পতিপরায়ণা রমণী কখনও কাহারও দৃষ্টিবিষয়ে বা শ্রুতিগোচরে পতিত হয় নাই। তিনি স্বীয় বিশুদ্ধ চরিতে পতিপরায়ণতা গুণের এরূপ পরা কাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন যে, বোধ হয়, বিধাতা মানবজাতিকে পতিব্রতাধর্ম্মে উপদেশ দিবার নিমিত্তে, সীতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণ-সম্পন্না কামিনী কোনও কালে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি পাইয়া, কখনও কোনও কামিনী তাঁহার মত দুঃখ-ভাগিনী হইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

মহাভারত

ভূমিকা

মহাভারতের উপক্রমণিকাভাগ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা পৃথক্ প্রচারিত হয় আমার এরূপ অভিলাষ ছিল না। অবশেষে কতিপয় বন্ধুর সবিশেষ অনুরোধে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। পুস্তকাকারে প্রচারিত করিতে গেলে পরিশ্রমসহকারে সংশোধনাদি করা আবশ্যক, কিন্তু অবকাশবিরহাদি কারণ বশতঃ তাহা সম্যক্ সমাহিত হইয়া উঠে নাই; সুতরাং বিশেষজ্ঞ মহাশয়েরা স্থানে স্থানে অশেষ দোষ দর্শন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

মহাভারতে নির্দ্দেশ আছে, কেহ প্রথম অবধি, কেহ আস্তীকপর্ব্ব অবধি, কেহ উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শেষ কল্প অবলম্বন করেন, তাঁহাদের মতে উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি ভারতের প্রকৃত আরম্ভ; সুতরাং তন্মতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সকল তদীয় উপক্রমণিকা স্বরূপ। এই পুস্তক ঐ অংশের অনুবাদ মাত্র; এই নিমিত্ত শেষ কল্প অবলম্বন করিয়া অনুবাদিত অংশ উপক্রমণিকাভাগ বলিয়া উল্লিখিত হইল।

মূলগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করাই তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল, আমিও অনুবাদকালে তদনুরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলাম কিন্তু সভার অভিপ্রায় রক্ষা বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, মূলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে অনেক স্থলে অর্থগত ও তাৎপর্য্যনিষ্ঠ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবেক, তাহার সংশয় নাই। মূলগ্রন্থে অনেক স্থান এরূপ আছে যে, সহজে অর্থবোধ ও তাৎপর্য্যগ্রহ হওয়া দুর্ঘট। সেই সকল স্থল, অনুধাবন করিয়া অথবা টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্বাপর যেরূপ বোধ হইয়াছিল, তদনুসারেই অনুবাদিত হইয়াছে; সুতরাং তত্তৎস্থলের অনুবাদ সর্ব্বসম্মত হওয়া সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ নানা কারণ বশতঃ মহাভারতের অনুবাদ নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়।

যাহা হউক, এই পুস্তক পাঠ করিয়া সকলে প্রীত হইবেন, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। যদি ইহা পাঠকবিশেষের পক্ষে কিঞ্চিৎ অংশেও প্রীতিপদ হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা। সংবৎ ১৯১৬। ১লা মাঘ। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

॥ মহাভারত ॥

আদিপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়—অনুক্রমণিকা।

নারায়ণ, সর্ব্বনরোত্তম নর, (১) এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া জয় (২) উচ্চারণ করিবেক।

(১) বিষ্ণুর অবতার ঋষিবিশেষ। বিষ্ণু ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহারা উভয়েই ঋষিরূপে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। যথা

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ॥ ভাগবত ২। ৭। ৭।

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥ ভাগ ১। ৩। ৭।

পুরাণান্তরে নর নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে নির্দিষ্ট আছে। মহাদেব সরভরূপ পরিগ্রহ করিয়া দন্তাগ্রভাগপ্রহার দ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহমূর্ত্তি দুই খণ্ড করেন, তাহার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হয়েন। যথা

ততো দেহপরিত্যাগং কর্ত্তুং সমভবদ্যদা।
তদা দংষ্ট্রাগ্রভাগেন নরসিংহং মহাবলম্।
সরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ॥
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন তস্য তু।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষি॥
তস্য পঞ্চাস্যভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
অভবৎ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ॥
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী।
যয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসু চ॥ কালিকাপুরাণ।

(২) রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস ও অষ্টাদশ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সংসার জয় হয়, অর্থাৎ জীব জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ সংসারশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়, এই নিমিত্ত তত্তৎ শাস্ত্রের নাম জয়। যথা

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
কার্ষ্ণং বেদং পঞ্চমঞ্চ যন্মহাভারতং বিদুঃ॥

তথৈব শিবধর্ম্মাশ্চ বিষ্ণুধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।
জয়েতি নাম তেষাঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
সংসারজয়নং গ্রন্থং জয়নামানমীরয়েৎ॥ ভবিষ্যপুরাণ।

কুলপতি (৩) শৌনক নৈমিষারণ্যে (৪) দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক দিবস ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে একত্র সমাগত হইয়া কথাপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে সূতকুলপ্রসূত (৫) লোমহর্ষণ-তনয় (৬) পৌরাণিক (৭) উগ্রশ্রবাঃ বিনীত ভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বিগণ, দর্শনমাত্র অদ্ভুত কথা শ্রবণবাসনাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। উগ্রশ্রবাঃ বিনয়নম্র ও কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিবাদন

(৩) আশ্রমের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মুনি।

(৪) ভগবান্ গৌরমুখ ঋষিকে কহিয়াছিলেন যে আমি এই অরণ্যে এক নিমিষে দুর্জ্জয় দানবসৈন্য ধ্বংস করিলাম, এই নিমিত্তে ইহা নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবেক। যথা

এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমেষেণেদং নিহতং দানবং বলম্।
অরণ্যেঽস্মিংস্ততস্ত্বেতন্নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্॥

(৫) ব্রহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন প্রাতিলোমজ সঙ্কীর্ণ জাতি। যথা

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ। যাজ্ঞবল্ক্য ১ অধ্যায়।

(৬) লোমহর্ষণ ব্যাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ সংহিতা সমর্পণ করেন। এই নিমিত্ত তিনি পুরাণবক্তা। লোমহর্ষণ সর্ব্বত্র সূত নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা তাঁহার কুলানুযায়ী নাম, প্রকৃত নাম নহে, যে হেতু কল্কিপুরাণে সূতপুত্র বলিয়া লোমহর্ষণের বিশেষণ আছে; এবং লোমহর্ষণ নামও তাঁহার আদি নাম নহে, তাঁহার নিকট পৌরাণিক কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষ অর্থাৎ লোমাঞ্চ হইত, এই নিমিত্ত তাঁহার লোমহর্ষণ নাম হয়। যথা

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাস্তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥ বিষ্ণু ৩। ৬।
তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ।
বলরামাস্ত্রযুক্তাত্মা নৈমিষেঽভূৎ স্ববাঞ্ছয়া॥ কল্কি ২৭ অ।
লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৄণাং যঃ স্বভাষিতৈঃ।
কর্ম্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণসংজ্ঞয়া॥ কূর্ম্মপুরাণ।

(৭) উগ্রশ্রবার পিতা লোমহর্ষণ ব্যাসাশ্রমে আসীন হইয়া নৈমিষারণ্যবাসী

পূর্ব্বক সেই সমস্ত মুনিদিগকে তপস্যার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও যথোচিত অতিথিসৎকারান্তে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে সমুদয় ঋষিগণ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে তিনিও নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর, তাঁহার শ্রান্তি দূর হইলে, কোন ঋষি কথা প্রসঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পদ্মপলাশলোচন সূতনন্দন! তুমি এক্ষণে কোথা হইতে অসিতেছ, এবং এত কাল কোথায় কোথায় ভ্রমণ করিলে বল।

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বাগ্মী উগ্রশ্রবাঃ সেই সভাস্থ প্রশান্তচিত্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া যথানিয়মে পরিশুদ্ধ বচনে এই উত্তর দিলেন, হে মহর্ষিগণ! প্রথমতঃ মহানুভব রাজাধিরাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র (৮) দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় বৈশম্পায়নমুখে কৃষ্ণদ্বৈতপায়নপ্রোক্ত (৯) মহাভারতীয় পরমপবিত্র বিবিধ অদ্ভুত কথা

দিগকে পুবাণ শ্রবণ করাইতেছেন, এমন সময়ে বলদেব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত হইলে ঋষিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার সংবর্দ্ধনা ও সৎকার করিলেন, কিন্তু লোমহর্ষণ গাত্রোত্থানাদি করিলেন না। বলদেব তদ্দর্শনে তাঁহাকে গর্ব্বিত বোধ করিয়া ক্রোধে অধীর হইযা করস্থ কুশাগ্রপ্রহার দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিলেন। পরে ঋষিদিগের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, ইহার আর পুনর্জীবন হইবেক না, ইহার পুত্র উগ্রশ্রবাঃ আপনাদিগকে পুরাণ শ্রবণ করাইবেন। তদবধি উগ্রশ্রবাঃ পুরাণ-বক্তা হইলেন। যথা

তমাগতমভিপ্রেত্য মুনয়ো দীর্ঘজীবিনঃ।
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং প্রণম্যোত্থায় চার্চ্চয়ন্॥ ১৩॥
অনভ্যুত্থায়িনং সূতমকৃতপ্রহ্বনাঞ্জলিম্।
অধ্যাসীনঞ্চ তান্ বিপ্রান্ চুকোপোদ্বীক্ষ্য মাধবঃ॥ ১৫॥
এতাবদুক্ত্বা ভগবান্ নিবৃত্তোঽসদ্বধাদপি।
ভাবিত্বাত্তং কুশাগ্রেণ করস্থেনাহনৎ প্রভুঃ॥ ১৯॥
আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্।
তস্মাদস্য ভবেদ্বক্তা আয়ুরিন্দ্রিয়সত্ত্ববান্॥ ২৭॥ ভাগ ১০। ৭৮।

(৮) সর্পযজ্ঞ। সর্পকুলধ্বংসের নিমিত্ত ঐ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। ইহার সবিশেষ বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে মূলেই প্রাপ্ত হইবেক।

(৯) বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরে বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস, বেদব্যাস, ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এই নিমিত্ত কৃষ্ণ, আর যমুনার দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন এই নিমিত্ত দ্বৈপায়ন। এই দুই শব্দ সমষ্টি, ব্যষ্টি, উভয়থাই ব্যাসবোধক হয়।

শ্রবণ করিলাম। অনন্তর, তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, নানা তীর্থ পরিভ্রমণ ও অশেষ আশ্রম দর্শন পূর্ব্বক, বহুব্রাহ্মণসমাকীর্ণ সমন্ত পঞ্চক তীর্থে উপস্থিত হইলাম। ঐ সমন্ত পঞ্চকে পূর্ব্বে পাণ্ডব ও কৌরব এবং উভয়পক্ষীয় নরপতিগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। তথা হইতে, মহাশয়দিগের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া, এই পরমপবিত্র আশ্রমে উপনীত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগের ব্রহ্মস্বরূপ। হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ! আপনারা স্নান আহ্নিক অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূত হইয়া স্বস্থ মনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, আজ্ঞা করুন, ধর্ম্মার্থসম্বন্ধ পরমপবিত্র পৌরাণিকী কথা, অথবা মহানুভাব নরপতিগণ ও ঋষিগণের ইতিহাস, কি বর্ণনা করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! ভগবান্ ব্যাসদেব যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছেন, সুরগণ ও ব্রহ্মর্ষিমণ্ডল যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে বহু প্রশংসা করেন, এবং দ্বৈপায়নশিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়ন তদীয় আদেশানুসারে সর্পসত্রসময়ে রাজা জনমেজয়কে যাহা শ্রবণ করাইয়াছিলেন, আমরা সেই ভারতাখ্য পরমপবিত্র বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণে বাসনা করি। ভারত বেদচতুষ্টয়ের সার সমাকর্ষণ পূর্ব্বক সঙ্কলিত এবং শাস্ত্রান্তরের সহিত অবিরুদ্ধ, ভারতে অনির্ব্বচনীয় অতর্কণীয় আত্মতত্ত্বাদি বিষয়ের সবিশেষ মীমাংসা আছে; ভারত পাঠ ও শ্রবণ করিলে পাপভয় নিবারণ হয়।

ঋষিগণের প্রার্থনা শুনিয়া উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, যিনি নিখিল জগতের আদিভূত, যিনি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি স্বীয় অনন্তশক্তিপ্রভাবে স্থূল, সূক্ষ্ম, স্থাবর, জঙ্গম, নিখিল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাজ্ঞিক পুরুষেরা যে অনাদি পুরুষের প্রীতি উদ্দেশে হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করেন, শত শত সামগ ব্রাহ্মণ যাঁহার গুণ গান করিয়া থাকেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান মায়াপ্রপঞ্চরূপ অতাত্ত্বিক বিশ্ব যাহার বিরাটমূর্ত্তি, লোকে ভোগাভিলাষে ও পরম পুরুষার্থ মুক্তি পদার্থ প্রার্থনায় যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত, কালত্রয়ে অবিকৃত, সকল মঙ্গল নিদানভূত, মঙ্গলমূর্ত্তি, ত্রিলোক-পাতা, যজ্ঞফলদাতা, চরাচরগুরু হরির চরণারবিন্দ বন্দনা করিয়া সর্ব্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের অশেষ মত নিঃশেষে কীর্ত্তন করিব।

অনেকানেক অতীতদর্শী মহাশয়েরা নরলোকে এই বিচিত্র ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে অনেকে কীর্ত্তন করিতেছেন, এবং উত্তর কালেও অনেকে কীর্ত্তন করিবেন। দ্বিজাতিরা দৃঢ়ব্রত হইয়া সংক্ষেপেও বাহুল্যে যাহা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বজ্ঞানের অদ্বিতীয় আকর বেদশাস্ত্র এই পরম পবিত্র ইতিহাস রূপে আবির্ভূত। এই বিচিত্র গ্রন্থ অশেষবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সময়ে (১০) বহুতর মনো-

(১০) নীলকণ্ঠমতে সময় শব্দের অর্থ সংকেত, অর্জুনমিশ্রমতে আচার।

স্বর শব্দে নানা ছন্দে অলংকৃত, এই নিমিত্ত পণ্ডিতমণ্ডলীতে সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছে।

প্রথমে এই জগৎ ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত হইয়া একান্ত অলক্ষিত ছিল। অনন্তর সৃষ্টিপ্রারম্ভে সকলব্রহ্মাণ্ডবীজভুত এক অলৌকিক অণ্ড প্রসূত হইল। নিরাকার, নির্বিকার, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বাচনীয়, সর্ব্বত্রসম, সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই অণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্ব্বলোকপিতামহ (১১) দেবগুরু ব্রহ্মা তাহাতে জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তদনন্তর রুদ্র, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রাচেতস, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, ও একবিংশতি প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। যাঁহাকে সমস্ত ঋষিগণ যোগদৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেই অপ্রমেয় পুরুষ, বিশ্বদেবগণ, একাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, যমজ অশ্বিনীকুমারযুগল, যক্ষগণ, সাধ্যগণ, পিশাচগণ, গুহ্যকগণ, ও পিতৃগণ জন্মিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন অনেকানেক রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। আর জল, বায়ু, পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, দিন, রাত্রি, ও বিশ্বান্তর্গত অন্যান্য যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইল।

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ প্রলয়কালে পুনর্ব্বার স্বাধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। যেমন পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইলে ঋতুগণ স্ব স্ব অসাধারণ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যুগপ্রারম্ভে সমুদায় পদার্থ স্ব স্ব নাম, রূপ, ও স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বভূতসংহারকারী সংসারচক্র এইরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা সংক্ষেপে সৃষ্ট হইলেন (১২)। আর বৃহদ্ভানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু, সবিতা, ঋচীক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি, ও মহু,

---

(১১) স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনুষ্য ও অন্যান্য জীব জন্তু প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্ব লোকের পিতৃস্বরূপে পরিগণিত। ব্রহ্মা সেই আদিপিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা, এই নিমিত্ত তিনি সর্ব্বলোকপিতামহ।

(১২) ত্রয়স্ত্রিংশৎসহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতানি চ।
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ দেবানাং সৃষ্টিঃ সংক্ষেপলক্ষণা॥

এই মূলের যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। শতসহস্রাদি সংখ্যা পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। এই পরস্পরবিরুদ্ধ ত্রিবিধ সংখ্যার টিকাকার নীলকণ্ঠ এই সমন্বয় করিয়াছেন যে, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা। ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত অথবা ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যা তাহাদিগের পরিবারাদি সহ গণনাভিপ্রায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাহুল্য সংখ্যাও সংক্ষেপসৃষ্ট অভিপ্রায়ে উল্লিখিত। বিস্তারিত সৃষ্টি অভিপ্রায়ে পুরাণান্তরে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। অর্জ্জুনমিশ্র প্রথমতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়া পরিশেষে যথাশ্রুত গ্রন্থার্থ সামঞ্জস্য সংস্থাপনে ব্যগ্র হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ শত ও ত্রয়স্ত্রিংশৎ এই তিনের সমষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ ৩৩৩৩৩ দেবতাদিগের সংক্ষেপ সৃষ্টি।

দিবের (১৩) এই একাদশ পুত্র জন্মিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ মহের পুত্র দেবভ্রাজ্, তৎপুত্র সুভ্রাজ্। সুভ্রাজের দশজ্যোতিঃ, শতজ্যোতি, সহস্রজ্যোতিঃ নামে তিন পুত্র হইলেন। দশজ্যোতির দশ সহস্র পুত্র, শতজ্যোতির লক্ষ পুত্র, ও সহস্রজ্যোতির দশ লক্ষ পুত্র হইল। ইহাদিগের হইতেই কুরুবংশ, যদুবংশ, ভরতবংশ, যযাতিবংশ, ইক্ষাকুবংশ, ও অন্যান্য রাজর্ষি বংশের উদ্ভব হইল।

মহর্ষি বেদব্যাস যোগবলে প্রাণীদিগের অবস্থিতি স্থান (১৪), ত্রিবিধ রহস্য (১৫), বেদ, যোগশাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও তত্তৎপ্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রাবিধান (১৬), এতৎ সমুদায় অবগত ছিলেন। এই ভারত গ্রন্থে ব্যাখ্যা সহিত সমস্ত ইতিহাস ও অশেষবিধ বেদার্থ যথাক্রমে কথিত হইয়াছে। লোকে কেহ কেহ সংক্ষেপে কেহ কেহ বা বাহুল্যে জানিতে বাসনা করে, এই নিমিত্ত মহর্ষি এই জ্ঞানশাস্ত্রকে সংক্ষেপে ও বাহুল্যে কহিয়াছেন। কোনও কোনও ব্রাহ্মণেরা প্রথম মন্ত্র (১৭) অবধি, কেহ কেহ আস্তীকপর্ব্ব অবধি, কেহ কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যান অবধি, এই ভারতের আরম্ভ বিবেচনা করিয়া অধ্যয়ন করেন। মনীষিগণ অশেষ প্রকারে এই পবিত্র সংহিতার ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ গ্রন্থব্যাখ্যা বিষয়ে পটু, কেহ কেহ বা গ্রন্থার্থধারণা বিষয়ে নিপুণ।

ভগবান্ সত্যবতীনন্দন, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে সনাতন বেদশাস্ত্র বিভাগ করিয়া, তদীয় সারসঙ্কলন পূর্ব্বক মনে মনে এই পরমাদ্ভুত পবিত্র ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। রচনানন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি রূপে এই গ্রন্থ শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করাইব। ভূতভাবন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ্ভ, পরাশরতনয়ের উৎকণ্ঠার বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে ও নরলোককে চরিতার্থ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া কৃতার্থম্মন্য ও বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, এবং স্বহস্তদত্ত আসনে উপবেশন করাইয়া অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহাকে আসনপরিগ্রহের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি

---

(১৩) অর্জ্জুনমিশ্রমতে দিব্ শব্দের অর্থ স্বর্গাত্রী দেবতা অথবা অদিতি।

(১৪) গ্রাম, নগর, দুর্গ, তীর্থ, আশ্রম প্রভৃতি।

(১৫) ধর্ম্মরহস্য, অর্থরহস্য, কামরহস্য। রহস্য শব্দের অর্থ গূঢ়তত্ত্ব অর্থাৎ যাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না।

(১৬) সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বিধিদর্শক নীতিশাস্ত্র বিশেষ।

(১৭) নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

প্রীতিপ্রফুল্ল নয়নে তদীয় আসনসন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি মনে মনে এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ সমুদায়ের ব্যাখ্যা, ইতিহাস ও পুরাণের অর্থ সমর্থন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের নির্ণয়, জরা মৃত্যু ভয় ব্যাধি ভাব অভাব নিরূপণ, নানাবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নির্দ্দেশ, চাতুর্ব্বর্ণ্য মীমাংসা, পৃথিবী চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র ও চতুর্যুগের বিবরণ, নারায়ণ যে যে কারণে যে যে দিব্য ও মানব যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহার কীর্ত্তন, এবং অশেষ পবিত্র তীর্থ, নানা দেশ, নদ, নদী, বন, পর্ব্বত, সাগর, গ্রাম, নগর, দুর্গ, সেনা, ব্যূহরচনা, যুদ্ধকৌশল, বক্তৃবিশেষে কথনবৈচিত্র্য, লোকযাত্রাবিধান, এই সমস্ত ও অপরাপর যাবতীয় বিষয়ের সবিশেষ নিরূপণ করিয়াছি, কিন্তু ভূতলে তদুপযুক্ত লেখক দেখিতেছি না।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহাপ্রভাব ঋষি আছেন, কিন্তু রহস্যজ্ঞানশালিতা প্রযুক্ত তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জন্মাবধি তুমি কখনও বিতথ বাক্য উচ্চারণ কর নাই; এক্ষণে তুমি স্বরচিত গ্রন্থকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, অতএব তোমার এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া বিখ্যাত হইবেক। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেইরূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য যাবতীয় কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এক্ষণে তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তিনি তোমার কাব্যের লেখক হইবেন।

ইহা বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলে সত্যবতীতনয় গণপতিকে স্মরণ করিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ গণনায়ক স্মৃতমাত্র ব্যাসদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি যথোপযুক্ত পূজা প্রাপ্তি পূর্ব্বক আসন পরিগ্রহ করিলে বেদব্যাস নিবেদন করিলেন, হে গণেশ্বর! আমি মনে মনে ভারত নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি বলিয়া যাই, আপনি লিখিয়া যান। ইহা শুনিয়া বিঘ্নরাজ কহিলেন, হে তপোধন! লিখিতে আরম্ভ করিলে যদি আমার লেখনীকে বিশ্রাম করিতে না হয় তবে আমি লেখক হইতে পারি। ব্যাসও কহিলেন, কিন্তু আপনিও অর্থগ্রহ না করিয়া লিখিতে পারিবেন না। গণনায়ক তথাস্তু বলিয়া লেখকতা অঙ্গীকার করিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন এই নিমিত্তই কৌতুক করিয়া মধ্যে মধ্যে দুরূহ গ্রন্থগ্রন্থি রচনা করিয়াছেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিয়াছেন, এই গ্রন্থে এরূপ অষ্ট সহস্র অষ্ট শত শ্লোক আছে যে, কেবল শুক ও আমি তাহার অর্থ বুঝিতে পারি; অপরের কথা দূরে থাকুক, সঞ্জয় বুঝিতে পারেন কি না সন্দেহ। অস্ফুটার্থতা প্রযুক্ত সেই সকল ব্যাসকূটের অদ্যাপি কেহ ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। গণেশ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সেই সকল স্থলে অর্থবোধানুরোধে মন্থর হইতেন, ব্যাসদেব সেই অবকাশে বহুতর শ্লোক রচনা করিতেন।

জীবলোক অজ্ঞানতিমিরে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ অনর্থ ভ্রমণ করিতেছিল, এই মহাভারত জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা মোহাবরণ নিরাকরণ করিয়া তাহাদের নেত্রোন্মীলন করিয়াছেন। এই ভারতরূপ দিবাকর সংক্ষেপে ও বাহুল্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ বিষয় সকল প্রকাশ ও মানবগণের মোহান্ধকার নিরাস করিয়াছেন। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় দ্বারা বেদার্থরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে, এবং মনুষ্যের বুদ্ধিরূপা কুমুদ্বতী বিকাশ পাইয়াছে। এই ইতিহাসরূপ মহোজ্জ্বল প্রদীপ মোহান্ধকার নিরাকরণ পূর্ব্বক সংসাররূপ মহাগৃহ আলোকময় করিয়াছে। যেমন জলধর সকল জীবের উপজীব্য, সেইরূপ এই অক্ষয় ভারতবৃক্ষ ভবিষ্য কবিদিগের উপজীব্য হইবেক। সংগ্রহাধ্যায় এই মহাদ্রুমের বীজ, পৌলোম ও আস্তীকপর্ব্ব মূল, সম্ভবপর্ব্ব স্কন্ধ (১৮), সভা ও বনপর্ব্ব বিটঙ্ক (১৯), অরণ্য-পর্ব্ব পর্ব্ব (২০), বিরাট ও উদ্যোগপর্ব্ব সার, ভীষ্মপর্ব্ব মহাশাখা, দ্রোণপর্ব্ব পত্র, কর্ণপর্ব্ব পুষ্প, শল্যপর্ব্ব সৌরভ, স্ত্রীপর্ব্ব ও ঐষীকপর্ব্ব ছায়া, শান্তিপর্ব্ব মহাফল, অশ্বমেধপর্ব্ব অমৃতরস, আশ্রমবাসিকপর্ব্ব আধারস্থান, আর মৌসলপর্ব্ব অত্যুচ্চ শাখান্তভাগ। এই নিরুক্ত ভারতদ্রুমের পরমপবিত্র সুরস ফল পুষ্প বর্ণনা করিব।

পূর্ব্ব কালে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, স্বীয় জননী সত্যবতী ও পরমধার্ম্মিক ধীরবুদ্ধি ভীষ্মদেবের নিয়োগানুসারে, বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অগ্নিত্রয়তুল্য (২১) তেজস্বী পুত্রত্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও বিদুরকে জন্ম দিয়া তপস্যানুরোধে পুনর্ব্বার আশ্রমপ্রবেশ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইলে তিনি নরলোকে ভারত প্রচার করিলেন। পরে সর্পসত্রকালে স্বয়ং রাজা জনমেজয় ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভারতশ্রবণার্থে ঔৎসুক্য ও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে, স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত কীর্ত্তনের আদেশ প্রদান করিলেন। বৈশম্পায়ন সদস্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী হইয়া দৈনন্দিন কর্ম্মাবসানে ভারত শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস ভারতে কুরুবংশের বৃত্তান্ত, গান্ধারীর ধর্ম্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য্য, বাসুদেবের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সাধুতা, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের দুর্ব্বৃত্ততা, এই

---

(১৮) মূল অবধি শাখানির্গম স্থান পর্য্যন্ত বৃক্ষভাগ, গুঁড়ি।

(১৯) পক্ষীর উপবেশনযোগ্য স্থান।

(২০) গ্রন্থি, গাঁটি।

(২১) দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়। কোনও যজ্ঞীয় অগ্নি অথবা গার্হপত্য অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া যাহা দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করা যায়, তাহার নাম দক্ষিণাগ্নি। গৃহস্থ ব্যক্তি চির কাল অবিচ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে, তাহার নাম গার্হপত্য। গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায়, তাহার নাম আহবনীয়।

সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি ভারত সংহিতাকে চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোক-ময়ী রচনা করিয়াছিলেন। উপাখ্যানভাগ পরিত্যাগ করিলে ভারতের সংখ্যা ঐরূপ হয়। অনন্তর সংক্ষেপে সর্ব্বার্থসঙ্কলন পূর্ব্বক সার্দ্ধশত শ্লোক দ্বারা অনুক্রমণিকা রচনা করিলেন।

ব্যাসদেব ভারত রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে আপন পুত্র শুকদেবকে, তৎপরে শুশ্রূষা-পরায়ণ অন্যান্য বুদ্ধিজীবী শিষ্যদিগকে, অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর ষষ্টিলক্ষশ্লোকময়ী ভারতসংহিতা রচনা করিলেন। তন্মধ্যে দেবলোকে ত্রিংশৎ, পিতৃলোকে পঞ্চদশ, গন্ধর্ব্বলোকে চতুর্দ্দশ, আর নরলোকে এক লক্ষ শ্লোক প্রতিষ্ঠিত আছে। নারদ দেবতাদিগকে, অসিত দেবল পিতৃগণকে, শুকদেব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ও রাক্ষসদিগকে শ্রবণ করান, আর ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন নরলোকে প্রচার করেন। তিনিই পরীক্ষিৎপুত্র রাজাধিরাজ জনমেজয়কে শ্রবণ করান। ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি এক্ষণে নরলোকপ্রতিষ্ঠিত শতসহস্রশ্লোকময়ী সংহিতা কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। দুর্য্যোধন অধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীপুত্র নকুল সহদেব পুষ্প ও ফল, কৃষ্ণ বেদ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল। যুধিষ্ঠিরের চরিতকীর্ত্তনে ধর্ম্মবৃদ্ধি, ভীমসেনের চরিতকীর্ত্তনে পাপপ্রণাশ, ও অর্জ্জুনের চরিতকীর্ত্তনে শৌর্য্যবৃদ্ধি হয়, আর নকুল সহদেবের চরিতকীর্ত্তনে রোগের সম্ভাবনা থাকে না।

রাজা পাণ্ডু, বুদ্ধিবলে ও বিক্রমপ্রভাবে নানা দেশ জয় করিয়া, পরিশেষে মৃগয়ানুরাগপরবশ হইয়া ঋষিগণের সহিত অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি দৈবদুর্বিপাকবশতঃ সম্ভোগাসক্ত মৃগ বধ করিয়া ঘোরতর আপদে (২২) পতিত হইয়াছিলেন। তথাপি শাস্ত্রবিধানানুসারে ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, ও অশ্বিনীকুমারযুগলের সমাগম দ্বারা পাণ্ডবদিগের জন্মলাভ ও সদাচারাভ্যাসাদি যাবতীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। কুন্তী ও মাদ্রী পরম পবিত্র অরণ্যে ঋষিদিগের আশ্রমে তাহাদিগের লালন পালন করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে, ঋষিগণ সেই ব্রহ্মচারিবেশ, অশেষশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজকুমারদিগকে রাজধানীতে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট আনয়ন করিলেন, এবং ইঁহারা পাণ্ডুর পুত্র, তোমাদিগের পুত্র, ভ্রাতা, শিষ্য, ও সুহৃদ, এই বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহা শুনিয়া সমুদায় কৌরব ও সুশীল ধর্ম্মপরায়ণ পুরবাসিগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন।

---

(২২) অপুত্ররূপ আপদ্। মৃগয়াকালে পাণ্ডু মৃগরূপধারী ঋষির সম্ভোগসময়ে প্রাণবধ করিয়াছিলেন। ঋষি তাঁহাকে এই শাপ দেন যে, তোমারও সম্ভোগকালে মৃত্যু হইবেক, তাহাতেই পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মে।

কেহ কেহ কহিল, ইহারা তাঁহার পুত্র নহে, কেহ কেহ বলিল, তাঁহারই বটে ; কেহ কেহ কহিল, বহু কাল হইল পাণ্ডুর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার কি রূপে সন্ততি হইতে পারে। অনন্তর সর্ব্বত্র এই বাক্য শ্রুত হইতে লাগিল, অদ্য আমরা ভাগ্যক্রমে পাণ্ডুর সন্ততি দেখিলাম ; হে পাণ্ডবগণ ! তোমরা কুশলে আসিয়াছ ? তাঁহারা কহিলেন, আমরা কুশলে আসিয়াছি। অনন্তর কোলাহল নিবৃত্ত হইলে, মহাশব্দে আকাশবাণী হইল, এবং পুষ্পবৃষ্টি, সৌরভসঞ্চার, ও শঙ্খদুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। পাণ্ডুপুত্রেরা নগর প্রবেশ করিলে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উক্ত সমস্ত ব্যাপার দর্শনে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া পৌরগণ আহ্লাদে কোলাহল করিতে লাগিল।

পাণ্ডবেরা নিখিল বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরমাদরে ও অকুতোভয়ে বাস করিতে লাগিলেন। সমুদায় লোক যুধিষ্ঠিরের সদাচার, ভীমের ধৈর্য্য, অর্জ্জুনের বিক্রম, এবং নকুল সহদেবের গুরুভক্তি, ক্ষমা, ও বিনয় দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর অর্জ্জুন সমাগত রাজগণ সমক্ষে দুরূহ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া স্বয়ংবরা কন্যা আনয়ন করিলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে সকল শস্ত্রবেত্তার পূজ্য হইলেন, এবং সমরকালে প্রদীপ্ত দিবাকরের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিলেন। তিনি পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেত সমুদায় নৃপতিদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞ আহরণ করেন। যুধিষ্ঠির, বাসুদেবের পরামর্শে এবং ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে, বলগর্ব্বিত জরাসন্ধ ও শিশুপালের বধ সাধন করিয়া, অন্নদান দক্ষিণাপ্রদানাদি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন রাজসূয় মহাযজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিলেন। নানা প্রদেশ হইতে পাণ্ডবদিগের নিকট মণি, কাঞ্চন, রত্ন, গো, হস্তী, অশ্ব, বিচিত্র বস্ত্র, শিবির, কম্বল, অজিন, জবনিকা, রাঙ্কব আস্তরণ (২৩), এই সমস্ত উপঢৌকন উপস্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবদিগের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ঈর্ষ্যা ও দ্বেষ উপস্থিত হইল। তিনি ময়দানবনির্ম্মিত পরমাশ্চর্য্য সভা দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ পাইলেন। সেই সভায় তিনি ভ্রমবশে (২৪) স্খলিতগতি হওয়াতে, ভীম কৃষ্ণের সমক্ষে তাঁহাকে গ্রাম্য লোকের ন্যায় উপহাস করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন অশেষবিধ ভোগসুখ ও নানারত্ন সম্পন্ন হইয়াও মনের অসুখে দিনে দিনে বিবর্ণ ও কৃশ হইতে লাগিলেন। পুত্রবৎসল ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের মনঃপীড়ার বিষয় অবগত হইয়া দ্যূতক্রীড়ার অনুজ্ঞা দিলেন। তৎশ্রবণে কৃষ্ণ অত্যন্ত রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন, বিবাদভঞ্জনের চেষ্টা না পাইয়া বরং তদ্বিষয়ে অনুমোদন প্রদর্শন করিলেন, দ্যূত প্রভৃতি অশেষবিধ কুনীতিও সহ্য করিলেন। কারণ বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, ও কৃপাচার্য্যের অনভিমতে আরব্ধ সেই তুমুল যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলধ্বংস হওয়া তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

(২৩) রঙ্কুরোম নির্ম্মিত। রঙ্কু মৃগবিশেষ।

(২৪) জলে স্থলভ্রম, স্থলে জলভ্রম, অদ্বারে দ্বারভ্রম, দ্বারে অদ্বারভ্রম ইত্যাদি।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের জয়রূপ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ এবং দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনির প্রতিজ্ঞা (২৫) স্মরণ করিয়া বহু ক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! আমি তোমায় সমুদায় কহিতেছি, শ্রবণ কর; কিন্তু শুনিয়া আমারে অপ্রাজ্ঞ বিবেচনা করিও না। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, পরম প্রাজ্ঞ। আমি বিবাদেও সম্মত ছিলাম না, এবং কুলক্ষয়দর্শনেও প্রীত হই নাই। আমার স্বপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রে বিশেষ ছিল না। পুত্রেরা সদা ক্রোধপরায়ণ, আমারে বৃদ্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করিত; আমি অন্ধ, লঘুচিত্ততা প্রযুক্ত পুত্রস্নেহে সকলেই সহ্য করিতাম; অচেতন দুর্য্যোধন মোহাভিভূত হইলে আমিও মোহাভিভূত হইতাম। সে রাজসূয় যজ্ঞে মহানুভাব যুধিষ্ঠিরের সমৃদ্ধি দেখিয়া, এবং সভাপ্রবেশকালে সেই রূপে উপহসিত হইয়া, অবমানিত বোধে ক্রোধে অন্ধ হইল; এবং ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও, যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে জয় করিতে অশক্ত ও রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিবার বিষয়ে হতোৎসাহ হইয়া, গান্ধাররাজের সহিত পরামর্শ করিয়া কপট দ্যূতক্রীড়ায় মন্ত্রণা করিল। এই সকল বিষয়ে আমি আদ্যোপান্ত যাহা অবগত আছি, কহিতেছি শুন। তুমি আমার বুদ্ধিযুক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া আমারে প্রজ্ঞাবান্ বলিয়া জানিতে পারিবে।

যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া, সমবেত রাজগণ সমক্ষে দ্রৌপদীরে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রারে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণ বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দেবরাজ ভূরি পরিমাণে বারিবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন দিব্য শরজাল দ্বারা সেই বারিবর্ষণ নিবারণ করিয়া খাণ্ডবদাহে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পঞ্চ পাণ্ডব কুন্তীসহিত জতুগৃহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর তাহাদের ইষ্টসাধনে যত্নবান্ হইয়াছে তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রঙ্গক্ষেত্রে লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিয়াছে, এবং মহাপরাক্রান্ত পাঞ্চাল পাণ্ডব উভয় কুল একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন বাহুবলে অতি তেজস্বী মগধেশ্বর জরাসন্ধের প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডুতনয়েরা দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া পরাক্রমপ্রভাবে সমস্ত ভূপতিদিগকে বশীভূত করিয়া রাজসূয় মহাযজ্ঞ

(২৫) জয়ই হউক অথবা মৃত্যুই হউক, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধপ্রদান করিব না।

সম্পন্ন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্রুমুখী, অতিদুঃখিতা, একবস্ত্রা, রজস্বলা, সনাথা দ্রৌপদীকে অনাথার ন্যায় সভায় লইয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধূর্ত্ত মন্দবুদ্ধি দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিয়াছে, অথচ বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শকুনি পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিয়াছে, অথচ তাহার অপ্রমেয়প্রভাবশালী সহোদরেরা অনুগত আছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন জ্যেষ্ঠভক্তিপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত অশেষ ক্লেশসহিষ্ণু ধর্ম্মশীল পাণ্ডবদিগের বনপ্রস্থানকালে নানা চেষ্টা শ্রবণ করিলাম, তখন আব আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহস্র সহস্র ভিক্ষাজীবী মহানুভাব স্নাতক ব্রাহ্মণ (২৬) বনবাসী যুধিষ্ঠিরের অনুগত হইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন দেবাদিদেব কিরাতরূপী মহাদেবকে যুদ্ধে প্রসন্ন করিয়া পাশুপত মহাস্ত্র লাভ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সত্যসন্ধ ধনঞ্জয় স্বর্গে গিয়া দেবরাজের নিকট যথাবিধানে অস্ত্রশিক্ষা করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম অর্জ্জুন বরদানগর্ব্বিত দেবতাদিগের অজেয় পুলোমপুত্র কালকেয়দিগেকে (২৭) পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুঘাতী অর্জ্জুন অসুরবধার্থে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন যখন শুনিলান, ভীম ও অন্যান্য পাণ্ডবেরা সেই মানুষের অগম্য দেশে কুবেরের সহিত সমাগত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণমতানুযায়ী ঘোষযাত্রাপ্রস্থিত মৎপুত্রদিগকে গন্ধর্ব্বেরা বদ্ধ করিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্ম যক্ষরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমার পুত্রেরা, বিরাটরাজ্যে দ্রৌপদীসহিত অজ্ঞাতবাসকালে, পাণ্ডদিগের অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, উত্তর গোগ্রহে অর্জ্জুন একাকী অস্মৎপক্ষীয় অতি প্রধান বীরদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম বিরাট আপন কন্যা

(২৬) ব্রহ্মচার্য্য সমাধান পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট।

(২৭) অতিদুর্দ্দান্ত মহাপরাক্রান্ত ষষ্টি সহস্র অসুর।

উত্তরাকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া অর্জ্জুনকে সম্প্রদান করিয়াছেন, এবং অর্জ্জুন আপন পুত্রের নিমিত্ত প্রতিগ্রহ করিয়ছে, তখন আর তখন আর আমি জয়ের আশ করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির নির্জ্জিত, নিধন, নির্ব্বাসিত, ও স্বজনবিযোজিত হইয়াও সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যিনি এই পৃথিবীকে এক পদক্ষেপে অধিকৃত করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়াছেন, তখন আর তিনি জয়ের আশা করি নাই। যখন নারদমুখে শুনিলাম, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন নরনারায়ণাবতার, তিনি ব্রহ্মলোকে তাঁহাদের দর্শন করেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণ লোকহিতার্থে কুরুদিগের বিরোধ ভঞ্জন করিতে আসিয়া অকৃতকার্য্য প্রতিগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ ও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিগ্রহ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিশ্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে হতদৃষ্টি করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কৃষ্ণের প্রস্থানকালে কুন্তী নিতান্ত কাতর হইয়া একাকিনী রথের অগ্রে দণ্ডায়মানা, তিনি তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব ও ভীষ্ম উভয়ে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রী হইয়াছেন, এবং দ্রোণাচার্য্য তাহাদের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, তুমি যুদ্ধ করিলে আমি যুদ্ধ করিব না, কর্ণ ভীষ্মকে এই কথা কহিয়া সেনা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাসুদেব, অর্জ্জুন, অপ্রমেয় গাণ্ডীব ধনু, এই তিন মহাবীর্য্য একত্র হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন রথোপরি মোহাভিভূত ও বিষণ্ণ হইলে, কৃষ্ণ তাহাকে স্বশরীরে চতুর্দ্দশ ভুবন দর্শন করাইয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, শত্রুমর্দ্দন ভীষ্ম, সংগ্রামে প্রতিদিন অযুতঘাতী হইয়াও, পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধান এক ব্যক্তিকেও বিনষ্ট করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের নিকট আপন বধোপায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহারাও হৃষ্ট চিত্তে সেই উপায় সাধন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া অতি দুর্দ্ধর্ষ মহাপরাক্রান্ত ভীষ্মকে হতবীর্য্য করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম কেবল মৎপক্ষীয়দিগকেই অল্পাবশিষ্ট করিয়া শরজালে ক্ষতকলেবর হইয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীষ্ম শরশয্যাশয়ান

হইয়া পানীয় আহরণার্থে আদেশ করিলে, অর্জ্জুন ভূভেদ করিয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বায়ু, ইন্দ্র, ও সূর্য্য পাণ্ডবদিগের অনুকূল হইয়াছেন, এবং হিংস্র জন্তুগণ নিরন্তর আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অদ্ভুত যোদ্ধা দ্রোণাচার্য্য সমরে নানাবিধ অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিয়াও পাণ্ডবপক্ষীয় প্রধানদিগকে নষ্ট করিতে পারিতেছেন না, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, আমরা অর্জ্জুনবধার্থে যে মহারথ (২৮) সংসপ্তকগণ নিযুক্ত করিয়াছিলাম, অর্জ্জুন তাহাদিগের বিনাশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, মহাবীর অভিমন্যু দ্রোণাচার্য্যরক্ষিত অন্যের অভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে একাকী প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয় মহারথেরা অর্জ্জুনবধে অসমর্থ হইয়া সকলে মিলিয়া শিশুপ্রায় অভিমন্যুকে বধ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অস্মৎপক্ষীয়েরা অভিমন্যুকে বধ করিয়া হর্ষে মহাকোলাহল করিতেছে, কিন্তু অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া জয়দ্রথবধ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন জয়দ্রথবধার্থে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, শত্রুমণ্ডলীমধ্যে সেই প্রতীজ্ঞা পরিপূর্ণ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুনের অশ্ব সকল একান্ত ক্লান্ত হইলে, বাসুদেব বন্ধনমোচন ও জলোপসেবন পূর্ব্বক তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনিয়া পুনর্ব্বার যোজিত করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, বাহনগণ অক্ষম হইলে, অর্জ্জুন রথোপরি অবস্থিত হইয়া সমুদায় যোদ্ধাদিগকে পরাভূত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সাত্যকি অতি দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধাসক্ত দ্রোণসৈন্য পরাভূত করিয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ কোদণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক ভীমকে ধরিয়া আনিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিল, কিন্তু সে কর্ণহস্তে পতিত হইয়াও মৃত্যুগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ, কৃতবর্ম্মা, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, ও শল্য প্রতিবিধানে অসমর্থ হইয়া জয়দ্রথবধ সহ্য করিয়াছে, তখন আর আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, কর্ণ অর্জ্জুনবধার্থ স্থাপিত দিব্য শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণ মরণার্থে কৃতনিশ্চয় ও

---

(২৮) যে ব্যক্তি অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ও একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, তাহাকে মহারথ বলে।

নিশ্চেষ্ট হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মমার্গ অতিক্রম করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, নকুল উভয়-পক্ষীয় সৈন্য সমক্ষে সমকক্ষ হইয়া অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দ্রোণবধানন্তর অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও পাণ্ডবদিগের প্রাণবধ করিতে পারেন নাই, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীমসেন যুদ্ধে দুঃশাসনের শোণিত পান করিয়াছে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে নাই, তখন আর আমি জয়েব আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন অতি দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রান্ত কর্ণের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যুধিষ্ঠির পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, দুঃশাসন, ও কৃতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, যে শল্য সংগ্রামে কৃষ্ণকে পরাজিত করিব বলিয়া স্পর্দ্ধা করিত, যুধিষ্ঠির সেই পরাক্রান্ত পুরুষের প্রাণসংহার করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, সহদেব বিবাদ ও দ্যূতক্রীড়ার মূল মায়াবী পাপিষ্ঠ শকুনির প্রাণবধ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন হতসৈন্য ও নিঃসহায় হইয়া জলস্তম্ভ করিয়া একাকী হ্রদপ্রবেশ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, পাণ্ডবেরা বাসুদেব সমভিব্যাহারে সেই হ্রদের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অসহন দুর্য্যোধনের তিরস্কার করিতেছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে অশেষ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিভ্রমণ করিতেছিল, ভীম কৃষ্ণের পরামর্শে কপট প্রহার দ্বারা তাহার উরুভঙ্গ করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম অশ্বত্থামা প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া দ্রৌপদীর নিদ্রিত পুত্রপঞ্চকের বধরূপ অতি ঘৃণিত কলঙ্ককর কর্ম্ম করিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, ভীম প্রতিফল প্রদানার্থে অশ্বত্থামার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া মহাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সুভদ্রার গর্ভ বিনাশ করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন স্বস্তি বলিয়া স্বীয় অস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মশিরঃ (২৯) অস্ত্র নিবারণ করিয়াছে, এবং অশ্বত্থামা মণিরত্ন প্রদান করিয়াছেন (৩০), তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম, অশ্বত্থামা মহাস্ত্র দ্বারা উত্তরার গর্ভ নাশ করিলে, দ্বৈপায়ন ও বাসুদেব উভয়ে অশ্বত্থামাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন,

---

(২৯) ব্রহ্মতেজোময় মহাপ্রভাব অস্ত্রবিশেষ। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনবধার্থে ঐ অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

(৩০) ভীমকে অক্রোধ ও প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত।

তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। গান্ধারীর পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, পিতৃ, ভ্রাতৃ প্রভৃতি সমুদায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অতি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত। পাণ্ডবেরা অতি দুষ্কর কার্য্য করিয়াছে ও পুনর্ব্বার অকণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কি কষ্ট! শুনিলাম, আমাদের তিন জন ও পাণ্ডবদিগের সাত জন, সমুদায়ে দশ জন মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। সঞ্জয়! আমি চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি, মোহে অভিভূত হইতেছি, আমার চেতনা লোপ হইতেছে, মন বিহ্বল হইতেছে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে আশ্বাসিত ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে কহিলেন, সঞ্জয়! যখন আমার ভাগ্যে এরূপ ঘটিল, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, আর আমি জীবনধারণের কিছুমাত্র ফল দেখিতেছি না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ কহিয়া বিলাপ, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ, ও পুনঃ পুনঃ মোহাবেশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন ধীমান্ সঞ্জয় প্রবোধদানার্থে কহিলেন, মহারাজ! দ্বৈপায়ন ও নারদ মুখে শ্রবণ করিয়াছ, শৈব্য, সঞ্জয়, সুহোত্র, রন্তিদেব, কাক্ষীবান্, ঔশিজ, বাহ্লীক, দমন, শর্য্যাতি, অজিত, নল, বিশ্বামিত্র, অম্বরীষ, মরুত্ত, মনু, ইক্ষাকু, গয়, ভরত, দাশরথি রাম, শশবিন্দু, ভগীরথ, কৃতবীর্য্য, জনমেজয়, শুভকর্ম্মা বহুযজ্ঞানুষ্ঠাতা যযাতি, এই সকল মহোৎসাহ মহাবল দিব্যাস্ত্রবেত্তা শক্রতুল্যতেজস্বী রাজারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন প্রধান প্রধান রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ধর্ম্মতঃ পৃথিবী জয়, নানা যজ্ঞানুষ্ঠান, ও যশোলাভ করিয়া পরিশেষে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্ব কালে চৈত্যরাজ পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে, দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে এই চতুর্বিংশতি রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন পুরু, কুরু, যদু, বিশ্বগশ্ব, অনূহ, যুবনাশ্ব, ককুৎস্থ, রঘু, বিজয়, বীতিহোত্র, অঙ্গ, ভব, শ্বেত, বৃহদ্গুরু, উশীনর, শতরথ, কঙ্ক, দুলিদুহ, দ্রুম, পর, বেণ, সগর, সঙ্কৃতি, নিমি, অজেয়, পরশু, পুণ্ড্র, শম্ভু, দেবাবৃধ, দেবাহ্বয়, সুপ্রতিম, সুপ্রতীক, বৃহদ্রথ, সুক্রতু, নল, সত্যব্রত, শান্তভয়, সুমিত্র, সুবল, জানুজঙ্ঘ, অনরণ্য, অর্ক, বলবন্ধু, নিরামর্দ্দ, কেতুশৃঙ্গ, বৃহদ্বল, ধৃষ্টকেতু, বৃহৎকেতু, দীপ্তকেতু, অবিক্ষিৎ, চপল, ধূর্ত্ত, কৃতবন্ধু, দৃঢ়েষুধি, মহাপুরাণসম্ভাব্য, প্রত্যঙ্গ, পরহা, শ্রুতি, এই সমস্ত ও অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র ও পদ্মসংখ্য নরপতিগণ প্রসিদ্ধ আছেন; ইঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিশালী ছিলেন, এবং অশেষ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরিশেষে তোমার পুত্রগণের ন্যায় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন; বিদ্যাবান্ সৎকবিগণ পুরাণে তাঁহাদিগের অলৌকিক কর্ম্ম, বিক্রম, দান, মাহাত্ম্য, আস্তিক্য, সত্য, শৌচ, দয়া, আর্জব, কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারসমৃদ্ধিসম্পন্ন ও নানাগুণে অলঙ্কৃত হইয়াও

নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন; তোমার পুত্রেরা দুরাত্মা, ক্রোধান্ধ, লব্ধ, অতি দুর্বৃত্ত ছিল, তাহাদিগের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, মেধাবী, বুদ্ধিমান্, ও পরম প্রাজ্ঞ। যাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি শাস্ত্রানুগামিনী হয়, তাঁহারা মোহাভিভূত হয়েন না। দৈব নিগ্রহ ও দৈব অনুগ্রহ তোমার অবিদিত নহে। অতএব, পুত্রগণের নিমিত্ত তোমার এতাবতী মমতা উচিত হয় না। যাহা ভবিতব্য ছিল ঘটিয়াছে, তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। কোন্ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে দৈবকার্য্য অন্যথা করিতে পারে? বিধাতার নিয়ম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? ভাব, অভাব, সুখ, অসুখ, সমুদায় কালমূলক। কাল সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করেন, কাল সর্ব্ব জীবের সংহার করেন, কাল সর্ব্ব জীবের দাহ করেন, কাল সর্ব্ব জীবের শান্তি করেন। ইহ লোকে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা হয়, সে সমুদায় কালকৃত। কাল সর্ব্বজীবসংহারকারী, কালই পুনর্ব্বার সর্ব্ব জীব সৃষ্টি করেন। সর্ব্ব জগৎ সুপ্ত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন। অতএব কাল দুরতিক্রম। কাল অপ্রতিহত প্রভাবে সমভাবে সর্ব্বভূত শাসন করেন। অতীত, অনাগত, সাম্প্রতিক, সমুদায় পদার্থ কালকৃত বোধ করিয়া তোমার ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত। সঞ্জয় পুত্র-শোকার্ত্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ প্রবোধ দিয়া সুস্থচিত্ত করিলেন। পরমকারুণিক ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন লোকহিতার্থে এই বিষয়ে পবিত্র উপনিষৎ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং বিদ্বান্ সৎকবিগণ পুরাণে সেই উপনিষৎ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

ভারত অধ্যয়নে পুণ্য জন্মে। অধিক কি কহিব, শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্লোকের এক চরণ মাত্র পাঠ করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয়। এই গ্রন্থে দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ, উরগ প্রভৃতির ও সনাতন ভগবান্ বাসুদেবের কীর্ত্তন আছে। তিনি সত্য, পবিত্র মঙ্গলপ্রদ, পরিচ্ছেদাতীত, কালত্রয়ে অবিকৃত, জ্যোতির্ম্ময় ও সনাতন; পণ্ডিতেরা তাঁহার অলৌকিক কর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তিনি এই কার্য্য কারণ রূপ বিশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি ব্রহ্মাদি দেবতার ও যজ্ঞাদি কার্য্যের সৃষ্টি করেন, তিনি জন্ম মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কারণ, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহের অধিষ্ঠাতা জীব ও নির্বিশেষ পরব্রহ্ম স্বরূপ। যতিগণ সমাহিত হইয়া ধ্যান ও যোগবলে দর্পণতলগত প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন।

ধর্ম্মপরায়ণ নর শ্রদ্ধা ও নিয়ম পূর্ব্বক এই অধ্যায় পাঠ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। আস্তিক ব্যক্তি ভারতের এই অনুক্রমণিকাধ্যায় প্রথমাবধি সর্ব্বদা শ্রবণ করিলে বিপদে পতিত হয় না। দুই সন্ধ্যা অনুক্রমণিকার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিলে, তৎক্ষণাৎ অহোরাত্র সঞ্চিত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই অধ্যায় ভারতের শরীর স্বরূপ, ইহাতে সত্য ও অমৃত উভয় আছে। যেমন গব্যের মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ,

বেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু, সেইরূপ মহাভারত সমস্ত ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণদিগকে অন্ততঃ ভারতীয় শ্লোকের এক চরণ শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃলোকের অক্ষয় তৃপ্তি হয়। ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ সমর্থন করিবেক। বেদ অল্পজ্ঞের নিকট এই ভয় করেন যে, এ আমাকে প্রহার করিবেক। বিদ্বান্ ব্যক্তি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত এই বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থলাভ করেন, এবং নিঃসন্দেহ ভ্রূণহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হন। যে ব্যক্তি শুচি ও সংযত হইয়া পর্ব্বে পর্ব্বে এই পরমপবিত্র অধ্যায় পাঠ করে, আমার মতে, তাহার সমুদায় ভারত অধ্যয়ন করা হয়। যে নর প্রতিদিন শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র শ্রবণ করে, তাহার দীর্ঘ আয়ুঃ, কীর্ত্তি, ও স্বর্গ লাভ হয়।

পূর্ব্ব কালে সমুদায় দেবতা একত্র হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারি বেদ ও অপর দিকে এই ভারত স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা ভারে অধিক হয়, এজন্য তদবধি ইহ লোকে ভারত মহাভারত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পরিমাণকালে ইহার মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব উভয়ই অধিক হইল, সেই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত। যে ব্যক্তি মহাভারত শব্দের ব্যুৎপত্তি জানে, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

তপস্যা পাপজনক নহে, বেদাধ্যয়ন পাপজনক নহে, বর্ণাশ্রমাদিনিয়মিত বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান পাপজনক নহে, অশেষ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা পাপজনক নহে; এই সমস্ত অসদভিপ্রায়দূষিত হইলেই পাপজনক হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়—পর্ব্বসংগ্রহ

ঋষিগণ কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যে সমন্তপঞ্চক তীর্থের উল্লেখ করিয়াছ, আমরা তাহার স্বরূপ ও সবিশেষ বিবরণ জানিতে বাঞ্ছা করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে সাধু ব্রাহ্মণগণ! আমি সমন্তপঞ্চকবৃত্তান্ত ও অন্যান্য নানা শুভ কথা কীর্ত্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। সকলশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধ-ক্রোধে অধীর হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন। সেই অনলতুল্য তেজস্বী ঋষি নিজ বীর্য্যে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ রুধিরহ্রদ করেন। আমরা শুনিয়াছি, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইয়া সেই সেই রুধিরহ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! আমরা তোমার এইরূপ পিতৃভক্তি ও বিক্রমাতিশয় দর্শনে সাতিশয়

প্রসন্ন হইয়াছি, ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে পিতৃগণ! যদি আপনারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও আমাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর দেন যে, আমি রোষবশে ক্ষত্রিয়কুল সংহার করিয়া যে পাপ গ্রস্ত হইয়াছি, যেন তাহা হইতে মুক্ত হই, এবং যেন এই সকল হ্রদ তীর্থরূপে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ও পরিগণিত হয়। পিতৃগণ যথাপ্রার্থিত বর প্রদান পূর্ব্বক ক্ষমস্ব বলিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞাত ক্ষত্রিয়কুলসংহারক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন।

সেই পঞ্চ রুধিরহ্রদের অদূরে যে পরম পবিত্র দেশ আছে, তাহাকে সমন্তপঞ্চক কহে। পণ্ডিতেরা কহেন, যে দেশ যে চিহ্নে চিহ্নিত, তদ্দ্বারাই সে দেশের নাম নির্দ্দেশ হওয়া উচিত। কলি ও দ্বাপরের অন্তরে সমন্তপঞ্চকে কুরু পাণ্ডব সৈন্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধবাসনায় সেই ভূদোষ (৩১) বৰ্জ্জিত ক্ষেত্রে সমাগত ও নিধন প্রাপ্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ! সেই দেশের নামের এই ব্যুৎপত্তি। সে দেশ পবিত্র ও রমণীয়। হে ব্রতপরায়ণ মহর্ষিগণ! উক্ত দেশে ত্রিলোকে যে রূপে বিখ্যাত, তৎসমুদায় নিবেদন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, যে সূতনন্দন! তুমি যে অক্ষৌহিণী শব্দ প্রয়োগ করিলে আমরা তাহার যথার্থ অর্থ শ্রবণের বাসনা করি। তোমার অবিদিত কিছুই নাই, অতএব কত পদাতি, কত অশ্ব, কত রথ, ও কত গজে এক অক্ষৌহিণী হয়, তাহার সবিশেষ বর্ণনা কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক রথ, এক গজ পাঁচ পদাতি, তিন অশ্ব, ইহাতে এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী এক বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনাতে এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, আর দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সমুদায়ে এক অক্ষৌহিণীতে ২১৮৭০ এক বিংশতি সহস্র অষ্টশত সপ্ততি সংখ্যক রথ, তাবৎ সংখ্যক গজ, ১০৯৩৫০ এক লক্ষ নয় সহস্র তিন শত পঞ্চাশ পদাতি, আর ৬৫৬১০ পঞ্চষষ্টি সহস্র ছয় শত দশ অশ্ব থাকে। আমি আপনাদিগকে যে অক্ষৌহিণীর কথা কহিয়াছিলাম, সংখ্যাতত্ত্ববেত্তারা তাহার এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সংগ্রামে এইরূপ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সমন্তপঞ্চকে একত্র হইয়াছিল, এবং কৌরবদিগকে উপলক্ষমাত্র করিয়া অদ্ভুতশক্তি কাল প্রভাবে সেই স্থানেই নিধন প্রাপ্ত হয়; পরমাস্ত্রবেত্তা ভীষ্মদেব দশ দিবস যুদ্ধ করেন; তৎপরে দ্রোণাচার্য্য পাঁচ দিন কুরুসৈন্য রক্ষা করেন; শত্রুঘাতী কর্ণ দুই দিন যুদ্ধ করেন; শল্য অৰ্দ্ধ দিবস মাত্র; তৎপরেই ভীম ও দুর্য্যোধনের অৰ্দ্ধদিনব্যাপী গদাযুদ্ধ; সেই দিবসের নিশাগমে অশ্বথামা

(৩১) হিংসা স্তেয় মিথ্যা প্রতারণা প্রভৃতি।

কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তিন জনে পরামর্শ করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নিদ্রাগত সমস্ত যুধিষ্ঠিরসৈন্য সংহার করেন।

হে শৌনক! আমি আপনার যজ্ঞে যে ভারত কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি, ব্যাসশিষ্য ধীমান বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের যজ্ঞে তাহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ইতিহাসের আদিভাগে মহানুভাব নরপতিগণের যশঃ ও বীর্য্যের সবিস্তর বর্ণনা নিমিত্ত পৌষ্য, পৌলোম, ও আস্তীক এই তিন পর্ব আছে। এই গ্রন্থ বিচিত্র অর্থ, পদ, আখ্যান ও বহুবিধ আচার নিয়মে পরিপূর্ণ। যেমন মোক্ষার্থীরা একমাত্র উপায় বোধে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ নরেরা একমাত্র শ্রেয়ঃসাধন বোধ করিয়া এই পরম পবিত্র ইতিহাস গ্রন্থের উপাসনা করেন। যেমন সমুদায় জ্ঞাতব্য পদার্থ মধ্যে আত্মা এবং সমস্ত প্রিয়-বস্তুমধ্যে জীবন শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ এই পরম পবিত্র ইতিহাস সর্বশাস্ত্রমধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীব ধারণের আব উপায় নাই, সেইরূপ এই ইতিহাসগ্রন্থোক্ত কথা ব্যতিরেকে ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুব সেবা করে, সেইরূপ কবিগণ জ্ঞান-লাভবাসনায় এই মহাভারতের সেবা করিয়া থাকেন। যেমন সমুদায় লৌকিক ও বৈদিক বাক্য স্বর ও ব্যঞ্জনে অর্পিত, সেইরূপ এই উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থে শ্রেয়ঃসাধনী বুদ্ধি অর্পিত আছে।

এক্ষণে আপনারা সেই অশেষ প্রজ্ঞার আকর, স্বচারু রূপে রচিত, অতর্কণীয় বিষয়ের মীমাংসাযুক্ত, বেদার্থভূষিত, ভারতাখ্য ইতিহাসের পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করুন। সর্ব্বপ্রথম অনুক্রমণিকা পর্ব্ব, দ্বিতীয় পর্বসংগ্রহপর্ব, তৎপরে পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, ও আদিবংশাবতারণ পর্ব্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত সম্ভব পর্ব্ব, তৎশ্রবণে শরীরে রোমাঞ্চ হয়, তৎপরে জতুগৃহদাহ, তৎপরে হিড়িম্ববধ, তৎপরে বকবধ, তৎপরে চৈত্ররথ, তৎপরে দ্রৌপদীস্বয়ংবর, তৎপরে বৈবাহিক পর্ব্ব, তৎপরে বিদুরাগমন ও রাজ্যলাভ পর্ব্ব, তৎপরে অর্জ্জুনবনবাস, তৎপরে সুভদ্রাহরণ, সুভদ্রাহরণের পর যৌতুকাহরণ পর্ব্ব তৎপরে খাণ্ডবদাহ ও ময়দানবদর্শন পর্ব্ব, তৎপরে সভাপর্ব্ব, তৎপরে মন্ত্রণাপর্ব্ব, তৎপরে জরাসন্ধবধ, তৎপরে দিগ্বিজয়পর্ব, দিগ্বিজয়ের পর রাজসূয় পর্ব্ব, তৎপরে অর্ঘাভিহরণ, তৎপরে শিশুপালবধ, তৎপরে দ্যূতপর্ব্ব, তৎপরে অনুদ্রুত পর্ব্ব, তৎপরে অরণ্যপর্ব্ব, তৎপরে কির্ম্মীরবধপর্ব, তৎপরে অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব, তৎপরে কিরাত পর্ব্ব, এই পর্বে মহাদেবের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ বর্ণিত আছে; তৎপরে ধীমান যুধিষ্ঠিরের তীর্থযাত্রাপর্ব্ব, তৎপরে জটাসুরবধ পর্ব্ব, তৎপরে যক্ষযুদ্ধ, তৎপরে ইন্দ্রলোকাভিগমন, তৎপরে নলোপাখ্যান পর্ব্ব, তৎশ্রবণে ধর্ম্মলাভ ও করুণরসের উদয় হয়; তৎপরে পতিব্রতামহাত্ম্য, তৎপরে পরমাদ্ভুত

সাবিত্রীমহাত্ম্য, তৎপরে নিবাতকবচ যুদ্ধ, তৎপরে অজগরপর্ব্ব, তৎপরে মার্কণ্ডেয় সমস্যা, তৎপরে দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ, তৎপরে ঘোষযাত্রা, তৎপরে মৃগস্বপ্ন, তৎপরে ব্রীহিদ্রৌণিক, তৎপরে ইন্দ্রদ্যুম্ন পর্ব্ব, তৎপরে জয়দ্রথ কর্তৃক বন হইতে দ্রৌপদীহরণ, তৎপরে রামোপাখ্যান, তৎপরে কুণ্ডলাহরণ, তৎপরে অরণীহরণ পর্ব্ব, তৎপরে বিরাট পর্ব্ব, তৎপরে পাণ্ডবপ্রবেশ, তৎপরে সময়পালন, তৎপরে কীচকবধ, তৎপরে গোগ্রহণ, তৎপরে অভিমন্যু ও উত্তরার বিবাহ পর্ব্ব, তৎপরে পরমাদ্ভুত উদ্যোগ পর্ব্ব, তৎপরে সঞ্জয়যাত্রা, তৎপরে চিন্তাপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্রের জাগরণ, তৎপরে পরমগুহ্য সনৎস্নজাত পর্ব্ব, ইহাতে আত্মজ্ঞানের কথা আছে; তৎপরে যানসন্ধি, তৎপরে ভগবদ্‌যাত্রা, তৎপরে মাতলীয়োপাখ্যান, তৎপরে গালচরিত, তৎপরে সাবিত্রী উপাখ্যান, বাম দেবোপাখ্যান, বৈণ্যোপাখ্যান, জামদগ্ন্যোপাখ্যান, তৎপরে ষোড়শরাজিক পর্ব্ব, তৎপরে কৃষ্ণের সভাপ্রবেশ, তৎপরে বিদুলাপুত্র শাসন, তৎপরে কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যান ও বিদুলাপুত্র দর্শন, তৎপরে সৈন্যোদ্যোগ ও শ্বেতোপাখ্যান, তৎপরে মহাত্মা কর্ণের বিবাদ, তৎপরে মন্ত্র নিশ্চয় পূর্ব্বক কার্য্যচিন্তন, তৎপরে সেনাপতিনিয়োগাখ্যান, তৎপরে শ্বেত বাসুদেব সংবাদ, তৎপরে কুরু পাণ্ডব সৈন্যনির্যাণ, তৎপরে সৈন্যসংখ্যা, তৎপরে অমর্ষবর্দ্ধক উলূক নামক দূতের আগমন, তৎপরে, অম্বোপাখ্যান তৎপরে অদ্ভুত ভীষ্মাভিষেক পর্ব্ব, তৎপরে জম্বুদ্বীপ সন্নিবেশ পর্ব্ব, তৎপরে ভূমিপর্ব্ব, তৎপরে দ্বীপবিস্তার কথন পর্ব্ব তৎপরে ভগবদ্গীতাপর্ব্ব, তৎপরে ভীষ্মবধপর্ব্ব, তৎপরে দ্রোণাভিষেক, তৎপরে সংশপ্তক সৈন্যবধ, তৎপরে অভিমন্যুবধ পর্ব্ব, তৎপরে প্রতিজ্ঞাপর্ব্ব, তৎপরে জয়দ্রথবধ, তৎপরে ঘটোৎকচবধ, তৎপরে পরমাদ্ভুত দ্রোণবধ, তৎপরে নারায়ণাস্ত্রত্যাগ পর্ব্ব, তৎপরে কর্ণপর্ব্ব, তৎপরে শল্যপর্ব্ব, তৎপরে হ্রদপ্রবেশ, তৎপরে গদাযুদ্ধপর্ব্ব, তৎপরে অতিবীভৎস সৌপ্তিক পর্ব্ব, তৎপরে অতি নিদারুণ ঐষীকপর্ব্ব, তৎপরে জলপ্রদানিক পর্ব্ব, তৎপরে স্ত্রীবিলাপপর্ব্ব, তৎপরে কুরুবংশীয়দিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াপর্ব্ব, তৎপরে ব্রাহ্মণবেশধারী চাবাক রাক্ষসের নিগ্রহপর্ব্ব, তৎপরে শান্তিপর্ব্ব এই পর্ব্বে রাজধর্ম্মানুশাসন ও আপদ্ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে; তৎপরে মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্ব, তৎপরে শুকপ্রশ্নাভিগমন, ব্রহ্মপ্রশ্নানুশাসন, দুর্ব্বাসার প্রাদুর্ভাব ও মায়াসংবাদপর্ব, তৎপরে আনুশাসনিক পর্ব্ব, তৎপরে ধীমান্ ভীষ্মের স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, তৎপরে সর্ব্বাপাপক্ষয়কারী অশ্বমেধপর্ব্ব, তৎপরে অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রতিপাদক অনুগীতাপর্ব্ব, তৎপরে আশ্রমবাসপর্ব্ব, অৎপরে পুত্রদর্শনপর্ব্ব, তৎপরে নারদাগমনপর্ব্ব, তৎপরে অতি দারুন মৌষল পর্ব্ব, তৎপরে মহাপ্রস্থান, তৎপরে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব, তৎপরে খিলনামক হরিবংশপর্ব্ব, ইহাতে বিষ্ণুপর্ব্ব, শিশুচর্য্যা, কংসবধ, ও পরমাদ্ভুত

ভবিষ্যপর্ব্ব উক্ত হইয়াছে। মহাত্মা ব্যাসদেব এই শত পর্ব্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পরে লোমহর্ষনপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে যথাক্রমে অষ্টাদশ পর্ব্ব কীর্ত্তন করেন; ভারতসংক্ষেপরূপ পর্বসংগ্রহ উক্ত হইল।

পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, আদিবংশাবতরণ, সম্ভব, জতুগৃহ হিড়িম্ববধ, বকবধ, চৈত্ররথ, দ্রৌপদীস্বয়ংবর, বৈবাহিক, বিদুরাগমন, রাজ্যলাভ, অর্জ্জুনবনবাস, সুভদ্রাহরণ, যৌতুকানয়ন, খাণ্ডবদাহ, ময়দর্শন, এই সমস্ত আদিপর্ব্বের অন্তর্গত। পৌষ্যপর্ব্বে উতঙ্কের মহাত্ম্য ও পৌলোমে ভৃগুবংশেব বিস্তার বর্ণিত আছে। আস্তীকপর্ব্বে সমুদায় সর্পকুল ও গরুড়ের উৎপত্তি, ক্ষীরসমুদ্রথন, উচ্চৈঃশ্রবার জন্ম, রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠানপ্রতিজ্ঞা ও ভরতবংশীয় মহাত্মাদিগের কীর্ত্তন আছে। সম্ভবপর্ব্বে অশেষ রাজকুল, অন্যান্য বীরপুরুষ, ও মহর্ষি দ্বৈপায়নের উৎপত্তি, দেবতাগণের অংশাবতার, সর্প, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী, ও অন্য অন্য নানা জীবের উদ্ভব, যে ভরতের নামানুসারে লোকে ভারতকুল প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তপঃপরায়ণ কন্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে তাঁহার জন্মগ্রহণ, শান্তনুগৃহে গঙ্গাগর্ভে মহাত্মা বসুদিগের পুনর্জ্জন্ম ও তাঁহাদিগের স্বর্গারোহণ, তদীয় তেজোভাগসমষ্টি, ভীষ্মের জন্ম, তাঁহার রাজ্য-পরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন, প্রতিজ্ঞাপালন, স্বীয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের রক্ষা, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের রক্ষা ও তাঁহাকে রাজ্যপ্রতিপাদন, অণীমাণ্ডব্যশাপে ধর্ম্মের নরলোকে উৎপত্তি ও বরদানবলে দ্বৈপায়নের ঔরসে জন্ম ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি, দুর্যোধনের বারণাবতযাত্রামন্ত্রণা, ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের হিতার্থে পথে তাঁহাকে ম্লেচ্ছভাষায় বিদুরের হিতোপদেশপ্রদান, বিদুরের পরামর্শে সুরঙ্গনির্ম্মাণ, জতুগৃহে পঞ্চপুত্র সহিত নিদ্রিতা নিষাদীর ও পুরোচননামক ম্লেচ্ছের দাহ, ঘোর অরণ্যে পাণ্ডবদিগের হিড়িম্বাদর্শন ও সেই স্থানে মহাবল ভীম কর্ত্তৃক হিড়িম্ববধ, ঘটোৎকচের জন্ম, মহাতেজস্বী মহর্ষি ব্যাসদেবের সন্দর্শন, তদীয় আদেশানুসারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণগৃহে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস, বকরাক্ষসবধ ও তদ্দর্শনে নগরবাসী লোকের বিস্ময়, দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম, ব্রাহ্মণমুখে দ্রৌপদীর পরমাদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ব্যাসের উপদেশানুসারে দ্রৌপদীলাভাভিলাষে স্বয়ংবর দর্শনার্থে পাণ্ডবদিগের পাঞ্চাল দেশ যাত্রা, গঙ্গাতীরে গন্ধর্ব্বরাজ অঙ্গারপর্ণকে পরাজিত করিয়া তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন ও তৎসমীপে তপতী, বশিষ্ঠ, ও ঔর্ব্বের উপাখ্যান শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃসহিত অর্জ্জুনের পাঞ্চালাভিমুখে গমন পাঞ্চাল নগরে সমাগত সর্ব্বনৃপতিসমক্ষে লক্ষ্যভেদপূর্ব্বক অর্জ্জুনের দ্রৌপদীলাভ, তদ্দর্শনে জাতক্রোধ রাজগণের এবং শল্য ও কর্ণের ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজয়, ভীম ও অর্জ্জুনের তাদৃশ অপ্রমেয়

অমানুষ বীর্য্য দর্শনে পাণ্ডব বোধ করিয়া কৃষ্ণ বলরামের তৎসাক্ষাৎকারার্থ ভার্গবগৃহগমন, পাঁচজনের এক ভার্য্যা হইবেক এই নিমিত্ত দ্রুপদের বিমর্ষ, তদুপলক্ষে পরমাদ্ভুত পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যান কথন, দ্রৌপদীর দেববিহিত অলৌকিক বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্রের পাণ্ডবসমীপে বিদুর প্রেরণ, বিদুরের উপস্থিতি ও কৃষ্ণ দর্শন, পাণ্ডবদিগের খাণ্ডবপ্রস্থে বাস ও রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্তি, নারদের আজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতার দৌপদী বিষযে নিয়ম ও প্রতিজ্ঞা, দ্রৌপদী সহিত নির্জনোপবিষ্ট যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন ও তথা হইতে অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক শরণাগত ব্রাহ্মণের অপহৃত গোধন প্রত্যানযন করিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অর্জ্জুনেব বন প্রস্থান, বনবাস কালে উলূপী নাম্নী নাগকন্যার সহিত সমাগম, তীর্থ পর্য্যটন ও বভ্রুবাহনজন্ম, তপস্বিব্রাহ্মণশাপে গ্রাহযোনি প্রাপ্ত পঞ্চ অপ্সবার শাপমোক্ষণ, প্রভাস তীর্থে কৃষ্ণেব সহিত সমাগম, দ্বারকাতে কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে সুভদ্রা প্রাপ্তি, যৌতুক প্রদানার্থে কৃষ্ণের খাণ্ডবপ্রস্থাগমনের পব সুভদ্রাগর্ভে মহাতেজাঃ অভিমন্যুব জন্ম, দ্রৌপদীর পুত্রোৎপত্তি, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন জলবিহারার্থে যমুনা গমন করিলে তথায় উভযেব চক্র ও ধনুঃপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ এবং ময়দানব ও ভুজঙ্গের অগ্নিদাহ হইতে মোক্ষণ, মন্দপালনামক মহর্ষির শার্ঙ্গীগর্ভে তনয়োৎপত্তি। বহুবিস্তৃত আদিপর্ব্বে এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। মহর্ষি ব্যাসদেব এই পর্ব্ব দুই শত সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। মহাত্মা মুনি ইহাতে আট সহস্র আট শত চতুরশীতি শ্লোক কহিয়াছেন।

বহুবৃত্তান্তযুক্ত সভা নামক দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইতেছে। পাণ্ডবদিগের সভা নির্ম্মাণ, কিঙ্কব দর্শন, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক ইন্দ্রাদি লোকপাল সভা বর্ণন, রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ, জরাসন্ধবধ, গিবিব্রজনিরুদ্ধ রাজগণের কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়, উপঢৌকন লইয়া রাজাদিগের রাজসূয় মহাযজ্ঞে আগমন, রাজসূয়ের অর্ঘ্য দান প্রস্তাব কালে শিশুপালবধ, যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনে দুর্য্যোধনের বিষাদ ও ঈর্ষ্যা, সভামণ্ডপে ভীমকৃত দুর্য্যোধনোপহাস, দুর্য্যোধনের ক্রোধ, দ্যূতক্রীড়ার অনুষ্ঠান, দ্যূতকার শকুনি কর্ত্তৃক দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, দ্যূতার্ণবমগ্না পরম দুঃখিতা স্নুষা দ্রৌপদীর মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক উদ্ধার, পাণ্ডবদিগের উদ্ধার দর্শনে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার্থে তাঁহাদিগের আহ্বান ও পরাজয় পূর্ব্বক বনপ্রেষণ। মহাত্মা দ্বৈপায়ন সভাপর্ব্বে এই সমস্ত ব্যাপার কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পর্ব্বে অষ্ট সপ্ততি অধ্যায় আছে। হে দ্বিজোত্তমগণ! সভাপর্ব্বে দ্বিসহস্র পঞ্চশত একাদশ শ্লোক আছে জানিবেন।

অতঃপর অরণ্যনামক তৃতীয় পর্ব্ব। মহাত্মা পাণ্ডবেরা বন প্রস্থান করিলে পুরবাসি-গণের যুধিষ্ঠিরানুগমন, অনুগত দ্বিজগণের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহার্থ ধৌম্যমুনির উপদেশানুসারে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা, সূর্য্যপ্রসাদাৎ অন্নলাভ, ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক হিতবাদী বিদুরের

পরিত্যাগ, ধৃতরাষ্ট্রপরিত্যক্ত বিদুরের যুধিষ্ঠিরাদিসমীপগমন, ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে তাঁহার পুনরাগমন, কর্ণের পরামর্শক্রমে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের বনস্থ পাণ্ডব বিনাশ মন্ত্রণা, তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ব্যাসের সত্বর আগমন, ব্যাস কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনাদির বনগমন নিবারণ, সুরভির উপাখ্যান, মৈত্রেযেব ধৃতবাষ্ট্রসমীপে আগমন, মৈত্রেয়ের ধৃ'রাষ্ট্রকে উপদেশ দান, মৈত্রেযের রাজা দুর্য্যোধনকে শাপ প্রদান, ভীমসেন কর্ত্তৃত সংগ্রামে কির্ম্মীর রাক্ষস বধ, শকুনি ছল পূর্ব্বক দ্যূতে পাণ্ডবদিগকে পবাজিত করিয়াছে শুনিয়া বৃষ্ণিবংশীয় ও পাঞ্চালদিগের আগমন, জাতক্রোধ কৃষ্ণের অর্জ্জুন কতৃক সান্ত্বনা, কৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীব বিলাপ ও পরিতাপ, দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে কৃষ্ণের আশ্বাস প্রদান, সৌভপতি শাল্বের বধ কীর্ত্তন, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সপুত্রা সুভদ্রার দ্বারকানয়ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীতনয়দিগেব পাঞ্চাল নগর নয়ন, পাণ্ডবদিগের রমণীয় দ্বৈতবনে প্রবেশ, তথায় দ্রৌপদী ও ভীমের সহিত যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন, ব্যাসদেবের পাণ্ডবসমীপে আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতিনামক বিদ্যা দান, ব্যাসের অন্তর্ধানের পর পাণ্ডবদিগেব কাম্যকবন প্রস্থান, অস্ত্রলাভার্থে মহাবীর্য্য অর্জ্জুনের প্রবাস গমন, কিরাতরূপী মহাদেবের সহিত যুদ্ধ, ইন্দ্রাদি লোকপাল দর্শন, অস্ত্র লাভ, অস্ত্র শিক্ষার্থে ইন্দ্রলোক গমন, পাণ্ডববৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা, পাণ্ডবদিগের পরম জ্ঞানী মহর্ষি বৃহদশ্বের দর্শন, দুঃখার্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বিলাপ ও পরিতাপ, ধর্ম্ম ও করুণ-রসজনক নলোপাখ্যান, দময়ন্তী ও নলের চরিতকীর্ত্তন যুধিষ্ঠিরের বৃহদশ্ব হইতে অক্ষহৃদয়-নামক বিদ্যা প্রাপ্তি, স্বর্গ হইতে লোমশ ঋষিব পাণ্ডবদিগের নিকটে আগমন, বনবাসগত মহাত্মা পাণ্ডবদিগের নিকটে লোমশ কর্ত্তৃক স্বর্গবাসী অর্জ্জুনের বৃত্তান্তকথন, অর্জ্জুন-বাক্যানুসারে পাণ্ডবদিগের তীর্থাভিগমন, তীর্থের ফল ও পবিত্রত্ব কীর্ত্তন, মহর্ষি নারদের পুলস্ত্যতীর্থ যাত্রা, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের তীর্থযাত্রা, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা কর্ণের ইন্দ্রহস্ত হইতে মুক্তি, গয়াসুরের যজ্ঞবর্ণন, অগস্ত্যোপাখ্যান ও বাতাপিভক্ষণ, সন্তান লাভার্থে অগস্ত্য মুনির লোপামুদ্রাপরিগ্রহ, কৌমারব্রহ্মচারী ঋষ্যশৃঙ্গের চরিতকীর্ত্তন, অতিতেজস্বী জামদগ্ন্য রামের চরিতকীর্ত্তন, কার্ত্তবীর্য্য ও হৈহয়দিগের বধবর্ণন, প্রভাসতীর্থে যদুবংশীয়দিগের সহিত পাণ্ডবদিগের সমাগম, সুকন্যার উপাখ্যান, শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞে চ্যবনমুনি কর্ত্তৃক অশ্বিনী-কুমার যুগলের সোমপীথিকার্য্যে বরণ অশ্বিনীকুমার যুগলের অনুগ্রহে চ্যবনের যৌবনপ্রাপ্তি, মান্ধাতার উপাখ্যান, জন্তুনামক রাজপুত্রের উপাখ্যান, সমধিক পুত্রলাভ বাসনায় সোমক রাজার জন্তুনামক পুত্রের প্রাণবধ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান ও শতপুত্রপ্রাপ্তি, অত্যুৎকৃষ্ট শ্যেন-কপোতোখ্যান, ইন্দ্র ও অগ্নির শিবি রাজাকে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, অষ্টাবক্রোপখ্যান, জনকযজ্ঞে নৈয়ায়িকশ্রেষ্ঠ বরুণপুত্র বন্দির সহিত অষ্টাবক্র মুনির বিবাদ, অষ্টাবক্রের বন্দি পরাজয় পূর্ব্বক সাগরজলমগ্ন পিতার উদ্ধার, যবক্রীত ও মহাত্মা রৈভ্যের উপাখ্যান, পাণ্ডবদিগের

গন্ধমাদন যাত্রা ও নারায়ণাশ্রমে বাস, গন্ধমাদনে অবস্থানকালে পুষ্পাহরণার্থে দ্রৌপদীর ভীমপ্রেরণ, গমনকালে ভীমকর্তৃক কদলীবনমধ্যস্থ মহাবল হনুমানের দর্শন, পুষ্পাহরণার্থে ভীমের সরোবরাবগাহন, মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসগণের ও মণিমান্ প্রভৃতি মহাবীর্য্য যক্ষদিগের সহিত ভীমের যুদ্ধ, ভীম কর্তৃক জটাসুর নামক রাক্ষসের বধ, রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার অভিগমন, পাণ্ডবদিগের আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গমন ও বাস, দ্রৌপদীর মহাত্মা ভীমসেনকে উৎসাহপ্রদান, ভীমের কৈলাসারোহণ, তথায় মণিমান্ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত যক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, পাণ্ডবদিগের কুবেরের সহিত সমাগম, দিব্যাস্ত্র লাভানন্তর অর্জ্জুনের ভ্রাতৃগণের সহিত সমাগম, হিরণ্যপুরবাসী নিবাতকবচগণের ও পুলোমপুত্র কালকেয়দিগের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুন কর্তৃক তাহাদিগের রাজার প্রাণবধ, যুধিষ্ঠিরসমীপে অর্জ্জুনের অস্ত্র সন্দর্শনের উপক্রম, দেবর্ষি নারদ কর্তৃক তৎপ্রতিষেধ,গন্ধমাদন হইতে পাণ্ডবদিগের অবতরণ, গহনবনে পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ডকায় মহাবল ভুজগেন্দ্র কর্তৃক ভীমগ্রহণ, প্রশ্ন কথন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ভীমোদ্ধার, মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুনর্ব্বার কাম্যকবনে আগমন, কাম্যকস্থিত নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবদিগের পুনর্দ্দর্শনার্থে কৃষ্ণের আগমন, মার্কণ্ডেয় সমস্যা, মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক বেণপুত্র পৃথুরাজার উপাখ্যানকীর্ত্তন, সরস্বতী ও তার্ক্ষ্য মুনি সংবাদ, তদনন্তর মৎস্যো-পাখ্যানকথন, ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, ধুন্ধুমারোপাখ্যান, পতিব্রতার উপাখ্যান, অঙ্গিরার উপাখ্যান, দ্রৌপদী সত্যভামা সংবাদ, পাণ্ডবদিগের দ্বৈতবনে পুনরাগমন, ঘোষযাত্রা, গন্ধর্ব্বগণ কর্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন, অর্জ্জুন কর্তৃক গন্ধর্ব্ববন্ধন হইতে দুর্য্যোধনের মোচন. যুধিষ্ঠিরের মৃগস্বপ্নদর্শন, কাম্যকবনে পুনর্গমন বহুবিস্তৃত ব্রীহি দ্রৌণিক উপাখ্যান, দুর্ব্বাসার উপাখ্যান আশ্রম মধ্য হইতে জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণ, মহাবল মহাবেগ ভীম কর্তৃক জয়দ্রথের পঞ্চশিখীকরণ বহুবিস্তৃত রামায়ণোপাখ্যান, যুদ্ধে রাম কর্তৃক রাবণবধ, সাবিত্রীর উপাখ্যান, কুণ্ডলদ্বয় দান দ্বারা ইন্দ্র হইতে কর্ণের মুক্তি, সন্তুষ্ট ইন্দ্রের কর্ণকে এক পুরুষ-ঘাতিনী শক্তি দান, আরণেয় উপাখ্যান, ধর্ম্মের স্বপুত্রানুশাসন, বরপ্রাপ্তি পূর্ব্বক পাণ্ডব-দিগের পশ্চিম দিক্ প্রস্থান। আরণ্যকপর্ব্বে এই সমস্ত কীর্ত্তিত আছে। এই পর্ব্বে দুই শত একোনসপ্ততি অধ্যায় ও একাদশ সহস্র ছয় শত চৌষট্টি শ্লোক আছে।

হে মুনিগণ! অতঃপর বহুবিস্তৃত বিরাটপর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিরাটনগরে গমন পূর্ব্বক শ্মশানে অতি প্রকাণ্ড শমীতরু দৃষ্টিগোচর করিয়া তাহাতে স্ব স্ব অস্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং নগরে প্রবেশ করিয়া ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ভীমসেন দ্রৌপদীসম্ভোগাভিলাষী কামান্ধ দুরাত্মা কীচকের প্রাণদণ্ড করেন। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে সুচতুর চরমণ্ডলী প্রেরণ করেন; তাহারা মহাত্মা পাণ্ডবদিগের সন্ধান করিতে পারিল না। প্রথমতঃ ত্রিগর্ত্তেরা বিরাট রাজার গোধন হরণ

করে। তাহাদিগের সহিত বিরাটের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ত্রিগর্ত্তেরা বিরাটকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, ভীম তাঁহাকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবেরা ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাভূত করিয়া বিরাটের অপহৃত গোধন উদ্ধার করিলেন। তৎপরে কৌরবেরা তাঁহার গোধন হরণ করেন। অর্জ্জুন নিজ বিক্রমে সমস্ত কৌরবদিগকে রণে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। বিরাট রাজা সুভদ্রাগর্ভসম্ভূত শত্রুঘাতী অভিমন্যুকে উদ্দেশ করিয়া অর্জ্জুনকে নিজ কন্যা উত্তরা সম্পদান করিলেন। অতি বিস্তৃত বিরাটনামক চতুর্থ পর্ব্ব বর্ণিত হইল। এই পর্ব্ব মহর্ষি সপ্তষষ্টি অধ্যায় গণনা করিয়াছেন। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন ; এই পর্ব্বে বেদবেত্তা মহর্ষি দ্বিসহস্র পঞ্চাশৎ শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর উদ্যোগনামক পঞ্চম পর্ব্ব শ্রবণ করুন। পাণ্ডবেরা বিপক্ষ জয়ার্থ উৎসুক হইয়া উপপ্লব্যনামক স্থানে অবস্থিত হইলে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন বাসুদেবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং উভয়েই প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই যুদ্ধে আমার সহায়তা কর। মহামতি কৃষ্ণ উত্তর করিলেন, এক পক্ষে এক অক্ষৌহিণী সেনা, পক্ষান্তরে আমি একাকী, কিন্তু আমি যুদ্ধ করিব না, কেবল মন্ত্রিস্বরূপ থাকিব ; তোমরা ইহার কে কি প্রার্থনা কর, বল। হিতাহিতবিবেকানভিজ্ঞ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সৈন্য প্রাথনা করিলেন, অর্জ্জুন যুদ্ধবিমুখ কৃষ্ণকে মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। মদ্ররাজ শল্য পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন, দুর্য্যোধন পথে তাঁহার দর্শন পাইয়া উপহার প্রদান দ্বারা বশীভূত করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, তুমি আমার সাহায্য কর। শল্য অঙ্গীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া শান্ত বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রের বৃত্রাসুরজয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলেন। পাণ্ডবেরা কৌরবসমীপে পুরোহিত প্রেরণ করিলেন। প্রতাপবান্ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবপ্রেরিত পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তিস্থাপন বাসনায় সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। বাসুদেবের ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তায় ধৃতরাষ্ট্রের নিদ্রাত্যাগ হইল। বিদুর মহাপ্রাজ্ঞ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বহুতর অদ্ভুত হিতবাক্য শ্রবণ করাইলেন। মহর্ষি সনৎসুজাতও রাজাকে মনস্তাপান্বিত ও শোক-বিহ্বল দেখিয়া পরমোৎকৃষ্ট অধ্যাত্ম শাস্ত্র শুনাইলেন। সঞ্জয় প্রভাতে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন একাত্মা বলিয়া বর্ণনা করিলেন। মহামতি কৃষ্ণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া বিরোধভঞ্জন ও শান্তিস্থাপনার্থে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী কৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। এই স্থলে দম্ভোদ্ভব রাজার উপাখ্যান, মহাত্মা মাতলির নিজ কন্যার্থে বরান্বেষণ, মহর্ষি গালবের চরিত ও বিদুলার স্বপুত্রানুশাসন কীর্ত্তিত আছে। কৃষ্ণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির দুষ্ট মন্ত্রণা জ্ঞাত

হইয়া সমস্ত রাজাদিগকে স্বীয় যোগেশ্বরত্ব প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর কর্ণকে নিজ রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহার সহিত অশেষবিধ পরামর্শ করিলেন। কর্ণ গর্ব্বান্ধতা প্রযুক্ত তদীয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না। শত্রুঘাতী কৃষ্ণ হস্তিনা হইতে উপপ্লব্যে প্রত্যাগমন করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট আদ্যোপান্ত অবিকল বর্ণনা করিলেন। তাঁহারা তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া হিতাহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক সংগ্রামের সমুদায় সজ্জা করিলেন। তদনন্তর সমুদায় পদাতি, অশ্ব, রথ, গজ, যুদ্ধার্থে হস্তিনানগর হইতে নির্গত হইল। রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব দিবসে উলূকনামক এক ব্যক্তিকে দৌতকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেষণ করিলেন। তৎপরে সৈন্যসংখ্যা ও কাশিরাজ-দুহিতা অম্বার উপাখ্যান। বহুবৃত্তান্তযুক্ত সন্ধিবিগ্রহবিশিষ্ট উদ্যোগনামক ভারতীয় পঞ্চম পর্ব্ব নির্দিষ্ট হইল। মহর্ষি উদ্যোগপর্ব্বে একশত ষড়শীতি অধ্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে তপোধনগণ! উদারমতি মহাত্মা ব্যাসদেব এই পর্ব্বে ষট্‌সহস্র ষট্‌শত অষ্ট নবতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অদ্ভুত ভীষ্মপর্ব্ব বর্ণিত হইতেছে। এই পর্ব্বে সঞ্জয় জম্বুখণ্ড নির্ম্মাণ বর্ণনা করেন। যুধিষ্ঠিরসৈন্য অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হয়। দশাহ ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মহামতি বাসুদেব অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বারা অর্জ্জুনের মায়ামোহজনিত বিষাদ নিরাকরণ করেন। যুধিষ্ঠিরহিতকাঙ্ক্ষী উদারমতি কৃষ্ণ বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া সত্বর রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অতি দ্রুত গমনে প্রতোদহস্তে নির্ভয় চিত্তে ভীষ্মকে সংহার করিতে যান, এবং সকলশস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বাক্যরূপ দণ্ড দ্বারা তাড়না করেন। অর্জ্জুন শিখণ্ডিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া তীক্ষ্ণতর শর প্রহার দ্বারা ভীষ্মকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করেন। ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করিলেন। বহুবিস্তৃত ভারতীয় ষষ্ঠ পর্ব্ব কথিত হইল। বেদবেত্তা ব্যাস ভীষ্মপর্ব্বে একশত সপ্তদশ অধ্যায় ও পঞ্চ সহস্র অষ্ট শত চতুরশীতি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

তদনন্তর বহু বৃত্তান্ত যুক্ত বিচিত্র দ্রোণপর্ব্ব আরব্ধ হইতেছে। প্রতাপবান্ মহাস্ত্রবেত্তা দ্রোণাচার্য্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের প্রীত্যর্থে প্রতিজ্ঞা করলেন, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে বদ্ধ করিয়া আনিব। সংশপ্তকেরা অর্জ্জুনকে রণক্ষেত্র হইতে অপসারিত করে। সংগ্রামে শত্রুতুল্য মহারাজ ভগদত্ত সুপ্রতীক নামক স্বীয় হস্তীর পরাক্রমে যুদ্ধে অতি দুর্দ্ধর্ষ ও ভয়ানক হইয়া উঠেন। অর্জ্জুন সুপ্রতীকের প্রাণ সংহার করেন। জয়দ্রথ প্রভৃতি অনেক মহারথেরা একত্র হইয়া অতি পরাক্রান্ত অপ্রাপ্তযৌবন শিশুপ্রায় অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। অভিমন্যু হত হইলে অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া সমরে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংহার পূর্ব্বক জয়দ্রথের জীবন নাশ করেন। মহাবাহু

ভীমও মহারথ সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অর্জ্জুনের অন্বেষণার্থ দেবতাদিগেরও দুৰ্দ্ধর্ষ কৌরবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করেন। হতাবশিষ্ট সংশপ্তকেরা সংগ্রামে নিঃশেষ হয়। দ্রোণপর্ব্বে অলম্বুষ, শ্রুতায়ুঃ, বীর্য্যবান্ জলসন্ধ, সোমদত্ত, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ঘটোৎকচ, ও অন্যান্য বীরপুরুষেরা নিহত হয়েন। দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে নিপাতিত হইলে অশ্বত্থামা অমর্ষপরবশ হইয়া অতি ভয়ঙ্কর নারায়ণাস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই পর্ব্বে উৎকৃষ্ট রুদ্রমাহাত্ম্য, ব্যাসদেবের আগমন, এবং কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতের সপ্তম পর্ব্ব উদাহৃত হইল। দ্রোণপর্ব্বে যে সকল পরাক্রান্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপাল নির্দিষ্ট হইয়াছেন, প্রায় সকলেই নিধন প্রাপ্ত হয়েন। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি পরাশরসূনু সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দ্রোণপর্ব্বে একশত সপ্ততি অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র নব শত নব শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

অতঃপর পরমাদ্ভুত কর্ণপর্ব্ব উক্ত হইতেছে। ধীমান্ শল্যের সারথিকার্য্যে নিয়োগ, ত্রিপুরনিপাত বর্ণন, প্রস্থান কালে কর্ণ ও শল্যের পরস্পর কলহ, কর্ণ তিরস্কারার্থ শল্যের হংসকাকীয় উপাখ্যান কথন, মহাত্মা অশ্বত্থামা কর্তৃক পাণ্ড্যরাজার বধ, তৎপরে দণ্ডসেন ও দণ্ডের বধ, সর্ব্বধনুর্দ্ধর সমক্ষে কর্ণের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণ সংশয়, যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের কোপ। কৃষ্ণ অনুনয় দ্বারা অর্জ্জুনের কোপ শান্তি করিলেন। ভীম প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া তদীয় শোণিত পান করেন। অর্জ্জুন দ্বৈরথ যুদ্ধে মহারথ কর্ণের প্রাণসংহার করেন। মহাভারতের অষ্টম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। কর্ণপর্ব্বে একোনসপ্ততি অধ্যায় ও চারি সহস্র নয় শত চতুঃষষ্টি শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

অতঃপর বিচিত্র শল্যপর্ব্ব আরব্ধ হইতেছে। কৌরবসৈন্য বীরশূন্য হইলে মদ্রেশ্বর শল্য সেনাপতি হইলেন। শল্যপর্ব্বে যাবতীয় রথযুদ্ধ ও কৌরবপক্ষীয় প্রধান বীরদিগের বিনাশ কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে শল্যের ও সহদেবহস্তে শকুনির প্রাণবধ হয়। দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য অল্পমাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া হ্রদ প্রবেশ পূর্ব্বক জলস্তম্ভ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাধেরা ভীমকে তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিল। অত্যন্ত অভিমানী দুর্য্যোধন ধীমান্ ধর্ম্মরাজের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভীমসেনের সহিত গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। গদাযুদ্ধ-কালে বলরাম তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎপরে সরস্বতী দেবীর ও অশেষ তীর্থের পবিত্রত্ব কীর্ত্তন ও তুমুল গদাযুদ্ধ বর্ণন। ভীম অতি প্রচণ্ড গদাঘাতে যুদ্ধে রাজা দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিলেন। অদ্ভুত নবম পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে বহু বৃত্তান্ত সম্বলিত উনষষ্টি অধ্যায় সংখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে শ্লোকসংখ্যা কথিত হইতেছে।

কৌরবদিগের কীর্ত্তিকীর্ত্তক মুনি নবম পর্ব্বে তিন সহস্র দুই শত বিংশতি শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর অতি দারুণ সৌতিকপর্ব্ব বর্ণন করিব। পাণ্ডবেরা রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলে পর, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা এই তিন মহারথ সায়ংকালে রুধিরাক্তসর্ব্বাঙ্গ ভগ্নোরু অভিমানী রাজা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা রণক্ষেত্রে পতিত আছেন। দৃঢ়ক্রোধ মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সমুদায় পাঞ্চাল ও অমাত্য সহিত সমস্ত পাণ্ডবদিগের প্রাণ সংহার না করিয়া গাত্র হইতে তনুত্রাণ উদ্ঘাটন করিব না। রাজাকে এইরূপ কহিয়া তিন মহারথেই তথা হইতে অপক্রান্ত হইয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে বনমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অতি প্রকাণ্ড বটবিটপিতলে উপবিষ্ট হইলেন। অশ্বত্থামা তথায় রাত্রিকালে এক পেচককে অনেক কাকের প্রাণসংহার করিতে দেখিয়া পিতৃবধ স্মরণে কোপাবিষ্ট হইয়া নিদ্রান্বিত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ সংকল্প করিলেন। তদনুসারে শিবিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক বিকটাকার অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক রাক্ষস আকাশ পর্য্যন্ত রোধ করিয়া তথায় অবস্থিত আছে। অশ্বত্থামা যত অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, রাক্ষস সমুদায় ব্যর্থ করিল। তখন তিনি সত্বর মহাদেবের আরাধনা করিয়া কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহযোগে নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীনন্দন-দিগের প্রাণবধ করিলেন। কৃষ্ণের বলাশ্রয় প্রভাবে কেবল পঞ্চ পাণ্ডব সাত্যকি রক্ষা পাইলেন, অবশিষ্ট সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি পাণ্ডবদিগকে সংবাদ দিল, অশ্বত্থামা নিদ্রাভিভূত পাঞ্চালদিগের প্রাণবধ করিয়াছে। দ্রৌপদী পুত্রশোকে আর্ত্তা ও পিতৃ ভ্রাতৃ বধ শ্রবণে কাতরা হইয়া অনশন সংকল্প করিয়া ভর্ত্তৃগণসন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। মহাপরাক্রান্ত বীর্য্যবান্ ভীমসেন দ্রৌপদীর মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থে তদীয় বচনানুসারে গদাগ্রহণ পূর্ব্বক কুপিত চিত্তে গুরুপুত্রের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অশ্বত্থামা ভীমভয়ে অভিভূত, রোষপরবশ ও দৈবপ্রেরিত হইয়া, পৃথিবী অপাণ্ডবা হউক, এই বলিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণ, এরূপ করিও না, বলিয়া অশ্বত্থামাকে নিষেধ করিলেন। পাপমতি অশ্বত্থামার অনিষ্টাচরণে এইরূপ অভিনিবেশ দেখিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা সেই অস্ত্রের নিবারণ করিলেন। অশ্বত্থামা দ্বৈপায়ন প্রভৃতি পরস্পর শাপ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা মহারথ দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে মণিগ্রহণ করিয়া হৃষ্ট চিত্তে দ্রৌপদীহস্তে সমর্পিলেন। সৌপ্তিকনামক দশম পর্ব্ব উদাহৃত হইল। উত্তমতেজা ব্রহ্মবাদী মহাত্মা মুনি সৌপ্তিকপর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায় ও অষ্ট শত সপ্ততি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন। ঐষীকপর্ব্ব এই পর্ব্বের অন্তর্গত।

অতঃপর করুণরসদ্বোধক স্ত্রীপর্ব্ব আরব্ধ হইতেছে। এই পর্ব্বে পুত্রশোকসন্তপ্ত

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভীমসেনের প্রাণবধ সংকল্প করিয়া কৃষ্ণানীত লৌহময়ী ভীমপ্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করেন। বিদুর অধ্যাত্মবিদ্যসম্বন্ধ হেতুবাদ দ্বারা শোকাভিভূত ধীমান ধৃতরাষ্ট্রের সাংসারিক মায়া মোহ নিরাকরণ ও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করেন। শোকার্ত্ত ধৃতরাষ্ট্র অন্তঃপুরিকাগণের সহিত রণক্ষেত্র দর্শনার্থ গমন করেন। বীরপত্নীদিগের অতি করুণ বিলাপ এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের কোপাবেশ ও মোহ। ক্ষত্রিয়নারীগণ যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পিতা ভ্রাতা ও পুত্রদিগকে দেখিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ পুত্রপৌত্র-শোককাতরা গান্ধারীর কোপ শান্তি করিলেন। পরমধার্ম্মিক মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির যথাশাস্ত্র রাজাদিগের শরীরদাহ করাইলেন। প্রেততর্পণ আরব্ধ হইলে কুন্তী কর্ণকে স্বীয় গূঢ়োৎপন্ন পুত্র বলিয়া অঙ্গীকার ও প্রকাশ করিলেন। মহর্ষি ব্যাস এই একাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়াছেন। এই পর্ব্ব শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে সজ্জনদিগকে শোকে অভিভূত ও অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়। ধীমান্ ব্যাসদেব স্ত্রীপর্ব্বে সপ্তবিংশতি অধ্যায় ও সপ্ত শত পঞ্চ সপ্ততি শ্লোক কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতঃপর শান্তিপর্ব্ব; ইহার অধ্যয়নে বুদ্ধিবৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পিতৃ ভ্রাতৃ পুত্র মাতুল প্রভৃতির সংহার করাইয়া যৎপরোনাস্তি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন। শরশয্যারূঢ় ভীষ্মদেব রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম শ্রবণ করান। ঐ সমুদায় ধর্ম্মজ্ঞানাভিলাষী রাজগণের অবশ্যজ্ঞেয়। ভীষ্মদেব কাল ও কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। ঐ সকল ধর্ম্ম অবগত হইলে নর সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর বিচিত্র মোক্ষধর্ম্মও সবিস্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাজ্ঞজনপ্রীতিপদ দ্বাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। হে তপোধনগণ! শান্তিপর্ব্বে ত্রিশত উনচত্বারিংশ অধ্যায় আছে জানিবেন। ধীমান্ পরাশরনন্দন এই পর্ব্বে চতুর্দ্দশ সহস্র সপ্ত শত সপ্ত শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! ইহার পরেই অতি প্রশস্ত অনুশাসনপর্ব্ব। কুরুরাজ যুধিষ্ঠির ভাগীরথীপুত্র ভীষ্মের নিকট ধর্ম্মনির্ণয় শ্রবণ করিয়া হতশোক ও স্থিরচিত্ত হইলেন। এই পর্ব্বে ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূল যাবতীয় ব্যবহার প্রদর্শন, অশেষবিধ দানের পৃথক্ পৃথক্ ফল নির্দ্দেশ, সদসৎ পাত্র বিবেক, দানবিধি কথন, আচারবিধি নির্ণয়, সত্যস্বরূপ নিরূপণ, গো ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, দেশকালানুসারে ধর্ম্মরহস্য মীমাংসা, ও ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ কীর্ত্তন আছে। ধর্ম্মনির্ণয়যুক্ত বহুবৃত্তান্তালঙ্কৃত অনুশাসন নামক ত্রয়োদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। এই পর্ব্বে এক শত ষট্চত্বারিংশৎ অধ্যায় ও অষ্ট সহস্র শ্লোক সংখ্যাত আছে।

তৎপরে আশ্বমেধিক নামক চতুর্দ্দশ পর্ব্ব। সংবর্ত্তমুনি ও মরুত্তরাজার উপাখ্যান, যুধিষ্ঠিরের হিমালয়স্থিত সুবর্ণরাশি প্রাপ্তি ও পরীক্ষিতের জন্ম। পরীক্ষিৎ অশ্বত্থামার অস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন; কৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে জীবন দান করেন। উৎকৃষ্ট যজ্ঞীয়

অশ্ব রক্ষার্থ তদনুগামী অর্জ্জুনের নানা স্থানে কুপিত রাজপুত্রগণের সহিত যুদ্ধ। চিত্রাঙ্গদা-গর্ভসম্ভূত নিজপুত্র বভ্রুবাহনের সহিত সংগ্রামে অর্জ্জুনের প্রাণসংশয় ঘটে। অশ্বমেধযজ্ঞে নকুলবৃত্তান্ত কীর্ত্তন। পরমাদ্ভুত আশ্বমেধিকপর্ব্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী মহর্ষি এই পর্ব্বে এক শত তিন অধ্যায় ও তিন সহস্র তিন শত বিংশতি শ্লোক নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তৎপরে আশ্রমবাস নামক পঞ্চদশ পর্ব্ব। রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বিদুর ও গান্ধারী সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রবেশ পূর্ব্বক ঋষিদিগের আশ্রমে বাস করেন। গুরুশুশ্রূষাপরায়ণা কুন্তী তাঁহাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া পুত্ররাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তদনুগামিনী হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধহত লোকান্তরগত পুত্র পৌত্রগণ ও অন্যান্য পার্থিববিগকে জীবিত পুনরাগত অবলোকন করিলেন। তিনি মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের প্রসাদাৎ এইরূপ অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য সন্দর্শন করিয়া শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সস্ত্রীক পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। বিদুর ও মহামাত্য বিদ্বান্ জিতেন্দ্রিয় সঞ্জয় ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া সদ্গতি পাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নারদের সন্দর্শন পাইয়া তাঁহার প্রমুখাৎ যদুবংশীয়-দিগের কুলক্ষয়বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অত্যদ্ভুত আশ্রমবাসাখ্য পর্ব্ব উক্ত হইল। তত্ত্বদর্শী ব্যাস এই পর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশৎ অধ্যায় ও এক সহস্র পাঁচ শত ছয় শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! অতঃপর অতি দারুণ মৌষলপর্ব্ব জানিবেন। এই পর্ব্বে ব্রহ্ম-শাপনিগৃহীত পুরুষশ্রেষ্ঠ যাদবেরা আপানে (৩২) সুরাপানে মত্ত ও দৈবপ্রেরিত হইয়া এরকারূপী (৩৩) বজ্র দ্বারা পরস্পর প্রহার করেন। রাম ও কেশব কুলক্ষয় করিয়া পরিশেষে উভয়ে সর্ব্বসংহারকারী উপস্থিত কালকে অতিক্রম করিলেন না। নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আসিয়া দ্বারকা যাদবশূন্য নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি বিষাদ ও মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আত্মমাতুল নরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবের সংস্কার করিয়া কৃষ্ণ, বলরাম, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান যাদবদিগেরও সংস্কার করিলেন। অনন্তর দ্বারকা হইতে বালক ও বৃদ্ধদিগকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া যাইতে যাইতে বিপৎকালে গাণ্ডীবের পরাক্রমক্ষয় ও দিব্যাস্ত্র সমুদায়ের অস্ফূর্ত্তি অবলোকন করিলেন, এবং যাদবরমণীদিগের অপহরণ এবং প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা দর্শনে সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মরাজসন্নিধানে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সন্ন্যাসাবলম্বনের বাসনা করিলেন। মৌষল নামক ষোড়শ পর্ব্ব পরিকীর্ত্তিত হইল। তত্ত্বদর্শী দ্বৈপায়ন এই পর্ব্বে আট অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

তৎপরে মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্ব। এই পর্ব্বে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান গমন করেন। তাঁহারা লৌহিত্য-

---

(৩২) যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সুরাপান করে।

(৩৩) এরকা তৃণবিশেষ, খড়ী।

সাগরতীরে উত্তীর্ণ হইয়া অগ্নির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। অর্জ্জুন মহাত্মা অগ্নির আদেশানুসারে পূজা পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বধনুঃশ্রেষ্ঠ দিব্য গাণ্ডীব প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে ক্রমে ক্রমে নিপতিত ও নিধনপ্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রস্থানিক নামক সপ্তদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। তত্ত্বদর্শী ঋষি এই পর্ব্বে তিন অধ্যায় ও তিন শত বিংশতি শ্লোক নিরূপণ করিয়াছেন (৩৪)।

তৎপরে অলৌকিক অত্যাশ্চর্য স্বর্গপর্ব্ব। মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মরাজ দয়ার্দ্রহৃদয়তা প্রযুক্ত স্বসমভিব্যাহারী কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া দেবলোকাগত দিব্য রথে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্ম, মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, কুক্কুররূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দর্শন দিলেন, যুধিষ্ঠির তৎসমভিব্যাহারে স্বর্গারোহণ করিলেন। দেবদূত ছলক্রমে তাঁহাকে নরক দর্শন করাইল। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে অবস্থিত আজ্ঞানুবর্ত্তী ভ্রাতৃগণের কাতর শব্দ শ্রবণ করিলেন। ধর্ম্ম ও ইন্দ্র তাঁহার ক্ষোভ নিরাকরণ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আকাশগঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে স্বধর্ম্মার্জ্জিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সমভিব্যাহারে পরমাদরে ও পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্যাসদেবপ্রোক্ত স্বর্গারোহণ নামক অষ্টাদশ পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট হইল। মহাত্মা ঋষি এই পর্ব্বে পাঁচ অধ্যায ও দুই শত নয় শ্লোক সংখ্যা করিয়াছেন।

এইরূপে অষ্টাদশ পর্ব্ব সবিস্তর উক্ত হইল। তৎপরে হরিবংশ ও ভবিষ্যপর্ব্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক গণনা করিয়াছেন।

মহাভারতীয় পর্ব্বসংগ্রহ কীর্ত্তিত হইল (৩৫)।

যুদ্ধাভিলাষে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র সমাগত হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবস ঐ মহাদারুণ যুদ্ধ হয়।

---

(৩৪) শ্লোকানাঞ্চ শতত্রয়ম্। বিংশতিশ্চ তথা শ্লোকাঃ সংখ্যাতাস্তত্ত্বদর্শিনা। এই স্থলে যথাশ্রুত অর্থ লিখিত হইল। কিন্তু মহাপ্রস্থানপর্ব্বে এক শত ত্রয়োবিংশতি শ্লোকের অধিক নাই। এই নিমিত্ত টীকাকার নীলকণ্ঠ সমাসবলে শতত্রয়ম্ এই শব্দে এক শত তিন এই অর্থ করিয়া বিংশতি সহযোগে এক শত ত্রয়োবিংশতি এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৩৫) পর্ব্বসংগ্রহে যেরূপ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা লিখিত হইল, ইতিপর্ব্বেই তাহার ন্যূনাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বনপর্ব্বে ও হরিবংশে অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রতিজ্ঞাত সংখ্যা অপেক্ষা বনপর্ব্বে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোক অধিক, হরিবংশে ন্যূনাধিক চারি সহস্র। পণ্ডিতেরা মীমাংসা করেন লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এইরূপ সংখ্যাগত ন্যূনাধিক্য ঘটিয়াছে।

যে দ্বিজ অঙ্গ (৩৬) ও উপনিষদ্ সহিত চারি বেদ জানেন, কিন্তু এই আখ্যান গ্রন্থ জানেন না, তিনি কখনই বিচক্ষণ নহেন। অমিতবুদ্ধি ব্যাসদেব এই গ্রন্থকে অর্থশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, ও কামশাস্ত্র স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পুংকোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কর্কশ কাকশব্দ শ্রবণে অনুরাগ হয় না, সেইরূপ এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রান্তর শ্রবণে অভিরুচি থাকে না। যেমন পঞ্চভূত হইতে ত্রিবিধ লোকসৃষ্টি নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ এই সর্ব্বোত্তম ইতিহাস গ্রন্থ হইতে কবিগণের বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। যেমন চতুর্ব্বিধ (৩৭) প্রজা অন্তরীক্ষের অন্তর্গত, হে দ্বিজগণ! সেইরূপ যাবতীয় পুরাণ এই উপাখ্যানের অন্তর্ব্বর্ত্তী। যেমন মনের ক্রিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়, সেইরূপ এই আখ্যান শাস্ত্র অশেষবিধ ক্রিয়া (৩৮) ও গুণের (৩৯) আশ্রয়। যেমন আহার ব্যতিরেকে শরীর-ধারণের অন্য উপায় নাই, সেইরূপ এই উপাখ্যানের অন্তর্গত কথা ব্যতিরিক্ত ভূমণ্ডলে আর কথা নাই। যেমন অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী ভৃত্যেরা সৎকুলজাত প্রভুর সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ, সমস্ত কবিগণ এই উপাখ্যানের উপাসনা করেন। যেমন গৃহস্থাশ্রম অন্যান্য সমস্ত আশ্রয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই কাব্য অন্যান্য কবিকৃত যাবতীয় কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

তোমাদিগের সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি হউক, পরলোকগত ব্যক্তির ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু। অর্থ ও স্ত্রী সাতিশয় নৈপুণ্য সহকারে উপাসিত হইলেও কোন কালে আত্মীয় ও স্থায়ী হয় না।

যে ব্যক্তি দ্বৈপায়নের ওষ্ঠপুটবিগলিত অপ্রমেয় পরম পবিত্র পাপহর মঙ্গলকর ভারতপাঠ শ্রবণ করে, তাহার পুষ্কর (৪০) জলাভিষেকের প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণ দিবাভাগ ইন্দ্রিয়সেবা দ্বারা যে পাপ সঞ্চয় করেন, মহাভারত কীর্ত্তন করিলে সায়ংকালে সেই পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। আর রাত্রিকালে কায়মনোবাক্যে যে পাপানুষ্ঠান করেন, ভারত কীর্ত্তন করিলে প্রাতঃকালে তাহা হইতে মুক্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বহুশ্রুত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণশৃঙ্গসমন্বিত গোশত দান করে, আর যে ব্যক্তি পরম পবিত্র ভারতকথা নিত্য শ্রবণ করে, সেই দুই জনের তুল্য ফল লাভ হয়। যেমন বিস্তীর্ণ সমুদ্র তরণীযোগে অনায়াসগম্য হয়, সেইরূপ অগ্রে পর্ব্বসংগ্রহ শ্রবণ করিলে এই অত্যুৎকৃষ্ট মহৎ আখ্যানশাস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে সুগম হয়।

---

(৩৬) শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, ছন্দঃ, এই ছয়, বেদের উচ্চারণ-নিয়মবোধক শাস্ত্রের নাম শিক্ষা, যে শাস্ত্রে বৈদিক ক্রিয়ার বিবরণ আছে, তাহাকে কল্প কহে, আর বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্রের নাম নিরুক্ত।

(৩৭) জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ। (৩৮) অধ্যয়ন দান, যজন, প্রভৃতি।

(৩৯) শম, দম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য প্রভৃতি।

(৪০) পরম পবিত্র তীর্থ বিশেষ।

তৃতীয় অধ্যায়—পৌষ্যপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় স্বীয় সহোদরগণ সমভিব্যাহারে কুরুক্ষেত্রে বহুবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রুতসেন, উগ্রসেন, ও ভীমসেন নামে তিন সহোদর। তাঁহাদের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে এক কুক্কুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতারা তাহাকে প্রহার করাতে, সে অতিশয় রোদন করিতে করিতে স্বীয় জননী সন্নিধানে গমন করিল। দেবশুনী সরমা পুত্রকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন রোদন করিতেছ, কে তোমারে প্রহার করিয়াছে? সে এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিল, জনমেজয়ের ভ্রাতারা আমাকে প্রহার করিলেন। তখন সরমা কহিল, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি কোন অপরাধ করিয়াছিলে, তাহাতেই তাঁহারা প্রহার করিয়াছেন। সে কহিল, আমার কোন অপরাধ নাই, যজ্ঞীয় হবিতে দৃষ্টিপাত বা জিহ্বাস্পর্শ কিছুই করি নাই। ইহা শুনিয়া তাহার মাতা সরমা পুত্রদুঃখে দুঃখিতা হইল, এবং যে স্থলে জনমেজয় ভ্রাতৃগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কোপাবেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক জনমেজয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পুত্রের কোন অপরাধ নাই, যজ্ঞীয় হবি অবেক্ষণ বা অবলেহন করে নাই, কি নিমিত্ত প্রহার করিয়াছ? তিনি কোন উত্তর দিলেন না। তখন সরমা কহিল, তুমি ইহাকে বিনা অপরাধে প্রহার করিয়াছ অতএব অতর্কিত কারণে তোমার ভয় উপস্থিত হইবেক। রাজা জনমেজয় সরমার শাপ শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইলেন। পরে আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করিয়া সবিশেষ যত্নসহকারে সরমাশাপনিবারণ-সমর্থ পুরোহিতের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

একদা পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় মৃগয়ায় গমন করিয়া নিজ রাজ্যান্তর্গত কোন জনপদে এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবা নামে তপস্যানুরক্ত পুত্র ছিলেন। জনমেজয় তাঁহার সেই পুত্রের নিকটে গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। তিনি প্রণাম করিয়া ঋষির নিকট নিবেদন করিলেন ভগবন্! আপনকার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। ঋষি রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন, এক সর্পী আমার শুক্র পান করিয়াছিল, আমার এই পুত্র তাহার গর্ভে জন্মেন, ইনি মহাতপস্বী, সর্ব্বদা স্বাধ্যায়রত, মদীয় তপোবীর্য্যসম্পন্ন, মহাদেবশাপ ব্যতিরেকে অন্যান্য সমুদায় শাপ নিরাকরণে সমর্থ হইবেন। কিন্তু ইহার এই এক নিগূঢ় ব্রত আছে যে, ব্রাহ্মণে ইহার নিকট যাহা প্রার্থনা করেন, ইনি তাহাই দেন, ইহাতে যদি তোমার সাহস

হয়, ইহাকে লইয়া যাও। জনমেজয় শ্রুতশ্রবার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয় তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবেক না। অনন্তর তিনি সেই পুরোহিত সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া নিজ ভ্রাতাদিগকে কহিলেন, ইনি যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, তোমরা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিবে, কোন মতে অন্যথা না হয়। ভ্রাতৃগণ তদীয় আদেশ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। জনমেজয় ভ্রাতাদিগকে এইরূপ আদেশ দিয়া তক্ষশিলা জয়ার্থে প্রস্থান করিলেন, এবং অবিলম্বে সেই দেশ আপন বশীভূত করিলেন।

এই অবসরে প্রসঙ্গক্রমে উপাখ্যানান্তর আরম্ভ হইতেছে। আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি, ও ধৌম্য নামে তিন শিষ্য। তিনি পাঞ্চাল-দেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। পাঞ্চাল্য আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে এক উপায় দেখিয়া স্থির করিলেন, ভাল, ইহাই করিব। এই নিশ্চয় করিয়া তিনি সেই কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন। শয়ন করাতে জলনির্গম নিবারিত হইল। পরে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গেল? তাঁহারা বিনীত বচনে উত্তর করিলেন, ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ঋষি শিষ্যদিগকে কহিলেন, তবে চল আমরা সকলেই সেখানে যাই। অনন্তর তিনি তথায় গমন করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, অহে বৎস পাঞ্চাল্য আরুণি! তুমি কোথায় আছ, আইস। আরুণি উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই কেদারখণ্ড হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি উপস্থিত হইয়াছি, কেদারখণ্ড হইতে যে জল নির্গত হইতেছিল, অবারণীয় হওয়াতে তাহা রোধ করিবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনকার শব্দ শুনিয়া সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনকার নিকটে উপস্থিত হইলাম, অভিবাদন করি, এক্ষণে কি করিব, আজ্ঞা করুন। শিষ্যবাক্যবসানে উপাধ্যায় তদীয় গুরুভক্তির দৃঢ়তা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কেদারখণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়া উত্থান করিয়াছ, অতএব তুমি অদ্যাবধি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে; আর আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মঙ্গল হইবেক, বেদ ও সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্ব কাল স্মরণপথারূঢ় থাকিবেক। আরুণি এইরূপ উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত দেশে প্রস্থান করিলেন।

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে, বৎস উপমন্যু! তুমি গো রক্ষা কর, এই আদেশ দিয়া গোচারণে প্রেরণ করিলেন। তিনি

উপাধ্যায়বচনানুসারে গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক উপাধ্যায়ের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস উপমন্যু! তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি, তুমি কি আহার করিয়া থাক? তিনি উত্তর করিলেন, ভগবন্। ভিক্ষালব্ধ অন্ন দ্বারা উদরপূর্ত্তি করি। উপাধ্যায় কহিলেন, অতঃপর আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করিবে না। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সংগৃহীত ভিক্ষান্ন আনিয়া উপাধ্যায়ের নিকট সমর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। পর দিন উপমন্যু দিবাভাগে গো রক্ষা করিয়া প্রদোষকালে গুরুকুল প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গুরুর পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এক্ষণেও তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, এখন তুমি কি আহার কর। উপমন্যু নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে প্রথম ভিক্ষা সমর্পণ করিয়া আর এক বার ভিক্ষা করি, তাহাতে যাহা পাই তাহাই আহার করিয়া প্রাণধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, ইহা গুরুকুলবাসীর ধর্ম্ম নহে; তুমি অন্যান্য ভিক্ষাজীবীর বৃত্তি প্রতিরোধ করিতেছ, একপ্রকারে জীবিকানির্ব্বাহ করাতে তোমার লোভিত্ব প্রকাশ পাইতেছে, অতঃপর তুমি দ্বিতীয় বার ভিক্ষা করিও না। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গো রক্ষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি গোরক্ষান্তে উপাধ্যায়গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূল দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস উপমন্যু! আমি তোমার সমুদায় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করি, আর ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে বিলক্ষণ স্থূলকায় দেখিতেছি; অতএব এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল। এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন, মহাশয়! এই সকল ধেনুর দুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করি। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি তোমাকে অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই, তোমার এ রূপে দুগ্ধপান করা কোন রূপেই ন্যায্য নহে। উপমন্যু, আর এরূপ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং গোরক্ষান্তে যথাকালে উপাধ্যায় গৃহে আগমন করিয়া গুরুসম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন। উপাধ্যায় এখনও তাঁহাকে স্থূলকলেবর অবলোকন করিয়া কহিলেন, বৎস উপমন্যু! ভিক্ষান্ন ভক্ষণ কর না, বারান্তরও ভিক্ষা কর না, দুগ্ধও পান কর না; তথাপি তোমাকে স্থূলকায় দেখিতেছি। অতএব, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু এইরূপ আদিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়! বৎসগণ স্ব স্ব মাতৃস্তন পান করিতে করিতে যে ফেন উদ্গার করে, তাহাই পান করিয়া থাকি। উপাধ্যায় কহিলেন, সুশীল বৎস সকল

তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদগার করে ; ফেনাপানে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি বৎসগণের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ ; অতএব তোমার ফেনাপানে করা উচিত নহে। উপমন্যু, আর করিব না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া পর দিন প্রভাতে গোরক্ষায় প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে প্রতিষিদ্ধ হইয়া ভিক্ষান্ন ভক্ষণ করেন না, বারান্তরও ভিক্ষা করেন না, দুগ্ধপান করেন না, দুগ্ধের ফেনও উপভোগ করেন না। এক দিবস অরণ্যে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। ঐ সকল ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অর্কপত্র অভ্যবহার করাতে চক্ষুর দোষ জন্মিয়া অন্ধ হইলেন, এবং অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কূপে পতিত হইলেন। সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, উপাধ্যায় তথাপি তাঁহাকে অপ্রত্যাগত দেখিয়া শিষ্যদিগকে কহিলেন, উপমন্যু কেন আসিতেছে না? তাঁহারা কহিলেন, সে গো রক্ষা করিতে গিয়াছে। উপাধ্যায় কহিলেন, আমি উপমন্যুর সর্ব্বপ্রকার আহার প্রতিষেধ করিয়াছি, সে কুপিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ; এই নিমিত্তই এত বিলম্ব হইল, তথাপি আসিতেছে না ; অতএব তাহার অন্বেষণ করা উচিত। এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্য প্রবেশ পুরঃসর এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, বৎস উপমন্যু! কোথায় আছ, শীঘ্র আইস। উপমন্যু উপাধ্যায়বাক্য শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে উত্তর প্রদান করিলেন, আমি কূপে পতিত হইয়াছি। উপাধ্যায় কহিলেন, কূপে পতিত হইলে কেন? তিনি কহিলেন, অর্কপত্র ভক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়াছি, তাহাতেই কূপে পতিত হইলাম। উপাধ্যয়ে কহিলেন, দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার যুগলের স্তব কর, তাঁহারা তোমাকে চক্ষুঃপ্রদান করিবেন।

উপমন্যু উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে ঋগ্বেদবাক্য দ্বারা অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে অশ্বিনীকুমারযুগল! তোমরা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলে, তোমরাই সর্ব্বজীবপ্রধান হিরণ্যগর্ভ রূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে, তোমরাই পরে এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার প্রপঞ্চ রূপে প্রকাশমান হইয়াছ, দেশ কাল, অবস্থা দ্বারা তোমাদের পরিচ্ছেদ করা যায়, না তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্য রূপে সর্ব্ব কাল বিরাজমান রহিয়াছ, তোমরাই শরীরবৃক্ষে অধিষ্ঠান করিতেছ, তোমরা সৃষ্টিবিষয়ে পরমাণু পরতন্ত্র বা প্রকৃতি সাপেক্ষ নহ (৪১), তোমরা অবাঙ্মনসগোচর, তোমরাই স্বীয় মায়ার

---

(৪১) বেদান্তমতে ঈশ্বর অভিধ্যান মাত্রেই সৃষ্টি করেন ; তাহাতে পরমাণু বা প্রকৃতির সহযোগিতা আবশ্যক করে না। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা কহেন, পরমাণু সকল নিত্য, সৃষ্টি প্রারম্ভে ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর সংযোগ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হয়, তাঁহার

বিক্ষেপ (৪২) শক্তি দ্বারা অশেষ ভুবন প্রকাশ করিয়াছ ; আমি অভয় প্রার্থনায় শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা তোমাদিগের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। তোমরা পরম রমণীয়, সর্ব্ব-সঙ্গবিবর্জ্জিত, লয়প্রাপ্ত সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠানভূত, মায়াকার্য্যবিনির্ম্মুক্ত, ও ক্ষয়োদয়বিকার-শূন্য, তোমরা সর্ব্বকাল সর্ব্বোৎকৃষ্ট রূপে বিরাজমান রহিয়াছ, তোমরা বিভাকর সৃষ্টি করিয়াদিনরজনীস্বরূপ শুক্ল কৃষ্ণ সূত্রসমূহ দ্বারা সংবৎসররূপ বিচিত্র বস্ত্র বয়ন করিতেছ, তোমরা জীবদিগকে সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগার্থে ভোগস্থান তত্তৎ ভুবনের পথ প্রদর্শন কর, তোমরা জীবাত্মস্বরূপা পক্ষিণীকে পরমাত্মশক্তিরূপ কালপাশ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষরূপ সৌভাগ্যভাগিনী করিয়া থাক। জীবেরা যাবৎ মায়ামোহিত ও বিষয়রস-পরবশ হইয়া ইন্দ্রিয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকে, তাবৎ তাহারা সর্ব্বদোষসংস্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ তোমাদিগকে জড়স্বভাবশরীরাভিন্ন ভাবে ভাবনা করে। ত্রিশতষষ্টিদিবস-রূপ ধেনুগণ সংবৎসররূপ যে বৎস প্রসব করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা ঐ বৎসকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্নফল বেদবিহিতক্রিয়াব্যূহরূপ ধেনুসমূহ হইতে তত্ত্বজ্ঞানরূপ দুগ্ধ দোহন করেন, তোমরা সেই সর্ব্বোৎপাদক সর্ব্বসংহারকারী বৎস উৎপাদন করিয়াছ। অহো-রাত্ররূপ সপ্তশত অর (৪৩) সংবৎসররূপ নাভিতে অবস্থিত এবং দ্বাদশমাসরূপ প্রধিতে নিবেশিত আছে, তোমাদিগের উদ্ভাবিত এই মায়াময় নেমিশূন্য অক্ষয় কালচক্র নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে ; অত্রত্য ও পরলোকস্থিত প্রজাগণ এই বিচিত্র চক্রের সংস্পর্শ হইতে মুক্ত নহে। দ্বাদশ অর, ছয় নাভি ও এক অক্ষ বিশিষ্ট, কর্ম্মফলের আধার স্বরূপ এক চক্র আছে, কালাধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ঐ চক্রে অধিরূঢ় আছেন ; তোমরা আমাকে সেই চক্র হইতে মুক্ত কর, আমি অত্যন্ত বিষাদ প্রাপ্ত হইতেছি। তোমরা পরব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও জড়স্বভাব বিশ্ব প্রপঞ্চ স্বরূপ, তোমরাই কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বরূপ, আকাশাদি নিখিল জড় পদার্থ তোমাদিগের স্বরূপেই লীন হয়, তোমরাই অবিদ্যাদোষে তত্ত্বজ্ঞানসাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ও বিষয়সুখাস্বাদ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিয়া সংসারপাশে বদ্ধ হও। তোমরা সৃষ্টির প্রাক্কালে দশ দিক্, আকাশ-

---

অভিধান মাত্রে হয় না, সুতরাং তন্মতে ঈশ্বর সৃষ্টি বিষয়ে পরমাণুপরতন্ত্র। সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বরের অভিধান মাত্রে সৃষ্টি নহে, প্রকৃতিই সকল সৃষ্টি করেন, প্রকৃতি ব্যতিরেকে সৃষ্টি হয় না।

(৪২) মায়ার দুই শক্তি, আবরণ ও বিক্ষেপ ; আবরণ শক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ তিরোধান এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা বিশ্ব প্রকাশ হয়। লৌকিক দৃষ্টান্তে রজ্জুসর্প স্থলে, আবরণ শক্তি দ্বারা রজ্জুর স্বরূপ তিরোধান ও বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তাহাতে সর্পের আবির্ভাব হয়।

(৪৩) অর, নাভি, প্রধি, নেমি, অক্ষ প্রভৃতি চক্রের অবয়ব বিশেষ।

মণ্ডল, ও সূর্য্য সৃষ্টি করিয়াছ; ঋষিগণ সেই সূর্য্যকৃত কালানুসারে বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং সমুদায় দেবতা ও মনুষ্য ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছেন। তোমরা আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পঞ্চীকরণ (৪৪) করিয়াছ সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক হইতে নিখিল বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া বিষয়ভোগ করিতেছে, এবং সমস্ত দেবতা ও সমস্ত মনুষ্য ভূতল আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। তোমাদিগের ও তোমরা যে পুষ্করমালা ধারণ কর, তাহার বন্দনা করি। নিত্যমুক্ত কর্ম্মফলদাতা অশ্বিনীতনয়দ্বয়ের সহায়তা ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবতারা স্ব স্ব ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ নহেন। হে অশ্বিনীকুমারযুগল! তোমার অগ্রে মুখ দ্বারা অন্নরূপ গর্ভ গ্রহণ কর, পরে অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই গর্ভ প্রসব করে, ঐ গর্ভ প্রসূত হইবামাত্র মাতৃস্তনপানে প্রবৃত্ত হয়। এক্ষণে তোমারা আমার জীবন রক্ষা ও নয়নদ্বয়ের অন্ধত্ব বিমোচন কর।

অশ্বিনীকুমারেরা উপমন্যুর এইরূপ স্তবে তুষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, আমরা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি এবং এক অপূপ দিতেছি, ভক্ষণ কর। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু নিবেদন করিলেন, আপনারা যাহা কহেন, কদাচ তাহার অন্যথা হয় না, কিন্তু আমি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারি না তখন আশ্বিনেয়েরা কহিলেন, পূর্ব্বে আমরা তোমার উপাধ্যায়ের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এক অপূপ দিয়াছিলাম, তিনি গুরুর নিকট নিবেদন না করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন; অতএব তোমার উপাধ্যায় যেরূপ করিয়াছেন, তুমিও সেইরূপ কর। ইহা শুনিয়া উপমন্যু কহিলেন, আমি আপনাদিগকে বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমি গুরুদেবকে না জানাইয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। তদনন্তর অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, আমরা তোমার এইরূপ অবিচলিত গুরুভক্তি দর্শনে সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত সকল লৌহময়, তোমার দন্ত সকল হিরন্ময় (৪৫); তুমি চক্ষুষ্মান্ ও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইবে।

উপমন্যু, অশ্বিনীকুমারবরপ্রভাবে নয়নলাভ করিয়া, উপাধ্যায়সমীপে আগমন ও অভিবাদন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন

---

(৪৪) প্রথমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, এই সূক্ষ্ম পঞ্চ ভূত উৎপন্ন হয়। পরে স্থূল সৃষ্টি সম্পাদনার্থে ঐ পঞ্চ ভূতকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের এক এক অর্দ্ধকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া স্বীয় অর্দ্ধ ব্যতিরেকে অন্য চারি অর্দ্ধে এক এক খণ্ড যোজিত করা যায়। ইহাকে পঞ্চীকরণ কহে।

(৪৫) অর্থাৎ তোমার উপাধ্যায় অত্যন্ত নিষ্ঠুর, তুমি অত্যন্ত সুশীল ও গুরুভক্তিসম্পন্ন।

এবং কহিলেন, অশ্বিনীতনয়েরা যেরূপ কহিয়াছেন, তুমি সেইরূপ সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে, সকল বেদ ও সমুদায় ধর্মশাস্ত্র সর্ব্ব কাল তোমার স্মরণপথারূঢ় থাকিবেক। উপমন্যুর এই পরীক্ষা হইল।

আয়োদধৌম্যের বেদ নামে আর এক শিষ্য ছিলেন। উপাধ্যায় তাঁহাকে এই আদেশ করিলেন, বৎস বেদ! আমার গৃহে থাকিয়া কিছু কাল শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হইবে। তিনি যে আজ্ঞা বলিয়া গুরুশুশ্রূষাতৎপর হইয়া দীর্ঘ কাল গুরুগৃহে অবস্থিতি করিলেন। গুরু তাঁহাকে সর্ব্বদাই কর্ম্মের ভার দিতেন। তিনি শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা জনিত সমস্ত ক্লেশ সহিতেন এবং আদেশ পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন, কখনও কোনও বিষয়ে অনিচ্ছা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বহু কালের পর গুরু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। তদীয় প্রসাদে বেদ, শ্রেয়ঃ, ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। বেদেরও এই পরীক্ষা হইল।

বেদ উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও গৃহাবস্থান কালে তিন শিষ্য হইল। তিনি শিষ্যদিগকে গুরুশুশ্রূষা বা কোন কর্ম্ম করিতে কহিতেন না। স্বয়ং গুরুকুলবাসের দুঃখাভিজ্ঞ ছিলেন, এজন্য শিষ্যদিগকে কখনও কোনও প্রকার ক্লেশ দিতে চাহিতেন না।

কিয়ৎ কাল পরে রাজা জনমেজয় ও পৌষ্য বেদের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়ের কার্য্যে বরণ করিলেন। তিনি যাজনকার্য্যোপলক্ষে প্রস্থান কালে উতঙ্ক নামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, বৎস! আমার অনুপস্থিতি কালে গৃহে যে কোনও বিষয়ের অসংস্থান হইবেক, তুমি তাহা সম্পন্ন করিবে। বেদ উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া প্রবাসে প্রস্থান করিলেন। উতঙ্ক গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

এক দিবস উপাধ্যায়পত্নীরা একত্র হইয়া উতঙ্ককে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমার উপাধ্যায়ানী ঋতুমতী হইয়াছেন, উপাধ্যায় গৃহে নাই; এক্ষণে যাহাতে উঁহার ঋতু নিষ্ফল না হয়, তাহা কর; কাল অতীত হইতেছে। উতঙ্ক তাঁহাদের কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি স্ত্রীলোকের কথায় কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না, গুরু আমাকে এরূপ আদেশ করেন নাই যে, তুমি কুকর্ম্মও করিবে। কিয়ৎ কাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহ-প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উতঙ্কের প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন এবং কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! তোমার কি অভীষ্টসম্পাদন করিব বল, তুমি ধর্ম্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমাদের পরস্পর প্রীতি বৃদ্ধি হইল; এক্ষণে আমি

তোমাকে গৃহগমনের অনুজ্ঞা করিতেছি, তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধি হইবেক, প্রস্থান কর।

এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক নিবেদন করিলেন, আপনকার কি প্রিয়সম্পাদন করিব, আজ্ঞা করুন। এরূপ আপ্তশ্রুতি আছে, যে ব্যক্তি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া অধ্যাপনা করেন, এবং যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগের অন্যতরের মৃত্যু হয়, অথবা পরস্পর বিদ্বেষ জন্মে। অতএব আপনকার অনুজ্ঞা লইয়া অভিমত গুরুদক্ষিণা আহরণের বাসনা করি। এইরূপ অভিহিত হইয়া উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! অপেক্ষা কর, বলিব। কিয়দ্দিন পরে উতঙ্ক উপাধ্যায়ের নিকট নিবেদন করিলেন, মহাশয় আজ্ঞা করুন, কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিলে আপনকার মনঃপ্রীতি হইতে পারে। উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! কিরূপ গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাক; অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীর নিকটে গিয়া, কি আহরণ করিব বলিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি যাহা কহেন, তাহাই আহরণ কর। এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উতঙ্ক উপাধ্যায়ানী সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, ভগবতি! উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমতি দিয়াছেন; এক্ষণে আমার এই বাসনা, আপনকার অভিমত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া গৃহপ্রস্থান করি; অতএব আজ্ঞা করুন, কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব। উপাধ্যায়ানী কহিলেন, বৎস! পৌষ্য রাজার নিকটে যাও; তাঁহার সহধর্ম্মিণী যে দুই কুণ্ডল ধারণ করিয়াছেন, তাহাই প্রার্থনা করিয়া আন; চতুর্থ দিবসে ব্রতনিবন্ধন উৎসব হইবেক, সেই দিন ঐ দুই কুণ্ডল পরিয়া শোভমানা হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেশন করিব; ইহাই সম্পন্ন কর, ইহা করিলেই তোমার সকল মঙ্গল লাভ হইবেক, নতুবা তোমার মঙ্গল নাই।

উতঙ্ক এইরূপে উপাধ্যায়ানী কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে গমন করিতে করিতে এক মহাকায় বৃষভ ও তদুপরি আরূঢ় এক মহাকায় পুরুষ অবলোকন করিলেন। সেই পুরুষ উতঙ্ককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অহে উতঙ্ক! তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতঙ্ক ভক্ষণে সম্মত হইলেন না। তখন সেই পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন, উতঙ্ক! সংশয় করিতেছ কেন, ভক্ষণ কর, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্ব্বে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উতঙ্ক সেই বৃষভের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিলেন এবং ব্যস্ততাপ্রযুক্ত উত্থানানন্তর আচমন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে উতঙ্ক আসনোপবিষ্ট পৌষ্য সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও সমুচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার নিকট যাচকভাবে উপস্থিত হইলাম। রাজা অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! ভৃত্য কি

করিবেক, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণা দিবার নিমিত্ত তোমার মহিষীর কর্ণস্থ কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা তুমি আমাকে দান কর। পৌষ্য কহিলেন, মহাশয়! অন্তঃপুরে গিয়া গৃহিণীর নিকট প্রার্থনা করুন। উতঙ্ক তদীয় বাক্য অনুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু পৌষ্যের মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি পৌষ্যের নিকটে আসিয়া কহিলেন, আমাকে প্রবঞ্চনা করা উচিত নহে, অন্তঃপুরে তোমার মহিষী নাই, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পৌষ্য উতঙ্কবাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণমাত্র অনুধ্যান করিয়া কহিলেন, মহাশয়! নিঃসন্দেহ আপনি উচ্ছিষ্ট ও অশুচি আছেন, মনে করিয়া দেখুন; আমার সহধর্ম্মিণী অতি পতিব্রতা, উচ্ছিষ্ট ও অশুচি থাকিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না, তিনি কখনও অশুচির দৃষ্টিগোচর হয়েন না।

রাজবাক্য বশ্রণানন্তর উতঙ্ক স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি উত্থানানন্তর গমন করিতে করিতে আচমন করিয়াছি। পৌষ্য কহিলেন, ঐ আপনকার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, উত্থানাবস্থায় অথবা গমন করিতে করিতে আচমন করা আর না করা দুই সমান। উতঙ্ক, যথার্থ কহিতেছ বলিয়া, প্রাঙ্মুখে উপবেশন ও পাণি পাদ বদন প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিঃশব্দ, অফেন, অনুষ্ণ, হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট (৩৬) জল দ্বারা বারত্রয় আচমন ও বারদ্বয় ইন্দ্রিয় মার্জন ও পুনর্ব্বার আচমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। পৌষ্যপত্নী দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান, অভিবাদন, ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন্ কি করিব। উতঙ্ক কহিলেন, গুরুদক্ষিণার্থে কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহা দান কর। তিনি তাঁহার ব্রতীয়সী গুরুভক্তি দর্শনে প্রসন্না ও প্রীতা হইলেন, এবং ইনি অতি সৎপাত্র, ইঁহার অভ্যর্থনা ভঙ্গ হওয়া উচিত নহে এই বিবেচনা করিয়া কর্ণ হইতে অবমোচন পূর্ব্বক তদীয় হস্তে কুণ্ডলদ্বয় সমর্পণ করিয়া কহিলেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডলের নিমিত্ত অত্যন্ত লোলুপ হইয়া আছেন, অতএব আপনি

---

(৩৬) মনু কহেন, যে জলে বুদ্বুদশব্দ ও ফেন সম্বন্ধ না থাকে ও যাহা উষ্ণ না হয়, তাহাতেই আচমন করিবেক। আর আচমনজল হৃদয়পর্য্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ পবিত্র হয়েন। যথা

অনুষ্ণাভিরফেনাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ। ২। ৬১।
হৃদ্গাভিঃ পূয়তে বিপ্রঃ কণ্ঠগাভিস্তু ভূমিপঃ।
বৈশ্যোঽদ্ভিঃ প্রাশিতাভিস্তু শূদ্রঃ স্পৃষ্টাভিরন্ততঃ। ২। ৬২।

সাবধান হইয়া লইয়া যাইবেন। উতঙ্ক কহিলেন, তোমার কোন উদ্বেগ নাই নাগরাজ তক্ষক আমাকে অভিনব করিতে পারিবেন না।

উতঙ্ক ইহা কহিয়া সমুচিত আমন্ত্রন পূর্ব্বক রাজপত্নীর নিকট বিদায় লইয়া পৌষ্যসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, মহারাজ! আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। অনন্তর পৌষ্য উতঙ্কের নিকট নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সর্ব্বদা সৎপাত্র সংযোগ ঘটে না। আপনি অতি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আতিথ্য করিতে চাই, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। উতঙ্ক কহিলেন, ভাল, অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু তুমি সত্বর হইয়া যাহা উপস্থিত আছে, তাহাই আনয়ন কর। তদনুসারে তিনি, যে অন্ন উপস্থিত ছিল, তাহাই আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করিতে দিলেন। উতঙ্ক সেই অন্ন কেশসংস্পর্শ-দূষিত ও শীতল দেখিয়া অশুচি বোধ করিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে অশুচি দিলে, অতএব অন্ধ হইবেক। শাপ শুনিয়া পৌষ কহিলেন, অদুষ্ট অন্ন দূষিত কহিতেছ, অতএব তুমি নির্ব্বংশ হইবে। তখন উতঙ্ক কহিলেন, অশুচি অন্ন আহার করিতে দিয়া পুনর্ব্বার অভিশাপ দেওয়া উচিত নহে, তুমি বরং অন্ন প্রত্যক্ষ কর। অনন্তর পৌষ স্বচক্ষে সেই অন্নের অশুচি ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন।

এইরূপে সেই অন্নের অশুচিত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া পৌষ্য উতঙ্ককে অনুনয় করিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি না জানিয়া এই কেশসংস্পর্শদূষিত শীতল অন্ন আনিয়াছি অতএব ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; এই অনুগ্রহ করুন, যে অন্ধ না হই। উতঙ্ক কহিলেন, আমার কথা মিথ্যা হয় না; অতএব একবার অন্ধ হইয়া অতি ত্বরায় অন্ধত্বদোষ হইতে মুক্ত হইবে। আর তুমি আমাকে শাপ দিয়াছ, তাহা কিন্তু যেন না ফলে। পৌষ কহিলেন, আমি শাপ সংবরণে সমর্থ নহি; এখন পর্য্যন্তও আমার কোপোপশম হয় নাই। আপনি কি ইহা জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় কোমল; তাঁহারা বাক্য তীক্ষ্ণধার ক্ষুরের ন্যায়। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের এই দুই বিপরীত; তাহার বাক্য নবনীত ও হৃদয় তীক্ষ্ণধার ক্ষুর। অতএব জাতিস্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণহৃদয়তা প্রযুক্ত আমি শাপ অন্যথা করিতে পারি না। তখন উতঙ্ক কহিলেন, তুমি অন্নের অশুচিত্ব প্রতক্ষ্য করিয়া আমার অনুনয় করিলে। পূর্ব্বে কহিয়াছিলে, নির্দোষ অন্নকে দূষিত কহিতেছ, অতএব নির্ব্বংশ হইবে, কিন্তু অন্ন যখন দোষযুক্ত প্রমাণ হইল; তখন আর আমাকে শাপ লাগিবেক না। এক্ষণে আমি চলিলাম। এই বলিয়া কুণ্ডল লইয়া উতঙ্ক প্রস্থান করিলেন।

উতঙ্ক পথিমধ্যে অবলোকন করিলেন, এক নগ্ন ক্ষপণক (৪৭) বারংবার দৃশ্য ও বারংবার অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছেন। তদনন্তর সেই কুণ্ডল ভূতলে রাখিয়া শৌচ আচমনাদি উদককার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই অবসরে সেই ক্ষপণক সত্বর তথায় উপস্থিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। উতঙ্ক উদককার্য্য সমাপন করিয়া শুচি ও সংযত হইয়া দেব গুরু প্রণাম পূর্ব্বক অতি বেগে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। এবং তক্ষক অত্যন্ত সন্নিহিত হইলে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। সে, গৃহীতমাত্র ক্ষপণকরূপ পরিত্যাগ করিয়া তক্ষকরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অকস্মাৎ আবির্ভূত সম্মুখবর্ত্তী মহাগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল, এবং নাগলোকে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিল। উতঙ্ক পৌষ্যপত্নীর বাক্য স্মরণ করিয়া তক্ষকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং প্রবেশমার্গ নিরর্গল করিবার নিমিত্ত দণ্ডকাষ্ঠ দ্বারা সেই মহাগর্ত্ত খনন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে এইরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া, যাইয়া এই ব্রাহ্মণের সাহায্য কর, স্বীয় বজ্রকে এই আদেশ দিয়া তাঁহার সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। বজ্র দণ্ডকাষ্ঠে আবির্ভূত হইয়া সেই গর্ত্ত বিদীর্ণ করিয়া পথ প্রস্তুত করিলে, উতঙ্ক তদ্দ্বারা নাগলোকে প্রবিষ্ট হইলেন—

উতঙ্ক এইরূপে নাগলোকে প্রবেশ করিয়া অনেকবিধ শত শত প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, বলভী (৪৮), নির্য্যূহ (৪৯), এবং নানাবিধ ক্রীড়াভূমি ও আশ্চর্য্যস্থান অবলোকন করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে নাগগণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, ঐরাবত যে সকল সর্পের অধিপতি, এবং যাঁহারা যুদ্ধে অতিশয় শোভমান ও বিদ্যুদ্যুক্ত পবনপ্রেরিত মেঘসমূহের ন্যায় বেগগামী, তাঁহারা ও ঐরাবতোৎপন্ন অন্যান্য সুরূপ বহুরূপ বিচিত্র কুণ্ডলালঙ্কৃত সর্পেরা সূর্য্যের ন্যায় স্বর্গলোকে বিরাজমান আছেন। গঙ্গার উত্তরতীরে নাগদিগের যে বহুসংখ্যক বাসস্থান আছে, আমি তত্রত্য মহৎ নাগদিগকে নিরন্তর স্তব করি। ঐরাবতব্যতিরিক্ত আর কে সূর্য্যরশ্মিসমূহে ভ্রমণ করিতে পারে? যখন এই ধৃতরাষ্ট্র প্রস্থান করেন, তখন অষ্টাবিংশতি সহস্র অষ্ট নাগ তাঁহার অনুগামী হয়েন। যাঁহারা এই ধৃতরাষ্ট্রের অনুগামী ও যাঁহারা দূর পথ প্রস্থিত, সেই সমস্ত ঐরাবতজ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগকে প্রণাম করি। পূর্ব্বকালে যাঁহার কুরুক্ষেত্রে ও খাণ্ডবে বাস ছিল, আমি কুণ্ডলের নিমিত্ত সেই নাগরাজ তক্ষকের স্তব করি। তক্ষক ও অশ্বসেন

---

(৪৭) কোনও গ্রন্থকার ক্ষপণকদিগকে বৌদ্ধ উদাসীন এবং কেহ কেহ জৈন উদাসীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দগিরিকৃত শঙ্করদিগ্বিজয়ে লিখিত আছে, তাহারা কালের উপাসনা করিত।

(৪৮) গৃহচূড়া।

(৪৯) নাগদন্ত, অর্থাৎ গৃহাদির ভিত্তিনির্গত কাষ্ঠদণ্ড।

উভয়ে সর্ব্বকালে পরস্পর সহচর হইয়া কুরুক্ষেত্রে ইক্ষুমতী নদীতীরে বাস করিয়াছিলেন, যে মহাত্মা তক্ষকপুত্র শ্রুতসেন নাগপ্রধান্যলাভাকাঙ্ক্ষী কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন তাঁহাকে প্রণাম করি।

ব্রহ্মর্ষি উতঙ্ক এইরূপে নাগশ্রেষ্ঠদিগের স্তব করিয়াও কুণ্ডল না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। নাগগণের স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন না, তখন দেখিলেন, দুই স্ত্রী উত্তম বেমযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ। ইহাও দেখিলেন, ছয় কুমার দ্বাদশ অরবিশিষ্ট এক চক্র পরিবর্ত্তিত করিতেছে। আর এক পুরুষ সুন্দরাকার এক অশ্ব অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বক্ষ্যমাণ প্রকারে তাহাদিগের সকলের স্তব করিতে লাগিলেন।

উতঙ্ক কহিলেন, এই আকল্পস্থায়ী নিত্য ভ্রমণশীল চতুর্বিংশতিপর্ব্বযুক্ত চক্রে ত্রিশত ষষ্টি তন্তুজাল অর্পিত আছে, ঐ চক্রকে ছয় কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। বিচিত্ররূপা দুই যুবতী শুক্ল কৃষ্ণ সূত্র দ্বারা এক তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছেন, তাঁহারাই সমস্ত ভূত ও চর্ব্বদ্দর্শ ভুবন উৎপাদন করেন। যে বজ্রধারী, ভুবনপালক, বৃত্রহন্তা, নমুচিঘাতী, কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রযুগলপরিধায়ী মহাত্মা লোকে সত্য ও অনৃত বিভক্ত করেন, এবং যিনি এই বিশ্বশরীর সৃজন করিয়া তাহাতে প্রতিবিম্বরূপে প্রবেশ করেন, সেই সকলভুবননিয়ন্তা ত্রিলোকনাথ পুরন্দরকে প্রণাম করি।

অনন্তর সেই পুরুষ উতঙ্ককে কহিলেন, আমি তোমার এই স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার কি উপকার করিব, বল। উতঙ্ক কহিলেন, এই করুন, যেন সমস্ত নাগ আমার বশে আইসে। তখন সেই পুরুষ কহিলেন, এই অশ্বের আপনদেশে অগ্নি প্রদান কর। তদনুসারে উতঙ্ক সেই অশ্বের অপানে অগ্নি যোজনা করিলেন। এইরূপ করাতে অশ্বের সমুদায় শরীররন্ধ্র হইতে ধূমসহিত অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দ্বারা নাগলোক উত্তাপিত হইলে, তক্ষক ব্যাকুল ও অগ্নির উত্তাপ ভয়ে বিষণ্ণ হইয়া, হস্তে কুণ্ডল লইয়া সহসা স্বীয় আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ককে কহিলেন, কুণ্ডল গ্রহণ কর। উতঙ্ক কুণ্ডল গ্রহণ করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, অদ্য উপাধ্যায়ানীর ব্রতদিবস, কিন্তু আমি অনেক দূরে আসিয়াছি, কি রূপে কার্য্য সিদ্ধি হইবেক।

উতঙ্ককে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া সেই পুরুষ কহিলেন, উতঙ্ক! তুমি এই অশ্বে আরোহণ কর, এ তোমাকে ক্ষণকালমধ্যেই গুরুকুলে লইয়া যাইবেক। তদনুসারে উতঙ্ক সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া উপাধ্যায়গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। উপাধ্যায়ানী স্নান করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক কেশ সংস্কার করিতে করিতে উতঙ্ক আসিল না বলিয়া তাঁহাকে শাপ দিবার উদ্যম করিতেছেন, এই সময়ে তিনি উপাধ্যায়গৃহে

প্রবেশ পূর্ব্বক উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদন করিয়া কুণ্ডল প্রদান করিলেন। উপাধ্যায়নী কহিলেন বৎস উতঙ্ক! যথাকালে ও যথাযোগ্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছ, কেমন, সুখে আসিয়াছ? আমি ভাগ্যে অকারণে তোমাকে শাপ দি নাই। তোমার তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, তুমি সিদ্ধি প্রাপ্ত হও।

অনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়ানীর নিকট বিদায় লইয়া উপাধ্যায়সন্নিধানে উপস্থিত অভিবাদন করিলেন। উপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বৎস উতঙ্ক! এত বিলম্ব হইল কেন? উতঙ্ক কহিলেন, মহাশয়! নাগরাজ তক্ষক কুণ্ডলাহরন বিষয়ে বিষম বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল, তন্নিমিত্ত নাগলোকে গিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, দুই, স্ত্রী তন্ত্রে বসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছে, সেই তন্ত্রের সূত্র সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ; আপনাকে জিজ্ঞাসা করি সে কি? আর দ্বাদশ অর বিশিষ্ট এক চক্র দেখিলাম, ছয় কুমার ঐ চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, সেই বা কি? আর এক পুরুষ ও মহাকায় এক অশ্ব দেখিলাম, তাহারাই বা কে? আর গমনকালে এক বৃষ দর্শন করিয়াছিলাম, ঐ বৃষে এক পুরুষ আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি সানুনয় বচনে কহিলেন, উতঙ্ক! এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্ব্বে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। পরে আমি তাঁহার কথানুসারে সেই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ করিলাম, তিনিই বা কে? আমি আপনার নিকট এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।

উতঙ্কের এইরূপ জিজ্ঞাসা বাক্য শ্রবণ করিয়া উপাধ্যায় কহিলেন, বৎস! যে দুই স্ত্রী দেখিয়াছ, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বর; আর এক শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ সূত্র সকল রাত্রি ও দিবা; যে দ্বাদশ অর বিশিষ্ট চক্র ছয় কুমারে পরিবর্ত্তিত করিতেছেন, সে চক্র সংবৎসর, ছয় কুমারেরা ছয় ঋতু; যে পুরুষ দেখিয়াছ, তিনি ইন্দ্র; যে অশ্ব, তিনি অগ্নি। আর পথে যাইবার সময় যে বৃষ দেখিয়াছিলে, তিনি করিরাজ ঐরাবত; যে পুরুষ তদুপরি আরূঢ় ছিলেন, তিনি ইন্দ্র; আর সেই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত; উহা ভক্ষণ করিয়াছিলে, তাহাতেই তুমি নাগলোকে রক্ষা পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা, তোমার ক্লেশ দর্শনে অনুকম্পাপরবশ হইয়া তোমাকে এই অনুগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই কুণ্ডল লইয়া পুনরাগত হইয়াছ। অতএব, প্রিয় বৎস! আমি তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, গৃহে গমন কর। তুমি সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে।

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লাভ করিয়া তক্ষকের বৈরনির্য্যাতন সঙ্কল্প করিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজা জনমেজয়ের নিকট গমন করিলেন। রাজা পূর্ব্বে তক্ষশিলা জয়ার্থ প্রস্থান করিয়া-

ছিলেন, তথায় সম্যক্ জয় লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উতঙ্ক মন্ত্রিবর্গপরিবৃত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজাকে, জয়োঽস্তু বলিয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া সাধুশব্দালঙ্কৃত বাক্যে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! তুমি কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া বালকপ্রায় কর্ম্মান্তরে ব্যাসক্ত হইয়া আছ।

রাজা জনমেজয় এইরূপ ব্রাহ্মণবাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি অতিথিসৎকার সমাধান পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপেক্ষা নাই, আমি প্রজাপালন দ্বারা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছি। এক্ষণে আপনি কি উদ্দেশে আগমন করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। পুণ্যশীল উতঙ্ক মহাত্মা রাজার কথা শুনিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি যে কর্ম্মে অনুরোধ করিব, তাহা তোমারই কার্য্য। যে দুরাত্মা তক্ষক তোমার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছে, তুমি তাহাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর। ঐ বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মহারাজ! স্বীয় মহাত্মা পিতার বৈর নির্য্যাতন কর। দুরাত্মা তক্ষক বিনা অপরাধে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সর্পকুলাধম তক্ষক বলদর্পে উদ্ধত হইয়া যে তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি অকার্য্য হইতে পারে? ধন্বন্তরি রাজর্ষিবংশরক্ষাকর্ত্তা দেবতুল্য রাজার প্রাণরক্ষার্থে আসিতেছিলেন, ঐ পাপাত্মাই তাঁহাকে নিবৃত্ত করে (৫০)। অতএব মহারাজ! অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপিষ্ঠকে প্রজ্বলিত হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান কর। ইহা করিলেই পিতার বৈর নির্য্যাতন করা হইবেক এবং আনুষঙ্গিক আমারও মহত্তর অভীষ্ট সম্পন্ন হইবেক। মহারাজ! আমি গুরুদক্ষিণা আহারার্থ যাত্রা করিয়াছিলাম, তাহাতে ঐ দুরাত্মা যৎপরোনাস্তি বিঘ্ন ঘটাইয়াছিল।

সৌতি কহিলেন, রাজা জনমেজয় শুনিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। যেমন হবিঃ প্রয়োগ করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইপ্রকার উতঙ্কবাক্যরূপ হবিঃ-প্রক্ষেপ দ্বারা রাজার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন রাজা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উতঙ্কের সমক্ষেই মন্ত্রীদিগের পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র জনমেজয় উতঙ্কমুখে পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র দুঃখে ও শোকে অভিভূত হইলেন।

---

(৫০) শমীক মুনির পুত্র রাজা পরীক্ষিৎকে অভিসম্পাত করিলে তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিতে যাইতেছিল, ধন্বন্তরি তাহা জানিতে পারিয়া বিষচিকিৎসা দ্বারা রাজার প্রাণরক্ষার্থে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক তাঁহার পরিচয় পাইয়া যথেষ্ট ধন দানাদি দ্বারা তাঁহাকে নিবৃত্ত করে।

চতুর্থ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব।

সৌতি কহিলেন, নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে যে সমস্ত ঋষি সমাগত হইয়াছিলেন, সূতকুলোদ্ভব লোমহর্ষণপুত্র পৌরাণিক উগ্রশ্রবাঃ পুরাণকীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাদের চিত্তরঞ্জন করিতেছিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, হে মহর্ষিগণ! রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রানুষ্ঠানের কারণান্তর স্বরূপ উতঙ্কচরিত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আপনারা আর কি শুনিতে বাসনা করেন? আজ্ঞা করুন, আর কি বর্ণনা করিব।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণপুত্র! আমরা শ্রবণবানদাপরবশ হইয়া কথা প্রসঙ্গক্রমে যে যে বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তৎসমুদায় বর্ণন করিবে। এক্ষণে কুলপতি শৌনক অগ্নিগৃহে অবস্থিত আছেন; তিনি দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সর্প, ও গন্ধর্ব্ব ঘটিত অলৌকিক তাবৎ বৃত্তান্ত জানেন; তিনি বিদ্বান্, কার্য্যদক্ষ, ব্রতপরায়ণ, বেদ ও বেদান্তশাস্ত্রের অদ্বিতীয় গুরু, সত্যবাদী, শান্তচিত্ত, তপস্যারত; তিনি আমাদিগের সকলের গুরু, মহামান্য, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা কর। তিনি পরমপূজিত আসনে আসীন হইয়া যাহা জিজ্ঞাসিবেন, তাহাই কহিবে।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তাহাই ভাল, সেই মহাত্মা আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসিলেই পরম পবিত্র বহুবিধ কথা কীর্ত্তন করিব। অতপর বিপ্রকুলতিলক মহর্ষি শৌনক যথাবিধি দেবযজ্ঞ পিতৃতর্পণ প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সমাপন করিয়া, যে স্থানে উগ্রশ্রবাঃ ও ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! তোমার পিতা, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সমীপে, সমস্ত পুরাণ ও আদ্যোপান্ত ভারত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তুমিও সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। পুরাণে সমুদায় অলৌকিক কথা ও সমস্ত আদিবংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; তন্মধ্যে প্রথমতঃ আমি ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি। তুমি সেই কথা কীর্ত্তন কর, আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিব।

এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া সূতপুত্র উগ্রশ্রবাঃ নিবেদন

করিলেন, বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহানুভাব দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ পূর্ব্ব কালে সম্যক্ রূপে যাহা অধ্যয়ন ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমার পিতা যাহা অধ্যয়ন করেন, এবং পরে আমি তাঁহার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ভৃগবংশ ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের ও অশেষ ঋষিকুলের পূজনীয়; পুরাণে সেই বিখ্যাত বংশের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা আমি যথাবৎ করিতেছি। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন; আমরা শুনিয়াছি, ভগবান্ ভৃগু সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে উৎপন্ন হন; ভৃগুর পুত্র চ্যবন, চ্যবনের পুত্র পরমধার্ম্মিক প্রমতি, ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মেন। প্রমদ্বরাগর্ভে রুরুর শুনকনামা পুত্র জন্মিলেন। তিনিই তোমার কুলের প্রধান পুরুষ। তিনি ধার্ম্মিক, বেদপারগ, তপস্বী, যশস্বী, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক কহিলেন, হে সূতপুত্র! মহাত্মা ভৃগুনন্দন চ্যবন নামে বিখ্যাত হইলেন কেন, তুমি তাহার সবিশেষ বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ ভৃগুর পুলোমা নামে ভুবনবিখ্যাতা প্রেয়সী ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। তাঁহার সহযোগে পুলোমা গর্ভবতী হইলেন। এক দিবস, পরমধার্ম্মিক ভৃগু স্নানার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে, পুলোমা নামে এক রাক্ষস তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইল। সে আশ্রমপ্রবেশানন্তর পরমসুন্দরী ভৃগুপত্নীকে নয়নগোচর করিয়া কামাবিষ্ট ও বিচেতন হইল। চারুদর্শনা পুলোমা তপোবনসুলভ ফল মূল্যাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। রাক্ষস মন্মথশরপ্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া, এই কামিনীকে হরণ করিব, এই নিশ্চয় করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইল। পুলোমা অগ্রে ঐ চারুহাসিনী কন্যাকে, মমেয়ং ভার্য্যা, বলিয়া বরণ করিয়াছিল, পশ্চাৎ তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রবিধানানুসারে ভৃগুকে প্রদান করেন। এই অবমাননা অনুক্ষণ তাহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এক্ষণে সে অবসর পাইয়া হরণ করিবার মানস করিল।

রাক্ষস এইরূপে পুলোমাহরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশ করিল, এবং প্রজ্বলিত হুতাশনসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে পাবক! তুমি দেবতাদিগের মুখ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ বল, এই কামিনী কাহার ভার্য্যা? আমি এই বরবর্ণিনীকে অগ্রে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলাম, পরে ইহার পিতা অধর্ম্মকারী ভৃগুকে দান করেন। অতএব এই নির্জনবাসিনী নিতম্বিনী যদি ভৃগুর ভার্য্যা হয় বল, ইহাকে আমি আশ্রম হইতে হরণ করিবার মানস করিয়াছি। ভৃগু যে আমার পূর্ব্ববৃতা রূপবতী ভার্য্যাকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই ক্রোধানল অদ্যাপি আমার হৃদয় দাহ করিতেছে।

দুরাত্মা রাক্ষস জ্বলিত অগ্নিকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া, ভৃগুভার্য্যা বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, হে হুতাশন! তুমি সর্ব্ব কাল সর্ব্ব ভূতের অন্তরে পুণ্যপাপের সাক্ষিস্বরূপ অবস্থিত আছ, অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ বল, পাপকারী ভৃগু আমার পূর্ব্ববৃতা কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিল, এই সেই কামিনী আমার ভার্য্যা কিনা? তোমার নিকট ইহার তত্ত্বার্থ শ্রবণ করিয়া তোমার সমক্ষেই ভৃগুভার্য্যাকে আশ্রম হইতে হরণ করিব।

রাক্ষসের এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া, অগ্নি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং এক পক্ষে মিথ্যা কথন, পক্ষান্তরে ভৃগুশাপ, উভয় ভয়ে ভীত হইয়া অনুদ্ধত স্বরে কহিলেন, হে দানবনন্দন! তুমি পূর্ব্বে ইহাকে বরণ করিয়াছিলে, যথার্থ বটে, কিন্তু তৎকালে তোমার মন্ত্র প্রয়োগ ও বিধি পূর্ব্বক বরণ করা হয় নাই। ইহার পিতা সৎপাত্র লোভাক্রান্ত হইয়া ভৃগুকে দান করিয়াছেন, তোমাকে দেন নাই। মহর্ষি ভৃগুও বেদদৃষ্ট বিধি ও পরম্পরাগত প্রণালী অনুসারে আমাকে সাক্ষী করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তথাপি তুমি পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলে, এই নিমিত্ত ইনি তোমারই ভার্য্যা। আমি মিথ্যা কহিতে পারিব না, লোকে কোন কালে মিথ্যার আদর নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাক্ষস অগ্নির এইরূপ বাক্য শুনিয়া বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভৃগুপত্নীকে হরণ করিয়া অদ্ভুত বেগে পলায়ন করিল। তখন পুলোমার গর্ভস্থ বালক পাপাত্মা রাক্ষসের অত্যাচার দর্শনে রোষপরবশ হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইলেন, তাহাতেই তাঁহার নাম চ্যবন হইল। রাক্ষস সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মাতৃগর্ভবিনিঃসৃত শিশুকে নয়নগোচর করিবামাত্র পুলোমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভস্মসাৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

অনন্তর পুলোমা, ভৃগুর ঔরস পুত্র চ্যবনকে ক্রোড়ে করিয়া সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তা হইয়া, অশ্রুমুখে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সর্ব্বলোক-প্রশংসিতা ভৃগুভার্য্যাকে রোদনপরায়ণা ও অশ্রুপূর্ণনয়না অবলোকন করিয়া তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। নিতান্ত দুঃখিতা ভৃগুপত্নী রোদন করিতে করিতে যেমন প্রস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহার অশ্রুবিন্দু বর্ষণ দ্বারা এক মহানদী উৎপন্ন হইল। ভগবান্ প্রজাপতি সেই নদীকে পুত্রবধূর অনুসরণে প্রবৃত্তা দেখিয়া তাহার নাম বধূসরা রাখিলেন। প্রতাপশালী ভৃগুপুত্র চ্যবন নামে বিখ্যাত হইবার এই কারণ।

পুলোমা পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া এইরূপে আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি ভৃগু স্নানক্রিয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও তনয়কে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, কোপাকুল চিত্তে পুলোমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে চারুহাসিনি! হরণোদ্যত দুরাত্মা রাক্ষসের নিকট কে তোমার পরিচয় দিল? সে পাপিষ্ঠ তোমাকে আমার ভার্য্যা বলিয়া জানিত না। তুমি সবিশেষ সমস্ত বল; আমি এখনি তাহাকে শাপ দিতেছি। কোন ব্যক্তি আমার শাপে ভীত নহে? কাহার এই দুষ্ট কর্ম্ম করিতে সাহস হইল?

এইরূপে স্বামিকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলোমা নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অগ্নি সেই রাক্ষসের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করেন, তৎপরে সেই পাপাত্মা আমাকে হরণ করে। আমি অনাথার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম; পরে তোমার এই পুত্রের প্রভাবে রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছি; দুরাত্মা নিশাচর ইহার তেজে ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ভৃগু পুলোমাবাক্যশ্রবণে অতিক্রুদ্ধ হইয়া, তুমি সর্ব্বভক্ষ হইবে, এই বলিয়া অগ্নিকে শাপ প্রদান করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব।

অগ্নি ভৃগুদত্ত শাপ শ্রবণে জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি কারণে তুমি সহসা আমাকে শাপ দিলে? জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য কহিয়াছি ইহাতে আমার অপরাধ কি? আমি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াছি ও পক্ষপাত-বিহীন হইয়া সত্য কহিয়াছি। যে সাক্ষী, জিজ্ঞাসিত হইয়া, জানিয়াও অন্যথা কহে, সে স্বকুলজাত উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে নিরয়গামী করে; আর যে ব্যক্তি উপস্থিত কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও না কহে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয়। যাহা হউক, আমিও তোমাকে শাপ দিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণকে মান্য করি, এজন্য ক্ষান্ত হইলাম। তুমি সমুদয় জান, তথাপি কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যোগবলে আত্মাকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিভেদে অগ্নিহোত্র, গর্ভাধান, জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়া সমুদায়ে অধিষ্ঠিত আছি; বেদোক্ত বিধান অনুসারে আমাতে যে হবিঃ হুত হয়, তদ্দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হয়েন; হূয়মান সোমরস প্রভৃতি দ্রব্য যাবতীয় দেবগণ ও পিতৃগণের শরীররূপে পরিণত হয়। দেবগণ ও পিতৃগণ, উভয়ের উদ্দেশে দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগ একত্র অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত দেবগণ ও পিতৃগণ অভিন্নস্বরূপ, পর্ব্বকালে কখন একত্র ও কখন

বা পৃথগনভাগে পূজিত হয়েন। আমাতে যে আহুতি প্রদত্ত হয়, দেবতা ও পিতৃগণ তাহা ভক্ষণ করেন, অতএব আমি দেবতাদিগের ও পিতৃগণের মুখ। অমাবস্যাতে পিতৃগণকে ও পূর্ণিমাতে দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া লোকে আমার মুখে আহুতি প্রদান করে, তাঁহারও আমার মুখেই ভক্ষণ করেন।

ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া অগ্নি দ্বিজগণের অগ্নিহোত্র ও যজ্ঞক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অগ্নি অন্তর্ধান করাতে প্রজাগণ, ওঙ্কার, বষট্‌কার, স্বধা, স্বাহা শূন্য হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল। তদ্দর্শনে ঋষিগণ উদ্বিগ্ন চিত্তে দেবতাদিগের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, হে দেবগণ! অগ্নির অন্তর্ধান বশতঃ অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া লোপ হওয়াতে লোকত্রয় কিঙ্কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে; অতএব যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন, কালাতিপাতের সময় নাই। অনন্তর ঋষিগণ ও দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া অগ্নির শাপ ও তন্নিবন্ধন ক্রিয়ালোপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! ভৃগু কোনও কারণ বশতঃ অগ্নিকে শাপ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি দেবতাদিগের মুখ ও যজ্ঞের অগ্রভাগভোক্তা হইয়া কি রূপে সর্ব্বভক্ষ হইবেন? সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের নিবেদন শুনিয়া অগ্নিকে আহ্বান পূর্ব্বক মনোহর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি সর্ব্ব-লোকের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা; তুমি ত্রিলোক ধারণ করিয়া আছ; তুমি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক, হে লোকনাথ! এক্ষণে যাহাতে ক্রিয়ালোপ না হয়, তাহা কর। তুমি ঈশ্বর হইয়া এমন বিমূঢ় হইতেছে কেন? তুমি সর্ব্ব কাল পবিত্র; তুমি সর্ব্ব ভূতের গতি। অতএব তুমি সর্ব্ব শরীরে সর্ব্বভক্ষ হইবে না। তোমার অপান দেশে যে সকল শিখা আছে তাহারাই সর্ব্ব বস্তু ভক্ষণ করিবেক এবং তোমার মাংসভক্ষণী যে তনু আছে, সেই সর্ব্বভক্ষ হইবেক। যেমন সূর্য্যকিরণসংস্পর্শে সর্ব্ব বস্তু শুচি হয়, সেইরূপ তোমার শিখা সমূহ দ্বারা দগ্ধ হইয়া সর্ব্ব বস্তু শুচি হইবেক। হে পাবক! তুমি পরম তেজঃপদার্থ, স্বীয় প্রভাবে নির্গত হইয়াছে; এক্ষণে স্বীয় তেজঃ দ্বারাই ঋষির শাপকে সত্য কর এবং তোমার মুখে আহুতিরূপে প্রদত্ত দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ কর।

অগ্নি পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া তদীয় আদেশ প্রতিপালনার্থে প্রস্থান করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। ঋষিগণ পূর্ব্ববৎ সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। দেবলোকে দেবগণ ও পৃথিবীতে যাবতীয় ভূতগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অগ্নিও শাপবিমুক্ত হইয়া পরম প্রীত লাভ করিলেন।

ভগবান্ অগ্নি এইরূপে পূর্ব্ব কালে ভৃগু হইতে শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অগ্নি-

শাপসম্বন্ধ পূর্ব্ব কালে ইতিহাস, পুলোমা রাক্ষসের বিনাশ, ও চ্যবনের উৎপত্তি কীর্ত্তিত হইল।

অষ্টম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব

সূত কহিলেন, ভৃগুপুত্র চ্যবনের ঔরসে সুকন্যাগর্ভে প্রমতি নামে অতি তেজস্বী-তনয় উৎপন্ন হইলেন। প্রমতিও ঘৃতাচীগর্ভে রুরুনামক এবং রুরুও প্রমদ্বরাগর্ভে শুনক-নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। সেই সুপ্রসিদ্ধ মহাতেজাঃ রুরুর আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিব, হে ঋষিপ্রবর শৌনক! শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে স্থূলকেশনামা সর্ব্বভূতহিতকারী তপঃপরায়ণ বিদ্যাবান্ এক মহর্ষি ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুসহযোগে মেনকানাম্নী অপ্সরা গর্ভবতী হইযাছিল। নির্লজ্জা নির্দয়া মেনকা, যথাকালে স্থূলকেশের আশ্রমে উপস্থিত হইযা, তথায় গর্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীতীরে প্রস্থান করিল। সেই গর্ভে এক পরম সুন্দরী কন্যা জন্মিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মহর্ষি স্থূলকেশ তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই দেবীকন্যাসদৃশী সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে অসহায়িনী পরিত্যক্তা দেখিয়া, অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইলেন, তাহাকে কন্যা স্বরূপে পরিগ্রহ করিয়া স্বসন্তাননির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং যথাক্রমে বিধি পূর্ব্বক তাহার জাতকাদি সমস্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। কন্যা সেই শুভপ্রদ আশ্রমপদে দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই কন্যাকে রূপে, গুণে, ও শীলে সকল প্রমাদা অপেক্ষা বরা অর্থাৎ উত্তমা দেখিয়া, মহর্ষি তাহার নাম প্রমদ্বরা রাখিলেন।

এক দিবস প্রমতিনন্দন রুরু আশ্রমবাসিনী প্রমদ্বরাকে নয়নগোচর করিয়া মদন-বাণে আহত হইলেন, এবং নিজ মনোরথ স্বীয় প্রিয়বয়স্য দ্বারা আত্মপিতার গোচর করিলেন। তদনুসারে প্রমতি স্থূলকেশসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া আপন পুত্রার্থে সেই কন্যা প্রার্থনা করিলেন। স্থূলকেশ ফল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহের দিন স্থির করিয়া রুরুকে প্রমদ্বরা প্রদান করিলেন।

বিবাহের কিছু পূর্ব্বে, এক দিন প্রমদ্বরা সখীগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করিতেছিল। তাহার ক্রীড়া স্থানে এক সর্প সুপ্ত পতিত ছিল। আসন্নমরণা প্রমদ্বরা অজ্ঞাতসারে সেই সর্পের উপর পদার্পণ করিল, এবং সর্প কুপিত হইয়া বিষাক্ত দশন দ্বারা দংশন করিবামাত্র, বিশ্রী, বিবর্ণা, বিবেতনা ও মুক্তকেশা হইয়া ভূতলে পতিতা হইল।

তদ্দর্শনে তদীয় বন্ধুগণ নিরানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু সে গতজীবনা ও হতশ্রী হইয়াও পুনর্ব্বার রমণীয় দর্শনা হইয়া সুপ্তার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ফলতঃ, প্রমদ্বারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোহরা হইল।

এইরূপে ভূতলপতিতা গতপ্রাণা প্রমদ্বরাকে সেই অবস্থায় তাহার পিতা ও অন্যান্য তপস্বিগণ অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজানু, কুশিক, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস, আর্ষ্টিষেণ, গৌতম ও পুত্রসহিত প্রমতি এবং অন্যান্য বনবাসী তপস্বিগণ অনুকম্পাপরবশ হইয়া তথায় সমাগমন করিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাকে ভুজঙ্গবিষপ্রভাবে কালগ্রাস-দেখিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রুরু তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নবম অধ্যায়—পৌলোম পর্ব্ব

সৌতি কহিলেন, সেই সমস্ত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তথায় উপবিষ্ট রহিলেন, রুরু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গহন বন প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি শোকাভিভূত হইয়া কাতর বচনে বহুতর বিলাপ করত প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে যে, আমার ও বান্ধবগণের শোকোদ্দীপনকারিণী সে কৃশাঙ্গী ভূশয্যায় শয়ন করিয়া আছে; যদি আমি দান, তপস্যা, বা গুরুজনের আরাধনা করিয়া থাকি, তৎফলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক; আমি জন্মাবধি সংযত হইয়া নানা ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি, এক্ষণে সেই পুণ্যবলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদ্বরা অবিলম্বে মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।

এইরূপে অরণ্যমধ্যে রুরুকে ভার্য্যার্থে দুঃখিত ও বিলাপপরায়ণ অবলোকন করিয়া, দেবদূত তৎসমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্ রুরো! তুমি দুঃখিত হইয়া যাহার বাসনা করিতেছে, তাহা অসম্ভব; মনুষ্য মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে পুনর্জীবিত হয় না। গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরার গর্ভসম্ভূতা এই কন্যার আয়ুঃশেষ হইয়াছে। অতএব বৎস! বৃথা শোকে অভিভূত হইও না। কিন্তু দেবতারা পূর্ব্বে ইহার এক উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যদি তাহা কর, পুনর্ব্বার প্রমদ্বরাকে পাইতে পার। রুরু কহিলেন, হে দেবদূত! দেবতারা কি উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যথার্থ বল; আমি শুনিবামাত্র তদনুযায়ী কার্য্য করিব; বিলম্ব করিও না, ত্বরায় ব্যক্ত করিয়া আমার পরিত্রাণ কর। দেবদূত কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! তুমি স্বভার্য্যা প্রমদ্বরাকে

স্বীয় আয়ুর অর্দ্ধ ভাগ প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইবেক। রুরু কহিলেন, আমি প্রমদ্বরাকে আয়ুর অর্দ্ধ প্রদান করিতেছি, সে পুনর্জীবিত হউক। তখন গন্ধর্ব্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে ধর্ম্মরাজের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে রুরুভার্য্যা প্রমদ্বরা তদীয় অর্দ্ধ আয়ু প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জীবিতা হয়। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দেবদূত। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ আয়ু পাইয়া পুনর্জীবিতা হউক। দেবরাজ এইরূপ কহিবামাত্র বরবর্ণিনী প্রমদ্বরা রুরুর অর্দ্ধ আয়ু লাভ করিয়া সুপ্তোত্থিতার ন্যায় মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল।

ভবিষ্য বৃত্তান্তে দৃষ্ট হইয়াছে যে, ভার্য্যার্থে মহাতেজস্বী রুরুর এইরূপে অর্দ্ধ আয়ু লুপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে রুরুর অর্দ্ধ আয়ু লাভ দ্বারা প্রমদ্বরার পুনর্ব্বার জীবনপ্রাপ্তি হইলে, তাহাদের পিতারা পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া শুভ দিবসে উভয়ের উদ্বাহবিধি সমাধান করিলেন, তাহারাও পরস্পর হিতৈষী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রুরু এবম্প্রকারে দুর্লভা ভার্য্যা লাভ করিয়া সর্পকুলধ্বংসার্থে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সর্পদর্শনমাত্র কোপপরতন্ত্র হইয়া শস্ত্রপ্রহার দ্বারা তাহার প্রাণসংহার করেন। এইরূপে সর্পবধপ্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এক দিবস মহাবন প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, এক অতি বৃদ্ধ জীর্ণকায় ডুণ্ডুভ শয়ন করিয়া আছে। তিনি কালদণ্ডসম দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইবামাত্র ডুণ্ডুভ কহিল, হে তপোধন! আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই; তুমি কেন অকারণে রোষাবেশপরবশ হইয়া আমার প্রাণবধের উদ্যম করিতেছ?

দশম অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব

রুরু কহিলেন, হে উরগ! এক দুষ্ট ভুজঙ্গ আমার প্রাণসমা ভার্য্যাকে দংশন করিয়াছিল, তদবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, দর্শনমাত্র সর্পের প্রাণদণ্ড করিব। সেই নিমিত্ত অদ্য আমি তোমার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছি। ডুণ্ডুভ কহিল, হে তপোধন! যাহারা মনুষ্যকে দংশন করে, সে সকল স্বতন্ত্র, ডুণ্ডুভেরা সে জাতি নহে; অতএব সর্পের নাম গন্ধ পাইয়া বিনা অপরাধে ডুণ্ডুভদিগের প্রাণহিংসা করা তোমার উচিত নহে। আক্ষেপের বিষয় এই, ডুণ্ডুভদিগে

প্রবৃত্তি ও সুখভোগ অন্যান্য সর্পের সমান নহে; কিন্তু অনর্থ ঘটনা ও দুঃখ ভোগের সময় সমানভাগী। যাহা হউক, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া হতভাগ্য ডুণ্ডুভদিগের প্রাণহিংসা করিও না।

রুরু সর্পের এই যুক্তিযুক্ত কাতর উক্তি শ্রবণে তাহাকে ডুণ্ডুভ নিশ্চয় করিয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন না। অনন্তর প্রশান্ত বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজগ! তুমি কে, কি নিমিত্তই বা তুমি সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ, বল। ডুণ্ডুভ কহিল, পূর্ব্ব কালে আমি সহস্রপাদ নামে ঋষি ছিলাম, পরে ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা শুনিয়া রুরু কহিলেন, হে ডুণ্ডুভ! ব্রাহ্মণ কি কারণে কুপিত হইয়া তোমাকে শাপ দিয়াছেন, এবং আর কত কালই বা তোমাকে এই কলেবরে কালযাপন করিতে হইবেক, ইহার সবিশেষ শুনিতে বাসনা করি।

একাদশ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব

ডুণ্ডুভ কহিল পূর্ব্ব কালে খগম নামে এক সত্যবাদী তপোবীর্য্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণ আমার বাল্যকালের সখা ছিলেন। এক দিবস তিনি অগ্নিহোত্রানুষ্ঠানে সাতিশয় ব্যাসক্ত আছেন, এমন সময়ে আমি, বালস্বভাবসুলভ কৌতুহলপরতন্ত্র হইয়া, তৃণ দ্বারা এক ভুজঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিলাম। তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন, কিন্তু চেতনাপ্রাপ্তি হইলে কোপানলে দগ্ধ হইয়া কহিলেন, আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যাদৃশ নির্বীর্য্য সর্প নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমার শাপে তুমি তাদৃশ সর্প হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। আমি তাঁহার তপস্যার প্রভাব অবগত ছিলাম; অতএব অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলাম, ভ্রাতঃ! আমি সখা বলিয়া পরিহাস করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে করিয়াছি, এক্ষণে ক্ষমা করিয়া শাপ নিবারণ কর।

খগম আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাকুল চিত্তে কহিলেন, দেখ, আমি যাহা কহিয়াছি, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইবেক না; তবে এখন যাহা কহি, অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া সর্ব্বকাল স্মরণ করিয়া রাখিবে। মহর্ষি প্রমতির রুরু নামে এক পরম পবিত্র পুত্র জন্মিবেন, তাঁহার দর্শনে তোমার শাপ মোচন হইবেক। আপনি রুরু নামে খ্যাত ও প্রমতির আত্মজ বটেন। আপনার দর্শন পাইয়াছি এক্ষণে স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে হিতোপদেশ দিতেছি, শ্রবণ করুন।

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ ইহা কহিয়া ডুণ্ডুভরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার স্বীয় ভাস্বর স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং কহিলেন, হে মহাপ্রভাব রুরো! অহিংসা পরম ধর্ম্ম, অতএব ব্রাহ্মণের কখনও প্রাণিহিংসা করা উচিত নহে। বেদের আদেশ এই যে, ব্রাহ্মণ প্রশান্তচিত্ত, বেদবেদাঙ্গবেত্তা, ও সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেদধারণ ব্রাহ্মণের পরম ধর্ম্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অবলম্বন করা বিধেয় নহে। দণ্ডধারণ, উগ্রস্বভাবতা, ও প্রজাপালন এ সকল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। পূর্ব্বে জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্পকুলের হিংসা আরম্ভ হইয়াছিল। অবশেষে, তপঃ-প্রভাসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় হইতে ভয়ার্ত্ত সর্পদিগের পরিত্রাণ হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়—পৌলোমপর্ব্ব

রুরু কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! কি নিমিত্ত রাজা জনমেজয় সর্পহিংসা করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ধীমান্ আস্তীক তাহাদিগের পরিত্রাণ করিলেন, আমি তাহা সবিস্তর শুনিতে বাসনা করি। আপনি ব্রাহ্মণদিগের প্রমুখাৎ মহাফলপ্রদ আস্তীক-অন্ত্যোপান্ত শ্রবণ করিবেন, আমার যাইবার ত্বরা আছে, এই বলিয়া সেই ঋষি যোগবলে অন্তর্হিত হইলেন। রুরু আশ্চর্য্য বোধ করিয়া অন্তর্হিত ঋষির অন্বেষণে সমস্ত বন ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে একান্ত ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং সেই ঋষির বাক্য বারংবার চিন্তা করিতে করিতে কিয়ৎ ক্ষণ অচেতনপ্রায় হইলেন। অনন্তর লব্ধচেতন হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজজনকসন্নিধানে সমুদায় নিবেদন করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্পূর্ণ আস্তীকোপাখ্যান শ্রবণ করাইলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! রাজাধিরাজ জনমেয় কি নিমিত্ত সর্পসত্রানুষ্ঠান দ্বারা সর্পকুল সংহার করিয়াছিলেন, কি নিমিত্তই বা জিতেন্দ্রিয়াগ্রগণ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক মহাশয় প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজগগণের পরিত্রাণ, তাহা সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। আর যে রাজা সর্পসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তিনি কাহার পুত্র, এবং

ঐ মহাত্ম ব্রাহ্মণই কাহার তনয়, তাহাও তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি আপনার নিকট মহাফলপ্রদ আস্তীকোপাখ্যান আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শৌনক কহিলেন, হে সূতকুলতিলক! যশস্বী পরাণ ঋষি। আস্তীক মহাশয়ের মনোরম আখ্যান সবিস্তর শুনিবার নিমিত্ত আমার নিতান্ত বাসনা জন্মিয়াছে। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিবর! আমার পিতা ব্যাসশিষ্য মেধাবী লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত সর্ব্বপাপক্ষয়কারী এই ইতিহাস শ্রবণ করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, অবিকল সেইরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

মহর্ষি আস্তীকের পিতা জরৎকারু প্রজাপতিতুল্য ব্রহ্মচারী বিষয়বাসনাশূন্য কঠোরতপস্যারত উর্দ্ধরেতাঃ যাযাবরাগ্রগণ্য (৫১) ধর্ম্মজ্ঞ ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন। সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহাত্মা যত্রসায়ংগৃহ (৫২) হইয়া তীর্থপর্য্যটন ও তীর্থস্নান করত পৃথিবী-মণ্ডল ভ্রমণ করিতেন। এইরূপে বহু কাল বায়ুভক্ষ, নিরাহার, শুষ্ককলেবর, ও বীতনিদ্র হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক দুঃসাধ্য ব্রতানুষ্ঠান করেন।

এক দিবস জরৎকারু পর্য্যটনক্রমে কোনও স্থানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে উর্দ্ধপাদ অধঃশিরাঃ মহাগর্ত্তে লম্বমান অবলোকন করিলেন। তদ্দর্শনে অনুকম্পা পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে, কি নিমিত্ত উশীরস্তম্বমাত্র অবলম্বন করিয়া অবাঙ্মুখে লম্বমান আছেন? এই গর্ত্তে গূঢবাসী এক মূষিক আপনাদিগের অবলম্বিত উশীরস্তম্বের মূল প্রায় সমুদায় ভক্ষণ করিয়াছে। পিতৃগণ কহিলেন, আমরা যাযাবর নামে ঋষি, বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি। আমরা অতি হতভাগ্য, আমাদিগের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছে, সেই মূঢ়মতি হতভাগ্য সংসারাশ্রমবিমুখ হইয়া কেবল তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়াছে, পুত্রোৎপাদনার্থে দারপরিগ্রহ করিতেছে না। সুতরাং বংশলোপ উপস্থিত হওয়াতে মহাগর্ত্তে লম্বমান হইয়া আছি। আমরা জরৎকারুরূপ নাথ সত্ত্বেও অনাথ ও পাপাত্মার ন্যায় হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি কে, কি নিমিত্ত আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা অবলোকন করিয়া অনুশোচন ও অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ?

জরৎকারু পূর্ব্বপুরুষদিগের এইরূপ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া নিবেদন করিলেন,

---

(৫১) যে তপস্বীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, নিয়ত স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের নাম যাযাবর।

(৫২) যত্রসায়ংগৃহ, যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই গৃহ অর্থাৎ তথায় অবস্থিতি করে।

হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পূর্ব্বপুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবেক। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! বংশরক্ষণে এবং তোমার ও আমাদিগের পারলৌকিক মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ হও। পুত্রবান্ লোকদিগের যেরূপ সদ্গতি লাভ হয়, ধর্ম্মফল ও চিরসঞ্চিত তপোবল দ্বারা তাদৃশ হয় না। অতএব তুমি আমাদিগের নিয়োগানুসারে দারপরিগ্রহে ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ ও মনোযোগী হও, তাহা হইলেই আমাদিগের পরম মঙ্গল। জরৎকারু কহিলেন, আমি কদাপি ভোগাভিলাষে দারপরিগ্রহ ও ধনোপার্জ্জন করিব না, কেবল আপনাদিগের হিতার্থে দারপরিগ্রহে সম্মত হইলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কন্যা আমার সন্নামী হয় ও তাহার বন্ধুগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভিক্ষাস্বরূপ দান করিতে চাহেন, তবেই আমি যথাবিধানে তাহার পাণিগ্রহণ করিব। কিন্তু আমি দরিদ্র, কোন্ ব্যক্তি দেখিয়া শুনিয়া আমাকে কন্যাদান করিবেক। তবে ভিক্ষাস্বরূপ যদি কেহ দান করিতে চাহে, আমি প্রতিগ্রহ করিতে অসম্মত নহি। হে পিতামহগণ! এই নিয়মে আমি দারপরিগ্রহে যত্নবান্ হইব, প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। এইরূপে পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভে আপনাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা পুত্র উৎপন্ন হইবেক, তখন আপনারা অক্ষয় স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রমোদে কালযাপন করিবেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু এইরূপে গৃহস্থাশ্রমপ্রবেশে কৃতসংকল্প হইয়া ভার্য্যালাভার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে কন্যাদান করিল না। এক দিন তিনি পিতৃলোকের আদেশ প্রতিপালনার্থে বনপ্রবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃ-স্বরে তিন বার কন্যা ভিক্ষা করিলেন। তখন বাসুকি স্বীয় ভগিনী আনয়ন করিয়া দান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু সেই কন্যা সনাম্নী নহে, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলেন না, কারণ, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি কন্যা সনাম্নী হয় ও তাহার বন্ধুগণ স্বেচ্ছাক্রমে দান করিতে উদ্যত হয়েন, তবেই তাহাকে ভার্য্যা স্বরূপে পরিগ্রহ করিব। অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাতপাঃ জরৎকারু বাসুকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! সত্য কহ তোমার এই ভগিনীর নাম কি? বাসুকি কহিলেন, হে জরৎকারু! আমার এই অনুজার নাম জরৎকারু, আমি তোমাকে দান করিতেছি, তুমি প্রতিগ্রহ কর। আমি ইহাকে তোমার নিমিত্তই এত কাল রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তুমি

পরিগ্রহ কর। ইহা কহিয়া বাসুকি জরৎকারুকে ভগিনী দান করিলেন। তিনি বেদবিহিত বিধান অনুসারে তাঁহাকে ভার্য্যা স্বরূপে পরিগ্রহ করিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ শৌনক! পূর্ব্বকালে সর্পেরা স্বীয় জননীর নিকট হইতে এই শাপ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেক। সর্পকুলচূড়ামণি বাসুকি সেই শাপ শান্তি করিবার আশয়ে ব্রতপরায়ণ মহাত্মা জরৎকারু ঋষিকে ভগিনী দান করেন। তিনিও তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক ধর্ম্মপত্নী স্বরূপ পরিগ্রহ করেন। তাঁহার গর্ভে আস্তীক নামে মহানুভব তনয় উৎপন্ন হইলেন। ঐ তপস্বী মহাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগ ও সর্ব্বভূতসমদর্শী ছিলেন, এবং পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের দাহভয় নিবারণ করেন। বহু কালের পর, পাণ্ডুকুলোদ্ভব রাজা জনমেজয় সর্পসত্র নামে প্রসিদ্ধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই সর্পকুলসংহারকারী যজ্ঞ আরব্ধ হইলে পর, তপপ্রভাবসম্পন্ন আস্তীক ভ্রাতৃগণ, মাতুলগণ, ও অন্যান্য সর্পগণের নিস্তার করিয়াছিলেন।

জরৎকারু পুত্রোৎপাদন ও তপস্যা দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধারসাধন, বিবিধব্রতানুষ্ঠান ও বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিগণের পরিতোষ সম্পাদন, ও নানা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি সমাধান করিলেন। এইরূপে তিনি ব্রহ্মচর্য্য, পুত্রোৎপাদন, ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ও দেবঋণরূপ গুরুভার হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত স্বর্গারোহণ করেন। হে ভৃগুকুলশ্রেষ্ঠ! আমি যথাক্রমে আস্তীকোপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি বর্ণন করিব, আজ্ঞা করুন।

ষোড়শ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি যাহা বর্ণন করিলে, পুনর্ব্বার তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা কর, আস্তীকের সবিস্তর বৃত্তান্ত শ্রবণে আমাদিগের মহীয়সী বাসনা জন্মিয়াছে। তুমি যাহা কীর্ত্তন করিতেছ, তাহা অতি ললিত ও মধুর বোধ হইতেছে; আমরা শুনিয়া পরম পরিতোষ পাইতেছি। তুমি পুরাণ কীর্ত্তন বিষয়ে আপন পিতার ন্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছ। তোমার পিতা যেমন অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া

আমাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পুরাণ শ্রবণ করাইয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ শ্রবণ করাও।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপন পিতার নিকট আস্তীকোপাখ্যান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, আপনার নিকট অবিকল সেইরূপ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

সত্যযুগে কদ্রু ও বিনতা নামে দক্ষ প্রজাপতির দুই সুলক্ষণা পরম সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ঐ দুই ভগিনীর কশ্যপের সহিত বিবাহ হয়। মহাত্মা কশ্যপ সেই দুই ধর্ম্মপত্নীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর প্রদান করিলেন। তাঁহারাও কশ্যপের নিকট স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষ ও পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। কদ্রু তুল্যতেজস্বী সহস্র নাগ পুত্র প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিনতা এই বর লইলেন যে, আমার দুইটি মাত্র পুত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন কদ্রুর সহস্র পুত্র অপেক্ষা বলে, বিক্রমে, ও কলেবরে শ্রেষ্ঠ হয়। কশ্যপ তাঁহাকে উক্ত অভিলষিত পবিত্র বর প্রদান কবিলেন। বিনতা স্বামীর নিকট যথাপ্রার্থিত বর লাভ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্টা ও চরিতার্থা হইলেন। কদ্রুও তুল্যবল সহস্র পুত্র লাভ দ্বারা আপনাকে কৃতার্থা জ্ঞান করিলেন। মহাতপাঃ কশ্যপ পত্নীদিগকে, তোমরা যত্ন পূর্ব্বক গর্ভধারণ করিবে, এই উপদেশ দিয়া বন প্রবেশ করিলেন।

বহুকাল অতীত হইলে পর, কদ্রু অণ্ডসহস্র ও বিনতা অণ্ডদ্বয় প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ তাঁহাদিগের প্রসূত অণ্ড সমুদায় উপস্বেদসম্পন্ন ভাণ্ড মধ্যে পঞ্চশত বর্ষ স্থাপন করিল। তদনন্তর কদ্রুপ্রসূত অণ্ডসহস্র মধ্য হইতে এক এক পুত্র নির্গত হইল; কিন্তু বিনতাপ্রসূত অণ্ড তদবস্থই রহিল। পুত্রার্থিনী দীনা বিনতা, তদ্দর্শনে লজ্জিতা হইয়া, কালবিলম্ব সহিতে না পারিয়া স্বপ্রসূত অণ্ডদ্বয়ের অন্যতর ভেদন পূর্ব্বক দেখিলেন, পুত্রের শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধমাত্র যথাবৎ সংঘটিত হইয়াছে, অন্যার্দ্ধ কিঞ্চিন্মাত্রও সংঘটিত হয় নাই। তখন সেই পুত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া স্বীয় জননীকে এই শাপ দিলেন, মাতঃ! তুমি লোভপরবশা হইয়া, শরীর সম্পূর্ণ সংঘটিত না হইতেই, আমাকে অকালে অণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিলে; অতএব তুমি যে সপত্নীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছ, পঞ্চশত বৎসর তাহার দাসী হইয়া থাকিবে। অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি তাহাকেও আমার মত অকালে বহিষ্কৃত করিয়া অঙ্গহীন অথবা বিকলাঙ্গ না কর, তবে সে তোমার দাসীভাব মোচন করিবেক। যদি তুমি পুত্রে বিশিষ্ট বল বিক্রম বাসনা কর, তবে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ইহার জন্মকাল প্রতীক্ষা কর; ইহার জন্মের আর পাঁচ শত বৎসর বিলম্ব আছে।

অরুণ, জননীকে এইপ্রকার শাপপ্রদানের পর, অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়া সূর্য্যদেবের রথের সারথি হইলেন। এই নিমিত্ত সর্ব্ব কাল প্রভাত সময়ে অরুণকে দেখিতে

পাওয়া যায়। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জাতমাত্র ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, বিধাতৃবিহিত স্বীয় ভোজ্য বস্তু আহরণার্থে বিনতাকে পরিত্যাগ করিয়া নভোমণ্ডলে গমন করিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! এই সময়ে কদ্রু ও বিনতা দুই ভগিনী অবলোকন করিলেন, উচ্চৈশ্রবাঃ অশ্ব তাঁহাদের সমীপ দেশ দিয়া গমন করিতেছে, দেবগণ হৃষ্ট চিত্তে তাহার সাতিশয় সমাদার করিতেছেন। সেই সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন, শ্রীমান্, অজর, অমোঘবল, দিব্য, অশ্বরত্ন অমৃতমন্থন কালে উৎপন্ন হয়।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি কহিলে, সেই পরম সুন্দর মহাবীর্য্য অশ্বরাজ অমৃতমন্থন কালে উৎপন্ন হয়; অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, দেবতারা কি নিমিত্তে ও কোন্ স্থানে অমৃত মন্থন করিয়াছিলেন?

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সুমেরু নামে এক পরম সুন্দর ভূধর আছে। তাহার স্বর্ণময় উজ্জ্বল শৃঙ্গসমূহের জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভাও মলিন বোধ হয়। ঐ কনকালঙ্কৃত অপ্রমেয় বিচিত্র গিরি দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি। অধর্ম্মপরায়ণ লোকেরা তাহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। অতিদুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ তদুপরি নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। রজনীতে নানাবিধ দিব্য ওষধি (৫৩) দ্বারা আলোকময় হয়। উচ্চতা দ্বারা দেবলোক আবরণ করিয়া অবস্থিত আছে। বহুতর তরঙ্গিণী ও তরুমণ্ডলী ঐ গিরিবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। অশেষবিধ মনোহর বিহঙ্গমগণ চারি দিকে অনবরত কোলাহল করিতেছে। ঐ ধরণীধর সামান্য লোকদিগের মনেরও অগম্য। তপোনিয়মসম্পন্ন মহাবল দেবগণ সেই স্বর্ণময় শৈলের শুভ শৃঙ্গে সমারূঢ় ও আসীন হইয়া অমৃতলাভবিষয়ক মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে দেবতাদিগকে মন্ত্রচিন্তনে সাতিশয় ব্যাসক্ত দেখিয়া নারায়ণ ব্রহ্মাকে সম্বোধিয়া কহিলেন, দেখ, দেবতারা ও অসুরগণ ঐক্যমত অবলম্বন করিয়া সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করুক, মন্থন করিতে করিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে অমৃত উৎপন্ন হইবেক। অনন্তর দেবতাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা সর্ব্বপ্রকার ওষধি (৫৪) ও সর্ব্বপ্রকার রত্ন

(৫৩) লতা বিশেষ, রজনীতে তাহার দীপ্তি প্রকাশ পায়।

(৫৪) ফল পক্ক হইলেই যাহারা শুষ্ক হইয়া যায়।

পাইয়াও উদধি মন্থনে বিরত হইবে না, উত্তরোত্তর মন্থন করিতে করিতে তোমাদিগের অমৃত লাভ হইবেক।

অষ্টাদশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দেবতারা অমৃতমন্থনের আদেশ পাইয়া মন্দর গিরিকে মন্থানদণ্ড করিবার নিশ্চয় করিলেন। কিন্তু সেই উত্তুঙ্গশৃঙ্গসমূহসুশোভিত, বহুললতাজালসংকীর্ণ, বহুবিধবিহগমণ্ডলকোলাহলসঙ্কুল, অনেকব্যালকুলসমাকুল, অপ্সরঃকিন্নর অমরগণসেবিত, একাদশসহস্র যোজন উন্নত, ও তৎপরিমাণে ভূগর্ভে অবস্থিত গিরিরাজের উদ্ধরণে অসমর্থ হইয়া, তাঁহারা ব্রহ্মা ও নারায়ণের নিকটে আসিয়া বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, আপনারা আমাদিগের হিতার্থে কোনও সদুপায় নির্ধারণ ও মন্দরের উদ্ধরণে যত্ন করুন।

অপ্রমেয়স্বরূপ নারায়ণ ও ব্রহ্মা তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইব। ভুজগরাজ অনন্তদেবকে মন্দরোদ্ধরণের আদেশ প্রদান করিলেন। মহাবল মহাবীর্য্য অনন্তদেব তাঁহাদিগের নিদেশানুসারে সমস্ত বন ও বনচরগণ সহিত সেই পর্ব্বতরাজের উদ্ধরণ করিলেন। তদনন্তর দেবগণ অনন্তদেব সমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং অর্ণবকে সম্বোধিয়া কহিলেন, আমরা অমৃতলাভার্থে তোমার জল মন্থন করিব। সমুদ্র কহিলেন, মন্দরপরিভ্রমণ দ্বারা আমাকে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হইবেক, অতএব আমিও যেন লাভের অংশভাগী হই। অনন্তর সমুদায় দেবতা ও অসুর মণ্ডলী কূর্ম্মরাজের নিকট প্রার্থনা করিলেন, তুমি এই গিরির অধিষ্ঠান হও। কূর্ম্মরাজ তথাস্তু বলিয়া মন্দর-গিরির অধিষ্ঠানার্থে আপন পৃষ্ঠ পাতিয়া দিলেন। দেবরাজ তৎপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত শৈলরাজকে যন্ত্রসহকারে চালিত করিলেন।

এইরূপে অমরগণ মন্দরকে মন্থানদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া অমৃত-লাভাভিলাষে সলিলনিধি সমুদ্রের মন্থন আরম্ভ করিলেন। মহাবল দানবাসুরদল রজ্জু স্থানীয় নাগরাজের মুখদেশ ও দেবগণ তাঁহার পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। ভগবান্ অনন্তদেব নারায়ণের অপর মূর্ত্তি, এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার দুর্ব্বিষহ বিষের প্রভাব সংবরণ করিয়া দিলেন। দেবতারা মন্থনার্থে নাগরাজ বাসুকিকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করাতে, তাঁহার মুখ হইতে বারংবার ধূম ও অগ্নিশিখা সহিত অতি প্রভূত শ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ঐ সমস্ত শ্বাসবায়ু সমবেত হইয়া বিদ্যুৎ সহিত মেঘসমূহরূপে পরিণত হইল এবং শ্রান্ত ও সন্তপ্ত দেবদানবদিগের উপর বারি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। আর সেই শৈলের শিখরদেশ হইতে সমন্ততঃ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

এইরূপে মন্দরগিরি দ্বারা সুরাসুরগণ কর্তৃক মথ্যমান সমুদ্র হইতে মেঘরবানুকারী বিশাল শব্দ হইতে লাগিল। নানাবিধ শত শত জলচরগণ মন্দরগিরির মর্দ্দনে নিষ্পিষ্ট হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। পাতালতলবাসী অন্যান্য বহুবিধ জলীয় প্রাণিগণ মন্দরাঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে, তদীয় শিখরদেশস্থিত অতি প্রকাণ্ড মহীরুহ সকল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া পতগগণ সহিত নিপতিত হইতে লাগিল। যেমন নীলবর্ণ জলধর সৌদামিনীমণ্ডল দ্বারা সমাবৃত হয়, তদ্রূপ মন্দর সেই সমস্ত ভূরুহের পরস্পর সংঘর্ষণসম্ভূত অতি প্রভূত হুতাশনের শিখা সমূহ দ্বারা সমাবৃত হইল। ঐ হুতাশন ক্রমশঃ প্রবল হইয়া অরণ্যবিনির্গত কুঞ্জর ও কেশরী সকল দগ্ধ করিল। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নানা বনচর ঐ হুতাশনের আহুতি হইল। হুতাশন এইরূপে ইতস্ততঃ দাহ আরম্ভ করাতে, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘসম্ভূত সলিলসেক দ্বারা তাহার শান্তি সম্পাদন করিলেন।

তদনন্তর মহাদ্রুমগণের নির্যাস ও অশেষবিধ ওষধিরস সাগরসলিলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই সমস্ত অমৃতগুণসম্পন্ন রসের ও কাঞ্চননিস্রবের প্রভাবে সুরগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অর্ণববারি উক্তবিধ রস, কাঞ্চননিস্রব, ও অন্যান্য বহুবিধ উৎকৃষ্ট রসে মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

অনন্তর দেবতারা পদ্মাসনে আসীন বরদ ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! দেবাদিদেব নারায়ণ ব্যতিরেকে আমরা সমুদায় দেব দানব একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি। কোন্ কালে মন্থন আরম্ভ করা গিয়াছে, এখন পর্য্যন্তও অমৃত উদ্ভূত হয় নাই। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে কহিলেন, তুমি ইহাদিগের বলাধান কর; তোমা ব্যতিরেকে এ বিষয়ে আর গতি নাই। নারায়ণ কহিলেন, যাহারা এই ব্যাপারে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগের সকলকেই আমি বল প্রদান করিতেছি। সকলে মিলিত হইয়া মন্দর পরিভ্রমণ দ্বারা সরিৎপতিকে আলোড়িত করুক।

সমুদায় দেব ও দানব নারায়ণের বচন শ্রবন মাত্র বল প্রাপ্ত ও একবাক্য হইয়া পুনর্ব্বার প্রবল রূপে জলধিমন্থন আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর মথ্যমান অম্ভোধির গর্ভ হইতে শীতলময়ূখসম্পন্ন সৌম্য ও প্রসন্নমূর্ত্তি চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন। শ্বেতসরোজসমাসীনা লক্ষ্মী, সুরাদেবী, ও শ্বেতবর্ণ অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ ঘৃত হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎপরে কৌস্তুভনামা শ্রীমান্ মহোজ্জ্বল দিব্য মণি ঘৃত সমুদ্ভূত হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরা, শশধর, ও মনোজব অশ্বরাজ আদিত্যপথানুসারী হইয়া দেবপক্ষে গমন করিলেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরিদেব অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে করিয়া আবির্ভূত হইতেন। এই-পরমাদ্ভূত ব্যাপার অবলোকন করিয়া দানবগণ, এই অমৃত আমার আমার বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল। তদনন্তর ধবলকান্তি,

দশনচতুষ্টয়সম্পন্ন, মহাকায় ঐরাবতনামা মাতঙ্গরাজ উৎপন্ন হইল। বজ্রধারী দেবরাজ ঐ গজরাজ অধিকার করিলেন।

দেবাসুরগণ ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া সাতিশয় মন্থন করাতে, কালকূট উৎপন্ন হইয়া ধূমবহুল প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় সহসা জগন্মণ্ডল আকুল করিল। ঐ অতি বিষম বিষের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রৈলোক্য বিচেতন ও মূর্চ্ছিত হইল। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া অনুরোধ করাতে, ভগবান্ মন্ত্রমূর্ত্তি মহেশ্বর লোকরক্ষার্থে তৎক্ষণাৎ তাহা পান করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করিলেন। তদবধি তিনি তিনি ত্রিলোকে নীলকণ্ঠ নামে বিখ্যাত হইলেন।

দানবেরা এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মী লাভার্থে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত করিল। তখন নারায়ণ, মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া স্ত্রীরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক, দানবদলের নিকট উপস্থিত হইলেন। মূঢ়মতি দৈত্য দানবগণ তাঁহার পরমাদ্ভুত রূপলাবণ্য অবলোকনে মোহিত ও তদগতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর সমুদায় দৈত্য দানব ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া দেবতাদিগকে আক্রমণ করিল। মহাবীর্য্য ভগবান্ বিষ্ণু, নরদেব সমভিব্যাহারে দানবেন্দ্রদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিলেন। দেবগণ বিষ্ণুর নিকট হইতে অমৃত প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে পান করিতে বসিলেন। দেবতারা অমৃত পান আরম্ভ করিলে, রাহু নামে এক ধূর্ত্ত দানব অবসর বুঝিয়া দেবরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ঐ সমভিব্যাহারে অমৃত পান করিল। অমৃত দানবের কণ্ঠদেশ মাত্র গমন করিয়াছে, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতার্থে ঐ গূঢ় ব্যাপার ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি সুদর্শন চক্র দ্বারা দানবের শিরশ্ছেদন করিলেন। রাহুর শৈলশৃঙ্গসম চক্রচ্ছিন্ন প্রকাণ্ড মস্তক তৎক্ষাৎ নভোমণ্ডলে আরোহণ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার কবন্ধ, সবন, সপর্ব্বত, সদ্বীপ, মহীমণ্ডল কম্পিত করিয়া, ভূতলে পতিত হইল। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহুমুখের চিরন্তন বৈরনির্ব্বন্ধ হইল। এই নিমিত্তই ঐ মুখ অদ্যাপি তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করিয়া থাকে। ভগবান্ নারায়ণ নিরুপম নারীরূপ পরিহার করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক দানবদল আক্রমণ করিলেন।

তদনন্তর লাবণার্ণবতীরে দেবদানবদলের ঘোরতর সময় আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাগ্র প্রাস তোমর প্রভৃতি বিবিধ শস্ত্র সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। অসুরগণ খড়্গ চক্র শক্তি গদা প্রভৃতি শস্ত্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল। তাহাদিগের তপ্তকাঞ্চনশোভিত মস্তক সকল অতি দারুণ পটিশপ্রহারে কলেবর হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া অনবরত ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল। সমরনিহত মহাসুরগণ রুধিরলিপ্তকলেবর হইয়া ধাতুরাগরঞ্জিত গিরিশিখরের ন্যায় ভূশয্যায় শয়ন করিল। পরস্পর শস্ত্র প্রহার দ্বারা রণক্ষেত্রে হাহা রব উত্থিত হইল। দূর হইতে লৌহময় তীক্ষ্ণ পরিঘের আঘাত ও সন্নিকর্ষে মুষ্টি প্রহার ইত্যাদি প্রকারে রণপ্রবৃত্ত দেবদানবদলের কোলাহল নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত করিল। চারি দিকে কেবল ছিন্ধি, ভিন্ধি, ঘাতয়, পাতয় ইত্যাদি ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে মহাভয়দায়ী তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, নর ও নারায়ণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। ভগবান নারায়ণ, নরদেবের দিব্য ধনু অবলোকন করিয়া, দানবকুলবিলয়কারী স্বীয় চক্র স্মরণ করিলেন। সেই অরাতিনিপাতন, সূর্য্যসমপ্রভ, অপতিহতপ্রভাব, ভীষণমূর্ত্তি সুদর্শন চক্র স্মৃতমাত্র অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইল। করিকরদীর্ঘবাহু ভগবান্, প্রজ্বলিতহুতাশনসম, পরপুরবিদারণ, মহাপ্রভ, চক্র বিপক্ষদলে প্রলেপ করিলেন। ভগবৎপ্রেরিত চক্র মহাবেগে গমন করিয়া সহস্র সহস্র দৈত্য দানব সংহার করিল; কোনও স্থলে অতি প্রদীপ্ত দহনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অসুরদল নিপাত করিল; কোনও স্থলে ভূতলে ও নভোমণ্ডলে বিচরণ পূর্ব্বক পিশাচের ন্যায় তাহাদের শোণিত পান কবিতে লাগিল।

নবজলধরকলেবর মহাবল পবাক্রান্ত অসুরেরাও গিরি নিক্ষেপ দ্বারা দেবদল দলন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আকাশমণ্ডল হইতে অতি প্রকাণ্ড ভয়ানক ভূধর সকল পরস্পরাভিঘাত পূর্ব্বক বহুবিধ জলধরের ন্যায় সমন্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ অবিরত অদ্রিপাতে অভিহিতা হইয়া সদ্বীপা সকাননা পৃথিবী বিচলিতা হইল। তখন নরদেব স্বর্ণমুখ শিলীমুখ (৫৫) সমূহ দ্বারা অসুরবিক্ষিপ্ত গিরিসমূহের শিখর বিদারণ পূর্ব্বক গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দান্ত অসুরদল ভগ্নবল হইয়া ও নভোমণ্ডলে প্রজ্বলিতহুতাশনসম সুদর্শনচক্রকে পরিকুপিত অবলোকন করিয়া ভয়ে ভূমধ্যে ও লবণার্ণবগর্ভে প্রবেশ করিল।

দেবতারা এইরূপে জয় প্রাপ্ত হইয়া সমুচিতসৎকারবিধান পূর্ব্বক মন্দর গিরিকে পূর্ব্ব স্থানে স্থাপিত করিলেন। জলধরেরাও গগনমণ্ডল ও স্বর্গলোক নিনাদিত করিয়া

(৫৫) বাণ।

যথাগত প্রতিগমন করিল। তদনন্তর দেবতারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতভাণ্ড সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট নিহিত করিলেন।

বিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! যে অমৃত মন্থনে শ্রীমান্ অতুলবিক্রম অশ্বরাজ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। কদ্রু সেই অশ্বরত্ন অবলোকন করিয়া বিনতাকে কহিলেন, বিনতে! শীঘ্র বল দেখি, উচ্চৈঃশ্রবার কিরূপ বর্ণ। বিনতা কহিলেন, এ অশ্বরাজ শ্বেতবর্ণ, তুমি কি বল, আইস এ বিষয়ে পণ করা যাউক। কদ্রু কহিলেন, হে চারুহাসিনি! আমি বোধ করি, এই অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; আইস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাউক, যে হারিবেক, সে দাসী হইবেক। তাঁহারা এইরূপে দাসীবৃত্তি-স্বীকাররূপ প্রতিজ্ঞায় আরূঢ় হইয়া, কল্য অশ্ব দেখিব, এই স্থির করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

কদ্রু গৃহে গিয়া কৌটিল্য করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় পুত্রসহস্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কজ্জলতুল্য রূপ ধারণ করিয়া ত্বরায় ঐ তুরঙ্গ শরীরে প্রবেশ কর; যেন আমাকে দাসী হইতে না হয়। যে সকল ভুজঙ্গ তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইল, তিনি তাহাদিগকে এই শাপ দিলেন, পাণ্ডুকুলোদ্ভব ধীমান্ রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কদ্রুদত্ত নিষ্ঠুর শাপ স্বকর্ণে শ্রবণ করিলেন, এবং সর্পগণের সংখ্যা অধিক দেখিয়া, ঐ শাপ প্রজাগণের হিতকর ভাবিয়া, দেবগণ সহিত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আর কহিলেন, কদ্রু স্বীয় সন্তানদিগকে যে এরূপ শাপ দিয়াছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; এই সকল মহাবল সর্পের বিষ অতি তীক্ষ্ণ ও বীর্য্যবৎ। ইহারা স্বভাবতঃ হিংসারত ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর নিয়ত অহিতকারী। অতএব কদ্রু উচিত বিবেচনা করিয়াছেন। তাহারা যেমন ক্রূর, দৈব তেমনই তাহাদিগের উপর প্রাণান্ত দণ্ড পাত করিয়াছেন।

ব্রহ্মা দেবতাদিগকে এইরূপ সম্ভাষণ ও কদ্রুর সমুচিত প্রশংসা করিয়া কশ্যপকে স্বসমীপে অহ্বান পূর্ব্বক করিলেন, হে পুণ্যাত্মন্! যে সকল তীক্ষ্ণবিষ মহাফণ দন্দশূক (৫৬) সর্প তোমার ঔরসে জন্মিয়াছে, জননী তাহাদিগকে শাপ দিয়াছেন। বৎস! তদ্বিষয়ে কোনও ক্রমেই তোমার মন্যু করা বিধেয় নহে। যজ্ঞে সর্পকুলসংহার

(৫৬) সদা দংশনে উদ্যত।

পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট আছে। বিধাতা, মহাত্মা কশ্যপ প্রজাপতিকে এইরূপে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাকে বিষহরী বিদ্যা প্রদান করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা পরস্পর দাস্য পণ করিয়া অমর্ষগ্রস্ত ও রোষ-পরবশ হইয়াছিলেন। এক্ষণে, রজনী প্রভাত ও দিবাকর উদিত হইবামাত্র, অনতিদূরবর্ত্তী তুরগরাজ উচ্চৈঃশ্রবার দর্শনার্থ প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাঁহারা জলধি অবলোকন করিলেন; জলধি অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর জলচরসমূহে সতত সমাকীর্ণ, সমস্ত রত্নের অদ্বিতীয় আকর, জলাধিপতি বরুণ দেবতার আলয়, নাগগণের আবাসস্থান অসুরগণের পরম মিত্র, স্থলচর প্রাণিসমূহের পক্ষে অতি ভয়ানক, অমৃতের একমাত্র উৎপত্তিস্থান, পাঞ্চজন্য শঙ্খের প্রভবভূমি, তাঁহার গর্ভে প্রবল বাড়বানল সর্ব্বকাল অবস্থিতি করিতেছে, এবং জলচরগণ অনবরত ঘোতর শব্দ করিতেছে, তদীয় কলেবর প্রবল পবনবেগে নিরন্তর পরিচালিত হইতেছে, সুতরাং অবিচ্ছেদ পর্ব্বতাকার তরঙ্গ উঠিতেছে, এবং তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন তিনি তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন, চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়, অপ্রমেয়প্রভাব ভগবান্ গোবিন্দ বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্তর্জলে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলোড়িত ও আবিল করিয়াছিলেন, ব্রতপরায়ণ ব্রহ্মর্ষি অত্রি শত শত বৎসরেও তাঁহার তল স্পর্শ করিতে পারেন নাই, অপ্রমিততেজাঃ ভগবান্ পদ্মনাভ প্রলয়কালে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া তাঁহার তরঙ্গশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, মৈনাক ভূধর দেবরাজের বজ্রপাত ভয়ে কাতর হইয়া শরণাগত হইলে তিনি তাহাকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, অসুরদল ঘোর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পরিত্রাণ পায়, এবং সহস্র সহস্র মহানদী প্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিসারিকাদিগের ন্যায় সতত তাঁহাতে সমাবেশ করিতেছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণ মাতৃশাপশ্রবণানন্তর বিবেচনা করিল, আমাদিগের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহ নাই, সুতরাং তাঁহার মনোরথ সম্পন্ন না হইলে কুপিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সম্পাদন করিতে পারিলে প্রসন্না হইয়া আমাদিগের শাপ মোচন করিতে পারেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। চল, সকলে মিলিয়া উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করি। এই সংকল্প করিয়া তাহারা

ঐ অশ্বের পুচ্ছকেশরূপে পরিণত হইল। এমন সময়ে দক্ষতনয়া কদ্রু ও বিনতা আকাশ-পথে, প্রচণ্ড বায়ুবেগে বিচলিত, ঘোরতরনিনাদসঙ্কুল, তিমিঙ্গিলমকরসমূহসমাকীর্ণ, বহুবিধ-ভয়ঙ্করজন্তুসহস্রপরিবৃত, অতিভীষণমূর্ত্তি, সমস্তনদীনায়ক, সকলরত্নাকর, অমৃতাধার, বরুণদেবভবন, নাগগণালয়, বাড়বানলাশ্রয়, ভয়ঙ্করপ্রাণিসমূহনিবাস, অসুরগণবাসভূমি, স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক নদীগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর পরিপূর্য্যমাণ, অতি দুর্দ্ধর্ষ, অতলস্পর্শ, অক্ষোভ্য, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অতিমনোহর, পবিত্রজল জলধি অবলোকন করিতে করিতে প্রীত মনে তদীয় অপর পারে উপনীত হইলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে অশ্বসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্ব শশাঙ্ককিরণের ন্যায় শুভ্রাকার, কেবল পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। বিনতা তদ্দর্শনে বিষাদসাগরে মগ্না হইলেন, কদ্রু জয়লাভে প্রফুল্লা হইয়া তাঁহাকে দাসীকর্ম্মে নিযোজিতা করিলেন। বিনতাও পণেতে পরাজিতা হইয়াছেন, সুতরাং দুঃসহ দুঃখদাবদহনে দগ্ধ হইয়া দাসীভাব অবলম্বন করিলেন।

এই সময়ে গরুড়ও, সময় উপস্থিত হওয়াতে, মাতৃসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া, স্বয়ং অণ্ড বিদারণ পূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাবল, মহাকায়, প্রলয়কালীন অনলতুল্য দুর্নিরীক্ষ্য, বিদ্যুৎসম সমুজ্জ্বলনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগম (৫৭) বিহঙ্গমরাজ, অতিপ্রদীপ্ত হুতাশন রাশির ন্যায় আভাসমান হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ ও ঘোরতর নিনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সহসা অতিপ্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা ব্যাকুল হইয়া বিশ্বরূপী আসনোপবিষ্ট অগ্নিদেবতার শরণাগত হইলেন এবং প্রণিপাত করিয়া অতি বিনয়ে নিবেদন করিলেন, হে অগ্নে! আর শরীর বৃদ্ধি করিও না, তুমি কি আমাদিগকে দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছ? ঐ দেখ, তোমার প্রদীপ্ত রাশি সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইতেছে। অগ্নি কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা বোধ করিতেছ, বাস্তবিক তাহা নহে; আমার তুল্য তেজস্বী বলবান্ বিনতানন্দন গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন; সেই তেজোরাশি দর্শনে তোমরা মোহাবিষ্ট হইয়াছ। এই সর্পকুলসংহারকারী মহাবল কশ্যপতনয় সদা তোমাদিগের হিতৈষী ও দৈত্য রাক্ষস প্রভৃতির অহিতকারী হইবেন। অতএব তোমাদের ভয়ের বিষয় নাই; তথাপি আইস, সকলে মিলিয়া গরুড়ের নিকটে যাই।

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেবতাগণ, ঋষিগণ সমভিব্যাহারে গরুড়সমীপে গমন পূর্ব্বক,

---

(৫৭) ইচ্ছা অনুসারে শীঘ্র ও সর্ব্বত্র গমনক্ষম।

তদীয় স্তুতিবাদ আরম্ভ করিলেন, হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি মুখ, তুমি পদ্মযোনি, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা ও বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, তুমি মহান্, তুমি সর্ব্বকাল সর্ব্বব্যাপী, তুমি অমৃত, তুমি মহৎ যশঃ, তুমি প্রভা, তুমি অভিপ্রেত, তুমি আমাদিগের পরম রক্ষাস্থান, তুমি মহাবল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিশালী, তুমি দুঃসহ, হে মহাকীর্ত্তে গরুড়! ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকল তোমা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তুমি সর্ব্বোত্তম, তুমি চরাচরমূর্ত্তি, তুমি স্বীয় কিরণমণ্ডল দ্বারা দিবাকরের ন্যায় অবভাসমান হইতেছ, তুমি স্বীয় তেজোরাশি দ্বারা সূর্য্যের প্রভামণ্ডল ন্যক্কৃত করিতেছ, তুমি অন্তক, তুমি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থস্বরূপ, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি পরিকুপিত দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি লোকসংহারে উদ্যত প্রলয়-কালীন অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপে উত্থিত হইয়াছ। আমরা মহাবল, মহাতেজাঃ, অগ্নিসমপ্রভ, বিদ্যুৎসমানকান্তি, তিমিরনিবারক, নভোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, পরাবরস্বরূপ, বরদ, দুর্দ্ধর্ষবিক্রম, বিহঙ্গমরাজ গরুড়ের শরণ লইলাম। হে জগন্নাথ! তোমার তপ্তসুবর্ণসমান-কান্তি তেজোরাশি দ্বারা জগন্মণ্ডল সন্তপ্ত হইয়াছে; অতএব তুমি মহাত্মা দেবতাদিগকে রক্ষা কর; দেবতারা ভয়ে অভিভূত হইয়া আকাশপথে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছেন। হে বিহগবর! তুমি দয়ালু মহাত্ম কশ্যপ ঋষির সন্তান, রোষ পরিহার কর, জগৎকে দয়া কর, শান্তি অবলম্বন কর, আমাদিগের রক্ষা কর। তোমার মহাবজ্রসদৃশ ভয়ঙ্কর রবে দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল, স্বর্গলোক, ভূলোক, ও আমাদিগের হৃদয় নিরন্তর কম্পিত হইতেছে। অতএব তুমি অনলতুল্য কলেবর সংহার কর। তোমার কুপিতকৃতান্ততুল্য আকার দর্শনে আমাদের মন একান্ত অস্থির হইয়াছে। হে ভগবন্ পতগপতে! আমরা প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন, শুভপ্রদ, ও সুখাবহ হও। গরুড় দেবতাদিগের ও দেবর্ষিগণের এইরূপ স্তুতিবাদ শ্রবণ করিয়া আত্মতেজঃ সংহার করিলেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

গরুড় দেবতাদিগের এইরূপ স্তুতি ও প্রার্থনা শুনিয়া এবং আপন কলেবর অবলোকন করিয়া তৎপ্রতিসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিলেন, আমার দেহ দর্শনে সকল প্রাণীকে আর ভীত হইতে হইবেক না। সকলেই ভয়ানক আকার দেখিয়া ভীত হইয়াছে; অতএব আমি আত্মতেজঃ সংহার করিতেছি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, কামগম কামবীর্য্য বিহঙ্গম, অরুণকে আত্মপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিত্রালয় হইতে মহার্ণবের অপরপারবর্ত্তিনী

স্বীয় জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং ঐ সময়ে সূর্য্য স্বীয় উগ্র তেজঃ দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ করিবার উদ্যম করাতে, মহাদ্যুতি অরুণকে পূর্ব্ব দিকে স্থাপিত করিলেন।

রুরু কহিলেন, ভগবান্ সূর্য্য কি নিমিত্ত সমস্ত ভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর দেবতারাই বা তাঁহার কি অপকার করিয়াছিলেন যে, তিনি এত কুপিত হইলেন? প্রমতি কহিলেন, যে সময় চন্দ্র ও সূর্য্য, রাহুকে ছদ্মবেশে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া দেন, তদবধি তাঁহাদের উভয়ের সহিত রাহুর বৈরানুবন্ধ হয়। পরে ঐ দুষ্ট গ্রহ সূর্য্যকে গ্রাসযন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিলে, তিনি এই ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন যে, আমি দেবতাদিগের মঙ্গল চেষ্টা করিয়া রাহুর কোপে পতিত হইলাম, এবং তন্নিবন্ধন আমিই একাকী নানা অনর্থকর পাপ ভোগ করিতেছি, বিপৎকালে কোন ব্যক্তিকেই সহায়তা করিতে দেখিতে পাই না, যৎকালে রাহু আমাকে গ্রাস করে, দেবতারা দেখিয়া অনায়াসে সহ্য করিয়া থাকে, অতএব নিঃসন্দেহ আমি সকল লোক সংহার করিব।

সূর্য্যদেব এই মানস করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন, এবং লোকবিনাশনমানসে স্বীয় তেজঃ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া দেবতাদিগের নিকটে গিয়া নিবেদন করিলেন, অদ্য অর্দ্ধরাত্র সময়ে সর্ব্বলোকভয়প্রদ মহান দাহ আরম্ভ হইবেক, তাহাতে ত্রৈলোক্যবিনাশ সম্ভাবনা। তখন দেবতারা ঋষিগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! অদ্য কোথা হইতে মহৎ দাহভয় উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছে না, এক্ষণে রজনী উপস্থিত, জানি না, সূর্য্য উদয় হইলে কি দশা ঘটিবেক।

পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! আমাদের সূর্য্য লোকসংহারে উদ্যত হইয়াছেন; অদ্য উদিত হইলেই ত্রিলোক ভস্মরাশি করিবেন। কিন্তু পূর্ব্বেই ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি। কশ্যপের অরুণ নামে মহাকায় মহাতেজাঃ এক পুত্র জন্মিয়াছে, সে সূর্য্যসম্মুখে অবস্থিতি করিবেক, তাঁহার সারথি হইবেক, এবং তদীয় তেজঃ সংহার করিবেক। প্রমতি কহিলেন, তদনন্তর অরুণ ব্রহ্মার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত হইলেন, এবং সূর্য্য উদিত হইবামাত্র তাঁহাকে আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইলেন। সূর্য্য যে কারণে কুপিত হইয়াছিলেন, এবং অরুণ যে রূপে তাঁহার সারথি হইলেন, সে সমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তৎপরে মহাবল মহাবীর্য্য কামী (৫৮) বিহগরাজ অর্ণবের অপরপারবর্ত্তিনী স্বীয় জননীর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গরুড়মাতা বিনতা পণে পরাজিতা ও দুঃখদাবানলে দগ্ধা হইয়া দাসীভাবে কালহরণ করিতেছিলেন। একদা তিনি পুত্রসমীপে উপবিষ্টা আছেন, এমন সময়ে সর্পকুলজননী কদ্রু বিনতাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, শুন বিনতে! সমুদ্রমধ্যে পরম রমণীয় অতি সুশোভন এক দ্বীপ আছে; ঐ দ্বীপ সর্পগণের আবাসভূমি; আমাকে তথায় লইয়া চল। বিনতা শ্রবণমাত্র কদ্রুকে পৃষ্ঠে লইয়া চলিলেন, গরুড়ও স্বীয় জননীর আদেশানুসারে সর্পদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া তদনুগামী হইলেন। বিনতাহৃদয়নন্দন বিহগরাজ সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে ভুজগগণ অতিপ্রদীপ্ত প্রভাকর প্রভাজালে তাপিত ও মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল।

কদ্রু স্বীয় তনয়দিগের তাদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া বৃষ্টি প্রার্থনায় দেবরাজ ইন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিলেন, হে সর্ব্বদেবনায়ক! হে বলবিনাশন! (৫৯) হে নমুচিপাতন! (৬০) হে শচীপতে! সহস্রাক্ষ তোমাকে প্রণাম করি; তুমি বারিবর্ষণ দ্বারা সূর্যকিরণ-তাপিত সর্পগণের প্রাণদান কর। হে অমরোত্তম! তুমিই আমাদিগের একমাত্র পরিত্রাণের উপায়; কারণ, তুমি অপর্য্যাপ্ত বারিবর্ষণে সমর্থ। হে পুরন্দর; তুমি মেঘ, তুমি বায়ু, তুমিই অগ্নি, তুমিই নভোমণ্ডলে বিদ্যুৎ স্বরূপে বিরাজমান হও, তুমিই ক্ষেপণ করিয়া থাক, এবং তোমাকেই মহামেঘ কহে, তুমি অতি বিষম ঘোর বজ্র স্বরূপ, তুমি ভীষণগর্জ্জনকারী মেঘ, তুমি সকল লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও সংহারকারী, তুমি সকল ভূতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তুমি আদিত্য, তুমি বিভাবসু, তুমিপরমাশ্চর্য্য মহৎ ভূত, তুমি রাজা, তুমি নিখিল দেবের অধীশ্বর, তুমি বিষ্ণু, তুমি সহস্রাক্ষ, তুমি দেব, তুমি পরম গতি, তুমি অমৃত, তুমি পরম পূজিত সোমদেবতা, তুমি তিথি, তুমি লব (৬১), তুমি ক্ষণ, তুমি শুক্ল পক্ষ, তুমি কৃষ্ণ পক্ষ, তুমি কলা (৬১), কাষ্ঠা (৬১), ত্রুটি (৬১), সংবৎসর, ঋতু, মাস, রজনী ও দিবস, তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও সমস্ত বন সহিত পৃথিবী, ভাস্করসহিত তিমিররহিত নভোমণ্ডল, এবং উত্তালতরঙ্গবহুল নীলমকরতিমিতিমিঙ্গিলসঙ্কুল জলধি,

---

(৫৮) ইচ্ছানুসারে শীঘ্র ও সর্ব্বত্র গমনক্ষম।

(৫৯) বলনামক অসুরের বিনাশকারী।

(৬০) নমুচিনামক অসুরের নিপাতকারী।

(৬১) কালের অংশ বিশেষ।

তুমি অতি যশস্বী, এই নিমিত্ত নির্ম্মমনীষা (৬২) সম্পন্ন মহর্ষিগণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে নিরন্ত তোমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, তুমি স্তুত হইয়া যজমানের হিতার্থে যজ্ঞীয় হবিঃ ও সোমরস পান করিয়া থাক। হে অতুলবল! ব্রাহ্মণেরা পারলৌকিক মঙ্গলফলাভিলাষে সতত তোমার অর্চ্চনা করেন, নিখিল বেদাঙ্গ (৬৩) তোমার মহিমা কীর্ত্তন করে, যাগ-পরায়ণ দ্বিজেন্দ্রগণ তোমার সাক্ষাৎকারলাভার্থে সর্ব্ব প্রযত্নে সমস্ত বেদাঙ্গের অনুগম (৬৪) করেন।

ষড়্বিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবান্ পাকশাসন (৬৫) কদ্রুকৃত স্তব শ্রবণ করিয়া নীল জলদপটল দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন, এবং জলদগণকে এই আদেশ দিলেন, তোমরা শুভ বারিবর্ষণ কর। জলদেরা, দেবরাজের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, সৌদামনীমণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া, আকাশমণ্ডলে অনবরত ঘন ঘোর গর্জ্জন করত তোয়রাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। জলধরগণের অভূতপূর্ব্ব প্রভূত বারিবর্ষ, অজস্র ঘোরতর গর্জ্জন প্রবল বাত্যাবহন, ও অনবরত বিদ্যুৎকম্পন দ্বারা নভোমণ্ডলে যেন প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। জলধরগণ অবিশ্রান্ত জলধারা বর্ষণ করাতে চন্দ্র ও সূর্য্য একে বারে তিরোহিত হইলেন। নাগগণ যৎপরোনাস্তি হর্ষ প্রাপ্ত হইল, ভূমণ্ডল সলিলভারে সমন্ততঃ পরিপূর্ণ হইল, শীতল বিমল জল রসাতলে প্রবিষ্ট হইল, পৃথিবী জলতরঙ্গে আপ্লাবিতা হইল, এবং সর্পেরা মাতৃসমভিব্যাহারে রামণীয়কদ্বীপে উত্তীর্ণ হইল।

সপ্তবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগ এইরূপে জলধারার অভিসিক্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইল, এবং গরুড়েরপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্বরায় সেই মকরগণবাসভূমি বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত রামণীয়কদ্বীপে উপস্থিত হইল। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ অতি প্রকাণ্ড লবণার্ণব অবলোকন করিল, এবং সেই দ্বীপবর্ত্তী সর্ব্বজনমনোহর পরম পবিত্র শুভপ্রদ কানন

---

(৬২) বুদ্ধি।

(৬৩) শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, ও জ্যোতিষ।

(৬৪) পরস্পর অবিরোধসম্পাদন, মীমাংসা।

(৬৫) পাকনামক অসুরের শাসনকর্ত্তা, ইন্দ্র।

মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিহার করিতে লাগিল। ঐ কানন নিরন্তর সাগরসলিলে সিক্ত হইতেছে, বহুবিধ বিহঙ্গগণ অনুক্ষণ চতুর্দ্দিকে কোলাহল করিতেছে, ফলকুসুমসুশোভিত তরুমণ্ডলীতে পরিবৃত হইয়া পরম রমণীয় হইয়া আছে, বিচিত্র অট্টালিকা, পরম সুন্দর সরোবর, ও নির্ম্মলজলপূর্ণ দিব্য হ্রদ সমূহে অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে, অবিশ্রান্ত শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার হইতেছে, অত্যুন্নত চন্দনতরু ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষ সমূহ দ্বারা সদা শোভিত হইয়া আছে, ঐ সকল বৃক্ষ বায়ুবেগে বিচলিত হইয়া অজস্র পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে, মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ রবে গান করিতেছে, ঐ কানন অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণের অতি প্রিয় স্থান, দর্শনমাত্র অন্তঃকরণে অতিমাত্র আহ্লাদ প্রদান করে।

কদ্রুনন্দনেরা কিয়ৎ ক্ষণ বনবিহার করিয়া মহাবীর্য্য গরুড়কে কহিল, দেখ, আমাদিগকে আর কোন নির্ম্মলজলসম্পন্ন রমণীয় দ্বীপে লইয়া চল, তুমি আকাশপথে গমনকালে নানা রম্য দেশ দেখিতে পাও। গরুড়, সর্পগণের এইরূপ আদেশ শ্রবণমাত্র, স্বীয় জননী সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! কি কারণে আমাকে সর্পগণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবেক, বল। বিনতা কহিলেন, বৎস! আমি দুর্দ্দৈববশতঃ সর্পগণের মায়াবলে পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাসী হইয়াছি। মাতৃমুখে এই কারণ শ্রবণ করিয়া গরুড় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সর্পগণের নিকটে গিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি বল, আমি কোন্ বস্তু আহরণ অথবা কি পৌরুষের কর্ম্ম করিলে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব। সর্পেরা গরুড়ের প্রার্থনা শুনিয়া কহিল, অহে বিহঙ্গম! যদি তুমি আপন পরাক্রম প্রভাবে অমৃত আহরণ করিতে পার, তবে তোমার দাসত্ব মোচন হইবেক।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, গরুড় সর্পগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া মাতৃসমীপে আসিয়া কহিলেন, জননি! আমি অমৃত আহরণে যাইতেছি, পথে কি আহার করিব, বলিয়া দাও। বিনতা কহিলেন, সমুদ্রমধ্যে বহু সহস্র নিষাদ (৬৬) বাস করে, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অমৃত আহরণ কর। কিন্তু কোনও ক্রমেই তোমার যেন ব্রাহ্মণবধে বুদ্ধি না জন্মে; ব্রাহ্মণ সর্পভূতের অবধ্য ও অনলতুল্য। ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইলে তিনি অগ্নি, সূর্য্য, বিষ ও শস্ত্রস্বরূপ হন। ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সর্পভূতের গুরুস্বরূপ পরিকীর্ত্তিত

---

(৬৬) ধীবর, যাহারা মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

হইয়াছেন। ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণ সাধুদিগের পরম পূজনীয়। অতএব বৎস! তুমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও কোনও ক্রমে কদাপি ব্রাহ্মণেব বধ বা বিদ্রোহাচরণ করিবে না। সংশিতব্রত (৬৭) ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে যেরূপ ভস্ম করিতে পারেন, কি অগ্নি, কি সূর্য্য, কেহই সেরূপ পারেন না।' বক্ষ্যমাণ বিবিধলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে। ব্রাহ্মণ সকল জীবের অগ্রজ, সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ, সকল লোকের পিতা ও গুরু।

গরুড় মাতৃমুখে ব্রাহ্মণের এইরূপ মহিমা ও প্রভাব শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মাতঃ! ব্রাহ্মণের কিপ্রকার আকার, কীদৃশ শীল ও কিরূপ পরাক্রম, তিনি কি অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্তকলেবর অথবা সৌম্যমূর্ত্তি? আমি যে সমস্ত শুভ লক্ষণ দ্বারা ব্রাহ্মণকে চিনিতে পারিব, তৎসমুদায় তুমি হেতুনির্দ্দেশ পূর্ব্বক বর্ণন কর। বিনতা কহিলেন, বৎস! যিনি তোমার কণ্ঠপ্রবিষ্ট হইয়া বড়িশপ্রায় ক্লেশকর হইলেন ও জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় কণ্ঠদাহ করিবেন, তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ জানিবে। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াও কদাপি ব্রাহ্মণবধ করিবে না। বিনতা পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত পুনর্ব্বার কহিলেন, যিনি তোমার জঠরে জীর্ণ হইবেন না, তাঁহাকে সুব্রাহ্মণ জানিবে। সর্পমায়াপ্রতারিতা পরম দুঃখিতা পুত্রবৎসলা বিনতা পুত্রের অতুল বীর্য্য জানিয়াও প্রীত মনে এই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, বায়ু তোমার পক্ষদ্বয় রক্ষা করুন, চন্দ্র ও সূর্য্য পৃষ্ঠদেশ, অগ্নি মস্তক, ও বসুগণ সর্ব্ব শরীর রক্ষা করুন। আর আমিও সংযতা ও ব্রতপরায়ণা হইয়া এই স্থানে তোমার মঙ্গলচিন্তনে তৎপরা রহিলাম। এক্ষণে অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধি নিমিত্ত নির্বিঘ্নে প্রস্থান কর।

এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বিহগরাজ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ পরে বুভুক্ষিত হইয়া দ্বিতীয়কৃতান্তপ্রায় নিষাদগণের বাসস্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার অবতরণবেগ দ্বারা এরূপ ধূলিপ্রবাহ উত্থিত হইল যে, নিষাদেরা অন্ধ ও নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, সমুদ্রের জল শুষ্ক হইতে লাগিল, আর পক্ষপবনবেগে সমীপবর্ত্তী বৃক্ষ সকল বিচলিত হইল। তৎপরে বিহগরাজ নিষাদদিগের পথ রুদ্ধ করিয়া অতি প্রকাণ্ড মুখ বিস্তার করিলেন। বিষাদমগ্ন নিষাদগণ, পবনবেগ ও ধূলিবর্ষ দ্বারা অন্ধপ্রায় ও দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, ত্বরিত গমনে সেই ভুজঙ্গভোজীর মুখাভিমুখে ধাবমান হইল। যেমন সমস্ত অরণ্য বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত হইলে সহস্র সহস্র পক্ষী কাতর হইয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করে, সেইরূপ নিষাদেরা গরুড়ের অতি প্রকাণ্ড বিস্তৃত মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বুভুক্ষিত বিহগরাজ এইরূপে নিষাদগণের প্রাণসংহার করিয়া মুখসঙ্কোচন করিলেন।

---

(৬৭) যে ব্যক্তি যথানিয়মে নিত্য নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে—

ঊনত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক গরুড়ের কণ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দাহ করিতে লাগিলেন। তখন বিহগরাজ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি মুখব্যাদান করিয়াছি, তুমি ত্বরায় নির্গত হও; ব্রাহ্মণ সদা পাপ কর্ম্মে রত হইলেও আমার বধ্য নহেন। গরুড়বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আমার ভার্য্যা নিষাদীও আমার সমভিব্যহারে নির্গতা হউক। গরুড় কহিলেন, তুমি নিষাদীকে লইয়া অবিলম্বে বহির্গত হও; বিলম্ব করিলে আমার জঠরানলে ভস্ম হইয়া যাইবে। তখন বিপ্র নিষাদী সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গরুড়ের সমুচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া স্বাভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে সস্ত্রীক বিপ্র নিষ্ক্রান্ত হইলে, বিহগরাজ দুই পক্ষ বিস্তৃত করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপ জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কি না, আর নরলোকে পর্য্যাপ্ত ভোজন পাইতেছ কি না। গরুড় কহিলেন, পিতঃ! আমার মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন, আর আমিও শারীরিক ভাল আছি, কিন্তু পর্য্যাপ্ত ভোজন পাই না। সর্পেরা আমাকে অমৃত আহরণে প্রেরণ করিয়াছে, আমি জননীর দাসীভাববিমোচনার্থে অমৃত আহরণ করিব। জননী নিষাদভক্ষণের আদেশ দিয়াছিলেন, আমি তদনুসারে সহস্র সহস্র নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু ক্ষুধানিবৃত্তি হয় নাই। অতএব যাহা আহার করিয়া অমৃত আহরণ করিতে পারি, আপনি এরূপ কোনও ভক্ষ্য দ্রব্য নির্দ্দেশ করুন। কশ্যপ কহিলেন, বৎস! সম্মুখে সরোবর অবলোকন করিতেছ, ঐ পবিত্র সরোবর দেবলোকেও বিখ্যাত। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখে কূর্ম্মরূপী স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। আমি তাহাদিগের পূর্ব্ব জন্মের বৈরকারণ ও আকারের পরিমাণ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতি ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম সুপ্রতীক। সুপ্রতীকের এরূপ অভিলাষ নহে যে, পৈতৃক ধন অবিভক্ত থাকে; এজন্য তিনি জ্যেষ্ঠের নিকট সর্ব্বদাই বিভাগের কথা উত্থাপন করেন। এক দিন বিভাবসু বিরক্ত হইয়া সুপ্রতীককে কহিলেন, দেখ অনেকেই মোহান্ধ হইয়া সর্ব্বদাই বিভাগ করিতে বাঞ্ছা করে; কিন্তু বিভক্ত হইয়াই অর্থমোহে বিমোহিত হইয়া পরস্পরে বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ভ্রাতারা ধনার্থে পৃথগ্‌ভূত হইলে শত্রুরা মিত্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের মনোভঙ্গ জন্মাইয়া দেয়; এবং ক্রমে ক্রমে ভগ্নস্নেহ হইলে, তাহারা পরস্পরের নিকট

পরস্পরের দোষারোপ করিয়া বৈর বৃদ্ধি করিয়া দিতে থাকে ; এইরূপ হইলে অবিলম্বেই তাহাদিগের সর্ব্বনাশ ঘটে। এই নিমিত্ত ভ্রাতৃবিভাগ সাধুদিগের অনুমোদিত নহে। তুমি নিতান্ত মূঢ় হইয়া ধনবিভাগ প্রার্থনা করিতেছ, কোনও ক্রমেই আমার বারণ শুনিতেছ না ; অতএব হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইবে। সুপ্রতীক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বিভাবসুকে কহিলেন, তুমিও কচ্ছপযোনি প্রাপ্ত হইবে। বুদ্ধিভ্রষ্ট সুপ্রতীক ও বিভাবসু এইরূপে পরস্পরদত্ত শাপ প্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াও রোষদোষ বশতঃ পরস্পর দ্বেষরত এবং শরীরগুরুতা ও বলদর্পে দর্পিত হইয়া, পূর্ব্ববৈরানুসরণ পূর্ব্বক, এই সরোবরে অবস্থিতি করিতেছে। তীরস্থিত গজের শব্দ শুনিতে পাইয়া জলমধ্যবাসী কচ্ছপ সমস্ত সরোবর আলোড়িত করিয়া উত্থিত হইয়াছে, এবং মহাবীর্য্য গজও কচ্ছপকে উত্থিত দেখিয়া শুণ্ড, কুণ্ডলীকৃত করিয়া জলে অবতীর্ণ হইয়াছে ; তদীয় দন্ত, শুণ্ড, লাঙ্গুল ও পদচতুষ্টয়ের বেগে সরোবর বিচলিত হইয়াছে, কচ্ছপও মস্তক উন্নত করিয়া যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইয়াছে। গজের আকার ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত ; কচ্ছপ তিন যোজন উন্নত, তাহার শরীরের মণ্ডল দশ-যোজন প্রমাণ! উহারা পরস্পর প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধোন্মত্ত হইয়াছে ; তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া স্বকার্য্য সাধন কর।

কশ্যপ গরুড়কে ইহা কহিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন, দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধকালে তোমার মঙ্গল হউক ; আর পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ ও আর যে কিছু মঙ্গলকর বস্তু আছে, সে সমস্ত তোমার শুভদায়ক হউক। হে মহাবল পরাক্রান্ত! যৎকালে তুমি দেবতাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ, সাম, এই ত্রিবিধ বেদ, পবিত্র যজ্ঞীয় হবিঃ, সমস্ত রহস্যশাস্ত্র ও সমস্ত বেদ, তোমার বলাধান করিবেন। গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং অনতিদূরে সেই নির্ম্মলসলিলপূর্ণ পক্ষিকুলসমাকুল হ্রদ দেখিতে পাইলেন। অনন্তর পিতৃবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপ গ্রহণ করিয়া আকাশমণ্ডলে অধিরোহণ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে অলম্বনামক তীর্থে উপস্থিত হইয়া দেববৃক্ষগণের উপরি আরোহণের উপক্রম করিলে, তাহারা তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া সাতিশয় কম্পিত হইল, এবং এই আশঙ্কা করিতে লাগিল, পাছে গরুড়ভরে ভগ্ন হই। গরুড়, সেই অভিলষিতফলপ্রদ দেবদ্রুমদিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া, অন্যান্য অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন। ঐ সমস্ত মহাদ্রুম কাঞ্চনময় ও রজতময় ফলে পরিপূর্ণ ও সতত সাতিশয় শোভমান ; তাহাদের শাখা সকল প্রবালকল্পিত, মূলদেশ অনবরত সাগরসলিলে ক্ষালিত হইতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ অতি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ গরুড়কে প্রবল

বেগে আগমন করিতে দেখিয়া কহিল, অহে বিহগরাজ! তুমি আমার এই শতযোজন-বিস্তৃত মহাশাখায় অবস্থিত হইয়া গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ কর। পর্ব্বততুল্যকলেবর বেগবান্ বিনতাতনয়ের স্পর্শমাত্র, বহুসহস্রবিহগসেবিত বটবৃক্ষ বিচলিত ও সেই নির্দ্দিষ্ট শাখা ভগ্ন হইল।

ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাবল বিহগরাজের পদস্পর্শমাত্র সেই তরুশাখা ভগ্ন হইল। ভগ্ন হইবামাত্র তিনি উহাকে ধারণ করিলেন, এবং শাখা ভগ্ন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করত, অধোমুখে লম্বমান তপঃপরায়ণ বালখিল্য ব্রহ্মর্ষিদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ঋষিগণ এই শাখায় লম্বমান আছেন, শাখা ভূতলে পতিত হইবামাত্র ইঁহাদিগের প্রাণবিনাশ হইবে। অনন্তর, গজ ও কচ্ছপকে নখর দ্বারা দৃঢ়তর রূপে ধারণ করিয়া ঋষিদিগের প্রাণবিনাশ আশঙ্কাতে চঞ্চুপুট দ্বারা সেই শাখা গ্রহণ করিলেন। মহর্ষিগণ, গরুড়ের এইরূপ অতিদৈব (৬৮) কর্ম্ম দেখিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে হেতুবিন্যাস পূর্ব্বক তাঁহার এই নাম রাখিলেন যে, যেহেতু এই বিহঙ্গম গুরু ভার গ্রহণ পূর্ব্বক উড্ডীন হইয়াছে, এজন্য অদ্যাবধি ইহার নাম গরুড় (৬৯) রহিল অনন্তর তিনি পক্ষপবনবেগে পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত সকল বিচলিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে পতগরাজ বালখিল্য ব্রহ্মর্ষিগণের প্রাণরক্ষার্থে গজ ও কচ্ছপ লইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া, তপঃপরায়ণ স্বীয় পিতা কশ্যপের দর্শন পাইলেন। কশ্যপও সেই বলবীর্য্যতেজঃসম্পন্ন, মন ও বায়ুসম বেগবান্, শৈলশৃঙ্গসমকায়, অচিন্তনীয়, অতর্কণীয়, সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর, মহাবীর্য্যধর, ভীষণমূর্ত্তি, অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত, দেবদানবরাক্ষসের অধৃষ্য ও অজেয়, গিরিশৃঙ্গভেদনক্ষম, সমুদ্রশোষণ-সমর্থ, ত্রিলোকদলনক্ষম, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, দিব্যরূপী বিহঙ্গমকে সমাগত দেখিয়া ও তদীয় মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, বৎস! সহসা এরূপ অসংসাহসিক কর্ম্ম করিও না, এরূপ করিলে ক্লেশ পাইবে, মরীচিপ (৭০) বালখিল্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে

---

(৬৮) দেবতাদিগেরও অসাধ্য।

(৬৯) গুরু শব্দের অর্থ মহৎ ও ড়ী ধাতুর অর্থ উড়িয়া যাওয়া; এই উভয়ের যোগে গরুড় পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

(৭০) মরীচি শব্দের অর্থ কিরণ, পা ধাতুর অর্থ পান। বালখিল্যেরা সূর্য্যের কিরণমাত্র পান করিয়া প্রাণধারণ করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে মরীচিপ কহে।

ভস্মসাৎ করিতে পারেন। অনন্তর তিনি পুত্রস্নেহপরবশ হইয়া তপস্যা দ্বারা হতপাপ মহাভাগ বালখিল্যদিগকে এই বলিয়া প্রসন্ন করিলেন, হে তপোধনগণ! গরুড় লোকহিতার্থে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তোমরা অনুজ্ঞা প্রদান কর। বালখিল্যগণ, ভগবান্ কশ্যপের অভ্যর্থনা শ্রবণ করিয়া সেই শাখা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তপস্যার্থে পরম পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্যগণ প্রয়াণ করিলে পর বিনতাতনয় স্বীয় পিতা কশ্যপকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! আমি কোন্ স্থানে এই তরুশাখা পরিত্যাগ করি, আপনি কোনও মানুষশূন্য দেশ নির্দ্দেশ করুন। তখন কশ্যপ মানবসমাগমশূন্য, হিমাচ্ছন্ন, অন্য লোকের মনেরও অগোচর, এক পর্ব্বত নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। মহাকায় বিহঙ্গম তরুশাখা এবং গজ ও কচ্ছপ সহিত অতিবেগে সেই পর্ব্বতোদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি যে তরুশাখা লইয়া গমন করিলেন, তাহা এমন প্রকাণ্ড যে, শত গোচর্ম্মনির্ম্মিত অতি দীর্ঘ রজ্জু দ্বারাও তাহার বেষ্টন ও বন্ধন হইতে পারে না। পতগরাজ অনতিদীর্ঘকালমধ্যে সেই শতসহস্র-যোজনান্তরস্থিত পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া পিতৃবাক্যানুসারে তদুপরি তরুশাখা পরিত্যাগ করিলেন। শৈলরাজ তদীয় পক্ষপবনে আহত হইয়া কম্পিত হইল, তত্রত্য তরুগণ বিচলিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল, যে সকল মণিকাঞ্চনশোভিত শৃঙ্গ সেই মহাগিরির শোভা সম্পাদন করিত, সে সমস্ত বিশীর্ণ হইয়া সমন্ততঃ পতিত হইল, বহুসংখ্যক বৃক্ষ গরুড়ানীত শাখা দ্বারা অভিহিত হইয়া, সুবর্ণকুসুম দ্বারা, বিদ্যুৎসমূহশোভিত জলধরগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, বৃক্ষগণ ভূতলে পতিত ও ধাতুরাগে রঞ্জিত হইয়া সাতিশয় শোভমান হইল। তদনন্তর গরুড, সেই গিরির শিখরদেশে অবস্থিত হইয়া গজ ও কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে সেই কূর্ম্ম ও কুঞ্জর অভ্যবহার করিয়া পর্ব্বতের শিখরাগ্রভাগ হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অতঃপর দেবতাদিগের ভয়সূচক উৎপাতারম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, দিবাভাগে নভোমণ্ডল হইতে ধূম অগ্নিশিখা সম্বলিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বসু, রুদ্র, আদিত্য, সাধ্য, মরুৎ ও অন্যান্য দেবতাগণের অস্ত্র সকল পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। অধিক কি কহিব, দেবাসুরযুদ্ধকালেও এরূপ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটে নাই। প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল, সহস্র সহস্র বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত হইতে লাগিল, আকাশে বিনা মেঘে ঘোরতর গর্জন হইতে লাগিল; যিনি দেবতাগণের দেব, তিনিও রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; দেবতাদিগের মাল্য ম্লান ও তেজঃ নষ্ট হইয়া গেল; অতি ভীষণ প্রলয়জলধর সকল অজস্র শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল; ধূলিপ্রবাহ উত্থিত হইয়া দেবতাদিগের মুকুট মলিন করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র, এই সমস্ত দারুণ উৎপাত দর্শনে উদ্বিগ্ন হইয়া, বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসিলেন ভগবন্! কি নিমিত্ত সহসা এই সকল ঘোরতর উৎপাত আরম্ভ হইল? আমাদিগকে যুদ্ধে অভিভব করিতে পারে, এমন শত্রু উপস্থিত দেখিতেছি না, তবে কি কারণে এ সকল ঘটিতেছে, বলুন। বৃহস্পতি কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তোমার অপরাধ ও অনবধান দোষে, মহাত্মা বালখিল্য মহর্ষিদিগের তপঃপ্রভাবে, বিনতাগর্ভে কশ্যপমুনির গরুড় নামে পক্ষিরূপী পুত্র জন্মিয়াছে; সেই মহাবল পরাক্রান্ত কামরূপী বিহঙ্গম অমৃত হরণ করিতে আসিয়াছে। তাহার তুল্য বলবান্ আর নাই, সে অমৃতহরণে সমর্থ বটে, তাহার নিকট কিছুই অসম্ভব নয়, সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ইন্দ্র সুরাচার্য্যের বচন শ্রবন করিয়া অমৃতরক্ষকদিগকে কহিলেন, মহাবল মহাবীর্য্য পক্ষী অমৃত হরণে উদ্যত হইয়াছে; অতএব তোমাদিগকে সাবধান করিতেছি, যেন সে বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া না লয়; বৃহস্পপতি কহিয়াছেন, তাহার অতুল বল। দেবগণ ইন্দ্রবাক্য শ্রবণে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যত্ন পূর্ব্বক অমৃত বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলেন, এবং দেবরাজও বজ্রহস্তে সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দিব্যাভরণভূষিত, উজ্জ্বলকায়, পাপসম্পর্কশূন্য, অনুপমবলবীর্য্যসম্পন্ন, অসুরসংহারকারী সুরগণ, কাঞ্চনময় বৈদূর্য্যবিনির্ম্মিত মহামূল্য মহোজ্জ্বল সুদৃঢ় বিচিত্র কবচ, বহুবিধ ভয়ঙ্কর অগণন তীক্ষ্ণ শস্ত্র, ধূম স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা-সহকৃত চক্র, পরিঘ, ত্রিশূল, পরশু, বহুবিধ তীক্ষ্ণ শক্তি, উজ্জ্বল করাল করবাল, প্রচণ্ড গদা ইত্যাদি বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অমৃতরক্ষণে তৎপর হইলেন। দেবগণ এইরূপে নানাবিধ অস্ত্র সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া, ভূতলে অকস্মাৎ আবির্ভূত সূর্য্যকিরণপ্রকাশিত আকাশমণ্ডলের ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীক পর্ব্ব

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্রের কি অপরাধ ও কিরূপ অনবধানদোষ ঘটিয়াছিল, বালখিল্য মহর্ষিগণের তপস্যা দ্বারাই বা গরুড় কেন উৎপন্ন হইলেন, দেবর্ষি কশ্যপেরই বা কেন পক্ষিরাজ পুত্র জন্মিল, আর সেই পক্ষীই বা কি কারণে সর্ব্বভূতের অনভিভবনীয়, অবধ্য, কামচারী ও কামবীর্য্য হইলেন? আমি এই সমস্ত বিষয় শুনিতে বাসনা করি; যদি পুরাণে বর্ণিত থাকে, কীর্ত্তন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাশয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা পৌরাণিক বিষয় বটে; আমি সংক্ষেপে সমুদায় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোনও সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঋষি, দেব ও গন্ধর্ব্বগণ সেই যজ্ঞে তাঁহার সমুচিত সাহায্য করেন। কশ্যপ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠের আহরণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র স্বীয় সামর্থ্যানুরূপ পর্ব্বতাকার কাষ্ঠভার লইয়া অক্লেশে আগমন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, অতি খর্ব্বাকৃতি বালখিল্য ঋষিরা সকলে মিলিয়া একটিমাত্র পত্রবৃন্ত আনিতেছেন; তাঁহাদের কলেবর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ; তাঁহারা অতি শীর্ণকায়, নিরাহার, নিতান্ত দুর্ব্বল, গোষ্পদের জলে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছেন। বীর্য্যমত্ত পুরন্দর তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া উপহাস করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাদিগকে লঙ্ঘন করিয়া সত্বর গমনে প্রস্থান করিলেন। ঋষিগণ এইরূপে যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং যাহাতে ইন্দ্রের ভয় জন্মে, এরূপ এক মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন। তাঁহারা এই কামনা করিয়া মহার্থ মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক যথাবিধি হুতাশনমুখে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, কামবীর্য্য, কামগম, দেবরাজভয়প্রদ অন্য এক ইন্দ্র উৎপন্ন হউক, অন্য আমাদিগের তপস্যাফলে ইন্দ্রের শতগুণ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন, মনের তুল্য বেগবান্ কোন দারুণ প্রাণী উৎপন্ন হউক।

দেবরাজ ইন্দ্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া বিষণ্ণ চিত্তে কশ্যপের শরণাগত হইলেন। প্রজাপতি কশ্যপ দেবরাজমুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বালখিল্যগণসমীপে গমন পূর্ব্বক কর্ম্মসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্যগণ তৎক্ষণাৎ, তথাস্তু, বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক সাদর বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, ইনি ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরাও আবার ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছ, ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা তোমাদিগের উচিত নয়, কিন্তু তোমাদিগের সংকল্পও ব্যর্থ করা আমার অভিপ্রেত নহে, অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত যত্ন করিতেছ, তিনি অতি বলবান্ পক্ষীন্দ্র হউন, আমার অনুরোধে তোমরা দেবরাজের প্রতি প্রসন্ন হও। তপোধন বালখিল্যগণ মুনিশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি কশ্যপের বাক্যশ্রবণানন্তর তাঁহার সমুচিত অর্চ্চনা করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমরা সকলে মিলিয়া ইন্দ্রার্থে এই উদ্যোগ করিয়াছি, আপনিও পুত্রার্থে এই অনুষ্ঠান করিয়াছেন; অতএব আপনি এই ফলোন্মুখ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর বোধ হয়, করুন।

এই সময়েই যশস্বিনী কল্যাণিনী ব্রতপরায়ণা দক্ষকন্যা বিনতা দেবী বহুকাল তপস্যা করিয়া ঋতুস্নানান্তে পুত্রকামনায় স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন কশ্যপ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি যাহা মানস করিয়াছ, তাহা সফল হইবে, বালখিল্যগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সংকল্পবলে তোমার গর্ভে ত্রিভুবনেশ্বর দুই বীর পুত্র জন্মিবেক, তাহারা মহাভাগ ও ত্রিলোকপূজিত হইবেক। ভগবান্ কশ্যপ বিনতাকে

পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি সাবধানা হইয়া এই মহোদয় গর্ভ ধারণ কর। এই দুই সর্ব্বলোক-পূজিত কামরূপী বিহঙ্গম সকল পক্ষীর ইন্দ্রত্ব পদ প্রাপ্ত হইবেক। অনন্তর প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে ইন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তোমার সেই দুই মহাবীর্য্য ভ্রাতা তোমার সহায় হইবেক, তাহাদিগের দ্বারা তোমার কখনও কোনও অপকার ঘটিবেক না। অতএব বিষাদ পরিত্যাগ কর, তুমিই ত্রিভুবনে ইন্দ্র থাকিবে। কিন্তু আর কখন তুমি অতি কোপন বাগ্বজ্র ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগকে উপহাস বা অমান্য করিও না। ইন্দ্র এইরূপ পিতৃবাক্য শ্রবণে নিঃশঙ্ক হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। বিনতাও পতির বরপ্রদান দ্বারা চরিতার্থতা লাভ করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রাপ্তা হইলেন, এবং যথাকালে অরুণ ও গরুড় দুই পুত্র প্রসব করিলেন। তন্মধ্যে অরুণ বিকলাঙ্গ, তিনি সূর্য্যদেবের পুরোবর্ত্তী হইয়াছেন; আর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা গরুড়কে পক্ষিজাতির ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। হে ভৃগুনন্দন! এক্ষণে সেই বিনতাহৃদয়নন্দন পতগেন্দ্রের অতিমহৎ কর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনক! দেবতাগণ নানাবিধ অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক সতর্ক হইয়া অমৃত রক্ষা করিতেছেন, এমন কালে পক্ষিরাজ গরুড় অতি বেগে তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত অবলোকন করিয়া সুরগণ কম্পান্বিত-কলেবর হইলেন, এবং হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। অপ্রমেয়-বলবীর্য্যসম্পন্ন, বিদ্যুৎ ও অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলকায় বিশ্বকর্ম্মাও অমৃতরক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন; তিনি মুহূর্ত্তকাল বিহগরাজ গরুড়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তদীয় পক্ষ, নখ ও চঞ্চু প্রহারে বিক্ষত ও মৃতকল্প হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। তদনন্তর গরুড় পক্ষপবন দ্বারা ধূলিপ্রবাহ উদ্ধৃত করিয়া সমস্ত লোক নিরালোক ও দেবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। সেই ধূলিবর্ষ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া অমৃতরক্ষক দেবগণ মোহপ্রাপ্ত ও অন্ধপ্রায় হইলেন। গরুড় এইরূপে দেবলোক আকুল করিয়া পক্ষ ও চঞ্চু প্রহার দ্বারা দেবতাদিগের শরীর বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ সহস্রাক্ষ পবনকে এই আজ্ঞা দিলেন, অহে মারুত! তুমি ত্বরায় এই ধূলিবর্ষ অপসারিত কর, ইহা তোমার কর্ম্ম। মহাবল পবনদেব তৎক্ষণাৎ ধূলিরাশি অপসারিত করিলে অন্ধকার নিরস্ত হইল। তখন দেবগণ গরুড়কে আক্রমণ করিলেন। দেবতারা প্রহারারম্ভ করিলে, মহাবল মহাবীর্য্য বিনতানন্দন, নভোমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মহামেঘের ন্যায় সর্ব্বভূতভয়ঙ্কর ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে অন্তরীক্ষে আরোহণ করিলেন।

ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়কে নভস্তলস্থিত অবলোকন করিয়া পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্র ও সূর্যরূপী চক্র ইত্যাদি বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিলেন। প্রতাপবান্ গরুড়, এইরূপে সুরগণ কর্ত্তৃক নানা অস্ত্র দ্বারা সমন্ততঃ আহত হইয়াও, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কোনও ক্রমেই বিচলিত হইলেন না, বরং পক্ষদ্বয় ও বক্ষঃস্থল দ্বারা দেবগণকে বিক্ষিপ্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবতারা গরুড় কর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত, তাড়িত ও আহত হইয়া, শোণিত বমন করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে, সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্ব দিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণ দিকে, আদিত্যগণ পশ্চিম দিকে, আর অশ্বিনীকুমারেরা উত্তর দিকে, পলাইলেন।

তদনন্তর গগনচর পক্ষিরাজ মহাবীর পরাক্রান্ত অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলুক, শ্বসন, নিমিষ, প্ররুজ, পুলিন এই নব যক্ষের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। প্রলয়কালে রুদ্রদেব যেরূপ ভয়ানক হইয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ হইয়া পক্ষ, নখ ও চঞ্চুপুটের অগ্রভাগ দ্বারা তাঁহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবল মহোৎসাহ যক্ষগণ গরুড়প্রহারে সর্ব্বাঙ্গে বিক্ষত হইয়া রুধিরধারাবর্ষী জলধরসমূহের ন্যায় আভাসমান হইল।

পরিশেষে পতগরাজ সেই সমস্ত যক্ষের প্রাণসংহার করিয়া অমৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, অগ্নি অমৃতের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে; ঐ অগ্নির জ্বালা অতি ভয়ানক, উহা শিখাসমূহ দ্বারা নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে; বোধ হয়, যেন প্রচণ্ড বায়ুবেগে চালিত হইয়া সূর্য্যদেবকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। তখন অমিত্রঘাতী বেগবান্ গরুড় শতাধিক অষ্ট সহস্র মুখ ধারণ করিলেন, এবং এই সমস্ত মুখ দ্বারা বহুসংখ্যক নদী পান করিয়া, মহাবেগে পুনরাগমন পূর্ব্বক, পীত নদীজল দ্বারা ঐ জ্বলন্ত অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন। এইরূপে অগ্নিশান্তি করিয়া তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র কলেবর অবলম্বন করিলেন।

ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পক্ষিরাজ অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণময় কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অমৃতসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণধার এক লৌহময় চক্র অবিশ্রামে তচ্চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দেবতারা, ঐ অগ্নিতুল্য সূর্য্যসমপ্রভ ভয়ঙ্কর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, অমৃতহরণকারীদিগের ছেদনার্থে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। গরুড় তৎক্ষণাৎ অঙ্গসঙ্কোচ করিয়া অরমধ্যবর্ত্তী স্থান দ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, মহাবীর্য্য, মহাঘোর, সদা ক্রুদ্ধ, অতি বেগবান্,

অনিমিষনয়ন দুই প্রকাণ্ড সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। উহাদের উভয়েরই শরীর অতি প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, চক্ষু অনবরত বিষ উদ্গার করিতেছে। তাহাদের মধ্যে এক সর্পও যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইয়া যায়। বিনতানন্দন, তাহাদের চক্ষুতে ধূলি প্রক্ষেপ করিয়া উভয়কেই অন্ধ করিলেন, এবং অলক্ষিত হইয়া নভোমণ্ডল হইতে তাড়ন ও প্রহার দ্বারা তাহাদের কলেবর খণ্ড খণ্ড করিয়া অমৃতকুম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক অতি বেগে উড্ডীন হইলেন, এবং স্বয়ং অমৃত পান না করিয়া তথা হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সূর্য্যপ্রভা আচ্ছন্ন করিয়া অপরিশ্রান্ত চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

বিনতানন্দন বিহগরাজ অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক আকাশপথে গমন করিতে করিতে নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন তিনি তাঁহার এইরূপ অলৌকিক ক্রিয়া ও লোভবিরহ দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, হে বিহগ! প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। গরুড় কহিলেন, আমি তোমার উপরে থাকিবার বাসনা করি। ইহা কহিয়া পুনর্ব্বার নারায়ণকে কহিলেন, আর ইহাও বর দাও, যেন আমি অমৃত পান না করিয়াও অজর ও অমর হই। নারায়ণ তথাস্তু বলিলেন। গরুড় এইরূপে নারায়ণসন্নিধান হইতে বরদ্বয় প্রতিগ্রহ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! তুমিও প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে বর দিব। বিষ্ণু মহাবল বিহগরাজের নিকট, তুমি আমার বাহন হও, এই প্রার্থনা করিলেন, এবং উপরে থাকিবার বর সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ধ্বজ করিয়া রাখিলেন। গরুড় তথাস্তু বলিয়া বায়ুসম বেগে প্রস্থান করিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র, এইরূপে গরুড়কে অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক বিমানপথে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, ক্রোধভরে বজ্র প্রহার করিলেন। তিনি বজ্র দ্বারা তাড়িত হইয়া হাস্যমুখে মধুর বচনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেখ, এই বজ্রের আঘাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথা বোধ হয় নাই, কিন্তু যে মুনির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাঁহার ও বজ্রের ও তোমার মানরক্ষার্থে একটি পক্ষ পরিত্যাগ করিতেছি, তুমি ইহার অন্ত পাইবে না, ইহা কহিয়া পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন। সকল প্রাণী ঐ পরিত্যক্ত পক্ষ অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া তাঁহার নাম সুপর্ণ (৭১) রাখিলেন। দেবরাজ এই মহৎ আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, এই পক্ষী অবশ্যই মহাপ্রাণী হইবেক, তখন তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, অহে বিহগরাজ! আমি তোমার অদ্ভুত বল বিক্রম জানিতে ও চির কালের নিমিত্ত তোমার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিতে বাসনা করি।

গরুড় যে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বজ্রপ্রহার প্রভাবে তাহা তিন খণ্ডে বিভক্ত হইলে, এক এক খণ্ডে ময়ূর, নকুল ও বিমুখ পক্ষী, এই তিন সর্পসংহারকারীর উৎপত্তি হইল।

---

(৭১) সু সুন্দর পর্ণ পক্ষ, যাহার পক্ষ দেখিতে অতি সুন্দর।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

গরুড় কহিলেন, হে দেবরাজ! তোমার ইচ্ছানুসারে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার সখ্য হউক, আমার বল অতি প্রভূত ও অত্যন্ত অসহ্য। সাধুরা কদাপি স্বীয় বল প্রশংসা ও গুণ কীর্ত্তন করেন না, তুমি সখা, তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই নিমিত্ত বর্ণন করিব; নতুবা অকারণে আত্মপ্রশংসা করা উচিত নহে। আমার বলের কথা অধিক কি বলিব, এই পৃথিবীকে সমুদায় পর্ব্বত, সমুদয় বন ও সমুদায় সাগর সহিত এক পক্ষে বহন করিতে পারি, আর তুমিও যদি ঐ পক্ষ অবলম্বন কর, ঐ সমভিব্যাহারে তোমাকেও বহিতে পারি, আর যদি আমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত ভুবন একত্র করিয়া বহন করি, তথাপি আমি পরিশ্রান্ত হইব না। আমার এত বল।

গরুড়ের এইরূপ উক্তি শুনিয়া সর্ব্বলোকহিতকারী কিরীটধারী শ্রীমান্ দেবরাজ কহিলেন, হে বিহগরাজ! তুমি যাহা কহিলে তোমাতে সকলই সম্ভব; এক্ষণে তুমি আমার সহিত পরমোৎকৃষ্ট বন্ধুতা স্থাপন কর। আর যদি তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে, আমাকে প্রদান কর, তুমি যাহাদিগকে দিবে, তাহারা কেবল আমাদিগের উপর অত্যাচার করিবে। গরুড় কহিলেন, হে সহস্রাক্ষ! আমি কোনও কারণ বশতঃ অমৃত লইয়া যাইতেছি, কিন্তু কাহাকেও পান করিতে দিব না। আমি যে স্থানে ইহা রাখিব, যদি পার, তথা হইতে হরণ করিয়া আনিও। ইন্দ্র কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! তুমি যাহা কহিলে, ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন গরুড় কদ্রুপুত্রগণের দৌরাত্ম্য ও ছলকৃত মাতৃদাস্য স্মরণ করিয়া কহিলেন, আমি সকলের প্রভু হইয়াও তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাবল ভুজগগণ আমার ভক্ষ্য হউক। দেবরাজ গরুড়কে তথাস্তু বলিয়া মহাত্মা দেবদেব যোগীশ্বর হরির নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিয়া গরুড়োক্ত বিষয়ে স্বীয় সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর ভগবান্ ত্রিদশনায়ক পুনর্ব্বার গরুড়কে কহিলেন, তুমি অমৃত স্থাপন করিলেই আমি হরণ করিয়া আনিব।

এইরূপ সম্ভাষণ করিয়া দেবরাজ বিদায় হইলে, গরুড় মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং হৃষ্ট মনে সমস্ত সর্পদিগকে কহিলেন, আমি অমৃত আনিয়াছি, কুশের উপর রাখিয়া দিব; তোমরা ত্বরায় স্নান ও মঙ্গলাচরণ করিয়া পান কর। দেখ, তোমরা যেরূপ কহিয়াছিলে, আমি তাহাই সম্পাদন করিলাম; অতএব অদ্যপ্রভৃতি আমার জননী দাসীভাব হইতে মুক্ত হউন। সর্পেরা তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া স্নান করিতে গেল; এবং ইন্দ্রও অবসর বুঝিয়া আগমন পূর্ব্বক অমৃত গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গারোহণ করিলেন। সর্পেরা স্নানক্রিয়া জপবিধি ও মঙ্গলাচরণ সমাধান করিয়া হৃষ্ট চিত্তে অমৃতপানাভিলাষে

সেই প্রদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু গরুড় যে কুশাসনে রাখিবেন বলিয়াছিলেন, তথায় অমৃত না দেখিয়া বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছল করিয়া বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম তেমনই ছল করিয়া অমৃত গ্রহণ করিয়াছে। পরে, এই স্থানে অমৃত রাখিয়াছিল বলিয়া, তাহারা কুশাসন চাটিতে লাগিল, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল। অমৃতস্পর্শ দ্বারা কুশের নাম পবিত্রী হইল।

মহাত্মা গরুড় এইরূপে অমৃতের হরণ ও আহরণ এবং সর্পগণের দ্বিজিহ্বতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তদনন্তর মহাযশাঃ খগকুলচূড়ামণি পরম হৃষ্ট চিত্তে সেই কাননে বিহার করিয়া ভুজঙ্গগণ ভক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় জননীর আনন্দ জন্মাইতে লাগিলেন। যে নর ব্রাহ্মণসভাতে এই উপাখ্যান শ্রবণ অথবা পাঠ করে, যে মহাত্মা বিহগরাজ গরুড়ের মহাত্ম্যকীর্ত্তন দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়া স্বর্গারোহণ করে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

শৌনিক কহিলেন, হে সূতনন্দন। ভুজঙ্গজননী কদ্রু স্বীয় সন্তানদিগকে, এবং বিনতাতনয় অরুণ আপন জননীকে, যে কারণে শাপ দেন, আর মহাত্মা কশ্যপ কদ্রু ও বিনতাকে যে বর প্রদান করেন, এবং বিনতাগর্ভসম্ভূত বিহগযুগলের নাম, তুমি ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত বর্ণন করিলে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সর্পগণের নাম কীর্ত্তন কর নাই। এক্ষনে আমরা প্রধান প্রধান সর্পের নাম শ্রবণে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে তপোধন! সর্পগণ অসংখ্য, অতএব তাহাদের সকলের নাম কীর্ত্তন করিব না। প্রধান প্রধানের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শেষ নাগ সর্ব্ব প্রথমে জন্মেন, তদনন্তর বাসুকি, তৎপরে ঐরাবত, তক্ষক, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, কালিয়, মণিনাগ, অপূরণ, পিঞ্জরক, এলাপত্র, বামন, নীল, অনিল কল্মাষ, শবল, আর্য্যক, উগ্রক, কলশপোতক, শুনামুখ, দধিমুখ, বিমলপিণ্ডক, আপ্ত, করোটক, শঙ্খ, বালিশিখ, নিষ্টানক, হেমগুহ, নহুষ, পিঙ্গল, বাহ্যকর্ণ, হস্তিপদ, মুদ্গরপিণ্ডক, কম্বল, অশ্বতর, কালীয়ক, বৃত্ত, সংবর্ত্তক, পদ্ম, শঙ্খমুখ, কুষ্মাণ্ডক, ক্ষেমক, পিণ্ডারক, করবীর, পুষ্পদংষ্ট্র, বিল্বক, বিল্বপাণ্ডুর, মূষকাদ, শঙ্খশিরাঃ, পূর্ণভদ্র, হরিদ্রক, অপরাজিত, জ্যোতিক শ্রীবহ, কৌরব, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খপিণ্ড, বিরজাঃ, সুবাহু, শালিপিণ্ড, হস্তিকর্ণ, পিঠরক, সুমুখ, কৌণপাসন, কুঠর, কুঞ্জর, প্রভাকর, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, তিত্তিরি, হলিক, কর্দ্দম, বহুমূলক, কর্কর, অকর্কর, কুণ্ডোদর ও মহোদর। হে দ্বিজোত্তম! প্রধান প্রধান নাগের নাম শুনাইলাম; বাহুল্যভয়ে অপরাপরের নাম কীর্ত্তন করিলাম না। ইহাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তান অসংখ্য; এই নিমিত্ত তাহাদের কথা বলিলাম না বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহুঅর্ব্বুদ সর্প আছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য।

ষষ্ঠত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, বৎস সূতনন্দন! তুমি মহাবীর্য্য দুরাধর্ষ সর্পগণের নাম কীর্ত্তন করিলে শ্রবণ করিলাম, সর্পেরা মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণান্তর কি করিয়াছিল, বল।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মহাযশাঃ ভগবান্ শেষ, নাগ, মাতৃসমীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাচীরধর, বায়ুভক্ষ, দৃঢ়ব্রত, একাগ্রচিত্ত, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, গন্ধমাদন, বদরী, গোকর্ণ, পুষ্কর ও হিমালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরম পবিত্র তীর্থে ও আশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার শরীরের মাংস, ত্বক ও শিরা সকল শুষ্ক হইয়া গেল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শেষের অবিচলিত ধৈর্য্য ও তাদৃশী দশা দর্শন করিয়া কহিলেন, হে শেষ। তুমি এ কি করিতেছ? প্রজালোকের মঙ্গল চিন্তা কর, তোমার কঠোর তপস্যা দ্বারা সকল লোক তাপিত হইতেছে; তোমার মনে কি অভিলাষ আছে? আমার নিকট ব্যক্ত কর। শেষ কহিলেন, আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত দুরাশয়, আমি তাহাদিগের সহিত বাস করিতে অনিচ্ছু, আপনি এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করুন। তাহারা সতত শত্রুর ন্যায় পরস্পর দ্বেষ করে, আর যেন তাহাদের মুখাবলোকন করিতে না হয়, এই অভিলাষে আমি তপস্যা করিতেছি। তাহারা অনবরত সপুত্র বিনতার অহিতাচরণ করে। বিহগরাজ বৈনতেয় আমাদের আর এক ভ্রাতা আছেন, তিনি পিতৃদত্ত বরপ্রভাবে অতিশয় বলবান্ হইয়াছেন। আমার ভ্রাতারা সর্ব্বদা তাঁহার বিদ্বেষ করে। অতএব আমি তপস্যা দ্বারা শরীর পরিত্যাগ করিব, বাসনা এই, যেন জন্মান্তরেও তাহাদের মুখাবলোকন করিতে না হয়।

এইরূপে শেষবাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার ভ্রাতৃগণের আচরণের বিষয় সকলই জানি; আর মাতৃশাপে তাহাদের যে মহৎ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও জানি। কিন্তু পূর্ব্বেই সেই শাপের পরিহার করা আছে। অতএব ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত তোমার খেদ করিবার আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, অদ্য আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মপথবর্ত্তিনী হইয়াছে। প্রার্থনা করি, উত্তরোত্তর তোমার ধর্ম্মে অচলা মতি হউক। শেষ কহিলেন, হে পিতামহ! এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন আমার মতি শম, তপ ও ধর্ম্মে সতত রত থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, আমি তোমার শম দম দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে এক অনুরোধ করিতেছি, প্রজাদিগের হিতার্থে তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবেক। তুমি অরণ্য, গিরি, সাগর, গ্রাম, নগরাদি সমেত এই বিচলিতা পৃথিবীকে এ রূপে ধারণ কর, যেন উহা অচলা হয়। শেষ কহিলেন, হে বরদ! প্রজাপতে! মহীপতে! ভূতপতে! জগৎ-

পতে। আপনকার আজ্ঞা প্রমাণ, আমি পৃথিবীকে নিশ্চলা করিয়া ধারণ করিব, আপনি আমার মস্তকে ন্যস্ত করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে ভুজগরাজ! পৃথিবী তোমাকে পথ দিবেন, তদ্দ্বারা তুমি তাহার অধোভাগে গমন কর। তুমি পৃথিবীকে ধারণ করিলে, আমি পরম পরিতোষ পাইব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পকুলাগ্রজ শেষ নাগ তথাস্তু বলিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন। তদবধি তিনি এই সসাগরা ধরণীকে মস্তকে ধারণ করিয়া আছেন। এইরূপে প্রতাপবান ভগবান্ অনন্তদেব, দেবাদিদেব ব্রহ্মার আদেশানুসারে, একাকী বসুধা ধারণ করিয়া পাতালে অবস্থিতি করিতেছেন। সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ ভগবান্ পিতামহ বিনতাতনয় বিহগরাজ গরুড়ের সহিত অনন্তদেবের মৈত্রী স্থাপন করিয়া দিলেন।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগকুলশ্রেষ্ঠ বাসুকি মাতৃদত্ত শাপ শ্রবণানন্তর সেই শাপ-মোচনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ঐরাবত প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। বাসুকি কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! জননী আমাদিগকে যে শাপ দিয়াছেন, তাহা তোমরা সকলেই বিদিত আছ। আইস, সকলে মিলিয়া সেই শাপমোচনের উপায় চিন্তা করি। সর্ব্বপ্রকার শাপেরই অন্যথা হইবার উপায় আছে; কিন্তু মাতৃদত্ত শাপ হইতে পরিত্রাণের কোনও পথ নাই। বিশেষতঃ, জননী অবিনাশী, অপ্রমেয়স্বরূপ, সত্যলোকাধিপতি ব্রহ্মার সমক্ষে আমাদিগকে শাপ দিয়াছেন, ইহাতেই আমার হৃৎকম্প হইতেছে। নিশ্চিত বুঝিলাম, আমাদের সমূলে বিনাশ উপস্থিত; নতুবা কি নিমিত্ত অবিনাশী ভগবান্ শাপদানকালে জননীকে নিবারণ করিলেন না? অতএব, যাহাতে সমস্ত নাগকুলের ভাবী বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ হয়, আইস, সকলে একত্র হইয়া তাহার উপায় চিন্তা করি; কোনও ক্রমেই কালাতিপাত করা উচিত নহে। আমরা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ; মন্ত্রণা করিয়া অবশ্যই পাপমোক্ষের কোনও উপায় উদ্ভাবিত করিতে পারিব। দেখ! পূর্ব্ব কালে ভগবান অগ্নি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দেবতারা মন্ত্রণাবলে তাঁহার উদ্ভাবন করেন। এক্ষণে যাহাতে জনমেজয়ের সর্পসত্র না হইতে পায়, অথবা বিফল হইয়া যায়, এমন উপায় করিতে হইবেক।

এইরূপ বাসুকিবাক্য শ্রবণ করিয়া, নীতিবিশারদ সমবেত কদ্রুনন্দনেরা তথাস্তু বলিয়া উপস্থিত কার্য্য সাধন বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিল। তন্মধ্যে কোনও কোনও নাগ কহিল, আমরা ব্রাহ্মণের স্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া জনমেজয়ের নিকট এই ভিক্ষা চাহিব, যে,

তুমি যজ্ঞ করিও না। কতকগুলি পণ্ডিতাভিমানী নাগ কহিল, চল, সকলে গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হই, তাহা হইলে তিনি সকল বিষয়েই কার্য্যাকার্য্য নিরূপণের নিমিত্ত আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন; তখন আমরা যাহাতে যজ্ঞ না হইতে পার, এরূপ পরামর্শ দিব। সেই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ রাজা আমাদিগকে নীতিবিদ্যাবিশারদ দেখিয়া অবশ্যই যজ্ঞ বিষয়ে মত জিজ্ঞাসা করিবেন। আমরা ঐহিক ও পারলৌকিক অশেষ বিষম দোষ দর্শাইয়া ও অপরাপর ভূরি ভূরি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, এ রূপে নিষেধপক্ষে মত দিব যে, আর সে যজ্ঞ হইতে পাইবেক না। অথবা যে সর্পসত্রবিধানজ্ঞ রাজকার্য্যতৎপর ব্যক্তি সেই যজ্ঞের উপাধ্যায় হইবেন, আমাদের মধ্যে কোনও নাগ গিয়া তাঁহাকে দংশন করুক, তাহা হইলেই তাঁহার মৃত্যু হইবেক। এইরূপে উপাধ্যায় মরিলে আর সে যজ্ঞ হইবেক না। তদ্ভিন্ন সর্পসত্রজ্ঞ আর আর যে সকল ব্যক্তি যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন, তাঁহাদিগকেও দংশন করিব; তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবেক। ইহা শুনিয়া অন্যান্য ধর্ম্মাত্মা দয়ালু নাগ কহিল, এ তোমাদের অতি অসৎ পরামর্শ, ব্রহ্মহত্যা কোনও ক্রমেই বিধেয় নহে, বিপৎকালে নির্ম্মলধর্ম্মমূলক প্রতীকার চিন্তা করাই প্রশস্ত কল্প, অধর্ম্মপরায়ণতা সমস্ত জগৎ উচ্ছিন্ন করে। আর আর নাগেরা কহিল, আমরা জলধরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া বারিবর্ষণ দ্বারা যজ্ঞীয় প্রদীপ্ত হুতাশন নির্ব্বাণ করিব; আর ঋত্বিক্‌গন রজনীযোগে যখন অনবহিত থাকিবেন, কোনও কোনও নাগ সেই সময়ে যজ্ঞপাত্র সকল হরণ করিয়া আনিবে, তাহা হইলেই যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটিবেক। অথবা, শত সহস্র নাগগণ সকলকেই এক কালে দংশন করুক, এরূপ করিলে অবশ্যই তাহাদের ত্রাস জন্মিবেক। কিংবা ভুজগেরা অতি অপবিত্র স্বীয় মূত্র পুরীষ দ্বারা সংস্কৃত ভোজ্য বস্তু সকল দূষিত করুক। আর আর নাগেরা কহিল, আমরাই সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইব, এবং অগ্রেই দক্ষিণা দাও বলিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিব। এইরূপ করিলে রাজা জনমেজয় আমাদিগের বশীভূত হইয়া আমাদিগেরই ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম করিবেন। কেহ কেহ কহিল, রাজা যৎকালে জলক্রীড়া করিবেন, তখন তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া গৃহে আনিয়া বন্ধন করিয়া রাখিব, তাহা হইলেই যজ্ঞ রহিত হইবে। আর কতকগুলি পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ নাগ কহিল, অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া রাজাকেই দংশন করা ভাল, তাহা হইলেই সকল সম্পন্ন হইল; রাজা মরিলেই সকল অনর্থের মূলোচ্ছেদন হইবেক। মহারাজ! আমাদিগের যেরূপ বুদ্ধি তদনুরূপ কহিলাম; এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিমত হয়, কর।

নাগরাজ বাসুকিকে ইহা কহিয়া নাগগণ তদীয় মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বাসুকি কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমগণ! তোমরা সকলে যে পরামর্শ স্থির করিলে তাহা আমার মতে কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। তোমরা যাহা যাহা কহিলে,

তাহার কিছুই আমার অভিমত নহে। কিন্তু যাহাতে তোমাদের হিত হয়, এমন কোনও উপায় দেখিতে হইবেক। আপনার ও জ্ঞাতিবর্গের হিতার্থে, আমার মতে মহাত্মা কশ্যপকে প্রসন্ন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তোমাদিগের বচনানুসারে কার্য্য করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাহা আমিই বিবেচনা করিয়া স্থির করিব। এক্ষণে আমি কুলজ্যেষ্ঠ, সুতরাং যাবতীয় দোষ গুণ আমার উপরেই পড়িবেক; এই নিমিত্তই আমি বিশেষ দুঃখিত হইতেছি।

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগগণের ও বাসুকির বাক্য শ্রবণ করিয়া এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে সম্বোধিয়া কহিল, হে নাগরাজ। যিনি যাহা বলুন, কোনও ক্রমে সে যজ্ঞ অন্যথা হইবার নহে, এবং পাণ্ডুকুলোদ্ভব যে রাজা জনমেজয় হইতে আমাদের কুলক্ষয়-সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহাকেও বঞ্চনা করিতে পারা যাইবেক না। যে ব্যক্তি দৈবদুর্বিপাক-গ্রস্ত হয়, তাহার দৈবই অবলম্বন করা উচিত, এমন স্থলে দৈব ব্যতিরেকে পরিত্রাণের আর উপায় নাই। হে নাগগণ। আমাদিগেরও এ দৈব ভয়, অতএব দৈবই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। এ বিষয়ে আমি যাহা কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

যৎকালে জননী আমাদিগকে শাপ প্রদান করিলেন, আমি মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে দেবতাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিলাম। দেবতারা শাপশ্রবণে একান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে আসিয়া কহিলেন, হে দেবদেব। কঠিন হৃদয়া কদ্রু আপনার সমক্ষে স্বীয় প্রিয়তম তনয়দিগকে নিষ্ঠুর শাপ দিলেন, কোনও জননী কোনও কালেই এরূপ বিরূপ আচরণ করেন নাই। আপনিও তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যই প্রমাণ করিলেন। কি কারণে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না, আমরা জানিতে বাসনা করি। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ। সর্পেরা অতি ক্রূরস্বভাব, তীক্ষ্ণবিষ, ঘোররূপ, ও অসংখ্য, অতএব আমি প্রজাদিগের হিতার্থে কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। কিন্তু যে সকল সর্প অতি তীক্ষ্ণবিষ, ক্ষুদ্রাশয়, ও অকারণে পরহিংসক, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবেক; যাহারা ধর্ম্মপরায়ণ, তাহাদের কোনও ভাবনা নাই। সেই কাল উপস্থিত হইলে, যে উপায়ে তাহাদের ভয়মোচন হইবেক, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাযাবরবংশে জরৎকারু নামে তপস্বী, জিতেন্দ্রিয়, ধীমান্, মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই জরৎকারুর আস্তীক নামে পুত্র জন্মিবেক; তাহা হইতেই সর্পসত্রের নিবারণ হইবেক এবং যে সকল সর্প ধর্ম্মপরায়ণ তাহারা রক্ষা পাইবেক। দেবগণ পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে

প্রভো! মহাতপাঃ মহাবীর্য্য, মহামুনি জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহাত্মা পুত্র উৎপাদন করিবেন? ব্রহ্মা কহিলেন, মহাবীর্য্য জরৎকারু মুনি সনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্য পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারু নামে এক ভগিনী আছে, তাহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেক, এবং সেই পুত্রই সর্পগণের শাপমোচন করিবেক। দেবগণ শ্রবণমাত্র তথাস্তু বলিলেন; ব্রহ্মাও দেবতাদিগকে পূর্ব্বোক্ত বাক্য কহিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

অতএব, হে নাগরাজ বাসুকে! এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, নাগকুলের ভয়শান্তি নিমিত্ত ব্রতপরায়ণ যাচমান জরৎকারু ঋষিকে ভিক্ষাস্বরূপ জরৎকারুনাম্নী ভগিনী প্রদান কর। আমি শাপমোচনের এই উপায় শ্রবণ করিয়াছি।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সমস্ত নাগগণ এলাপত্রবাক্য শ্রবণে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। বাসুকিও শুনিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তদবধি স্বীয় স্বসা জরৎকারুকে পরমাদরে পরিপালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে পর, দেবতারা সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করিলেন। অতি বলবান্ নাগরাজ বাসুকি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। দেবগণ মন্থনকার্য্য সমাপন করিয়া, বাসুকিকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত এবং বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! বাসুকি মাতৃশাপে ভীত হইয়া সাতিশয় পরিতাপ পাইতেছেন। ইনি জ্ঞাতিবর্গের হিতৈষী, আপনি কৃপা করিয়া ইঁহার মনোবেদনা দূর করুন। বাসুকি সতত আমাদের হিতৈষী ও প্রিয়কারী। হে দেবদেব! প্রসন্ন হইয়া ইঁহার মানসিক ক্লেশ নিরাকরণ করুন।

দেবগণের অভ্যর্থনা শুনিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, হে অমরগণ! পূর্ব্ব কালে এলাপত্র ইঁহাকে যাহা কহিয়াছিল, তাহা আমারই বাক্য। নাগরাজ বাসুকি যথাসময়ে তদনুযায়ী কার্য্য করুন, যাহারা পাপাত্মা, তাহাদিগেরই বিনাশ হইবেক, ধর্ম্মপরায়ণদিগের কোনও আশঙ্কা নাই। দ্বিজশ্রেষ্ঠ জরৎকারু জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপস্যায় একান্ত রত হইয়াছেন; বাসুকি যথাকালে তাঁহাকে ভগিনী দান করুন। এলাপত্র নাগকুলের হিতজনক যে বাক্য কহিয়াছে, তাহা কদাচ অন্যথা হইবেক না।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এইরূপ প্রজাপতিবাক্য শ্রবণানন্তর নাগরাজ বসুকি, জরৎকারুকে ভগিনীদানসংকল্প করিয়া, বহুসংখ্যক নাগগণকে তৎসমীপে নিয়ত অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। কহিয়া দিলেন, জরৎকারু ভার্য্যাপরিগ্রহের বাসনা প্রকাশ করিলে ত্বরায় আমাকে সংবাদ দিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের সকল রক্ষা হইবেক।

চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি জগৎকারু নামে যে মহাত্মা ঋষির চরিত কীর্ত্তন করিলে, তাঁহার নামের অর্থ শুনিতে বাসনা করি। তিনি যে জরৎকারু নামে ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইলেন, ইহার কারণ কি? তুমি কৃপা করিয়া জরৎকারু শব্দের যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎশব্দের অর্থ ক্ষীণ, কারুশব্দের অর্থ দারুণ। তাঁহার শরীর অতিশয় দারুণ ছিল, ধীমান্ মহর্ষি সেই দারুণ শরীরকে কঠোর তপস্যা দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি লোকে জরৎকারু নামে বিখ্যাত। উক্ত হেতু বশতঃ বাসুকির ভগিনীর নামও জরৎকারু।

ধর্ম্মাত্মা শৌনক শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন, এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! যাহা কহিলে, যুক্তিসিদ্ধ বটে। তুমি যাহা কহিলে, সকলই শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আস্তীকের জন্মবৃত্তান্ত শুনিতে বাসনা করি।

উগ্রশ্রবাঃ শৌনকবাক্য শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রানুসারে কহিতে লাগিলেন। মহামতি বাসুকি, সমস্ত নাগগণকে আদেশ দিয়া, জরৎকারু ঋষিকে ভগিনীদান করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইয়া রহিলেন। বহু কাল অতীত হইল, সেই ঊর্দ্ধরেতাঃ মহর্ষি কোনও ক্রমে দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইলেন না; কেবল তপস্যারত, বেদাধ্যয়নতৎপর, ও নির্ভয়চিত্ত হইয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে পর, কুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ মহাবাহু পাণ্ডুর ন্যায় ধনুর্বিদ্যা-পারদর্শী, যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ ও মৃগয়াশীল ছিলেন। রাজা সর্ব্বদাই মৃগ, মহিষ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ও অন্য অন্য বহুবিধ বন্য জন্তু বধ করিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করেন। একদা তিনি বাণ দ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিয়া পৃষ্ঠদেশে ধনুগ্র্হণ পূর্ব্বক তদনুসরণক্রমে গহন বনে প্রবিষ্ট হইলেন। এইরূপে ভগবান্ মহাদেব যজ্ঞমৃগ বিদ্ধ করিয়া হস্তে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক স্বর্গে সেই মৃগের অন্বেষণার্থে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিতের বাণে বিদ্ধ হইয়া কোনও মৃগই জীবিত থাকে না ও পলায়ন করিতে পারে না; কিন্তু সেই মৃগ যে বিদ্ধ হইয়াও অদর্শন প্রাপ্ত হইল, সে কেবল তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ হইল।

রাজা পরীক্ষিৎ সেই মৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে দূরদেশে নীত হইলেন, এবং শ্রান্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এক গোচারণস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক ঋষি স্তনপানপরায়ণ বৎসগণের মুখঃনিসৃত ফেন পান করিতেছেন। রাজা ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, অতএব সত্বর গমনে মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

ভো ভো মুনীশ্বর! আমি অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ। এক মৃগ আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন কি না। সেই মুনি মৌনব্রত, অতএব কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমীপপতিত মৃতসর্প উঠাইয়া তাঁহার স্কন্ধে ক্ষেপণ করিলেন। ঋষি তাহতে রুষ্ট হইলেন না ও ভাল মন্দ কিছুই কহিলেন না। তখন রাজা মুনিকে তদবস্থ দেখিয়া অক্রোধ হইয়া নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু মুনি সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মুনীশ্বর অতিশয় ক্ষমাশীল ছিলেন; এবং মহারাজ পরীক্ষিৎকে অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ জানিতেন, এজন্য নিতান্ত অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে শাপ দিলেন না। ভরতকুলপ্রদীপ রাজাও সেই মহর্ষিকে তাদৃশ ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া জানিতেন না, এই নিমিত্তই তাঁহার তাদৃশ অবমাননা করিলেন।

সেই মহর্ষি অতি তেজস্বী তপঃপরায়ণ এক যুবা পুত্র ছিলেন। তাঁহার নাম শৃঙ্গী। শৃঙ্গী স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ ছিলেন, এক বার ক্রুদ্ধ হইলে শত শত অনুনয়বচনেও প্রসন্ন হইতেন না। তিনি অতি সংযত হইয়া সময়ে সময়ে সর্ব্বলোকপিতামহ সর্ব্বভূত-হিতকারী ব্রহ্মার উপাসনা করিতে যাইতেন। এক দিন তিনি উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুজ্ঞা লইয়া গৃহ প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া তাঁহার পিতৃবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। শৃঙ্গী অতিশয় কোপনস্বভাব ও বিষয়তুল্য, পিতার অপমানবার্ত্তা শ্রবণমাত্র রোষবিষে পরিপূর্ণ হইলেন। কৃশ কহিলেন, অহে শৃঙ্গিন্! তুমি এমন তপস্বী ও তেজস্বী; কিন্তু তোমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প বহন করিতেছেন। অতএব আর তুমি বৃথা গর্ব্ব করিও না এবং আমাদিগের মত বেদবিৎ সিদ্ধ তপস্বী ঋষিপুত্রেরা কিছু কহিলেও কোন কথা কহিও না। এখন তোমার পুরুষত্বাভিমান কোথায় রহিল ও সেই সকল গর্ব্ববাক্যই বা কোথায় গেল? কিঞ্চিৎ পরেই দেখিবে, তোমার পিতা শব বহন করিতেছেন। আমি তোমার পিতার তাদৃশ অবমাননা দর্শনে অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু সেইরূপ অবমানিত হইলে যাহা করা উচিত, তিনি তদনুরূপ কোনও কর্ম্ম করেন নাই।

একচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তেজস্বী শৃঙ্গী কৃশের নিকট পিতার শববহনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোপানলে জ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং কৃশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রিয় বাক্যে সম্বোধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! কি নিমিত্ত আমার পিতা স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণ করিতেছেন, বল। কৃশ কহিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার

পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী কহিলেন, হে কৃশ! আমার পিতা রাজা পরীক্ষিতের কি অপরাধ করিয়াছিলেন, স্বরূপ বর্ণনা করিয়া কর, পরে আমি তপস্যার প্রভাব দেখাইতেছি। কৃশ কহিলেন, অভিমন্যুতনয় রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ারসে ব্যাসক্ত হইয়া একাকী অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিলে, রাজা তাহার অন্বেষণার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তোমার পিতাকে পলায়িত মৃগের কথা বারংবার জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। তোমার পিতা মৌনব্রতাবলম্বী, অতএব কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা রুষ্ট হইয়া অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছেন। তোমার পিতা তদবধি তদবস্থই আছেন, রাজা নিজ রাজধানী হস্তিনাপুর প্রস্থান করিয়াছেন।

এইরূপে পিতৃস্কন্ধে মৃতসর্পক্ষেপণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ঋষিকুমার শৃঙ্গী ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইলেন, তাঁহার নয়নযুগল লোহিতবর্ণ হইল। তেজস্বী শৃঙ্গী ক্রোধে অন্ধ হইয়া আচমন পূর্ব্বক এই বলিয়া রাজাকে শাপ প্রদান করিলেন, যে রাজকুলাধম মৌনব্রতপরায়ণ বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, অতি তীক্ষ্ণতেজাঃ তীক্ষ্ণবিষ সর্পরাজ তক্ষক আমার বচনানুসারে অতি ক্রুদ্ধ হইয়া অদ্য হইতে সপ্ত রাত্রির মধ্যে সেই কুরুকুলের অকীর্ত্তিকর, ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী, পাপিষ্ঠ দুরাচারকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক।

শৃঙ্গী ক্রোধভরে রাজা পরীক্ষিৎকে এই শাপ প্রদান করিয়া গোষ্ঠস্থিতপিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিতার স্কন্ধে মৃত ভুজগ অবলোকন করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কোপাবিষ্ট হইলেন। এবং দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! কুরুকুলাধম পরীক্ষিৎ তোমার যেরূপ অবমাননা করিয়াছিল, আমি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে তদুপযুক্ত এই ভয়ানক শাপ দিয়াছি যে, সর্পশ্রেষ্ঠ তক্ষক সপ্ত দিবসে তাহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবেক।

শমীক ঋষি ক্রোধান্ধ পুত্রের এইরূপ উগ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে কর্ম্ম করিয়াছ, তহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। ইহা তপস্বীর ধর্ম্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি, তিনি ন্যায়পথাবলম্বী হইয়া আমাদের রক্ষা করিতেছেন, তাঁহার অনিষ্টাচরণ করা আমার অভিমত নহে। সৎপথাবলম্বী রাজা কদাচিৎ কোনও অপরাধ করিলেও অস্মাদৃশ লোকের ক্ষমা করা উচিত। ধর্ম্মকে নষ্ট করিলে ধর্ম্ম আমাদিগকে নষ্ট করেন, সন্দেহ নাই। দেখ, যদি রাজা রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, আমাদের ক্লেশের আর পরিসীমা থাকে না, আর ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারি না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা আমাদের রক্ষা করেন, তাহাতেই আমরা নির্ব্বিঘ্নে বহুল-

ধর্ম্মোপার্জ্জন করি। সেই উপার্জ্জিত ধর্ম্মে ধর্ম্মতঃ রাজাদিগের ভাগ আছে। অতএব রাজা কদাচিৎ অপরাধ করিলে ক্ষমা করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, রাজা পরীক্ষিৎ স্বীয় পিতামহ পাণ্ডুর ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। প্রজাপালন রাজার পরম ধর্ম্ম। অদ্য সেই মহাত্মা ক্ষুধার্ত্ত শ্রান্ত হইয়া, আমার মৌনব্রতধারণের বিষয় না জানিয়াই, এই কর্ম্ম করিয়াছেন। দেশ অরাজক হইলে নিয়ত দস্যুভয়াদি নানা দোষ জন্মে। লোক উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজা দণ্ডবিধান দ্বারা শাসন করেন। দণ্ডভয়েই পুনর্ব্বার শান্তি স্থাপন হয়। ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে না, ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলে কেহ ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারে না। রাজা ধর্ম্ম স্থাপন করেন; ধর্ম্ম হইতে স্বর্গ স্থাপিত হয়, রাজার প্রভাবেই নির্ব্বিঘ্নে যাবতীয় যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়, অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়া দ্বারা দেবতাদিগের প্রীতি জন্মে, দেবতা হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য, শস্য হইতে মনুষ্যদিগের প্রাণ ধারণ হয়। অতএব অভিষেকাদিগুণসম্পন্ন রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতা স্বরূপ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, রাজা দশ শ্রোত্রিয়ের সমান মান্য। সেই রাজা অদ্য ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আমার মৌনব্রতধারণের বিষয় না জানিয়াই, এরূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তুমি বালস্বভাবসুলভ অবিমৃষ্যকারিতাপরবশ হইয়া কি নিমিত্ত সহসা এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিলে? রাজা কোনও ক্রমেই আমাদিগের শাপ দিবার পাত্র নহেন।

দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

শৃঙ্গী কহিলেন, পিতঃ! শাপ দেওয়াতে যদিও আমার সাহসিকতা অথবা দুষ্কর্ম্ম করা হইয়া থাকে, আর উহা তোমার প্রিয়ই হউক, অপ্রিয় হউক, যাহা কহিয়াছি, মিথ্যা হইবার নহে। আমি তোমাকে তত্ত্ব কথা কহিতেছি, উহা কদাচ অন্যথা হইবেক না। আমি পরিহাসকালেও মিথ্যা কহি না, শাপ দান কালের ত কথাই নাই। শমীক কহিলেন, বৎস! আমি জানি, তুমি অত্যন্ত উগ্রপ্রভাব ও সত্যবাদী, কখনও মিথ্যা কহ নাই, সুতরাং তোমার শাপ মিথ্যা হইবার নহে। পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও, তাহাকে পিতার শাসন করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে পুত্র উত্তরোত্তর গুণশালী ও যশস্বী হইতে পারে। তুমি ত বালক, তোমাকে অবশ্যই শাসন করিতে পারি। তুমি সর্ব্বদা তপস্যা করিয়া থাক; যাঁহারা তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রভাবসম্পন্ন হয়েন, তাঁহাদের অতিশয় কোপবৃদ্ধি হয়। তুমি পুত্র, তাহাতে বয়সে বালক, আবার যৎপরোনাস্তি অবিবেচনার কর্ম্ম করিয়াছ, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তোমাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। অতএব কহিতেছি শুন, তুমি শমপথাবলম্বী হইয়া এবং বন্য ফল মূল মাত্র

আহার ও ক্রোধের দমন করিয়া তপস্যানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। লোকে পারলৌকিক মঙ্গলাকাঙ্খায় অশেষ ক্লেশে ধর্মসঞ্চয় করে, কিন্তু ক্রোধবশ হইলে এক কালে সমুদায় সঞ্চিত ধর্ম উচ্ছিন্ন হয়। ধর্মহীনদিগের সদগতি নাই। ক্ষমাশীল লোকের শমই সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধন, ক্ষমাশীলের ইহলোক পরলেকে উভয়ত্র জয়। অতএব সতত ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া চলিবে। ক্ষমাশীল হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে। আমি শমপথাবলম্বী হইয়া যাহা করিতে পারি তাহা করি, রাজাকে এই সংবাদ পাঠাইয়া দি যে আমার পুত্র নিতান্ত বালক, অদ্যাপি তাহার বুদ্ধির পরিপাক হয় নাই; তুমি আমার যে অবমাননা করিয়াছিলে, সে তদ্দর্শনে অমর্ষবশ হহয়া তোমাকে শাপ দিয়াছে।

এইরূপ কহিয়া সুব্রত তপঃপরায়ণ শমীকমুনি গৌরমুখনামক সুশীল সমাহিত স্বীয় শিষ্যকে রাজা পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইলেন, এবং কহিয়া দিলেন, অগ্রে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে এই সংবাদ নিবেদন করিবে। গৌরমুখ, গুরুর আদেশানুসারে ত্বরায় হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া, দ্বারপাল দ্বারা সংবাদ দিয়া রাজভবনের প্রবেশ করিলেন, এবং রাজকৃত অভ্যাগতসৎকার স্বীকার ও শ্রান্তি পরিহার করিয়া অদ্যোপান্ত শমীকবাক্য নরপতিগোচরে নিবেদন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! শান্ত, দান্ত, মহাতপাঃ পরমধর্মাত্মা, মৌনব্রতপরায়ণ শমীকঋষি আপনকার রাজ্যে বাস কবেন। আপনি অটনী দ্বারা তাঁহার স্কন্ধদেশে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র ক্ষমা না করিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে আপনাকে এই শাপ দিয়াছেন, তক্ষক সপ্তরাত্র-মধ্যে আপনকার প্রাণসংহার করিবেক। শমীকমুনি পুত্রকে শাপনিবারণের নিমিত্ত বারংবার কহিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, সে শাপ অন্যথা করে। মহর্ষি কুপিত পুত্রকে কোনও ক্রমেই শান্ত করিতে না পারিয়া, পরিশেষে আপনকার হিতার্থে আমাকে সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছেন।

রাজা পরীক্ষিৎ গৌরমুখের এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ ও স্বকৃত গর্হিত কর্ম্ম স্মরণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। শমীকমুনি মৌনব্রত, এই নিমিত্তই উত্তর দেন নাই, ইহা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। যে মহাত্মা সেইপ্রকার অবমানিত হইয়াও এরূপ দয়া প্রদর্শন করিলেন, তাহার উপরেও আমি তাদৃশ অত্যাচার করিয়াছি, মনোমধ্যে এই আলোচনা করিয়া তাঁহার পরিতাপের আর সীমা রহিল না। বিনা দোষে ঋষির অবমাননা করিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি যেরূপ দুঃখিত হইলেন, নিজ মৃত্যুর কথা শুনিয়া তদ্রূপ হইলেন না। অনন্তর গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, আপনি মহর্ষিকে বলুন, যেন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন।

গৌরমুখ প্রস্থান করিবামাত্র, রাজা একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা করিয়া, এক সর্ব্বতঃসুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন, তথায় বহু চিকিৎসক, নানা ঔষধ ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে নিয়োজিত করিলেন, এবং সেই প্রাসাদে থাকিয়া সর্ব্ব প্রকারে রক্ষিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহার নিকটে যাইতে পায় না, সর্ব্বত্রগামী বায়ুও সেই প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না।

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ মহর্ষি কাশ্যপ শুনিয়াছিলেন যে, পন্নগপ্রধান তক্ষক দংশন করিয়া রাজাকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেক। অতএব তিনি মনে করিয়াছিলেন, তক্ষক দংশন করিলে আমি চিকিৎসা দ্বারা রাজাকে বিষমুক্ত করিব, তাহাতে আমার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয় লাভ হইবেক। নির্দ্ধারিত সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে, কাশ্যপ একাগ্র মনে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে নাগেন্দ্র তক্ষক, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনীশ্বর! তুমি সত্বর হইয়া কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইতেছ? কাশ্যপ কহিলেন, অদ্য সর্পরাজ তক্ষক কুরুকুলোদ্ভব শত্রুবিনাশন রাজা পরীক্ষিৎকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা ভস্মাবশেষ করিবেক, আমি চিকিৎসা দ্বারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছি। তক্ষক কহিলেন, হে মহর্ষে! আমিই সেই তক্ষক, আমিই রাজাকে দগ্ধ করিব। আমি দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, অতএব নিবৃত্ত হও। কাশ্যপ কহিলেন, তুমি দংশন করিলে আমি বিদ্যাবলে রাজাকে বিষমুক্ত করিতে পারিব, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

তক্ষক কহিলেন, যদি আমি কোনও বস্তু দংশন করিলে তুমি চিকিৎসা করিয়া নির্ব্বিষ করিতে পার, আমি এই বটবৃক্ষ দংশন করিতেছি, তুমি জীবন দান কর। তুমি যত পার যত্ন কর ও আপন মন্ত্রবল দেখাও, আমি তোমার সমক্ষে এই বটবৃক্ষ দগ্ধ করিতেছি। কাশ্যপ কহিলেন, হে নাগেন্দ্র! যদি তোমার অভিরুচি হয়, বটবৃক্ষ দংশন কর, আমি এখনই উহাকে পুনর্জীবিত করিতেছি। তক্ষক, মহাত্মা কাশ্যপের এইরূপ বাক্য শুনিয়া, নিকটে গিয়া বটবৃক্ষ দংশন করিলেন। দংশন করিবামাত্র, বৃক্ষ অত্যুগ্র বিষপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ ভস্মাবশেষ হইল। এইরূপে বৃক্ষকে ভস্মীভূত করিয়া তক্ষক কাশ্যপকে সম্বোধিয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই বৃক্ষের জীবনদান বিষয়ে যত্ন কর। তক্ষকবচনান্তে কাশ্যপ দগ্ধ বৃক্ষের সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ করিয়া কহিলেন, হে পন্নগরাজ! আমার বিদ্যাবল দেখ, আমি তোমার সমক্ষে বৃক্ষকে বাঁচাইতেছি। তদনন্তর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ভগবান্ কাশ্যপ

রিত্যপ্রভাবে সেই ভস্মরাশীকৃত বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। প্রথমতঃ অঙ্কুরমাত্র, তৎপরে ক্রমে ক্রমে পত্রদ্বয়, পত্ররাশি, শাখা মহাশাখা সমুদায় প্রস্তুত হইল।

এইরূপে কাশ্যপের মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত দেখিয়া তক্ষক কহিলেন, হে দ্বিজবাজ। তুমি যে আমার অথবা মাদৃশ অন্য কাহারও বিষ নাশ করিতে পার, এ তোমার অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আকাঙ্ক্ষা করিয়া তথায় যাইতেছ। তুমি যে অভিলষিত লাভের আশয়ে সেই রাজার নিকটে যাইতেছ, যদি তাহা দুর্লভও হয়, আমি তোমাকে দিব, তুমি তথায় যাইও না। রাজা বিপ্রশাপে পতিত, তাঁহার আয়ুঃশেষ হইয়াছে এমন স্থলে তথায় যাইলেও তোমার কৃতকার্য্য হওয়া সন্দেহস্থল। তাহা হইলেই, তোমার ত্রিলোকব্যাপিনী নির্ম্মলা কীর্ত্তি, প্রভাহীন দিবাকরের ন্যায়, এক কালে বিলয়প্রাপ্ত হইবেক। হে দ্বিজবর! যদি তুমি রাজার নিকট ধনলাভবাসনায় যাইতেছ, এমন হয়, তাহা হইলে তুমি সেখানে যত পাইতে পার, আমি তোমাকে তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, তুমি নিবৃত্ত হও। মহাতেজাঃ কাশ্যপ, তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, ধ্যানারম্ভ করিলেন। অনন্তর, দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে রাজার আয়ুঃশেষ নিশ্চয় করিয়া, তক্ষকের নিকট হইতে অভিলাষানুরূপ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ প্রতিগমন করিলেন।

এইরূপে মহাত্মা কাশ্যপ নিবৃত্ত হইলে পর, তক্ষক সত্বর গমনে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন। গমনকালে লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সাবধান হইয়া আছেন। তখন তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, মায়াবলে রাজাকে বঞ্চনা করিতে হইবেক, অতএব কি উপায় অবলম্বন করি? অনন্তর, স্বীয় অনুচর সর্পদিগকে তাপসবেশ ধারণ করাইয়া, রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন, কহিয়া দিলেন, তোমরা, বিশেষ কার্য্য আছে, এইরূপ ভান করিয়া, অব্যাকুলিত চিত্তে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ফল কুশ ও জল প্রদান করিবে। ভুজঙ্গমগণ, তক্ষকের আদেশানুসারে তথায় উপস্থিত হইয়া, রাজাকে কুশ কুসুম ফল জল প্রদান পূর্ব্বক যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিল। বীর্য্যবান্ রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ সেই সকল গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিয়া দিয়া গমন করিতে কহিলেন।

কপটতাপসবেশধারী নাগগণ নির্গত হইলে পর, রাজা যাবতীয় অমাত্য ও সুহৃদ্বর্গকে কহিলেন, আইস, সকলে মিলিয়া তাপসগণের আনীত এই সকল সুস্বাদ ফল ভক্ষণ করি। রাজা ব্রহ্মশাপমূলক দুর্দৈবপ্রযোজিত হইয়া সচিবগণসমভিব্যাহারে ফল ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তক্ষক যে ফলে প্রবিষ্ট ছিলেন, দৈবগত্যা রাজা স্বয়ং ভক্ষণার্থে সেই ফল লইলেন। ভক্ষণ করিতে করিতে তন্মধ্য হইতে অতি ক্ষুদ্র তাম্রবর্ণ কৃষ্ণনয়ন এক কৃমি

নির্গত হইল। রাজা, হস্তে সেই কৃমি লইয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, দেখ, সূর্য্য অস্তগত হইতেছে, অদ্য আর আমার বিষভয় নাই। অতএব মুনিবাক্য সত্য হউক, এই কৃমি তক্ষকপ্রতিরূপ হইয়া আমাকে দংশন করুক, তাহা হইলেই শাপের পরিহার হইল। মন্ত্রীরাও কালবশীভূত হইয়া তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। মুমূর্ষু হতচেতন রাজা সেই কৃমিকে গ্রীবাতে স্থাপন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কৃমিরূপী তক্ষক তৎক্ষণাৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ফণমণ্ডল দ্বারা রাজার গ্রীবা বেষ্টন পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, মন্ত্রিগণ রাজাকে তক্ষকের ফণমণ্ডলে বেষ্টিত দেখিয়া বিষণ্ণবদন ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, তাঁহারা তক্ষকের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণে ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং দেখিতে পাইলেন, তক্ষক নভোমণ্ডলে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় গমন করিতেছেন। তদনন্তর, সেই প্রাসাদকে ভুজগরাজের বিষজনিত হুতাশনে বেষ্টিত ও প্রজ্বলিত অবলোকন করিয়া, তাঁহারা চারি দিকে পলায়ন করিলেন। রাজা বজ্রাহত প্রায় ভূতলে পতিত হইলেন।

এইরূপে রাজা তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিলে, অমাত্যগণ রাজপুরোহিত দ্বারা তদীয় পারলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করাইলেন, এবং যাবতীয় পৌরগণকে সমবেত করিয়া রাজার শিশু পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। লোকে এই কুরুকুলপ্রবীর শত্রুঘাতী রাজাকে জনমেজয় নামে ঘোষণা করে। মহামতি রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয় বালক হইয়াও, পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, স্বীয় প্রপিতামহ মহাবীর অর্জ্জুনের ন্যায়, রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজমন্ত্রিগণ, অভিনব রাজাকে দুষ্টদমনাদি কার্য্যে বিশিষ্টরূপ পারদর্শী দর্শন করিয়া, তাঁহার দারক্রিয়া সমাধানার্থে কাশিরাজ সুবর্ণবর্ম্মার নিকট তদীয় বপুষ্টমানাম্নী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। কাশিরাজ কুরুকুলপ্রদীপ রাজা জনমেজয়কে বপুষ্টমা প্রদান করিলেন। জনমেজয় তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাপি অন্য নারীতে আসক্তচিত্ত হয়েন নাই। যেমন পুরূরবা পূর্ব্ব কালে উর্ব্বশীকে পাইয়া তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ইনিও এক মহিষী পাইয়া প্রসন্ন হইয়া নানা মনোহর সরোবর ও রমণীয় উপবনে তাঁহার সহিত বিহারসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা বপুষ্টমাও হৃষ্টচিত্তা হইয়া অনুরাগাতিশয় সহকারে বিহারকালে সেই সৎপতিকে পরম সুখী করিয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, এই সময়েই অতি তেজস্বী মহাতপস্বী মহর্ষি জরৎকারু কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইয়া নানা পবিত্র তীর্থে স্নান করিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই রূপে বায়ুভক্ষ, নিরাহার, দিন দিন ক্ষীণকলেবর, ও যত্রসায়ংগৃহ হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একদা তিনি অতি দীনভাবাপন্ন, অনাহারী, শুষ্কশরীর, উর্দ্ধপাদ, অধঃশিরাঃ, গর্ত্তে লম্বমান স্বীয় পিতৃগণকে অবলোকন করিলেন। তাঁহাদিগকে পরিত্রাণেচ্ছু বোধ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনারা কে বলুন, আমি দেখিতেছি আপনারা একমাত্র উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া অধোমুখে গর্ত্তে লম্বমান আছেন, গর্ত্তস্থিত মূষিক উশীরস্তম্বের মূল প্রায় সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছে, একমাত্র তন্তু অবশিষ্ট আছে, তাহাও অবিলম্বেই নিঃশেষ হইবে, অনন্তর আপনারাও এই গর্ত্তে পতিত হইবেন। আপনাদিগকে এপ্রকরে ঘোর বিপদাপন্ন দেখিয়া আমার শোক উদ্ভূত হইতেছে; অতএব আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি সাহায্য করিব, আমার সঞ্চিত তপস্যার চতুর্থ ভাগ, তৃতীয় ভাগ, অর্দ্ধ ভাগ বা সমগ্র দ্বারা আপনারা নিষ্কৃতি লাভ করুন।

পিতৃপুরুষেরা কহিলেন, হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্! তুমি আপন তপস্যার ফল দিয়া আমাদিগের পরিত্রাণ ইচ্ছা করিতেছ, কিন্তু তপস্যাবলে আমাদিগেব উদ্ধার লাভ হইতে পারে না, আমাদিগেরও তপস্যার ফল আছে। আমবা কেবল বংশলোপের উপক্রম হওয়াতেই অপবিত্র নরকে পতিত হইতেছি। আমরা এই মহাগর্ত্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, এজন্য তোমার পৌরুষ সর্ব্বত্র বিখ্যাত, তথাপি তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। হে মহাভাগ! তুমি আমাদিগকে শোকাবিষ্ট ও সাতিশয় দুঃখিত দেখিয়া অনুকম্পা প্রকাশ করিতেছ; অতএব তুমি আমাদিগের পরিচয় শ্রবণ কর। আমরা যাযাবর নামে ঋষি, বংশনাশের উপক্রম হওয়াতেই পুণ্যলোক হইতে প্রচ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছি, আমাদিগের প্রগাঢ় তপস্যার ফল বিলুপ্ত হইয়াছে, আমাদের আর কোনও উপায় নাই। আমরা অতি হতভাগ্য, আমাদিগের একমাত্র সন্তান আছে, কিন্তু সেই হতভাগ্যের থাকা না থাকা তুল্য হইয়াছে। তাহার নাম জরৎকারু। জরৎকারু বেদবেদাঙ্গপারগ, নিয়তাত্মা ও ব্রতপরায়ণ, সে সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তপস্যাধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহার তপস্যালোভদোষেই আমাদের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! তাহার ভার্য্যা নাই, পুত্র নাই, বান্ধবও নাই, তাহাতেই আমরা অনাথের ন্যায় হতজ্ঞান হইয়া এই মহাগর্ত্তে লম্বমান আছি। হে দ্বিজবর! আমরা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছি, উহা আমাদিগের কুলতন্তু; আর যে স্তম্বমূল দেখিতেছ, তাহা আমাদিগের কালগ্রস্ত সন্তানপরম্পরা, এবং যে অর্দ্ধাবশিষ্ট

মূল দেখিতেছ ও যাহাতে আমরা লম্বিত আছি, ওই তপস্যারত মূঢ়মতি অচেতন জরৎকারু; আর যে মূষিক দেখিতেছ, ইনি মহাবল পরাক্রান্ত কাল, ইনিই অল্পে অল্পে তাহাকে সংহার করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যায় আমাদিগের উদ্ধার সাধন হইবে না। আমরা হতভাগ্য, আমাদিগের মূল প্রায় শেষ হইয়াছে; এই দেখ, আমরা পাপাত্মার ন্যায় অধঃপতিত হইতেছি; আমরা সবান্ধবে এই গর্ত্তে পতিত হইলে জরৎকারুও কালপ্রেরিত হইয়া নিরয়গামী হইবেক। তপস্যা যজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ পরম পবিত্র কর্ম্ম আছে, সে সকল সন্তানের সমান উপকারক নহে। তুমি আমাদের দুরবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেছ, এ নিমিত্ত তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি আমাদিগকে যে প্রকার দেখিলে তাহার সহিত দেখা করিয়া সমস্ত অবিকল বর্ণন করিবে, এবং এই অনুরোধ করিবে যে, তুমি দারপরিগ্রহে ও পুত্রোৎপাদনে যত্নবান্ হও। সে যাহা হউক, তুমি আমাদিগের বন্ধুর ন্যায় অনুকম্পা করিতেছ; অতএব, তুমি কে আমরা শুনিতে বাসনা করি।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, জরৎকারু, পিতৃগণের এই প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণে একান্ত শোকাভিভূত হইয়া অশ্রুজলপূর্ণ লোচনে অর্দ্ধস্ফুট বচনে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! আপনারা আমার পূর্ব পুরুষ, আমারই নাম জরৎকারু, আমি আপনাদিগের অপরাধী সন্তান, অতি পাপাত্মা ও অকৃতাত্মা, অতএব আপনারা আমার যথোচিত দণ্ডবিধান করুন এবং আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবেক। পিতৃগণ কহিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদৃচ্ছাক্রমে এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত এ পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ কর নাই। জরৎকারু কহিলেন, হে পিতামহগণ! আমার বাসনা এই, আমি উর্দ্ধরেতাঃ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিব। আমি দারপরিগ্রহ করিব না, এই আমার একান্ত ইচ্ছা। এক্ষণে, আপনাদিগকে এই গর্ত্তে পক্ষীর ন্যায় লম্বমান দেখিয়া, ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম। আমি আপনাদিগের অভিপ্রেত সম্পাদনার্থে, নিঃসন্দেহ দারপরিগ্রহ করিব। যদি কখনও সনাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হই, যদি সেই কন্যা বিনা প্রার্থনায় স্বয়ং উপস্থিত হয়, আর যদি তাহার ভরণ পোষণ করিতে না হয়, তাহার পাণিগ্রহণ করিব। হে পিতামহগণ! আমি যথার্থ কহিতেছি, আপনাদিগের অনুরোধে আমি এই নিয়মে দারপরিগ্রহে সম্মত আছি, প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হইব না। এই প্রকারে পরিণীতা

ভার্য্যার গর্ভে আপনাদিগের উদ্ধারক সন্তান উৎপন্ন হইবেক, এবং আপনারাও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিবেন।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে শৌনক! জরৎকারু পিতৃগণকে এইরূপ কহিয়া ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া ভার্য্যালাভে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তিনি নির্ব্বিণ্ণ মনে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পিতৃগণের হিতসাধন মানসে কন্যালাভার্থে উচ্চৈঃস্বরে তিন বার এই বাক্য উচ্চারণ করিলেন, এই স্থলে যে সমস্ত স্থাবর, জঙ্গম অথবা অদৃষ্টপ্রাণী আছে, তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুক; আমি অতি কঠোর তপস্যায় কালযাপন করিতেছিলাম, কিন্তু আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা অতিশয় কাতর হইয়া বংশরক্ষার্থে আমারে দারপরিগ্রহের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে আমি দারপরিগ্রহে কৃতসংকল্প হইয়া কন্যালাভার্থে সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়াছি, আমি দরিদ্র ও দুঃখশীল, আমার উল্লিখিত প্রাণিসমূহের মধ্যে যদি কাহারও কন্যা থাকে, তিনি আমাকে প্রদান করুন, কিন্তু যে কন্যা সনাম্নী ও ভিক্ষান্ন স্বরূপে উপনীতা হইবেক, এবং আমাকে যাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে হইবেক না, আমাকে তোমরা এরূপ কন্যা প্রদান কর। বাসুকি যে সকল নাগকে জরৎকারুর অন্বেষণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহার নিকটে গিয়া এই সংবাদ প্রদান করিল, নাগরাজ বাসুকি শ্রবণমাত্র আপন ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া, অরণ্য প্রবেশ পূর্ব্বক জরৎকারুসমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ভিক্ষান্ন স্বরূপে প্রদান করিলেন। কিন্তু সেই কন্যা সনাম্নী কি না ও তাহার ভরণ পোষণের ভার লইতে হইবেক কি না, এই সংশয়ে তৎপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বাসুকিকে কহিলেন, যদি এই কন্যার পাণিগ্রহণ করি, আমি ভরণ পোষণ করিতে পারিব না।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগরাজ বাসুকি মহর্ষি জরৎকারুকে কহিলেন, হে মুনিবর! আমার ভগিনী তোমার সনাম্নী বটেন, ইঁহারও নাম জরৎকারু। ইনি তোমার মত তপস্যায় রত। তুমি ইঁহাকে সহধর্ম্মিণী রূপে পরিগ্রহ কর, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জীবন প্রাণপণে ইঁহার ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। আমি তোমারে দান করিবার নিমিত্তই এত দিন ইঁহারে অবিবাহিত রাখিয়াছি। ঋষি কহিলেন, তবে এই নিয়ম স্থির হইল, আমি ইঁহার ভরণ পোষণ করিব না। আর, ইনি কখনও আমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিবেন না, করিলেই পরিত্যাগ করিব।

নাগরাজ ভগিনীর ভরণ পোষণ করিব, এই অঙ্গীকার করিলে পর, ধর্ম্মাত্মা জরৎকারু তদীয় আলয়ে গমন পূর্ব্বক যথাবিধানে নাগরাজভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ হর্ষিত মনে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর জরৎকারু সহধর্ম্মিণীসমভিব্যাহারে বাসগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, পরিকল্পিত পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিলেন। তথায় তিনি পত্নীর সহিত এই নিয়ম করিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তুমি কদাচ অপ্রিয় বাক্য কহিবে না ও অপ্রিয় কর্ম্ম করিবে না, করিলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব, এবং আর তোমার আবাসে অবস্থিতি করিব না; যাহা কহিলাম, স্মরণ করিয়া রাখিবে। নাগরাজভগিনী স্বামিবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্না ও দুঃখিতা হইয়া, তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া লইলেন, এবং অতিসাবধানে ও অতিকষ্টে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে জরৎকারুর গর্ভাধানকাল উপস্থিত হইলে, তিনি যথাবিধানে স্বামিসেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি জ্বলন্তঅনলতুল্য তেজস্বী গর্ভ ধারণ করিলেন। সেই গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। কতিপয় দিবস অতীত হইলে, একদা মহাযশস্বী জরৎকারু মুনি, নিতান্ত ক্লান্তের ন্যায়, নাগভগিনী জরৎকারুর ক্রোড়দেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলেন। বহু ক্ষণ অতীত হইল, তথাপি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। মনস্বিনী বাসুকিভগিনী, স্বামীর সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি বিধির অতিক্রমনিমিত্তক ধর্ম্মলোপদর্শনে সাতিশয় শঙ্কিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য, ইঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করি কি না। ইনি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব, যদি ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করি, নিঃসন্দেহ কোপ করিবেন। নিদ্রা ভঙ্গ না করিলে সন্ধ্যার সময় বহিয়া যায়, তাহাতে ধর্ম্মলোপ হয়। এক্ষণে কি করিলে আমি অপরাধিনী না হই, বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু কোপ ও ধর্ম্মশীলের ধর্ম্মলোপ, এই উভয়ের মধ্যে ধর্ম্মলোপ সমধিক দোষাবহ। অতএব যাহাতে ধর্ম্মলোপ নিবারণ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, মধুরভাষিণী বাসুকিভগিনী সেই জ্বলন্তঅনলপ্রায় প্রদীপ্ততেজাঃ নিদ্রিত মহর্ষিকে সম্বোধন করিয়া বিনয়বচনে কহিলেন, মহাভাগ! সূর্য্য অস্তগত হইতেছেন, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আচমন করিয়া সন্ধ্যোপাসনা কর। অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত, পশ্চিম দিকে সন্ধ্যা প্রবৃত্ত হইতেছে। মহাতপাঃ ভগবান্ জরৎকারু, স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য শ্রবণে রোষসরবশ হইয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! তুমি আমার অবমাননা করিলে, আর আমি তব সমীপে অবস্থিতি করিব না, অতঃপর স্বস্থানে প্রস্থান করিব। আমার স্থির সিদ্ধান্ত আছে, আমি নিদ্রাগত থাকিতে সূর্য্যদেবের সামর্থ্য কি

যথাকালে অস্তগমন করেন। সামান্য ব্যক্তিও অবমানিত হইলে অবমাননাস্থলে বাস করিতে পারে না; আমার অথবা মাদৃশ ধর্ম্মশীল ব্যক্তির কথাই নাই।

জরৎকারু, স্বামীর এইরূপ হৃদয়কম্পকর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীতা হইয়া, নিবেদন করিলেন, ভগবন্! তোমার ধর্ম্মালোপ হয়, এই ভয়ে আমি তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অবমাননার অভিসন্ধিতে করি নাই। তখন মহাতপাঃ জরৎকারু ঋষি সাতিশয় কোপাবিষ্ট ও ভার্য্যাত্যাগাভিলাষী হইয়া কহিলেন, হে ভুজঙ্গমে! আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আমি অবশ্যই প্রস্থান করিব। পূর্ব্বে বাসগৃহে তোমার সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলাম। যাহা হউক, যত দিন ছিলাম, সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম। তোমার ভ্রাতাকে বলিও, মুনি চলিয়া গিয়াছেন। আর, আমি প্রস্থান করিলে পর, তুমিও শোকাকুল হইও না।

এইরূপ স্বামিবাক্য শ্রবণে জরৎকারুর সহসা মুখশোষ ও হৃদয়কম্প হইল। পরিশেষে ধৈর্য অবলম্বন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদগদ বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার আমাকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দেখ, আমি কখনও কোনও অপরাধ করি নাই। সদা ধর্ম্মপথে আছি, নিয়ত তোমার প্রিয় কর্ম্ম ও হিতচিন্তা করিয়া থাকি। যে ফলোদ্দেশে ভ্রাতা আমাকে তোমায় দান করিয়াছেন, আমি মন্দভাগিনী, অদ্যাপি তাহা লাভ করি নাই। অতএব ভ্রাতা আমাকে কি কহিবেন? আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহাদের অভিলাষ এই, তোমার ঔরসে আমার এক পুত্র জন্মে। কিন্তু অদ্যাপি তাহা সম্পন্ন হয় নাই। তোমার ঔরসে পুত্র জন্মিলে তাঁহাদের শাপ বিমোচন হইবেক। তাহা হইলেই তোমার সহিত আমার পাণিগ্রহণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব হে মহাত্মন্! জ্ঞাতিকুলের হিতাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, প্রসন্ন হও। এই অব্যক্ত গর্ভ আধান করিয়া বিনা অপরাধে কি রূপে আমারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহ। স্বীয় সহধর্ম্মিণীর এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া মহর্ষি তাঁহাকে এই যুক্তিযুক্ত উপযুক্ত বাক্য কহিলেন, হে সুভগে! তোমার এই গর্ভে এক পরম ধর্ম্মাত্মা বেদবেদাঙ্গপরাগ অনলতুল্য তেজস্বী ঋষি জন্মিয়াছেন। এই বলিয়া জরৎকারু পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইয়া অরণ্য প্রবেশ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, নাগভগিনী জরৎকারু অবিলম্বে ভ্রাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া স্বীয় স্বামীর প্রস্থানবৃত্তান্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। ভুজগরাজ এই অতি মহৎ অপ্রিয় শ্রবণে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি জান, যে উদ্দেশে তোমায়

আমি জরৎকারুকে দান করিয়াছিলাম। তাহা কেবল সর্পকুলের হিতার্থে; যদি তাঁহার ঔরসে তোমার পুত্র জন্মে, সেই পুত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্র হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ করিবেক। ভগবান্ সর্পলোকপিতামহ ব্রহ্মা পূর্ব্বে সর্ব্বসুরসমক্ষে ইহাই কহিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, তৎসহযোগে তোমার গর্ভসম্ভাবনা হইয়াছে কি না। আমার বাসনা এই, জরৎকারুকে যে ভগিনী দান করিয়াছিলাম, তাহা নিষ্ফল না হয়। তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোনও ক্রমেই ন্যায্য নহে; কিন্তু গুরুতর কার্য্যসংক্রান্ত বিষয় বলিয়া অগত্যা এরূপ অনুচিত জিজ্ঞাসা করিতে হইল। আর আমি বিলক্ষণ জানি, তাঁহার তপস্যায় যেরূপ অনুরাগ, কোন মতেই প্রত্যাগমনে সম্মত হইবেন না, এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার প্রয়াস পাইব না। তিনি যেরূপ উগ্রস্বভাব, আমাকে শাপ দিলেও দিতে পারেন। অতএব মুনি কি বলিলেন, কি করিলেন, আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া আমার চিরস্থির ঘোর হৃদয়শল্য উদ্ধার কর।

এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া জরৎকারু শোকসন্তপ্ত ভুজগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, যৎকালে সেই মহাতপাঃ মহাত্মা গমন করেন, আমি তাঁহাকে পুত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম? তিনি, অস্তি অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এই মাত্র উত্তর প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি পরিহাসকালেও ভুলিয়া কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই, সুতরাং এমন গুরুতর বিষয়ে মিথ্যা কহিবেন কেন? তিনি, হে ভুজঙ্গমে! তুমি পরিতাপ করিও না, তোমার গর্ভে প্রদীপ্ত দিবাকর ও প্রজ্বলিত অনলতুল্য তেজস্বী এক পুত্র জন্মিবেক, এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব ভ্রাতঃ! তোমার মনে যে বিষম দুঃখ আছে, তাহা দূর কর।

নাগরাজ বাসুকি এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিলেন, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া ভগিনীর যথোচিত সম্মান ও সমাদর করিলেন। যেমন শুক্লপক্ষের শশাঙ্ক অন্তরীক্ষে দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তদ্রূপ তাঁহার গর্ভ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পূর্ণ কাল উপস্থিত হইলে, নাগভগিনী জরৎকারু পিতৃ মাতৃ উভয় কুলের ভয়হারক দেবকুমারতুল্য এক কুমার প্রসব করিলেন। নাগভাগিনেয় মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ও জ্ঞানবৈরাগ্যাদিগুণসম্পন্ন বালক বাল্যকালেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ভৃগুকুলোদ্ভব চ্যবন মুনির নিকট যাবতীয় বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। যৎকালে তিনি গর্ভস্থ ছিলেন, তাঁহার পিতা, অস্তি, বলিয়া বনপ্রস্থান করেন, এই নিমিত্ত তিনি লোকে আস্তীক নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ভুজগরাজ পরম যত্নে সেই অপ্রমিতবুদ্ধিশালী বালকের লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনিও দিন দিন বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া নাগকুলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

ঊনপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

শৌনক কহিলেন, রাজা জনমেজয় নিজ মন্ত্রীদিগকে আত্মপিতার স্বর্গারোহণ বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা তুমি আমার নিকট পুনর্ব্বার সবিস্তর বর্ণন কর। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা মন্ত্রীদিগকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং মন্ত্রীরা পরীক্ষিতের পরলোকপ্রাপ্তির বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন। জনমেজয় কহিলেন, হে অমাত্যগণ! আমার ভুবনবিখ্যাত অতিযশস্বী পিতা কালবশ যে রূপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা তোমরা সবিশেষ জান, এক্ষণে তোমাদিগের নিকট পিতৃবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তদীয় হিতসাধনে যত্নবান্ হইব, কিন্তু তদুপলক্ষে কদাচ অন্যের অহিতাচরণ করিব না।

ধর্ম্মবেত্তা প্রজ্ঞাগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ মহাত্মা নৃপতিকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আপনকার মহাত্মা রাজাধিরাজ পিতার যেরূপ চরিত্র ছিল ও যে রূপে তাঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয় হয়, তৎসমুদায় শ্রবণ করুন। আপনকার ধর্ম্মাত্মা মহাত্মা প্রজাপালনতৎপর পিতা যাদৃশ গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহাই বর্ণন করিতেছি। সেই ধর্ম্মবেত্তা রাজা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকার-কালে চারি বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে রত ছিল। সেই অতুলবিক্রমশালী শ্রীমান্ ভূপতি পৃথিবীকে ন্যায়ানুসারে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার কেহ দ্বেষ্টা ছিল না, তিনি কাহারও দ্বেষ করিতেন না, প্রজাপতির ন্যায় সর্ব্ব ভূতে সমদর্শী ছিলেন। তদীয় অপ্রতিহত শাসন-প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্ব স্ব কর্ম্মে রত ছিল। তিনি বিধবা, অনাথ, বিকলাঙ্গ, ও দীন দরিদ্র গণের ভরণ পোষণ করিতেন। সেই সত্যবাদী, দৃঢ়বিক্রম, সর্ব্বতোষক, সর্ব্বপোষক, শ্রীমান্ রাজা দ্বিতীয় শশধরের ন্যায় সর্ব্ব ভূতের নয়নরঞ্জন ও সর্ব্বলোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি শারদ্বতের নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন, কৃষ্ণের অতি প্রিয় ছিলেন। কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে, অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ। তিনি রাজধর্ম্মনিপুণ, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, মনস্বী, মেধাবী, ধর্ম্মপরায়ণ, ষড়্‌বর্গ (৭২) জয়ী, মহাবুদ্ধি, ও অদ্বিতীয় নীতিশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন; ষাটি বৎসর (৭৩) প্রজাপালন করেন; পরে সকলকে দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া পরলোকযাত্রা

---

(৭২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।

(৭৩) রাজা পরীক্ষিৎ ষাটি বৎসর বয়সে তক্ষকের দংশনে প্রাণত্যাগ করেন, সুতরাং ষাটি বৎসর প্রজাপালন সম্ভব ও সঙ্গত হয় না। টীকাকার নীলকণ্ঠ কহেন, মূলে যে ষাটি বৎসর নির্দ্দেশ আছে, তাহা জন্ম অবধি গণনা অভিপ্রায়ে, রাজ্যলাভাবধি গণনা অভিপ্রায় নহে, কারণ পরীক্ষিৎ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে রাজ্যলাভ করিয়া চব্বিশ বৎসর মাত্র প্রজাপালন করেন।

করিয়াছেন। তদনন্তর আপনি সহস্র বৎসরের জন্য এই কুলক্রমাগত রাজ্য ধর্ম্মতঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনি শৈশবকালেই অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বভূতের পালন করিতেছেন।

জনমেজয় কহিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ পূর্ব্বপুরুষদিগের চরিত্র অনুশীলন করিয়া বোধ হইতেছে, এই কুলে কোনও কালে এমন রাজা হয়েন নাই যে, তিনি প্রজাদিগের প্রিয় ও হিতকারী ছিলেন না। আমার পিতা তথাবিধ রাজা হইয়া কেন অকালে কালগ্রাসে পরিক্ষিপ্ত হইলেন বল, আমি আদ্যোপান্ত অবিকল শুনিতে বাসনা করি। প্রিয়কারী হিতৈষী মন্ত্রিগণ এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিতের মৃত্যুবৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! আপনকার পিতা রাজাধিরাজ পাণ্ডুর ন্যায় শস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় ও সতত মৃগয়াশীল ছিলেন। একদা তিনি আমাদিগের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শর দ্বারা এক মৃগ বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ মৃগ পলায়ন করিল। রাজা তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইলেন, কিন্তু পলায়িত মৃগকে আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ও জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এজন্য ত্বরায় পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইলেন। সেই নিবিড় অরণ্যে এক মুনি মৌনব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সমাধি করিতেছিলেন, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি কিছুই উত্তর দিলেন না। রাজা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও ক্লান্ত ছিলেন, মুনিকে মৌনাবলম্বী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ রোষবশ হইলেন। তিনি তাঁহাকে মৌনব্রতী বলিয়া জানিতেন না, এই নিমিত্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, অটনী দ্বারা ধরাতল হইতে এক মৃত সর্প উদ্ধৃত করিয়া, সেই শুদ্ধচিত্ত ঋষির স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ঋষি এইরূপে অবমানিত হইয়াও কুপিত হইলেন না, রাজাকে ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না, স্কন্ধে মৃত সর্প ধারণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

মন্ত্রিগণ কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে মুনির স্কন্ধদেশে মৃত সর্প নিক্ষেপ করিয়া নিজরাজধানী প্রস্থান করিলেন। সেই ঋষির গোগর্ভে সমুৎপন্ন মহাতেজাঃ মহাবীর্য্য অতি কোপনস্বভাব শৃঙ্গী নামে এক মহাযশস্বী পুত্র ছিলেন। এই মুনিকুমার সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার উপসনার্থে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বীয় সখার মুখে পিতার অবমাননাবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার সখা কহিলেন, বয়স্য! তোমার পিতা মৌনপরায়ণ হইয়া সমাধি করিতেছিলেন, রাজা পরীক্ষিৎ আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে মৃত সর্প

ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। মহাতেজাঃ শৃঙ্গী বয়সে বালক হইয়াও তপস্যা ও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন ; এক্ষণে শ্রবণমাত্র কোপানলে প্রজ্বলিত হইয়া উদক স্পর্শ পূর্ব্বক স্বীয় সখাকে সম্বোধন করিয়া, তোমার পিতাকে এই শাপ দিলেন, বয়স্য! আমার তপস্যার বল দেখ, যে দুরাত্মা বিনা অপরাধে আমার পিতার স্কন্ধে মৃত সর্প ক্ষেপণ করিয়াছে, তীক্ষ্ণবিষ তীক্ষ্ণবীর্য্য নাগরাজ তক্ষক আমার বাক্যানুসারে সপ্তম দিবসে তাহার প্রাণসংহার করিবেক। ইহা কহিয়া শৃঙ্গী পিতার সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং পিতাকে তদবস্থ দেখিয়া শাপপ্রদানবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন সেই সাধু সদাশয় মুনিশ্রেষ্ঠ, সুশীল গুণবান্ গৌরমুখনামক শিষ্যকে, ইহা কহিবার নিমিত্ত, আপনার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে আমার পুত্র তোমাকে শাপ দিয়াছে, তুমি সাবধান হও, তক্ষক তোমাকে স্বীয় তেজঃ দ্বারা দগ্ধ করিবেক। গৌরমুখ আপনকার পিতার নিকট আসিয়া বিশ্রামান্তে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। আপনার পিতা এই ভয়ঙ্কর বাক্য শ্রবণ করিয়া তক্ষকের ভয়ে অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া রহিলেন।

সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মর্ষি কাশ্যপ সত্বর গমনে আপনকার পিতার নিকট আসিতেছিলেন। তক্ষক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মহর্ষে! তুমি কোথায় ও কি প্রয়োজনসাধনার্থ এত সত্বর গমন করিতেছ? তিনি কহিলেন, অদ্য তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে ভস্মাবশেষ করিবেক, আমি তাহার প্রতিকারার্থে যাইতেছি, আমি সমীপে থাকিলে, তক্ষক রাজার প্রাণ বিনাশ করিতে পারিবেক না। তক্ষক কহিল, হে ঋষে! আমি সেই তক্ষক, আমি তাঁহাকে দংশন করিব। তুমি কি নিমিত্ত তাঁহাকে বাঁচাইতে বৃথা চেষ্টা পাইবে? আমি দংশন করিলে তুমি কোনও ক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে পারিব না, তুমি আমার অদ্ভুত বীর্য্য দেখ। এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষকে দংশন করিল। বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল। কাশ্যপও তৎক্ষণাৎ সেই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক, তুমি কি অভিলাষে যাইতেছে বল, এই বলিয়া তাঁহাকে লোভপ্রদর্শন করিল। কাশ্যপ কহিলেন, আমি ধনলাভপ্রত্যাশায় যাইতেছি। তক্ষক কহিল, তুমি রাজার নিকট যত ধনের প্রত্যাশা কর, আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি, লইয়া নিবৃত্ত হও। কাশ্যপ তক্ষকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিলাষানুরূপ অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে সেই ব্রাহ্মণ নিবৃত্ত হইলে, তক্ষক ছদ্ম বেশে আপনকার পিতার নিকট আসিয়া স্বীয় দুর্ব্বিষহ বিষবহ্নি দ্বারা তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিল। তদনন্তর আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন। মহারাজ! এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমরা যেরূপ দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, অবিকল বর্ণন করিলাম, এক্ষণে নিজ পিতার ও মহর্ষি উতঙ্কের পরাভব বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

রাজা জনমেজয়, পিতৃপরাভববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তক্ষক যে বৃক্ষকে ভস্মসাৎ করিয়াছিল এবং কাশ্যপ যে সেই ভস্মীভূত বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তোমরা কাহার নিকট শুনিয়াছিলে? বোধ করি, সর্পকুলাধম তক্ষক এই বিবেচনা করিয়াছিল, কাশ্যপ মন্ত্রবলে রাজার প্রাণরক্ষা করিবেক, সন্দেহ নাই। আমি দংশন করিলে যদি এ ব্রাহ্মণ রাজাকে বাঁচায়, তাহা হইলে আমাকে লোকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবেক। এই ভাবিয়াই সে ব্রাহ্মণে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দিব। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্ত নির্জন বনে ঘটিয়াছিল, তাহা কে বা দেখিল, কে বা শুনিল, তোমরাই বা কি রূপে অবগত হইলে বল, সবিশেষ শুনিয়া সর্পকুলনিপাতের উপায় বিধান করিব। মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক ও কাশ্যপের বৃত্তান্তে যে রূপে যে ব্যক্তি আমাদিগকে কহিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। কোনও ব্যক্তি কাষ্ঠ আহরণ নিমিত্ত পূর্ব্বেই সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল। তক্ষক ও কাশ্যপ উভয়েই তাহা জানিতে পারেন নাই। ঐ ব্যক্তি সেই বৃক্ষের সহিতই ভস্মীভূত হয়, ও সেই বৃক্ষের সহিতই পুনর্জীবিত হয়। সেই আসিয়া আমাদিগকে এই অদ্ভুত বিষয়ের সংবাদ দেয়। মহারাজ! যথাদৃষ্ট যথাশ্রুত সমুদায় নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যাহা বিহিত হয়, করুন।

এইরূপ মন্ত্রিবাক্য শ্রবণে রাজা জনমেজয়, রোষরসে কলুষিত হইয়া, করে করে পরিপেষণ এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুধারা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্রু নিবারণ ও যথাবিধি উদক স্পর্শ করিয়া অমর্ষভাবে কিয়ৎ ক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করিলেন, অনন্তর মনে মনে কর্ত্তব্য নির্ধারণ করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের নিকট পিতার পরলোক প্রাপ্তি বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। আমার মত এই, যে দুরাত্মা তক্ষক শৃঙ্গীকে হেতুমাত্র করিয়া পিতার প্রাণ-হিংসা করিয়াছে, তাহাকে সমুচিত প্রতিফল দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি কাশ্যপ আসিতেন, পিতা অবশ্যই জীবন পাইতেন; কিন্তু তক্ষকের এমনই দুরাত্মতা যে, তাঁহাকে অর্থ দিয়া নিবৃত্ত করিল। যদিই পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রিগণের মন্ত্রণাবলে জীবন পাইতেন, তাহাতে তাহার কি হানি হইত? কিন্তু কাশ্যপ আসিয়া পাছে রাজাকে জীবন দেন, এই আশঙ্কায় সেই দুরাত্মা অর্থদান দ্বারা বশীভূত করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছে। এ অত্যন্ত অসহ্য অত্যাচার। অতএব আমি, আমার নিজের, উতঙ্কের ও তোমাদের সকলের মনোরথ সম্পাদনের নিমিত্ত পিতার বৈরনির্যাতন করিব।

একপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, অনন্তর রাজা জনমেজয় মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সর্পসত্রানুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, যে দুরাত্মা তক্ষক পিতার প্রাণহিংসা করিয়াছে, এক্ষণে আমি কি উপায়ে তাহাকে যথোচিত প্রতিফল দিতে পারি, আপনারা তাহা বলুন। আপনারা এমন কোনও কর্ম্ম জানেন কি না যে, তদ্দ্বারা আমি তাহাকে তাহার বন্ধুবর্গের সহিত প্রদীপ্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিতে পারি। সে যেমন আমার পিতাকে বিষবহ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছে, আমি সেই পাপিষ্ঠকে তদ্রূপ দগ্ধ করিতে বাসনা করি। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ। পুরাণে সর্পসত্রনামে এক মহৎ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। দেবতারা তোমার নিমিত্তই ঐ যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছেন। পৌরাণিকেরা কহেন, তোমা ভিন্ন ঐ যজ্ঞ করিবার অন্য লোক নাই, আর আমরাও ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে জানি।

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়াই তক্ষককে প্রদীপ্ত অগ্নিমুখে প্রবিষ্ট ও দগ্ধ বোধ করিলেন এবং সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি সেই যজ্ঞ করিব, আপনারা সমুদায় আয়োজন করুন। তদনুসারে সেই বেদবিদ্‌ বহুজ্ঞ ঋত্বিক্‌গণ, শাস্ত্রপ্রমাণ পরিমাণ করিয়া পরম সমৃদ্ধিযুক্ত প্রভূতধনধান্যাদিসম্পন্ন অভিপ্রায়ানুরূপ যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজাকে সর্পসত্রে দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু প্রথমতই যজ্ঞের বিঘ্নকর এক মহৎ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তননির্ম্মাণকালে বাস্তুবিদ্যাবিশারদ পুরাণবেত্তা বুদ্ধিজীবী সূত্রধার কহিল, যে স্থানে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের মাপনা আরম্ভ হইল, তাহাতে বোধ হইতেছে, এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবেক। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া, দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে, দ্বারপালকে এই আদেশ দিলেন, যেন কোনও ব্যক্তিই আমার অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিতে না পারে।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর সর্পসত্রবিধানানুসারে ক্রিয়ারম্ভ হইল। যাজকগণ যথাবিধি স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় ধারণ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনবরত ধূমসম্পর্ক দ্বারা তাঁহাদের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা সর্পদিগের উল্লেখ করিয়া আহুতি প্রদান আরম্ভ করিলে, তাহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। তদনন্তর সর্পগণ, নিতান্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া নিশ্বাস পরিত্যাগ এবং মস্তক ও লাঙ্গুল দ্বারা পরস্পর বেষ্টন ও আর্ত্তনাদ

করিতে করিতে, সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে অনবরত পতিত হইতে লাগিল। শ্বেতবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, বৃদ্ধ, শিশু, ক্রোশপ্রমাণ, যোজনপ্রমাণ, গোকর্ণপ্রমাণ, পরিঘপ্রমাণ, অশ্বাকার, করি-শুণ্ডাকার, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাকায়, মহাবল, বহুবিধ, শত শত, সহস্র সহস্র, অযুত অযুত, অর্ব্ব ও অর্ব্বুদ, মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপদোষে অবশ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূতনন্দন। পাণ্ডুকুলাবতংস রাজা জনমেজয়ের ভয়ঙ্কর সর্পসত্রে কোন্ কোন্ মহর্ষি ঋত্বিকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আর কাঁহারাই বা সদস্য হইয়াছিলেন, সেই সমস্ত সবিস্তর বর্ণন কর, তাহা হইলেই কাঁহারা সর্পসত্রবিধানজ্ঞ, তাহা জানা যাইবেক। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সকল মনীষিগণ সেই যজ্ঞে ঋত্বিক ও সদস্য ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। চ্যবনবংশোদ্ভব অদ্বিতীয় বেদবেত্তা সুবিখ্যাত চণ্ডভার্গব হোতা, বৃদ্ধ বিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু, আর ব্রাহ্মণোত্তম উতঙ্ক উন্নেতা ছিলেন। পুত্র ও শিষ্য সহিত ব্যাসদেব, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অশিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত, অত্রেয়, কুণ্ড, জঠর, কালঘট, বাৎস্যবংশপ্রসূত বয়োবৃদ্ধ তপঃস্বাধ্যায়শীলসম্পন্ন শ্রুতশ্রবাঃ, কোহল, দেবশর্ম্মা, মৌদ্গল্য, সমসৌবভ ইত্যাদি অনেকানেক বেদপারগ ব্রাহ্মণ সদস্য হইয়াছিলেন।

ঋত্বিক্‌গণ আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর সর্প সকল হুতাশনে নিপতিত হইতে লাগিল। সর্পগণের বসা ও মেদঃ দ্বারা বহুসংখ্যক হ্রদ হইয়া গেল। তাহাদিগের অনবরত দাহ দ্বারা উৎকট গন্ধ নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নিপতিত ও আকাশস্থিত সর্পগণের চীৎকার ও কোলাহল অবিশ্রান্ত শ্রুত হইতে লাগিল।

নাগরাজ তক্ষক রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। দেবরাজ তক্ষকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নাগরাজ! সে সর্পসত্রে তোমার কোনও ভয় নাই। তোমার হিতার্থে আমি ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া রাখিয়াছি, তোমার ভয় নাই, তুমি নির্ভয় ও নিশ্চন্ত হও। ইন্দ্রের নিকট এই আশ্বাস পাইয়া তক্ষক হৃষ্ট মনে তদীয় ভবনে অবস্থিত করিতে লাগিল।

সর্পগণ অনবরত অগ্নিতে পতিত হওয়াতে, বাসুকি স্বীয় পরিবার অল্পাবশিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, এবং একান্ত শোকাকুল ও ব্যাকুলহৃদয় হইয়া ভগিনীকে কহিলেন অয়ি কল্যাণিনি। আমার সর্ব্বাঙ্গ শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, দশ দিক অন্ধকারময়

দেখিতেছি, মোহে অবসন্ন হইতেছি, মন ও নয়ন ঘূর্ণিত হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; অদ্য আমি একান্ত অবশ হইয়া সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে পতিত হইব। জনমেজয়ের যজ্ঞ সর্পকুল সংহারের নিমিত্ত আরব্ধ হইয়াছে; অতএব আমিও নিঃসন্দেহ যমালয়ে যাইব। আমি তোমাকে যদর্থে জরৎকারুকে দান করিয়াছিলাম, তাহার সময় উপস্থিত। এক্ষণে আমাদিগের সব স্বজনে সপরিবারে পরিত্রাণ কর। পিতামহ স্বয়ং আমাকে কহিয়াছিলেন, আস্তীক জনমেজয়ের যজ্ঞ নিবারণ করিবেক। অতএব এক্ষণে তুমি আমার সপরিবারের পরিত্রাণের নিমিত্ত স্বীয় প্রিয় তনয়কে অনুরোধ কর।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, তদনন্তর নাগভগিনী জরৎকারু স্বীয় সহোদরের বচনানুসারে আপন পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! আমার ভ্রাতা কোনও প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে আমারে তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রয়োজন উপস্থিত, তাহা সম্পন্ন কর।

মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া আস্তীক কহিলেন, জননি! মাতুল মহাশয় কি প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে তোমারে আমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, তুমি আমাকে তাহার সবিশেষ কহ, শুনিয়া আমি তাহা সম্পন্ন করিব। বন্ধুকুলহিতৈষিণী নাগরাজভগিনী জরৎকারুপুত্রকে সবিশেষ সমস্ত কহিতে লাগিলেন।

বৎস! শ্রবণ কর। সমস্ত নাগকুলের জননী কদ্রু রোষবশা হইয়া আপন পুত্র-দিগকে এই শাপ দিয়াছিলেন যে, আমি বিনতার সহিত দাসত্ব পণ করিয়া শুক্লবর্ণ উচ্চৈঃ-শ্রবাকে কৃষ্ণবর্ণ করিবার নিমিত্ত কহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা আমার সে কথা রক্ষা করিলে না, অতএব রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে অগ্নি তোমাদিগকে দগ্ধ করিবেন; তাহাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া তোমরা প্রেতলোকে গমন করিবে। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নাগজননীর শাপদান শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া অনুমোদন করিলেন। বাসুকি এইরূপ পিতামহবাক্য শ্রবণ করিয়া অমৃতমন্থনকালে দেবতাদিগের শরণাগত হইলেন। দেবতারা অমৃতলাভে কৃতকার্য্য হইয়া আমার ভ্রাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতামহসমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং স্তুতি ও প্রণতি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া শাপনিবারণের উপায় প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, ভগবন! নাগরাজ বাসুকি জ্ঞাতিকুলক্ষয়সম্ভাবনা দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন। আপনি কৃপা করিয়া শাপমোচনের উপায় বিধান করুন। ব্রহ্মা কহিলেন, জরৎকারু জরৎকারুনাম্নী যে

ভার্য্যা পরিগ্রহ করিলেন, তাহার গর্ভজাত ব্রাহ্মণ সর্পকুলকে সেই শাপ হইতে মুক্ত করিবে। পন্নগরাজ বাসুকি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমায় তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন। তুমিও প্রয়োজনসাধনের সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত, উপস্থিত ভয় হইতে নাগকুলের পরিত্রাণ কর, আমার ভ্রাতাকে সেই বিষম হুতাশন হইতে রক্ষা কর। আমার ভ্রাতা যে অভিপ্রায়ে আমায় তোমার পিতাকে দান করিয়াছিলেন, যেন তাহা বিফল হয় না। এক্ষণে তোমার কি অভিপ্রায় বল।

আস্তীক এইরূপ মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং শোকসন্তপ্ত বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতুল! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনাকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিব। আপনি সুস্থচিত্ত হউন, আপনকার কোনও ভয় নাই, যাহাতে আপনাদিগের মঙ্গল হয়, আমি তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান হইব। অন্য কথা দূরে থাকুক, পরিহাসকালেও আমি কখনও মিথ্যা কহি নাই। অদ্য আমি সর্পসত্রদীক্ষিত রাজা জনমেজয়ের নিকট গিয়া, মাঙ্গলিক বাক্য দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া, যাহাতে সেই যজ্ঞ নিবারণ হয়, তাহা করিব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সমুদায় সম্পন্ন করিব, আপনি আমার বিষয়ে কোনও ক্রমেই সন্দিহান হইবেন না। বাসুকি কহিলেন, বৎস! আমি মাতৃদণ্ডনিগৃহীত হইয়া ঘূর্ণিত হইতেছি আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, দিগ্‌ভ্রম জন্মিতেছে। আস্তীক কহিলেন, মহাশয়! আপনকার আর পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। সর্পসত্রের প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে মহাশয়ের যে ভয় জন্মিয়াছে, আমি তাহা দূর করিব, প্রলয়কালীন অনলতুল্য মহাঘোর ব্রহ্মদণ্ড নিরাকরণ করিব, আপনি কোনও ক্রমেই ভীত হইবেন না।

এইরূপ আশ্বাসপ্রদান দ্বারা বাসুকির অতিবিষম শোকানল শান্তি করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ আস্তীক ভুজগকুলের পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্বর গমনে রাজা জনমেজয়ের সর্ব্বগুণসম্পন্ন সর্পসত্রে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, সূর্য্য ও বহ্নি সম তেজস্বী সদস্যগণ উৎকৃষ্ট যজ্ঞায়তনে উপবিষ্ট আছেন। প্রবেশকালে দ্বারবানেরা নিবারণ করিল। তখন সেই অদ্বিতীয় পুণ্যশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবেশলাভের নিমিত্ত সর্পসত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। অনন্তর যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজার, ঋত্বিক্‌গণের, সদস্যবর্গের, এবং যজ্ঞীয় হুতাশনের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

আস্তীক কহিলেন, পূর্ব্ব কালে প্রয়াগে সোম, বরুণ ও প্রজাপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শত ও অযুত সংখ্যক যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। গয়, শশবিন্দু, বৈশ্রবণ, এই তিন সুবিখ্যাত নৃপতি যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। নৃগ, অজমীঢ় ও দশরথতনয় রাজা রামচন্দ্র যেরূপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। রাজা দিবিদেবসূনু, যুধিষ্ঠির ও অজমীঢ়ের যেরূপ যজ্ঞ বিখ্যাত আছে, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। সত্যবতীতনয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের যজ্ঞ যেরূপ, এবং সেই ভগবান্ স্বয়ং যে যজ্ঞের সমুদায় কর্ম্ম করিয়াছেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ জনমেজয়! তোমার এই যজ্ঞ সেইরূপ, প্রার্থনা করি, আমাদিগের হিতৈষিগণের মঙ্গল হউক। তোমার এই দেবরাজকৃত যজ্ঞ তুল্য যজ্ঞে সূর্য্য সম তেজস্বী ঋত্বিক্‌গণ অধিষ্ঠান করিতেছেন। ইঁহাদের জ্ঞানের ইয়ত্তা করা যায় না। ইঁহাদিগকে দান করিলে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় হয়। আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত আছে, ত্রিভুবনে দ্বৈপায়নের তুল্য ঋত্বিক্ নাই। ইঁহার শিষ্যেরা সমস্ত ভূমণ্ডল ব্যাপিয়াছেন। তাঁহাদের তুল্য সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ ঋত্বিক্ আর নাই। ভগবান্ অগ্নি দেবতাগণের তৃপ্তি নিমিত্ত প্রদীপ্ত ও দক্ষিণাবর্তশিখাবিশিষ্ট হইয়া তোমার এই যজ্ঞে হব্যগ্রহণ করিতেছেন। জগতে তোমার তুল্য প্রজাপালনপরায়ণ নৃপতি দ্বিতীয় নাই। তোমার ধৈর্য্যগুণ দর্শনে আমি সদা প্রীত আছি। তুমি, বরুণ ও ধর্ম্মরাজের তুল্য। বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র যেমন প্রজাদিগের রক্ষাকর্তা, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাদিগের মতে তুমি প্রজাদিগের সেইরূপ রক্ষাকর্ত্তা। কোনও কালে কোনও রাজা তোমার তুল্য যজ্ঞ করিতে পারেন নাই। হে সুব্রত! তুমি রাজা খট্টাঙ্গ, নাভাগ ও দিলীপের তুল্য, তোমার প্রভাব যযাতি ও মান্ধাতার সদৃশ, তোমার তেজঃ সূর্য্যের সমান, তুমি ভীষ্মদেবের ন্যায় বিরাজমান হইতেছ। তোমার বীর্য্য বাল্মীকি মুনির বীর্য্যের ন্যায় অপ্রকাশিত, তোমার কোপ মহর্ষি বশিষ্ঠের কোপের ন্যায় বশীকৃত, তোমার প্রভুত্ব

ইন্দ্রত্বতুল্য, তোমার প্রভাব নারায়ণের প্রভাবসদৃশ শোভা পাইতেছে। তুমি যমের ন্যায় ধর্ম্মনির্ণয় করিতে জান, কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন, তুমি সকল সম্পত্তির নিবাস স্বরূপ এবং সকল যজ্ঞের একাধার স্বরূপ। তুমি দম্ভপুত্র বলনামক অসুরের তুল্য পরাক্রমী, রামের তুল্য শাস্ত্রবেত্তা ও শস্ত্রবেত্তা, ঔর্ব্ব ও ত্রিতের তুল্য তেজস্বী, ভগীরথের তুল্য দুষ্প্রেক্ষণীয়।

এইরূপ স্তব শ্রবণ করিয়া রাজা, সদস্যবর্গ, ঋত্বিক্‌গণ ও অগ্নি, সকলেই প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

জনমেজয় কহিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমার বয়সে বালক হইয়াও বুদ্ধি ও জ্ঞানে বৃদ্ধবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন। আমার মতে ইনি বালক নহেন, বৃদ্ধ। আমি ইহাকে অভিলষিত প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। হে সদস্যগণ! আপনারা এ বিষয়ে যথাবিহিত আদেশ করুন। তদস্যগণ কহিলেন, ব্রাহ্মণ বালক হইলেও রাজাদিগের মহামান্য; যে ব্যক্তি বিদ্বান্ হন, তিনি বিশেষ মান্য। ইনি মহারাজের সর্ব্বপ্রকার বরদানপাত্র। কিন্তু নাগরাজ তক্ষক যাহাতে মন্ত্রবলে আকৃষ্ট হইয়া ত্বরায় আমাদের বশে আইসে, তাহাও চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর রাজা অভিলষিত দানে উদ্যত হইয়া, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, আস্তীককে ইহা কহিতে উপক্রম করিবামাত্র, হোতা অনতিহৃষ্ট চিত্তে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক এখনও আইসে নাই। জনমেজয় কহিলেন, যাহাতে আমার এই কর্ম্ম সমাপন হয়, এবং যাহাতে তক্ষক শীঘ্র আইসে, আপনারা সকলে তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ যত্নবান্ হউন, তক্ষক আমার পরম শত্রু। ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! শাস্ত্রে যেরূপ কহিতেছে, এবং যজ্ঞীয় হুতাশন যেরূপ ব্যক্ত করিতেছেন, তদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, তক্ষক প্রাণভয়ে কাতর হইয়া ইন্দ্রভবনে অবস্থিতি করিতেছে।

লোহিতনয়ন পুরাণবেত্তা মহাত্মা সূত পূর্ব্বে যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণকালে বিঘ্নসম্ভাবনা কহিয়াছিলেন। এক্ষণেও নরপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! বিপ্রগণ যাহা কহিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে। পুরাণ শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে

নিবেদন করিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র তক্ষককে অভয়দান করিয়াছেন; কহিয়াছেন, তুমি আমার নিকটে থাক, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।

সর্পসত্রদীক্ষিত রাজা শুনিয়া সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং হোতাকে কর্ম্ম সমাপন বিষয়ে সত্বর হইবার নিমিত্ত বারংবার কহিতে লাগিলেন। হোতাও মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহানুভাব দেবরাজ বিমানারোহণ পূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন। জলধরগণ, বিদ্যাধরগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে আসিল। দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। নাগরাজ তক্ষক তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, সে ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অত্যন্ত অসুখে কালহরণ করিতে লাগিল।

রাজা তক্ষকের প্রাণদণ্ড করিবার নিমিত্ত একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছিলেন, অতএব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার ঋত্বিগ্‌দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! যদি তক্ষক ইন্দ্রের ভবনে থাকে, তবে তাহাকে ইন্দ্রসহিত হুতাশনে পাতিত করুন। হোতা রাজা জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া, ইন্দ্রসহিত তক্ষককে উদ্দেশ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। তিনি এইরূপে আহুতি প্রদান করিলে নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, ইন্দ্র ও তক্ষক উভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তথা হইতে যজ্ঞ দর্শন করিয়া ইন্দ্র যৎপরোনাস্তি ভীত হইলেন, এবং তক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া আপন আলয়ে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে দেবরাজ পলায়ন করিলে পর, তক্ষক ভয়ে অচেতন ও অনায়ত্ত হইয়া মন্ত্রপ্রভাবে যজ্ঞীয় অগ্নিশিখা সন্নিধানে উপস্থিত হইল। তখন ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন মহারাজ! আপনার কর্ম্ম বিধি পূর্ব্বক সম্পন্ন হইল, এখন আপনি ব্রাহ্মণকে বরদান করিতে পারেন। অনন্তর জনমেজয় আস্তীককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অপ্রমেয়প্রভাব ব্রহ্মবীর্য্যসম্পন্ন ব্রাহ্মণকুমার! আমি তোমাকে অভিলষিত প্রদান করিব, তুমি অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর, যদি তাহা অদেয় হয়, তথাপি দান করিব। এই সময়ে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ! তক্ষক তোমার বশে আসিতেছে, তাহার ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। নিশ্চিত্ত বোধ হইতেছে, ইন্দ্র তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতেই মন্ত্রবলে বিকলাঙ্গ বিচেতন ও ঘূর্ণমান হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে আসিতেছে।

নাগরাজ তক্ষক হুতাশনে পতিত হয়, এমনসময়ে অবসর বুঝিয়া আস্তীক কহিলেন, রাজন্ জনমেজয়! যদি আমাকে বর দেওয়া অভিমত হয়, তাহা হইলে আমি এই প্রার্থনা করি, তোমার এই যজ্ঞ রহিত হউক, এবং সর্পগণ যেন আর এই যজ্ঞীয়

হুতাশনে পতিত না হয়। রাজা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অনতিহৃষ্ট মনে আস্তীককে কহিলেন, হে ব্রাহ্মন্! স্বর্ণ, রজত, গো, অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তাহা তোমাকে দিতেছি, আমার যজ্ঞ রহিত করিও না। আস্তীক কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার নিকট স্বর্ণ, রজত, অথবা গোধন প্রার্থনা করি না, আমার এইমাত্র প্রার্থনা, তোমার যজ্ঞ রহিত হউক, তাহা হইলে আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হয়। জনমেজয় অভিহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজকুলশ্রেষ্ঠ। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর। কিন্তু তিনি কোনও মতেই অন্য বর প্রার্থনা করিলেন না। তখন বেদজ্ঞ সদস্যবর্গ সকলে মিলিয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! ব্রাহ্মনকে প্রার্থিত বর প্রদান কর।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

শৌনিক কহিলেন, হে সূতকুলতিলক। রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে যে সকল সর্প হুতাশনে পতিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলের নাম শ্রবণের অভিলাষ করি। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! বহু সহস্র, বহু প্রযুত, বহু অর্ব্বদ সর্প সর্পসত্রে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের সংখ্যা করা অসাধ্য, তথাপি, যত দূর স্মরণ হয়, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমতঃ বাসুকিকুলোৎপন্ন যে সকল নীলবর্ণ রক্তবর্ণ শুক্লবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় মহাবিষ ভুজঙ্গমগণ, মাতৃশাপরূপ বিষম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া, যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হয়, তাহাদেরই বাহুল্য নামোল্লেখ করিব।

কোটিশ, মানস, পূর্ণ, শল, পাল, হলীল, পিচ্ছল, কৌণপ, চক্র, কালবেগ, প্রকালন, হিরণ্যবাহু, শরণ, কক্ষক, কালদন্ত, এই সকল বাসুকিজাত সর্প প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতিরিক্ত বাসুকিবংশসম্ভূত অতি ভয়ঙ্কর মহাবলশালী আর আর অনেক নাগ প্রদীপ্ত হুতাশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

এক্ষণে তক্ষককুলোদ্ভূত নাগগণের নামোল্লেখ করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুচ্ছাণ্ডক, মণ্ডলক, পিণ্ডসক্ত, রভেণক, উচ্ছিখ, শরভ, ভঙ্গ, বিল্বতেজাঃ বিরোহণ, শিলী, শলকর, মূক, সুকুমার, প্রবেপন, মুদ্গর, শিশুরোমা, সুরোমা, মহাহনু, এই সমস্ত তক্ষকজাত নাগ হব্যবাহনে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পারাবত, পারিপাত্র, পাণ্ডুর, হরিণ, কৃশ, বিহত, শরভ, মেদ, প্রমোদ, সংহতাপন, ঐরাবতকুলোৎপন্ন এই সকল নাগ অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

হে দ্বিজোত্তম! অতঃপর কৌরব্যকুলজাত নাগদিগের উল্লেখ করিব, শ্রবণ করুন। এরক, কুণ্ডল, বেণী, বেণীস্কন্ধ, কুমারক, বাহুক, শৃঙ্গবের, ধূর্ত্তক, প্রাতর, অস্তক, এই সকল কৌরব্যকুলজাত সর্প হুতাশনপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রকুলপ্রসূত বায়ুসমবেগশালী মহাবিষ সর্পগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, পিঠরক, কুঠার, মুখসেচক, পূর্ণাঙ্গদ, পূর্ণমুখ, প্রহাস, শকুনি, হরি, অমাহঠ, কামহঠ, সুষেণ, মানস, ব্যয়, ভৈরব, মুণ্ডবেদাঙ্গ, পিশঙ্গ, উণ্ড্রপারক, ঋষভ, বেগবান্, নাগ, পিণ্ডারক, মহাহনু, রক্তাঙ্গ, সর্ব্বসারঙ্গ, সমৃদ্ধ, পটবাসক, বরাহক, বীরণক, সুচিত্র, চিত্রবেগিক, পরাশর, তরুণক, মনিস্কন্ধ, আরুণি।

হে ব্রহ্মন্! বিখ্যাত প্রধান প্রধান নাগের নাম কীর্ত্তন করিলাম; বাহুল্য প্রযুক্ত সকলের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ইহাদের যে সকল সন্তান ও সন্তানের সন্তান প্রদীপ্ত পাবকে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা করা অসাধ্য। অতি ভয়ঙ্কর, প্রলয়কালীন অনলতুল্য বিষবিশিষ্ট, দ্বিশীর্ষ, সপ্তশীর্ষ, দশশীর্ষ, এবং অন্যান্য শত শত সহস্র সহস্র সর্প সেই যজ্ঞীয় হুতাশনে হুত হইয়াছে! মহাকায়, মহাবেগ, শৈলশৃঙ্গসমুন্নত, যোজনায়ত, দ্বিযোজনায়ত, পঞ্চযোজনায়ত, দশযোজনায়ত, দ্বাদশযোজনায়ত, কামরূপী, কামবল, প্রদীপ্ত অনলতুল্য বিষশালা মহাসর্প সকল ব্রহ্মদণ্ডে নিগৃহীত হইয়া সেই মহাসত্রে দগ্ধ হইয়াছে।

অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়—আস্তীকপর্ব্ব

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, রাজা জনমেজয় আস্তীককে এইরূপে বরদানে উদ্যত হইলে, আমরা তাঁহার আর এই এক অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি। নাগরাজ তক্ষক ইন্দ্রহস্ত হইতে চ্যুত হইয়া নভোমণ্ডলেই থাকিল! তখন রাজা জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। ভয়ার্ত্ত তক্ষক সেই বিধি পূর্ব্বক হুত প্রদীপ্ত যজ্ঞীয় হুতাশনে পতিত হইল না। শৌনিক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের মন্ত্র সকল কি নিস্তেজ হইয়াছিল, যে তক্ষক অগ্নিতে পতিত হইল না। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, পন্নগরাজ ইন্দ্রহস্ত হইতে চ্যুত ও বিচেতন হইয়া পতিত হইতেছে, এমন সময়ে আস্তীক, তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এই

বাক্য তিন বার উচ্চারণ করিলেন, এবং তক্ষকও উদ্বিগ্ন চিত্তে অন্তরীক্ষে অবস্থিত হইল। তখন রাজা সদস্যগণের উপদেশবশবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আস্তীক যাহা কহিলেন, তাহাই হউক, এই কর্ম্ম সমাপিত হউক, নাগগণ নিরাপদ্ হউক, আস্তীক প্রীত হউন, এবং সূতের বাক্য সত্য হউক।

রাজা আস্তীককে বর প্রদান করিবামাত্র, চারি দিকে প্রীতিপূর্ণ কোলাহল উত্থিত হইল, সর্পসত্র নিবৃত্ত হইল, ভরতকুলতিলক রাজা জনমেজয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, যে সমস্ত ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ সেই সর্পসত্রে সমাগত হইয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে অপর্য্যাপ্ত অর্থ প্রদান করিলেন আর যে লোহিতনয়ন সূত যজ্ঞায়তননির্ম্মাণকালে কহিয়াছিলেন যে, এক ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ করিয়া সর্পসত্র রহিত হইবেক, প্রীত হইয়া তাঁহাকেও প্রভূত অর্থ, অন্যান্য নানা দ্রব্য, এবং অন্ন ও বস্ত্র দান করিলেন। তদনন্তর যথাবিধি অবভৃথক্রিয়া (৭৪) সম্পাদন করিলেন। পরে প্রীত মনে যথোচিত সৎকার করিয়া কৃতকৃত্য মহাত্মা আস্তীককে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন, এবং তাঁহার প্রস্থানকালে কহিলেন, ভগবন্! পুনর্ব্বার যেন আপনকার আগমন হয়। যৎকালে আমি অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব, আপনাকে সেই যজ্ঞে সদস্য হইতে হইবেক।

আস্তীক, এইরূপে স্বকার্য্যসাধন ও রাজার সন্তোষসম্পাদন করিয়া, তথাস্তু বলিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং পরম প্রীত মনে মাতুলের ও জননীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাদবন্দন করিয়া আদ্যোপ্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যে সমস্ত নাগ সেই স্থানে উপস্থিত ছিল, শ্রবণমাত্র তাহাদের শোক ভয় ও মোহ দূর হইল। তাহারা সাতিশয় প্রীত হইয়া আস্তীককে কহিল, বৎস! অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তাহারা চারি দিক্ হইতে ভূয়োভূয়ঃ ইহাই কহিতে লাগিল, হে বিদ্বন্! আমরা তোমার কি প্রিয় কর্ম্ম করিব বল; আমরা পরম প্রীত হইয়াছি, তুমি আমাদের সকলকে ঘোর বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছ; বৎস! আমরা তোমার কি অভীষ্ট সম্পাদন করিব বল। আস্তীক কহিলেন, যে সকল ব্রাহ্মণ অথবা অন্যান্য মানবগণ প্রসন্ন মনে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার এই উপাখ্যান পাঠ করিবেক, এই বর দাও, যেন তোমাদের হইতে তাহাদিগের কোনও ভয় থাকে না। নাগগণ প্রীতি ও প্রসন্ন হইয়া কহিল, হে ভাগিনেয়! তুমি যে প্রার্থনা করিলে, আমরা প্রীতি চিত্তে নিঃসন্দেহ তাহা সম্পাদন করিব।

যে ব্যক্তি দিবাভাগে অথবা রাত্রি কালে অসিত অর্ত্তিমান্ সুনীথকে স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। হে মহাভাগ নাগগণ! যে মহাযশস্বী মহাপুরুষ মহর্ষি

---

(৭৪) যদি কোনও অংশে ন্যূনতা ঘটিয়া থাকে, এই আশঙ্কা করিয়া সম্ভাবিত ন্যূনতার পরিহার যে যজ্ঞ করিয়া প্রধান যজ্ঞের সমাপন করে, তাহার নাম অবভৃথ।

জরৎকারুর ঔরসে নাগভগিনী জরৎকারুর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যিনি জনমেজয়ের সর্পসত্রে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে স্মরণ করিতেছি; অতএব তোমাদের আমাকে হিংসা করা উচিত নহে। হে মহাবিষ সর্প! অপসর্পণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, চলিয়া যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞান্তে আস্তীক যে বাক্য কহিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কর। যে সর্প আস্তীকবাক্য শুনিয়া নিবৃত্ত না হয়, তাহার মস্তক শিংশবৃক্ষফলের ন্যায় শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যায়।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, দ্বিজেন্দ্র আস্তীক সমাগত ভুজগগণ কর্ত্তৃক এইপ্রকার উক্ত হইয়া, পরম প্রীতি প্রাপ্ত ও গমনাভিলাষী হইলেন। তিনি ভুজগগণকে সর্পসত্রভয় হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র রাখিয়া যথাকালে কাল প্রাপ্ত হইলেন। হে ঋষিপ্রবর! আমি আপনকার নিকট আস্তীকের উপাখ্যান যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম। এই উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে কখনও সর্পভয় থাকে না। হে ভৃগুকুলাবতংস! আপনকার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ প্রমতি, স্বীয় পুত্র রুরু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আস্তীকের পরম পবিত্র চরিত্র যেরূপ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এবং আমিও তাঁহার নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, আপনকার নিকট অন্তোপান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। আপনি ডুণ্ডুভবাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আস্তীকের সেই পরমপবিত্র ধর্ম্মময় আখ্যান শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে আপনকার অতি মহৎ কৌতূহল নিবৃত্ত হউক।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতসূচনা।

শৌনক কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি আমার নিকট ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অখিল মহৎ আখ্যান কীর্ত্তন করিলে, ইহাতে আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি, ব্যাসসংক্রান্ত যে সমস্ত কথা আছে, সে সমুদায় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। অতি দুঃসাধ্য সর্পসত্রে মহাত্মা সদস্যগণ অবসরকালে যে যে বিষয়ে যে সকল বিচিত্র কথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমরা তোমার নিকট সেই সমস্ত কথা যথাবৎ শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি আমাদিগের নিকট বর্ণন কর।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, সর্পসত্রনিযুক্ত ব্রাহ্মণেরা অবসরকালে বেদমূলক নানা আখ্যান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যাসদেব মহাভারতরূপ বিচিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করেন। শৌনক কহিলেন, ভগবন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অবসরকালে, রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত মহানুভাব মহর্ষির মনঃসাগরসম্ভূত সেই পরম পবিত্র কথা যথাবিধি শুনিতে অভিলাষ করি, হে সাধুশ্রেষ্ঠ! তুমি তাহা কীর্ত্তন কর; আমি অদ্যাপি আ্যাখানশ্রবণে তৃপ্ত হই নাই। উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, হে ঋষিপ্রবর! আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত মহৎ উৎকৃষ্ট মহাভারত-নামক আখ্যান প্রথমাবধি সমুদায় কীর্ত্তন করিব, আপনি শ্রবণ করুন। আমারও এই আখ্যান কীর্ত্তন করিতে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিতেছে।

ষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতসূচনা।

উগ্রশ্রবাঃ কহিলেন, ভগবন্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা জনমেজয়কে সর্পসত্রে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। যে পাণ্ডবপিতামহ মহাপুরুষ যমুনাদ্বীপে শক্তিপুত্র পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর কন্যাবস্থাতেই তদীয় গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি জাতমাত্র স্বেচ্ছাক্রমে দেহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; যিনি অঙ্গসহিত সমস্ত বেদ ও সমস্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, উপবাস, পুত্রোৎপাদন ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কেহ যাঁহার তুল্য হইতে পারেন; যে অদ্বিতীয় বেদবেত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সচ্চরিত্র সত্যপরায়ণ, কবি, ব্রহ্মর্ষি এক বেদকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যে পবিত্রকীর্তি মহাযশস্বী মহাপুরুষ শান্তনুর বংশরক্ষার্থে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্ম দিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা বেদবেদাঙ্গপারগ শিষ্যসমভিব্যাহারে রাজর্ষি জনমেজয়ের যজ্ঞক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, রাজা বহুসংখ্যক সদস্য, নানাদেশীয় নরপতিগণ, এবং যজ্ঞানুষ্ঠাননিপুণ প্রজাপতিতুল্য ঋত্বিক্‌গণে পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট আছেন।

ভরতকুলপ্রদীপ রাজর্ষি জনমেজয় মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সত্বর হইয়া, স্বগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক বসিবার নিমিত্ত কাঞ্চননির্ম্মিত আসন প্রদান করিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণের পূজনীয় মহর্ষি উপবিষ্ট হইলে, রাজা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন; প্রথমতঃ পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে মধুপর্কোক্ত-বিধানে এক গো নিবেদন করিয়া দিলেন। ব্যাসদেব জনমেজয়ের পূজা গ্রহণ করিয়া

সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং নিরপরাধে গোবধ করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া উহার প্রাণবধ নিবারণ করিলেন।

রাজা, এইরূপে প্রপিতামহের পূজা সমাধান করিয়া প্রীত মনে তৎসমীপে উপবেশন পুরঃসর তাঁহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ ও আত্মকুশল নিবেদিলেন। পরে সমুদায় সদস্যগণ তাঁহার স্তব করিলেন; তিনিও তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিলেন। অনন্তর জনমেজয়, সমস্ত সদস্যগণসহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, এই জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কৌরব ও পাণ্ডবদিগের বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন; অতএব আমার একান্ত বাসনা এই, আপনি তাঁহাদের চরিত কীর্ত্তন করেন। আমার পিতামহেরা রাগদ্বেষাদিশূন্য ছিলেন, তথাপি কি নিমিত্ত তাদৃশ বিবাদ ও তাদৃশ সর্ব্বসংহারকারী মহাযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, আপনি কৃপা করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার সেই প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সমীপোপবিষ্ট স্বীয় শিষ্য বৈশম্পায়নকে এই আদেশ করিলেন, পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যে রূপে আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট তুমি যেরূপ শুনিয়াছ, সেই সমস্ত ইঁহাকে শ্রবণ করাও। বৈশম্পায়ন গুরুদেবের আদেশ পাইয়া, রাজা সদস্যবর্গ ও অন্যান্য নৃপতিগণের নিকট কুরুপাণ্ডবের গৃহবিচ্ছেদ ও কুলক্ষয় সংক্রান্ত পুরাতন ইতিহাস আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতসূচনা

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রথমতঃ গুরুদেবকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে একাগ্র চিত্তে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া এবং সমস্ত ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সম্মান ও সৎকার করিয়া, সর্ব্বলোকবিখ্যাত ধীমান মহর্ষি ব্যাসদেবের অশেষ মত বর্ণন করিব।

মহারাজ! আপনি এই ভারতীয় কথা শ্রবণের যোগ্য পাত্র, এবং গুরুদেবের আদেশ পাইয়া আমারও এই মহতী কথার কীর্ত্তনে উৎসাহ জন্মিতেছে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন। রাজ্যের নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়া দ্বারা যে রূপে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের আত্মবিচ্ছেদ, পাণ্ডবদিগের বনবাস ও সর্ব্বসংহারকারী সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তাহা আমি আপনার নিকট বর্ণন করিব। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বীর, পিতার পরলোক প্রস্থানের পর, অরণ্য হইতে আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অচিরকালমধ্যেই বেদে ও

ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলেন। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে এইরূপ শ্রী, কীর্ত্তি, রূপ, বল, বীর্য্য ও ঔদার্য্য সম্পন্ন এবং পুরবাসিগণের প্রিয় দেখিয়া অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরবশ হইলেন। ক্রূরস্বভাব দুর্য্যোধন, কর্ণ ও সৌবল, একমতাবলম্বী হইয়া, পাণ্ডবদিগের নানা নিগ্রহ করিতে ও তাঁহাদিগের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। পাপাত্মা দুর্য্যোধন ভীমকে অন্নের সহিত বিষপান করাইয়াছিল; কিন্তু ভীম তাহা জীর্ণ করিয়াছিলেন। ভীম গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবস্থায় তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া গঙ্গাপ্রবাহে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহে আসিয়াছিল। পরে কুন্তীনন্দন জাগরিত হইয়া নিজ বাহুবলে বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক গঙ্গাপ্রবাহ হইতে উত্থান করেন। একদা ভীমকে নিদ্রিত দেখিয়া, দুর্য্যোধন অতি তীক্ষ্ণবিষ কৃষ্ণসর্প দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে দংশন করায়, তথাপি তাঁহার প্রাণনাশ হয় নাই।

এইরূপে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের যে সকল নিগ্রহ করিত, মহামতি বিদুর তৎপ্রতীকার ও তৎসমুদায় হইতে তাঁহাদের রক্ষণবিষয়ে সতত অবহিত ছিলেন। স্বর্গবাসী দেবরাজ ইন্দ্র যেমন জীবলোকেব সুখপ্রদ, বিদুর পাণ্ডবদিগের নিয়ত সেইরূপ সুখপ্রদ ছিলেন।

যখন দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কি গুপ্ত কি প্রকাশিত, কোনও উপায়েই পাণ্ডবদিগের বিনাশ কবিতে পারিল না, তখন কর্ণ দুঃশাসন প্রভৃতি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্রের অনুজ্ঞা লইয়া জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল। পুত্রের চিত্তরঞ্জনকারী রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগাভিলাষে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা ও জননী ছয় জনে হস্তিনাপুর হইতে প্রস্থান করিলেন। মহাপ্রাত্র বিদুব মহাশয় প্রস্থানকালে তাঁহাদের মন্ত্রিস্বরূপ হইয়াছিলেন; তাঁহারই মন্ত্রণাপ্রভাবে তাঁহারা নিশীথ সময়ে জতুগৃহদাহ হইতে মুক্ত হইয়া বন প্রস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা বারণাবতনগরে উপস্থিত হইয়া জননীসহিত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে, অত্যন্ত সাবধান ও সতর্ক হইয়া, জতুগৃহে সংবৎসর বাস করিলেন। অনন্তর বিদুরের উপদেশ ক্রমে প্রথমতঃ সুরঙ্গ প্রস্তুত করিলেন, পরে সেই জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া এবং দুরাচার পুরোচনকে দগ্ধ করিয়া জননী সহিত গুপ্ত ভাবে পলায়ন করিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া পাণ্ডবেরা এক বননির্ঝর সমীপে হিড়িম্বনামক এক মহাভয়ানক রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, এবং ঐ রাক্ষসরাজের প্রাণবধ করিয়া প্রকাশভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ভীমসেন এই স্থলে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণিগ্রহণ করেন। এই হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। অনন্তর পাণ্ডবেরা একচক্রানামক নগরীতে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্রহ্মচারিবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নরত ও ব্রতপরায়ণ হইয়া, কিছু কাল এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অবস্থিতি করিলেন। তথায় এক মহাবল পরাক্রান্ত

বকনামক ভয়ানক ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষস ছিল; মহাবাহু ভীমসেন তাহার নিকটে গিয়া, নিজ বাহুবীর্য্য প্রভাবে তাহার প্রাণবধ করিয়া, নগরবাসীদিগের ভয় নিরাকরণ ও শোক নিবারণ করিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে পাণ্ডবেরা শ্রবণ করিলেন, পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদী নামে এক কন্যা স্বয়ংবরা হইয়াছেন। স্বয়ংবরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা তথায় গমন করিলেন, এবং দ্রৌপদী লাভ করিয়া সংবৎসর কাল পাঞ্চালদেশে অবস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে সকলে পাণ্ডব বলিয়া জানিতে পারিবাতে, পুনর্ব্বার তাঁহারা হস্তিনাপুর প্রত্যাগমন করিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদেব পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, হে বৎসগণ! কিসে তোমাদিগের ভ্রাতৃবিরোধ না হয়, এই বিষয় বিবেচনা করিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাদিগকে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে হইবেক; অতএব তোমরা খাণ্ডবপ্রস্থ প্রস্থান কর। ঐ নগর পরম রমণীয়, বাসের উপযুক্ত স্থান। তাঁহারা, তাঁহাদিগের দুই জনের বচনানুসারে, আপনাদিগের সমুদায় সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত সুহৃজ্জন সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থ প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবেরা তথায় বহু বৎসর বাস করিলেন, এবং শস্ত্রবলপ্রভাবে অন্যান্য নরপতিদিগকে বশীভূত করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যব্রতপরায়ণ, সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান ও ক্ষমাশীল হইয়া অনেকানেক বিপক্ষগণকে বশীভূত করিতে লাগিলেন। মহাযশস্বী ভীমসেন পূর্ব্ব দিক্ জয় করিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন উত্তর দিক্, নকুল পশ্চিম দিক্, বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী সহদেব দক্ষিণ দিক্ জয় করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে সমস্ত পৃথিবীকে আপনাদিগের বশীভূত করিলেন। সূর্য্যদেব স্বভাবতঃ সতত বিরাজমান আছেন, এক্ষণে যথার্থ বিক্রমশালী পঞ্চ পাণ্ডব সূর্য্যদেবের ন্যায় বিরাজমান হওয়াতে, পৃথিবী ষট্সূর্য্যসম্পন্নার ন্যায় হইল।

অনন্তর, যথার্থবিক্রমশালী তেজস্বী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কোনও প্রয়োজনবশতঃ প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্থিরমতি, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত অর্জ্জুনকে বনপ্রেরণ করিলেন। তিনি পূর্ণ সংবৎসর ও এক মাস বনবাস করিয়া, কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, দ্বারকা গমন করিলেন। তথায় তিনি বাসুদেবের অনুজা রাজীবলোচনা মধুরভাষিণী সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন। যেমন ইন্দ্রের শচী, নারায়ণের লক্ষ্মী, সেইরূপ সুভদ্রা পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনের সহধর্ম্মিণী হইলেন।

কুন্তীতনয় অর্জ্জুন, বাসুদেবের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, খাণ্ডবদাহে হব্যবাহনের তৃপ্তি সম্পাদন করিলেন। বাসুদেব সহায় থাকাতে খাণ্ডবদাহ অর্জ্জুনের কষ্টসাধ্য হইল না।

অগ্নি প্রীত হইয়া অর্জ্জুনকে ধনুঃশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব, অক্ষয়বাণপূর্ণ দুই তুণ, এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহকালে ময়নামক অসুরকে মুক্ত করেন, এই নিমিত্ত মায়াসুর রাজসূয়যজ্ঞকালে সর্ব্বরত্নালঙ্কৃত দিব্য সভা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিতান্ত দুর্ম্মতি হীনবুদ্ধি দুর্য্যোধন সেই সভা দর্শনে লোভাক্রান্ত হইলেন, তৎপুরে শকুনির সহিত পাশক্রীড়াতে যুধিষ্ঠিরকে বঞ্চনা করিয়া দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনপ্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে থাকিলেন।

পাণ্ডবেরা, এইরূপে ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া, যখন চতুর্দ্দশ বর্ষে স্বীয় রাজ্যাধিকার প্রার্থনা করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন যুদ্ধারম্ভ হইল। তাঁহারা সেই যুদ্ধে ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস ও রাজা দুর্য্যোধনের প্রাণবধ করিয়া পুনরায় রাজ্যাধিকার লাভ করিলেন।

মহাত্মা পাণ্ডবদিগের পুরাবৃত্ত, রাজ্যাধিকারের নিমিত্ত ভ্রাতৃভেদ ও যুদ্ধজয়ের বৃত্তান্ত এই।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়—ভারতপ্রশংসা

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। কৌরবচরিত মহাভারত উপাখ্যান সমুদায় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলেন; কিন্তু বিস্তারিত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, অতএব আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তারিত করিয়া পুনর্ব্বার কীর্ত্তন করুন। আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের মহৎ চরিত্র শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না। পাণ্ডবেরা যে ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও অবধ্য জ্ঞাতিবর্গ প্রভৃতির প্রাণবধ করিয়াছিলেন, অথচ সর্ব্বজনপ্রশংসনীয় হইয়াছেন, ইহা অল্প হেতুতে হইতে পারে না। কি নিমিত্ত সেই নিরপরাধ মহাপুরুষেরা, বিপৎপ্রতীকারসমর্থ হইয়াও, দুরাত্মা কৌরবদিগের প্রযোজিত সেই সমস্ত অসহ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কি নিমিত্ত অযুতহস্তিবলধারী বাহুশালী বৃকোদর, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও, ক্রোধ সংবরণ করিয়াছিলেন, দুরাত্মারা দ্রৌপদীকে অশেষ প্রকারে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু তিনি প্রতীকারসমর্থা হইয়াও কি নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ক্রোধনেত্র দ্বারা দগ্ধ করেন নাই; দুরাত্মারা, নরশ্রেষ্ঠ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকেও যথেষ্ট ক্লেশ দিয়াছিল, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূত ব্যসনে আসক্ত দেখিয়াও কি নিমিত্ত তাঁহার অনুগত ছিলেন; সর্ব্বধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এরূপ ক্লেশভোগের যোগ্য নহেন,

তিনিই বা কি নিমিত্ত এত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন; আর কি রূপেই বা অর্জ্জুন একাকী কেবল কৃষ্ণকে সারথি রূপে সহায় পাইয়া অসংখ্য সেনা বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং সেই মহাপুরুষেরা তত্তৎকালে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহা যথাযথ বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ক্ষণ কাল বিলম্ব করুন, কৃষ্ণদ্বৈপায়নকীর্ত্তিত অতি সুবিস্তৃত পবিত্র আখ্যান কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহাত্মা মহাতেজাঃ সর্ব্বলোকপূজিত মহর্ষি বেদব্যাসের সমুদায় অভিপ্রায় ক্রমে ক্রমে বর্ণনা করিতেছি। অমিততেজাঃ সত্যবতীতনয় পবিত্র লক্ষ শ্লোক দ্বারা এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে বিদ্বান্ ইহা পাঠ করেন ও যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া দেবতুল্যতা প্রাপ্ত হন। মহর্ষিপ্রণীত এই উৎকৃষ্ট পুরাণ বেদতুল্য, পবিত্র, সুশ্রাব্য ও ঋষিগণপূজিত। এই পরম পবিত্র ইতিহাসে অর্থ, কাম ও তত্ত্বজ্ঞানের যথার্থ লক্ষণ স্পষ্ট রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি দানশীল সত্যবাদী ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগকে এই ব্যাসপ্রণীত বেদ শ্রবণ করাইয়া অর্থ লাভ করেন। চন্দ্র যেরূপ রাহু হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়েন, সেইরূপ লোকেরা দুরাত্মা হইলেও এই পুরাণ পাঠে ভ্রূণহত্যাদি মহাপাপ হইতে নিঃসন্দেহ পরিত্রাণ পায়। এই ইতিহাসের নাম জয়, অতএব বিজিগীষুদিগের ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। রাজারা ইহা শ্রবণ করিলে পৃথিবী জয় ও আরতি পরাজয় করিতে পারেন। ইহা মহৎ স্বস্ত্যয়ন ও পুংসবন সংস্কার স্বরূপ; যুবরাজ মহিষীর সহিত ইহা বারংবার শ্রবণ করিলে, তাঁহাদিগের অতি বীর্য্যশালী পুত্র ও রাজ্যভাগিনী কন্যা জন্মে। অপরিমিতবুদ্ধি-শালী মহর্ষি বেদব্যাস, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ও মোক্ষশাস্ত্র স্বরূপ এই ভারত রচনা করিয়াছেন। এই ভারত বর্ত্তমান কালে অনেকে কীর্ত্তন করিতেছে, এবং উত্তর কালে অনেকে শ্রবণ করিবে। পুত্রেরা ভারত শ্রবণ করিলে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী ও প্রিয়কারী হয়। যে নর ইহা শ্রবণ করে, সে কায়মনোবাক্যে কৃত পাপ হইতে শীঘ্র বিনির্মুক্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি অসূয়াশূন্য হইয়া ভারতবংশীয়দিগর মহৎ জন্মবৃত্তান্ত শবণ করে, তাহাদিগের ব্যাধিভয় ও পরলোকভয় থাকে না। মহাত্মা পাণ্ডবদিগের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবার উদ্দেশে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যশস্কর আয়ুষ্কর এবং স্বর্গ ও সাধন এই পবিত্র পুরাণ রচনা করিয়াছেন। যিনি শুদ্ধচরিত পবিত্র ব্রাহ্মণদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি সনাতন ধর্ম্ম লাভ করেন। যিনি শুচি হইয়া বিখ্যাত কুরুকুলের ও অন্যান্য প্রভূতধনসম্পন্ন অতি তেজস্বী সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বিখাত-কীর্ত্তি নরপতিদিগের প্রসিদ্ধ বংশ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার বংশের বিপুল বৃদ্ধি হয়, এবং সকলে তাঁহার সম্মান পূজা করে। যে ব্রাহ্মণ ব্রতপরায়ণ হইয়া বর্ষা চারি মাস পবিত্র ভারত অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাপ হইতে

মুক্ত হয়েন। যিনি নিত্য ভারত পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে সকল বেদের পারদর্শী বলা যায়। যাহাতে দেবতাদিগের, রাজর্ষিদিগের, বিধূতপাপ পুণ্যশালী ব্রহ্মর্ষিদিগের ভগবান্ দেবেশ কেশবের ও দেবীর কীর্ত্তন আছে, যাহাতে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবিবরণ বর্ণিত আছে, যাহাতে গোব্রাহ্মণমহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সমস্তবেদস্বরূপ সেই ভারত ধর্ম্মলাভাকাঙ্ক্ষী-দিগের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। যে বিদ্বান পর্ব্ব দিনে বিপ্রদিগকে ইহা শ্রবণ করান, তিনি নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক জয় করিয়া সনাতন ব্রহ্মলোকে গমন করেন। শ্রাদ্ধদিবসে অন্ততঃ ইহার এক পাদ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইলে, সেই শ্রাদ্ধ পিতৃলোকদিগের অক্ষয় তৃপ্তি সম্পাদন করে। দিবসে ইন্দ্রিয় ও মনের দারা জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ মনুষ্য যে সকল পাপ সঞ্চয় করে, মহাভারত শুনিলেই তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্মবিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহার নাম মহাভারত; যিনি মহাভারত শব্দের এই ব্যুৎপত্তি অবগত হয়েন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। এই ভারতে ভরতবংশীয়দিগের বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা পাঠে করিলে মনুষ্যেরা মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। লব্ধকাম মহর্ষি কৃষ্ণ দৈপায়ন ক্রমাগত তিন বৎসর শুচি ও যত্নশীল হইয়া নিয়ম পূর্ব্বক এই ভারত রচনা করিয়াছেন, অতএব ব্রাহ্মণদিগের নিয়মযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করা উচিত। এই ব্যাসপোক্ত পবিত্র ভারতকথা যে সকল ব্রাহ্মণ পাঠ করেন, ও যাঁহারা শ্রবণ করেন, তাঁহার যথেষ্টচারী হইলেও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিহিত কর্ম্মে অনমুষ্ঠান জন্য দোষে লিপ্ত হয়েন না। ধর্ম্মকামনায় আদ্যন্ত এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে কামনা সিদ্ধ, হয়। এই পরম পবিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস শ্রবণে যাদৃশ সুখ ও সন্তোষ লাভ হয়, মনুষ্য স্বর্গলাভেও তাদৃশ সুখ ও সন্তোষের অধিকারী হইতে পারে না। যে সকল পুণ্যশীল লোক এই অদ্ভুত কথা শ্রবণ করেন, এবং শ্রবণ করান, তাঁহাদিগের রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যেমন সমুদ্র ও সুমেরু রত্ননিধি বলিয়া বিখ্যাত, এই ভারতও সেইরূপ রত্ননিধি। এই মহাভারত বেদতুল্য, পবিত্র, উৎকৃষ্ট, শ্রুতিসুখপ্রদ ও শীলবর্দ্ধন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি যাচকদিগকে এই ভারত দান করে, তাহার সসাগরা পৃথিবী দান করা হয়। আমি পুণ্য ও বিজয়ের নিমিত্ত সন্তোষদায়িনী এই দিব্য মহাভারতকথা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষি বেদব্যাস সতত যত্নশীল হইয়া তিন বৎসরে এই মহাভারত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। হে ভরতকুলপ্রদীপ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষের বিষয়ে যাহা ইহাতে লিখিত আছে, তাহাই অন্যত্র দেখা যায়, যাহা ইহাতে লিখিত হয় নাই, তাহা আর কুত্রাপি নাই।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

ভ্রান্তিবিলাস

ভূমিকা

কিছু দিন পূর্ব্বে, ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি শেক্সপীয়রের প্রণীত ভ্রান্তিপ্রহসন পড়িয়া আমার বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যানভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।

সেক্সপীয়র পঁয়ত্রিশখানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তির ও রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত, তিনি চারখানি খণ্ড কাব্যের ও কতকগুলি ক্ষুদ্র কাব্যের রচনা করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি যে কেবল ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, এরূপ নহে; এ পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলে যত কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহেন। এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বা পক্ষপাতবিবর্জ্জিত কি না, মাদৃশ ব্যক্তির তদ্বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রগল্‌ভতাপ্রদর্শন মাত্র।

ভ্রান্তিপ্রহসন, কাব্যাংশে, শেক্সপীয়রপ্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট; কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরসোদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশলপ্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে শেক্সপীয়রের সেই অপ্রতিম কৌশল নাই; সুতরাং, ইহা দ্বারা লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।

বাঙ্গালাপুস্তকে ইয়ুরোপীয় নাম সুশ্রাব্য হয় না; বিশেষতঃ, যাঁহারা ইঙ্গরেজী জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে, এই দোষের পরিহারবাসনায়, ভ্রান্তিবিলাসে সেই সেই নামের স্থলে এতদ্দেশীয় নাম নিবেশিত হইয়াছে। উপাখ্যানে এবংবিধ প্রণালী অবলম্বন করা কোনও অংশে হানিকর বা দোষাবহ হইতে পারে না। ইতিহাসে বা জীবনচরিতে নামের যেরূপ উপযোগিতা আছে, উপাখ্যানে সেরূপ নহে।

যদি ভ্রান্তিবিলাস পড়িয়া এক ব্যক্তিরও চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতিসঞ্চার হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।

বর্দ্ধমান।
৩০এ আশ্বিন। সংবৎ ১৯২৬। } শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

ভ্রান্তিবিলাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

হেমকূট ও জয়স্থল নামে দুই প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে জয়স্থলে এই নৃশংস নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়, হেমকূটের কোনও প্রজা বাণিজ্য বা অন্যবিধ কার্য্যের অনুরোধে জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিলে, তাহার গুরুতর অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হইলে প্রাণদণ্ড, হইবেক। হেমকূটরাজ্যেও জয়স্থলবাসী লোকদিগের পক্ষে অবিকল তদ্রূপ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় রাজ্যই বাণিজ্যের প্রধান স্থান। উভয় রাজ্যের প্রজারাই উভয়ত্র বিস্তারিত রূপে বাণিজ্য করিত। এক্ষণে, উভয় রাজ্যের উল্লিখিত নৃশংস ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, সেই বহুবিস্তৃত বাণিজ্য এক কালে রহিত হইয়া গেল।

এই নিয়ম প্রচারিত হইবার কিঞ্চিৎ কাল পরে, সোমদত্ত নামে এক বৃদ্ধ বণিক্ ঘটনাক্রমে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া হেমকূটবাসী বলিয়া পরিজ্ঞাত ও বিচারালয়ে নীত হইলেন। জয়স্থলে অধিরাজ বিজয়বল্লভ স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া সোমদত্তের দিকে দৃষ্টি-সঞ্চারণ পূর্ব্বক বলিলেন, অহে হেমকূটবাসী বণিক! তুমি, প্রতিষ্ঠিত বিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছ, এই অপরাধে আমি তোমার পাঁচ সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিলাম; যদি অবিলম্বে এই দণ্ড দিতে না পার, সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক।

অধিরাজের আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে আমার প্রাণদণ্ড করুন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কাতর নহি। আমি অহর্নিশ দুর্বিষহ যাতনাভোগ করিতেছি; মৃত্যু হইলে পরিত্রাণ বোধ করিব। কিন্তু, মহারাজ! যথার্থ বিচার করিলে আমার দণ্ড হইতে পারে না। সাত বৎসর অতীত হইল, আমি জন্মভূমিপরিত্যাগ করিয়া দেশপর্য্যটন করিতেছি। যৎকালে হেমকূট হইতে প্রস্থান করি, উভয় রাজ্যের পরস্পর বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। এক্ষণে পরস্পর যে বিরোধ ঘটিয়াছে, এবং ঐ উপলক্ষে উভয় রাজ্যে যে এরূপ কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি অবগত

নহি। যদি প্রচারিত নিয়মের বিশেষজ্ঞ হইয়া আপনকার অধিকারে প্রবেশ করিতাম, তাহা হইলে আমি অবশ্য অপরাধী হইতাম।

এই সকল কথা শ্রবণগোচর করিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, শুন, সোমদত্ত! জয়স্থলের প্রচলিত বিধির সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিয়া চলিব, কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না, ধর্ম্মপ্রমাণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি অধিরাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। সুতরাং জয়স্থলে হেমকূটবাসী লোকদিগের পক্ষে যে সমস্ত বিধি প্রচলিত আছে, আমি প্রাণান্তেও তাহার বিপরীত আচরণ করিতে পারিব না। জয়স্থলের কতিপয় পোতবণিক্ দুই রাজ্যের বিরোধ ও অভিনব বিধি-প্রচলনের বিষয় কিছুমাত্র অবগত ছিল না। তাহারাও তোমার মত না জানিয়া হেমকূটের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিল। তোমাদের অধিরাজ নব-প্রবর্ত্তিত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ তাহাদের অর্থদণ্ডবিধান করেন। অর্থদণ্ডপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে অবশেষে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। এই নৃশংস ঘটনা জয়স্থলবাসীদের অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ জাগরূক রহিয়াছে। এ অবস্থায় আমি প্রচলিত বিধির লঙ্ঘন পূর্ব্বক তোমার প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারিব না। অবিলম্বে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিতে পারিলে তুমি অক্ষত শরীরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পার। কিন্তু আমি তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না, কারণ, তোমার সমভিব্যাহারে যাহা কিছু আছে; সমুদয়ের মূল্য উর্দ্ধ-সংখ্যায় দুই শত মুদ্রার অধিক হইবেক না। সুতরাং সায়ংকালে তোমার প্রাণদণ্ড একপ্রকার অবধারিত বলিতে হইবেক।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া সোমদত্ত অক্ষুব্ধচিত্তে বলিলেন, মহারাজ! আমি যে দুঃসহ দুঃখপরম্পরার ভোগ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার অণুমাত্রও প্রাণের মায়া নাই। আপনার নিকট অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, এক ক্ষণের জন্যেও আমি বাঁচিতে ইচ্ছা করি না। আপনি সায়ংকালের কথা কি বলিতেছেন, এই মুহূর্ত্তে প্রাণবিয়োগ হইলে আমার নিস্তার হয়।

ঈদৃশ আক্ষেপবাক্যের শ্রবণে অধিরাজের অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুকম্পা ও কৌতুহল উদ্ভূত হইল। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সোমদত্ত! কি কারণে তুমি মরণকামনা করিতেছ; কি হেতুতেই বা তুমি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত সাত বৎসর কাল দেশপর্য্যটন করিতেছ; কি উপলক্ষেই বা তুমি অবশেষে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়াছ, বল। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! আমার অন্তর নিরন্তর দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইতেছে; জন্মভূমি পরিত্যাগের ও দেশপর্য্যটনের কারণ নির্দেশ করিতে গেলে আমার শোকানল শতগুণ প্রবল

হইয়া উঠিবেক। সুতরাং আপনকার আদেশপ্রতিপালন অপেক্ষা আমার পক্ষে অধিকতর আন্তরিক ক্লেশকর ব্যাপার আর কিছুই ঘটিতে পারে না। তথাপি আপনকার সন্তোষার্থে সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্তবর্ণন করিতেছি। তাহাতে আমার এক মহৎ লাভ হইবেক। সকল লোকে জানিতে পারিবেক, আমি কেবল পরিবারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া এই অবান্ধব দেশে রাজদণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতেছি; আমার এই প্রাণদণ্ড কোনও গুরুতর অপরাধ নিবন্ধন নহে।

মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি হেমকূটনগরে জন্মগ্রহণ করি। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে লাবণ্যময়ীনাম্নী এক সুরূপা রমণীর পাণিগ্রহণ করিলাম। লাবণ্যময়ী যেমন সৎকুলোৎপন্না, তেমনই সদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। উভয়ের সহবাসে উভয়েই পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিলাম। মলয়পুরে আমার বহুবিস্তৃত বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থাগম হইতে লাগিল। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হইত, অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে পারিতাম। মলয়পুরে আমার যিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তত্রত্য কার্য্য সকল সাতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। শুনিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলাম, এবং সহধর্ম্মিণীকে গৃহে রাখিয়া মলয়পুরপ্রস্থান করিলাম। ছয় মাস অতীত না হইতেই, লাবণ্যময়ী বিরহবেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনধিক কালের মধ্যেই অন্তর্বত্নী হইয়া যথাকালে দুই সুকুমার যমজ কুমার প্রসব করিলেন। কুমারযুগলের অবয়বগত অণুমাত্র বৈলক্ষণ্য ছিল না। উভয়েই সর্ব্বাংশে এরূপ একাকৃতি যে, উভয়ের ভেদগ্রহ কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। আমরা যে পান্থনিবাসে অবস্থিতি করিতাম, তথায় সেই দিনে সেই সময়ে এক দুঃখিনী নারীও সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ তনয় প্রসব করে। উহাদের প্রতিপালন করা অসাধ্য ভাবিয়া সে আমার নিকটে আসিয়া ঐ দুই যমজ সন্তানের বিক্রয়ের প্রস্তাব করিল। উত্তরকালে উহারা দুই সহোদরে আমার পুত্রদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিবেক, এই অভিপ্রায়ে আমি ক্রয় করিয়া পুত্রনির্বিশেষে উহাদের প্রতি-পালন করিতে লাগিলাম। যমজেরা সর্ব্বাংশে একাকৃতি বলিয়া এক নামে এক এক যমজের নামকরণ করিলাম; পুত্রযুগলের নাম চিরঞ্জীব, ক্রীত শিশুযুগলের নাম কিঙ্কর রাখিলাম।

কিছু কাল গত হইলে আমার সহধর্ম্মিণী হেমকূটপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া সর্বদা উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। আমি অবশেষে নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক সম্মত হইলাম। অল্প দিনের মধ্যেই চারি শিশু

সমভিব্যাহারে আমরা অর্ণবপোতে আরোহণ করিলাম। মলয়পুর হইতে যোজনমাত্র গমন করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল; প্রবল বেগে প্রচণ্ড বাত্যা বহিতে লাগিল; সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। আমরা জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া প্রতি ক্ষণেই মৃত্যুপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমার সহধর্ম্মিণী সাতিশয় আর্ত্ত স্বরে হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া দুই তনয় ও দুই ক্রীত বালক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বাষ্পাকুল লোচনে অতি কাতর বচনে মুহুর্মুহুঃ বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমরা মরি, তাহাতে কিছুমাত্র খেদ নাই, যাহাতে দুটি সন্তানের প্রাণরক্ষা হয়, তাহার কোনও উপায় কর।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্ণবপোত মগ্নপ্রায় হইল। নাবিকেরা পোতরক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিল, এবং অর্ণবপোতে যে কয়খানি ক্ষুদ্র তরী ছিল, তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। তখন আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক উপায় স্থির করিলাম। অবর্ণপোতে দুটি অতিরিক্ত গুণবৃক্ষ ছিল; একের প্রান্তভাগে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ ক্রীত শিশুর, অপরটির প্রান্তভাগে কনিষ্ঠ পুত্রের ও ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশুর বন্ধন পূর্ব্বক, আমরা স্ত্রী পুরুষের একৈকের অপর প্রান্তভাগে এক এক জন করিয়া আপনাদিগকে বদ্ধ করিলাম। দুই গুণবৃক্ষ স্রোতের অনুবর্ত্তী হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। বোধ হইল, আমরা কর্ণপুর অভিমুখে নীত হইতেছি। কিয়ৎ ক্ষণ পরে সূর্য্যদেবের আবির্ভাব ও বাত্যার তিরোভাব হইল। তখন দেখিতে পাইলাম, দুই অর্ণবপোত অতি বেগে আমাদের দিকে আসিতেছে। বোধ হইল, আমাদের উদ্ধরণের জন্যই উহারা ঐ রূপে আসিতেছিল। তন্মধ্যে, এক খানি কর্ণপুরের, অপর খানি উদয়নগরের। এ পর্য্যন্ত দুই গুণবৃক্ষ পরস্পর অতি সন্নিহিত ছিল; কিন্তু, উল্লিখিত পোতদ্বয় আমাদের নিকটে আসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আকস্মিক-বায়ুবেগবশে পরস্পর অতিশয় দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। আমি এক দৃষ্টিতে অপর গুণবৃক্ষের নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম, কর্ণপুরের পোতস্থিত লোকেরা বন্ধনমোচন পূর্ব্বক আমার গৃহিণী পুত্র, ও ক্রীত শিশুকে অর্ণবগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিল। কিঞ্চিৎ পরেই অপর পোত আসিয়া আমাদের তিন জনের উদ্ধরণ করিল। এই পোতের লোকেরা যেরূপ সুহৃদ্ভাবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, অপর পোতের লোকেরা সেরূপ নহেন, ইহা বুঝিতে

পারিয়া আমাদের উদ্ধারকেরা আমার গৃহিণী ও শিশুদ্বয়ের উদ্যুক্ত হইলেন; কিন্তু অপর পোত অধিকতর বেগে যাইতেছিল, সুতরাং ধরিতে পারিলেন না। তদবধি আমি পুত্র ও প্রেয়সীর সহিত বিযোজিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই—

এই কথা বলিতে বলিতে সোমদত্তের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! দৈববিড়ম্বনায় তোমাব যে শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় অতিশয় শোকাকুল হইতেছে; ক্ষমতা থাকিলে, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিতাম। সে যাহা হউক, তৎপরে কি কি ঘটনা হইল, সমুদয় শুনিবার নিমিত্তে আমার চিত্তে নিরতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিতেছে, সবিস্তর বর্ণন করিলে আমি অনুগৃহীত বোধ করিব।

সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! তারপরে কিছু দিনের মধ্যেই, কনিষ্ঠ তনয় ও কনিষ্ঠ ক্রীত শিশু সমভিব্যাহারে নিজ আগারে প্রতিগমন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া, শিশুযুগলের লালন পালন করিতে লাগিলাম। বহুকাল অতীত হইয়া গেল, কিন্তু গৃহিণী ও অপর শিশুযুগলের কোন সংবাদ পাইলাম না। কনিষ্ঠ পুত্রটির যত জ্ঞান হইতে লাগিল, ততই সে জননী ও সহোদরের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল। আমার নিকটে স্বকৃত জিজ্ঞাসার যে উত্তর পাইত, তাহাতে তাহার সন্তোষ জন্মিত না অবশেষে, অষ্টাদশবর্ষ বয়সে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া আমার অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পবিচারিকা সমভিব্যাহারে সে তাহাদের উদ্দেশার্থে প্রস্থান করিল। পুত্রটি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল; এজন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না। তৎকালে এই আশঙ্কা হইতে লাগিল, এ জন্মে যে গৃহিণী ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত সমাগম হইবেক, তাহার আর প্রত্যাশা নাই; আমার যেরূপ অদৃষ্ট, হয় ত এই অবধি ইহাকেও হারাইলাম। মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আমার তাহাই ঘটিয়া উঠিল। দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি কনিষ্ঠ পুত্র প্রত্যাগমন করিল না। আমি তাহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম; পাঁচ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিলাম; কিন্তু কোনও স্থানেই কিছুমাত্র সন্ধান পাইলাম; না। পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া হেমকূট অভিমুখে গমন করিতেছিলাম জয়স্থলের উপকূল দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে মনে ভাবিলাম, এত দেশে পর্য্যটন করিলাম, এই স্থনেটি অবশিষ্ট থাকে কেন। এখানে যে তাহাকে

দেখিতে পাইব, তাহারে কিছুমাত্র আশা ছিল না; কিন্তু না দেখিয়া চলিয়া যাইতেও কোনও মতে ইচ্ছা হইল না। এইরূপে জয়স্থলে উপস্থিত হইয়া কিয়ৎ ক্ষণ পরেই ধৃত ও মহারাজের সম্মুখে আনীত হইয়াছি। মহারাজ! আজ সায়ংকালে আমরা সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। যদি, প্রেয়সী ও তনয়েরা জীবিত আছে, ইহা শুনিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে আর আমার কোনও ক্ষোভ থকে না।

সোমদত্তের আখ্যানশ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন, সোমদত্ত! আমার বোধ হয়, তোমার মত হতভাগ্য ভূমণ্ডলে আর নাই। অবিচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগে কালহরণ করিবার নিমিত্তই তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণগোচর করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যদি ব্যবস্থাপিত বিধির উল্লঙ্ঘন না হইত, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতাম। জয়স্থলের প্রচলিত বিধি অনুসারে তোমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে; যদি অনুকম্পার বশবর্তী হইয়া ঐ ব্যবস্থা রহিত করি, তাহা হইলে আমি চিরকালের জন্য জয়স্থলসমাজে যার পর নাই হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইব। তবে, আমার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে তাহা করিতেছি। তোমাকে সায়ংকাল পর্য্যন্ত সময় দিতেছি; এই সময়ের মধ্যে যদি কোনও রূপে পাঁচ সহস্র মুদ্রার সংগ্রহ করিতে পার, তোমার প্রাণরক্ষা হইবেক, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য। অনন্তর তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, তুমি সোমদত্তকে যথাস্থানে সাবধানে রাখ। কারাধ্যক্ষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, সোমদত্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল।

কর্ণপুরের লোকেরা কুবলপুরের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত বিখ্যাত বীর বিজবর্ম্মার নিকট, চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে বেচিয়াছিল। তৎপরে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে বিজয়বর্ম্মা নিজ ভ্রাতৃপুত্র বিজয়বল্লভের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে এত ভাল বাসিতেন যে, ক্ষণকালের জন্যেও তাহাদিগকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না। সুতরাং জয়স্থলপ্রস্থানকালে তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। ঐ দুই বালককে দেখিয়া ও তাহাদের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত শুনিয়া বিজয়বল্লভের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া উপস্থিত হয়, এবং দিন দিন তাহাদের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহসঞ্চার হইতে থাকে। পিতৃব্যের প্রস্থান-সময় সমাগত হইলে, ভ্রাতৃব্য সবিশেষ আগ্রহপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বালকদ্বয়ের প্রাপ্তিবাসনা জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে বিজয়বর্ম্মা তদীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করেন। অভিপ্রেতলাভে সাতিশয়

আহ্লাদিত হইয়া বিজয়বল্লভ পরম যত্নে চিরঞ্জীবের লালন পালন করিতে লাগিলেন; এবং, সে বিষয়কার্য্যের উপযোগী বয়স্ প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে এক কালে সেনাসংক্রান্ত উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চিরঞ্জীব প্রত্যেক যুদ্ধেই বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা, অকুতোভয়তা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয়প্রদান করিতে লাগিলেন। একদা বিজয়বল্লভ একাকী বিপক্ষমণ্ডলে এরূপে বেষ্টিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল; সে দিন কেবল চিরঞ্জীবের বুদ্ধিকৌশলে ও সাহসগুণে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়। বিজয়বল্লভ যার পর নাই প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তদবধি তাঁহার প্রতি পুত্রবাৎসল্যপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে, জয়স্থলবাসী এক শ্রেষ্ঠী, অতুল ঐশ্বর্য এবং চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী নামে দুই পরম সুন্দরী কন্যা রাখিয়া পরলোকযাত্রা করেন। মৃত্যুকালে তিনি অধিরাজ বিজয়বল্লভের হস্তে স্বীয় সমস্ত বিষয়ের ও কন্যাদ্বিতয়ের রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত ভারপ্রদান করিয়া যান। বিজয়বল্লব শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠা কন্যা চন্দ্রপ্রভার সহিত চিরঞ্জীবের বিবাহ দিলেন। চিরঞ্জীব এই অসম্ভাবিত পরিণয়সংঘটন দ্বারা এক কালে এক সুরূপা কামিনীর পতি ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইলেন। এইরূপে তিনি বিজয়বল্লভের স্নেহগুণে ও অনুগ্রহবলে জয়স্থলে গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন, এবং স্বভাবসিদ্ধ দয়া, সৌজন্য, ন্যায়পরতা, ও অমায়িক ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের স্নেহপাত্র ও সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

চিরঞ্জীব অতি শৈশবকালে পিতা, মাতা, ও ভ্রাতার সহিত বিয়োজিত হইয়াছিলেন; তৎপরে আর কখনও তাঁহাদের কোনও সংবাদ পান নাই। সুতরাং, জগতে তাঁহার আপনার কেহ আছে বলিয়া কিছুমাত্র বোধ ছিল না। তিনি শৈশবকালের সকল কথাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন; সমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলেন, কোন রূপে প্রাণরক্ষা হইয়াছে, কেবল এই বিষয়টির অনতিপরিস্ফুট স্মরণ ছিল। জয়স্থলে তাঁহার আধিপত্যের সীমা ছিল না। যদি তিনি জানিতে পারিতেন, সোমদত্ত তাহার জন্মদাতা, তাহা হইলে সোমদত্তকে এক ক্ষণের জন্যেও রাজদণ্ডে নিগ্রহভোগ করিতে হইত না।

যে দিবস সোমদত্ত জয়স্থলে উপস্থিত হন, কনিষ্ঠ চিরঞ্জীবও সেই দিবস স্বকীয় পরিচারক কনিষ্ঠ কিঙ্কর সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইয়াছিলেন। তিনিও স্বীয় পিতার ন্যায় ধৃত, বিচারালয়ে নীত, ও রাজদণ্ডে নিগৃহীত হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। দৈবযোগে, এক বিদেশীয় বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি বলিলেন, বয়স্য! তুমি এ দেশে আসিয়াছ কেন? কিছু দিন হইল,

জয়স্থলে হেমকূটবাসীদিগের পক্ষে ভয়ানক নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তুমি হেমকূটবাসী বলিয়া কোন ক্রমে কাহারও নিকট পরিচয় দিও না। মলয়পুর তোমার জন্মস্থান এবং সে স্থানে তোমাদের বহুবিস্তৃত বাণিজ্য আছে; কেহ জিজ্ঞাসা করিলে মলয়পুরবাসী বলিয়া পরিচয় দিবে। অত্রত্য লোকে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইলে নিঃসন্দেহ তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক। হেমকূটবাসী এক বৃদ্ধ বণিক্ আজ জয়স্থলে আসিয়াছিলেন। অধিরাজের আদেশক্রমে, সূর্য্যদেবের অস্তাচল-চূড়ায় অধিরোহণ করিবার পুর্ব্বেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবেক। অতএব, যত ক্ষণ এখানে থাকিবে, সাবধানে চলিবে। আর আমার নিকট যাহা রাখিতে দিয়াছিলে, লও।

এই বলিয়া তিনি স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি চিরঞ্জীবের হস্তে প্রত্যর্পিত করিলেন। তিনি তাহা স্বকীয় পরিচারকের হস্তে দিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া পান্থনিবাসে প্রতিগমন কর; অতি সাবধানে রাখিবে, কোন ক্রমে কাহারও হস্তে দিবে না। এখনও আমাদের আহারের সময় হয় নাই, প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব আছে; এই সময় মধ্যে নগরদর্শন করিয়া আমিও পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছি। তুমি যাও, আর দেরি করিও না। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব সেই বৈদেশিক বন্ধুকে বলিলেন, বয়স্য! কিঙ্কর আমার চিরসহচর ও যার পর নাই বিশ্বাসভাজন। উহার বিশেষ এক গুণ আছে; আমি যখন দুর্ভাবনায় অভিভূত হই, তখন ও পরিহাস করিয়া আমার চিত্তের অপেক্ষাকৃত সাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করে। এক্ষণে চল, দুই বন্ধুতে নগর দেখিতে যাই; তৎপরে উভয়ে পান্থনিবাসে এক সঙ্গে আহারাদি করিব। তিনি বলিলেন, আজ এক বণিক্ আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; অবিলম্বে তদীয় আলয়ে যাইতে হইবেক। তাহার নিকট আমার উপকারের প্রত্যাশা আছে। অতএব আমায় মাপ কর, এখন আমি তোমার সঙ্গে যাইতে পারিব না; অপরাহ্ণে নিঃসন্দেহ সাক্ষাৎ করিব এবং শয়নের সময় পর্য্যন্ত তোমার নিকটে থাকিব। এই বলিয়া সে ব্যক্তি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব একাকী নগরদর্শনে নির্গত হইলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অতি প্রত্যূষে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন; আহারের সময় উপস্থিত হইল তথাপি প্রতিগমন করিলেন না। তাহার গৃহিণী চন্দ্রপ্রভা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া কিঙ্করকে আহ্বান করিয়া বলিলেন; দেখ, কিঙ্কর! এত বেলা হইল, তথাপি তিনি গৃহে আসিতেছেন না। বোধ করি, কোনও গুরুতর কার্য্যে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাহাতেই আহারের সময় পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তুমি যাও, সত্বর তাহাকে ডাকিয়া আন; দেখিও,

যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়; তাঁহার জন্তে সকলকার আহারবন্ধ। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল, এবং কিয়ৎ ক্ষণ পরেই নগরদর্শনে ব্যাপৃত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে সত্বর গমনে তাহার সন্নিহিত হইতে লাগিল।

চিরঞ্জীবযুগল ও কিঙ্করযুগল জন্মকালে যেরূপ সর্ব্বাংশে একাকৃতি হইয়া ছিলেন, এখনও তাহারা অবিকল সেইরূপ ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি বা অবস্থাভেদ নিবন্ধন কোনও অংশে আকৃতির কিছুমাত্র বিভিন্নতা ঘটে নাই। সুতরাং, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্করের যেমন স্বীয় প্রভু বলিয়া বোধ জন্মিয়াছিল, জয়স্থলবাসী কিঙ্কর সন্নিহিত হইবামাত্র তাহাকে দেখিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবেরও তেমনি স্বীয় পরিচারক বলিয়া বোধ জন্মিল; সে যে তাহার সহচর কিঙ্কর নয়, তিনি তাহার কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তদনুসারে তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি হে, তুমি সত্বর আসিলে কেন? সে বলিল, এত সত্বর আসিলে; কেমন; বরং এত বিলম্বে আসিলে কেন, বলুন। বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল, আপনি এ পর্য্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক ক্ষণ আহারসামগ্রী প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে এবং ক্রমে শীতল হইয়া যাইতেছে। আহারসামগ্রী যত শীতল হইতেছে, কর্ত্রী ঠাকুরাণী তত উষ্ণ হইতেছেন। আহারসামগ্রী শীতল হইতেছে, কারণ আপনি গৃহে যান নাই, আপনি গৃহে যান নাই, কারণ আপনকার ক্ষুধা নাই; আপনকার ক্ষুধা নাই, কারণ আপনি বিলক্ষণ জলযোগ করিয়াছেন, কিন্তু আপনকার অনুপস্থিতি জন্য আমরা অনাহারে মারা পড়িতেছি।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ভাবিলেন, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে। তখন কিঞ্চিৎ বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! আমি এখন তোমার পরিহাসরসের অভিলাষী নহি; তোমার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, কাহার নিকট রাখিয়া আসিলে বল। সে চকিত হইয়া বলিল সে কি, আপনি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তে কখন দিলেন? কেবল বুধবার দিন চর্ম্মকারকে দিবার জন্য চারি আনা দিয়েছিলেন, সেই দিনেই তাহাকে দিয়াছি, আমার নিকটে রাখি নাই; চর্ম্মকার কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঘোড়ার সাজ মেরামত করিয়াছিল। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! এ পরিহাসের সময় নয়; যদি ভাল চাও, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিলে, বল। আমরা ঘটনাক্রমে নিতান্ত অপরিচিত অবান্ধব দেশে আসিয়াছি,

কি সাহাসে কোন্ বিবেচনায় তত স্বর্ণমুদ্রা অপরের হস্তে দিলে? কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আপনি আহারে বসিয়া পরিহাস করিবেন, আমরা আহ্লাদিত চিত্তে শুনিব। এখন আপনি গৃহে চলুন; কর্ত্রী ঠাকুরাণী সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন; বিলম্ব হইলে কিংবা আপনারে না লইয়া গেলে, আমার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবেক না; হয় ত প্রহার পর্য্যন্ত হইয়া যাইবেক।

চিরঞ্জীব নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! তুমি বড় নির্বোধ, যত আমায় ভাল লাগিতেছে না, ততই তুমি পরিহাস করিতেছ; বারংবার বারণ করিতেছি, তথাপি ক্ষান্ত হইতেছে না; দেখ, সময়ে সকলই ভাল লাগে; অসময়ে অমৃতও বিস্বাদ ও বিষতুল্য বোধ হয়। যাহা হউক, আমি তোমার হস্তে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছি, তাহা কোথায় রাখিলে, বল। কিঙ্কর বলিল, না মহাশয়! আপনি আমার হস্তে কখনই স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন কিঙ্কর! আজ তোমার কি হইয়াছে বলিতে পারি না। পাগলামির চূড়ান্ত হইয়াছে, আর নয়, ক্ষান্ত হও। বল, স্বর্ণমুদ্রা কোথায় কাহার নিকটে রাখিয়া আসিলে। সে বলিল, মহাশয়! এখন স্বর্ণমুদ্রার কথা রাখুন। আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দিয়া থাকেন, পরে বুঝাইয়া লইবেন; সে জন্যে আমার তত ভাবনা নাই। কিন্তু, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আজ কাল অতিশয় উগ্রচণ্ডা হইয়াছেন, তাঁহার ভয়েই আমি হইতেছি। তিনি সত্বর আপনাকে বাটীতে লইয়া যাইতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনারে লইয়া না গেলে আমার লাঞ্ছনার একশেষ ঘটিবেক। অতএব, বিনয় করিয়া বলিতেছি, সত্বর গৃহে চলুন। তিনি ও তাঁহার ভগিনী নিতান্ত আকুল চিত্তে আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, আরে দুরাত্মন্! তুমি পুনঃ পুনঃ কর্ত্রী ঠাকুরাণী উল্লেখ করিতেছ; তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী কে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিঙ্কর বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আপনকার সহধর্ম্মিণীকে আমরা সকলেই কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া থাকি; তিনি ভিন্ন আর কাহাকে কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিব? তিনিই আমায় আপনাকে গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পাঠাইয়াছেন। চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না; আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, নিঃসন্দেহ তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতে না। আমি কবে কোন্ কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছি যে, তুমি বারংবার আমার সহধর্ম্মিণীর উল্লেখ করিতেছ। এখানে আমার বাটী

কোথায় যে, আমায় বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতেছ। কিঙ্কর শুনিয়া হাস্যমুখে বলিল, মহাশয়! যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আপনারই বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, আপনিই উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় কথা কহিতেছেন; এ সকল কথা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি আপনাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিবেন; তখন, এখানে আপনকার বাটী আছে কি না, এবং কখনও কোনও কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন কি না, অক্লেশে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক; আপনি হঠাৎ কেমন করিয়া এমন রসিক হইয়া উঠিলেন বলুন। চিরঞ্জীব, আর সহ্য করিতে না পারিয়া, এই তোমার পাগলামির ফলভোগ কর এই বলিয়া, তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিঙ্কর হতবুদ্ধি হইয়া বলিল মহাশয়! অকারণে প্রহার করেন কেন; আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আপনকার ইচ্ছা হয়, বাটীতে যাইবেন, ইচ্ছা না হয়, না যাইবেন; যাঁহার কথায় আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম, তাঁহার নিকটেই চলিলাম।

ইহা বলিয়া কিঙ্কর প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, বোধ হয়, কোনও ধূর্ত্ত কৌশল করিয়া কিঙ্করের নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাগুলি হস্তগত করিয়াছে, তাহাতেই ভয়ে উহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; নতুবা পূর্ব্বাপর এত প্রলাপবাক্যের উচ্চারণ করিবেক কেন? প্রকিতিস্থ ব্যক্তি কখনও এরূপ অসম্বন্ধ কথা বলে না, হয় ত হতভাগ্য উন্মাদগ্রস্ত হইল। সকলে বলে, জয়স্থলে ইন্দ্রজালিকবিদ্যা বিলক্ষণ প্রচলিত, এখানকার লোকে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেশে চলে যে, উহাদিগকে কোনও মতে চিনিতে পারা যায় না; উহারা দুর্বিগাহ মায়াজাল বিস্তৃত করিয়া বৈদেশিক লোকের ধনে প্রাণে উচ্ছেদসাধন করে। শুনিতে পাই, এখানকার কামিনীরা নিতান্ত মায়াবিনী, বৈদেশিক পুরুষদিগকে অনায়াসে মুগ্ধ করিয়া ফেলে; এক বার মোহজালে বদ্ধ হইলে আর নিস্তার নাই। আমি এখানে আসিয়া ভাল করি নাই; শীঘ্র পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। আর আমারা নগরদর্শনের আমোদে কাজ নাই; পান্থনিবাসে যাই, এবং যাহাতে অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করি। এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা উচিত নহে।

চিরঞ্জীব, এই বলিয়া নগরদর্শনকৌতুকে বিসর্জ্জন দিয়া, আকুল মনে সত্বরগমনে পান্থনিবাসের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিঙ্করকে চিরঞ্জীবের অন্বেষণে প্রেরণ করিরা চন্দ্রপ্রভা স্বীয় সহোদরাকে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনি! দেখ, প্রায় চারি দণ্ড হইল কিঙ্করকে তাঁহার অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছি; না এ পর্য্যন্ত তিনিই আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল; ইহার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিলাসিনী বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, কোনও স্থানে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তথায় আহার করিয়াছেন। অতএব আর তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই; চল. আমরা আহার করি। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আর, তোমায় একটি কথা বলি, তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইলে তুমি এত বিষণ্ণ হও কেন, এবং কি জন্যই বা এত আক্ষেপ কর? পুরুষেরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ; স্ত্রীজাতিকে তাঁহাদের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে হয়। পুরুষজাতির রোষের বা অসন্তোষের ভয়ে স্ত্রীজাতিকে যত সঙ্কুচিত ও যত সাবধান হইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে হয়; পুরুষজাতিকে যদি সে রূপে চলিতে হইত, তাহা হইলে স্ত্রাজাতির সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। স্ত্রীজাতি নিতান্ত পরাধীন; সুতরাং তাহাদিগকে অনেক সহ্য করিয়া কালহরণ করিতে হয়। তাহাদের অভিমান করা বৃথা।

শুনিয়া সাতিশয় রোশবশা হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, স্ত্রীজাতি অপেক্ষা পুরুষজাতির স্বাতন্ত্র্য অধিক হইবেক কেন, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। বিবেচনা করিয়া দেখিল স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরই সমান স্বাতন্ত্র্য আছে; সে বিষয়ে ইতরবিশেষ হইবার কোনও কারণ নাই। তিনি আপন ইচ্ছামতে চলিবেন, আমি আপন ইচ্ছামতে চলিতে পারিব না কেন? বিলাসিনী বলিলেন. কারণ, তাঁহার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার বন্ধনশৃঙ্খলাস্বরূপ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, গো গর্দ্দভ ব্যতিরিক্ত কে ওরূপ শৃঙ্খলাবন্ধন সহ্য করিবেক? বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! তুমি না বুঝিয়া এরূপ উদ্ধত ভাবে কথা কহিতেছ। স্ত্রীজাতির অসদৃশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পরিণামে নিরতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠে। জলে, স্থলে, নভোমণ্ডলে, যেখানে দৃষ্টিপাত কর, স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য দেখিতে পাইবে না; কি জলচর, কি স্থলচর, কি নভশ্চর, জীবমাত্রেই এই নিয়মের অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকে।

এই সকল কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর সস্মিত বদনে পরিহাসবচনে বলিলেন, এই পরাধীনতার ভয়েই বুঝি তুমি বিবাহ করিতে চাও না। বিলাসিনীও হাস্যমুখে উত্তর দিলেন, হাঁ, ও এক কারণ বটে; তদ্ভিন্ন, বিবাহিত অবস্থায় অন্যবিধ নানা অসুবিধা আছে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার বোধ হয়, তুমি বিবাহিতা হইলে পুরুষের আধিপত্য ও অত্যাচার অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে। বিলাসিনী বলিলেন, পুরুষের অভিপ্রায় বুঝিয়া চলিতে বিলক্ষণ রূপে অভ্যাস না করিয়া আমি বিবাহ করিব না। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিলেন, ভগিনি! যত অভ্যাস কর না কেন, কখনই অবিরক্ত চিত্তে সংসারধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবে না। পুরুষের পদে পদে অত্যাচার; কত সহ্য করিবে, বল তুমি পুরুষের আচরণের বিষয়ে সবিশেষ জান না, এজন্য ওরূপ বলিতেছ; যখন ঠেকিবে, তখন শিখিবে; এখন মুখে ওরূপ বলিলে কি হইবেক। বিশেষতঃ পরের বেলায় আমরা উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু, আপনার বেলায় বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে, তখন বিবেচনাও থাকে না, সহিষ্ণুতাও থাকে না। তুমি এখন আমায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিতেছ, কিন্তু যদি কখনও বিবাহ কর, আমার মত অবস্থায় কত ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া চল, দেখিব।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে কিঙ্কর বিষণ্ণ বদনে তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি যে একাকী আসিলে; তোমার প্রভু কোথায়? তাঁহার দেখা পাইয়াছ কি না, কত ক্ষণে গৃহে আসিবেন, বলিলেন। কিঙ্কর বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমার বলিতে শঙ্কা হইতেছে, কিন্তু না বলিলে নয়, এজন্য বলিতেছি। আমি তাঁহাকে যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইল, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; তাঁহাতে উন্মাদের সম্পূর্ণ লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। আমি বলিলাম, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর আদেশে আমি আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি, ত্বরায় গৃহে চলুন, আহারের সময় বহিয়া যাইতেছে। তিনি আমায় দেখিয়া বিরক্তপ্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখিয়া আসিলে। পরে, আমি যত গৃহে আসিতে বলি, তিনি ততই বিরক্ত হইতে লাগিলেন, এবং, আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায়, বারংবার কেবল এইকথা বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আপনি এ পর্য্যন্ত গৃহে না যাওয়াতে কর্ত্রী ঠাকুরাণী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি সাতিশয় কুপিত হইয়া বলিলেন, তুই কর্ত্রী ঠাকুরাণী কোথায় পাইলি?

আমি তোর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে চিনি না; আমার স্বর্ণমুদ্রা কোথায় রাখলি, বল্।

এই কথা শুনিয়া. চকিত হইয়া, বিলাসিনী জিজ্ঞাসিলেন, কিঙ্কর! এ কথা কে বলিল। কিঙ্কর বলিল, কেন, আমার প্রভু বলিলেন; তিনি আরও বলিলেন, আমার বাটী কোথায়, আমার স্ত্রী কোথায়, আমি কবে বিবাহ করিয়াছি যে, কথায় কথায় আমার স্ত্রীর উল্লেখ করিতেছিস্। অবশেষে, কি কারণে বলিতে পারি না, ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমায় প্রহার করিলেন। এই বলিয়া সে স্বীয় কর্ণমূলে মুষ্টিপ্রহারের চিহ্ন দেখাইতে লাগিল। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি পুনরায় যাও, এবং যেরূপ পার তাঁহারে অবিলম্বে গৃহে লইয়া আইস। সে বলিল, আমি পুনরায় যাইব এবং পুনরায় মার খাইয়া গৃহে আসিব। বলিতে কি, আমি আর মার খাইতে পারিব না; আপনি আর কাহাকেও পাঠাইয়া দেন। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যদি তুমি না যাও, আমি তোমায় বিলক্ষণ শিক্ষা দিব; যদি ভাল চাও, এখনই চলিয়া যাও। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রহার করিয়া এখান হইতে তাড়াইবেন; তিনি প্রহার করিয়া সেখান হইতে তাড়াইবেন; আমার উভয় সঙ্কট, কোনও দিকেই নিস্তার নাই।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেলে পর, চন্দ্রপ্রভা ঈর্ষ্যাষায়িত লোচনে সরোষ বচনে বলিতে লাগিলেন, বিলাসিনি! তোমার ভগিনীপতির কথা শুনিলে। এত ক্ষণ আমায় কত বুঝাইতেছিলে, এখন কি বল। শুনিলে ত, তাঁহার বাটী নাই, তাঁহার স্ত্রী নাই, তিনি বিবাহ করেন নাই। আমি কিঙ্করকে পাঠাইয়াছিলাম, অকারণে তাহাকে প্রহার করা আমার উপর অবজ্ঞাপ্রদর্শন মাত্র। আমি ইদানীং তাঁহার চক্ষের শূল হইয়াছি। আমরা তাঁহার প্রতীক্ষায় এত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারেরহিয়াছি; তিনি অন্যত্র আমোদে কাল কাটাইতেছেন। তুমি যা বল, এখন তাঁহার উপর আমার বিলক্ষণ সন্দেহ হয়। আমি তাঁহার নিকট কি অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমি কিছুং তত রূপহীন বা গুণহীন নই যে, তিনি আমার প্রতি এত ঘৃণাপ্রদর্শন করিতে পারেন। অথবা কার দোষ দিব, সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।

ভগিনীর ভাবদর্শন করিয়া বিলাসিনী বলিলেন, দিদি! ঈর্ষ্যা স্ত্রীলোকের অতি বিষম শত্রু; ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তিনী হইলে স্ত্রীজাতিকে যাবজ্জীবন দুঃখভাগিনী হইতে হয়; অতএব এরূপ শত্রুকে অন্তঃকরণ হইতে এক বারে অপসারিত কর। এই কথা শুনিয়া যার পর নাই বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা

বলিলেন, বিলাসিনি! ক্ষমা কর, আর তোমার আমায় বুঝাইতে হইবেক না; এত অত্যাচার সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়। আমি তত নিরভিমান হইতে পারিব না যে, তাঁহার এরূপ আচরণ দেখিয়াও আমার মনে অসুখ জন্মিবেক না। ভাল, বল দেখি, যদি আমার প্রতি পূর্ব্বের মত অনুরাগ থাকিত, তিনি কি এত ক্ষণ গৃহে আসিতেন না; অকারণে কিঙ্করকে প্রহার করিয়া বিদায় করিতেন? তুমি ত জান, আজ কত দিন হইল এক ছড়া হার গড়াইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। সেই অবধি আর কখনও তাঁহার মুখে হারের কথা শুনিয়াছ? বলিতে কি, এত হতাদর হইয়া বাঁচা অপেক্ষা মরা ভাল। যেরূপ হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর যেরূপ হইবেক, তাহাতে আমার অদৃষ্টে কত কষ্টভোগ আছে বলিতে পারি না।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, আকুল হৃদয়ে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষকে কিঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন প্রায় চারি দণ্ড হইল, সে এখানে আসিয়াছে, এবং, আপনি তাহার হস্তে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছিলেন, তাহা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পরে অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব দেখিয়া সে এইমাত্র আপনকার অন্বেষণে গেল। এই কথা শুনিয়া সংশয়ারূঢ় হইয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, অধ্যক্ষ যেরূপ বলিলেন, তাহাতে আমি স্বর্ণমুদ্রা সহিত কিঙ্করকে আপণ হইতে বিদায় করিলে পর, তাহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ বা কথোপকথন হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু আমি তাহার সহিত কথোপকথন করিয়াছি, এবং অবশেষে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। অধ্যক্ষ বলিতেছেন, সে এই মাত্র পান্থনিবাস হইতে নির্গত হইয়াছে; এ কিরূপ হইল বুঝিতে পারিতেছি না। মনোমধ্যে তিনি এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিতে পাইবামাত্র চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! তোমার পরিহাসপ্রবৃত্তি নিবৃত্তি পাইয়াছে, অথবা সেইরূপই রহিয়াছে। তুমি মার খাইতে বড় ভাল বাস; অতএব আমার ইচ্ছা, তুমি আর খানিক আমার সঙ্গে পরিহাস কর। কেমন, আজ আমি তোমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দি নাই, তোমার কর্ত্রী ঠাকুরাণী আমায় লইয়া যাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন জয়স্থলে আমার বাস। তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নতুবা পাগলের মত আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে না। কিঙ্কর শুনিয়া চকিত হইয়া বলিল সে কি মহাশয়! আমি কখন আপনকার নিকট ও সকল কথা বলিলাম? চিরঞ্জীব বলিলেন, কিছু পূর্ব্বে, বোধ হয় এখনও আধ ঘণ্টা হয় নাই।

কিঙ্কর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, আপনি স্বর্ণমুদ্রার থলী আমার হাস্তে দিয়া এখানে পাঠাইলে পর, কই আপনকার সঙ্গে ত আর আমার দেখা হয় নাই। চিরঞ্জীব অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন, দুরাত্মন্! আর আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, বটে; তুমি বারংবার বলিতে লাগিলে, আপনি আমার হস্তে স্বর্ণমুদ্রা দেন নাই, কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়াছেন তিনি ও তাঁহার ভগিনী আপনকার অপেক্ষায় রহিয়াছেন, আহার করিতে পারিতেছেন না। পরিশেষে, সতিশয় রোষাক্রান্ত হইয়া আমি তোমায় প্রহার করিলাম।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিঙ্কর কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অবশেষে, চিরঞ্জীব কৌতুক করিতেছেন বিবেচনা করিয়া বলিল, মহাশয়! এত দিনের পর আপনকার যে পরিহাসে প্রবৃত্তি হইয়াছে, ইহাতে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, কিন্তু এ সময়ে এরূপ পরিহাস করিতেছেন কেন তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেছি না; অনুগ্রহ করিয়া তাহার কারণ বলিলে আমার সন্দেহ দূর হয়। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি পরিহাস করিতেছি, না তুমি পরিহাস করিতেছ; আজ তোমার দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে; তখন যৎপরোনাস্তি বিরক্ত করিয়াছ, এখন আবার বলিতেছ, আমি পরিহাস করিতেছি। এই তোমার দুর্ম্মতির ফলভোগ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রোধভরে বারংবার বিলক্ষণ প্রহার করিলেন।

এইরূপে প্রহার প্রাপ্ত হইয়া কিঙ্কর বলিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত প্রহার করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কোনও অপরাধ নাই; সকল অপরাধ আমার। ভৃত্যের সহিত প্রভুর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তাহা না করিয়া, আমি যে তোমার সঙ্গে সৌহৃদ্যভাবে কথা কই, এবং সময়ে সময়ে তোমার পরিহাস শুনিতে ভাল বাসি, তাহাতেই তোমার এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে। তোমার সময় অসময় বিবেচনা নাই। যদি আমার নিকট পরিহাস করিবার ইচ্ছা থাকে, আমি কখন কি ভাবে থাকি তাহা জান ও তদনুসারে চলিতে আরব্ধ কর, নতুবা প্রহার দ্বারা তোমার পরিহাসরোগের শাস্তি করিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি প্রভু, প্রহার করিলেন, করুন, আমি দাস, অনায়াসে সহ্য করিলাম; কিন্তু কি কারণে প্রহার করিলেন তাহা না বলিলে কিছুতেই ছাড়িব না। চিরঞ্জীব এই সময়ে দুটি ভদ্র স্ত্রীলোককে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! স্থির হও, এখন আর ও সকল কথা কহিও না; দুটি ভদ্রবংশের স্ত্রীলোক বোধ হয় আমার নিকটেই আসিতেছেন।

জয়স্থলের কিঙ্কর সত্বর প্রতিগমন না করাতে, চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় পতি চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন। ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে পান্থনিবাসে উপস্থিত হইয়া তিনি হেমকূটের চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাদিগকে জয়স্থলের চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর স্থির করিয়া নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব ইতঃপূর্ব্বেই স্বীয় ভৃত্য কিঙ্করের উপর অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিলক্ষণ যত্ন পাইলেন, তথাপি তদীয় উগ্রভাবের এক বারে তিরোভাব হইল না। চন্দ্রপ্রভা তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া অভিমানভরে বলিতে লাগিলেন, নাথ! আমায় দেখিলেই তোমার ভাবান্তর উপস্থিত হয়; তোমার বদনে রোষ ও অসন্তোষ বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। যাহারে দেখিলে সুখোদয় হয়, তাহার নিকটে কিছু এ ভাব অবলম্বন কর না। আমি এখন আর সে চন্দ্রপ্রভা নই, তোমার পরিণীতা বনিতাও নই। পূর্ব্বে, আমি কথা কহিলে তোমার কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইত; আমি দৃষ্টিপাত করিলে তোমার নয়নযুগল প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইত: আমি স্পর্শ করিলে তোমার সর্ব্ব শরীর পুলকিত হইত; আমি হস্তে করিয়া না দিলে উপাদেয় আহারসামগ্রীও তোমার সুস্বাদ বোধ হইত না। তখন আমা বই আর জানিতে না। আমি ক্ষণ কাল নয়নের অন্তরাল হইলে দশ দিক্ শূন্য দেখিতে। এখন সে সব দিন গত হইয়াছে। কি কারণে এ বিসদৃশ ভাবান্তর উপস্থিত হইল, বল। আমার নিতান্ত তোমাগত প্রাণ, তুমি বই এ সংসারে আমার আর কে আছে। তুমি এত নির্দয় হইলে আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। বিলাসিনীকে জিজ্ঞাসা কর, ইদানীং আমি কেমন মনের সুখে আছি। দুর্ভাবনায় শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, আমার উপর তোমার আর সে অনুরাগ নাই। যাহার ভাগ্য ভাল, এখন সে তোমার অনুরাগভাজন হইয়াছে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জীবন্মৃত হইয়া আছি। দেখ, আর নির্দয় হইও না; আর আমায় মর্ম্মান্তিক যাতনা দিও না। বিবেচনা কর, কেবল আমিই যে যন্ত্রণাভোগ করিব, এরূপ নহে; এ সকল কথা ব্যক্ত হইলে তুমিও ভদ্রসমাজে হেয় হইবে।

চন্দ্রপ্রভার আক্ষেপ ও অনুযোগ শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব হতবুদ্ধি হইলেন, এবং, কি কারণে অপরিচিত ব্যক্তিকে পতিসম্ভাষণ ও পতিকৃত অনুচিত আচরণের আরোপণ পূর্ব্বক, ভর্ৎসনা করিতেছে, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, কিছু

বলা আবশ্যক, নিতান্ত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা বিধেয় নহে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি বিস্ময়াকুল লোচনে মৃদু বচনে বলিলেন, অয়ি বরবর্ণিনি! আমি বৈদেশিক ব্যক্তি, জয়স্থলে আমার বাস নয়; এই সর্ব্বপ্রথম এ স্থানে আসিয়াছি, তাহাও চারি পাঁচ দণ্ডের অধিক নহে; ইহার পূর্ব্বে আমি আর কখনও তোমায় দেখি নাই; তুমি আমায় লক্ষ্য করিয়া যে সকল কথা বলিলে, তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিলাম না। বিলাসিনী শুনিয়া আশ্চর্য্যজ্ঞান করিয়া বলিলেন, ও কি হে, তুমি যে আমায় এক বারে অবাক্ করিয়া দিলে। হঠাৎ তোমার মনের ভাব এত বিপরীত হইল কেন? যা হউক ভাই! ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দিদির উপর তোমার এ ভাব দেখি নাই। দিদির অপরাধ কি? আহারের সময় বহিয়া যায়, এজন্য কিঙ্করকে তোমায় ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এই কথা বলিবামাত্র চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্করকে! কিঙ্করও চকিত হইয়া বলিল, কি আমাকে! তখন চন্দ্রপ্রভা কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ তোমাকে। তুমি উঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া বলিলে, তিনি প্রহার করিলেন; বলিলেন, আমার বাটী নাই, আমার স্ত্রী নাই, এখন আবার, যেন কিছুই জান না, এইরূপ ভান করিতেছ। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ কুপিত হইয়া কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কি এই স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথন করিয়াছিলে? সে বলিল, না মহাশয়! আমি উঁহার সঙ্গে কখন কথা কহিলাম? কথা কহা দূরে থাকুক, ইহার পূর্ব্বে আমি উঁহারে কখনও দেখি নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, দুরাত্মন্! তুমি মিথ্যা বলিতেছ; উনি যে সকল কথা বলিতেছেন, তুমি আপণে গিয়া আমার নিকট অবিকল ঐ সকল কথা বলিয়াছিলে। সে বলিল, না মহাশয়! আমি কখনও বলি নাই; জন্মাবচ্ছিন্নে আমি উঁহার সহিত কথা কই নাই। চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার সঙ্গে যদি দেখা ও কথা না হইবেক, উনি কেমন করিয়া আমাদের নাম জানিলেন।

চন্দ্রপ্রভা, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের ও কিঙ্করের কথোপকথন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া, আক্ষেপবচনে বলিতে লাগিলেন, নাথ! যদিই আমার উপর বিরাগ জন্মিয়া থাকে, চাকরের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এরূপে অপমান করা উচিত নহে। আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, এরূপ ছল করিয়া আমার এত লাঞ্ছনা করিতেছ। তুমি কখনই আমায় পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি যা ভাব না কেন, আমি তোমা বই আর জানি

না; যাবৎ এ দেহে প্রাণ থাকিবেক, তাবৎ আমি তোমার বই আর কারও নই। আমি জীবিত থাকিতে তুমি কখনও অন্যের হইতে পারিবে না। তুমি দিবাকর, আমি কমলিনী; তুমি শশধর, আমি কুমুদিনী; তুমি জলধর আমি সৌদামনী। তুমি পরিত্যাগ করিতে চাহিলেও আমি তোমায় ছাড়িব না। অতএব, আর কেন, গৃহে চল; কেন অনর্থক লোক হাসাইবে, বল।

এই সকল কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, এ কি বিপদ্ উপস্থিত! কেহ কখনও এমন বিপদে পড়ে না। এত পতিজ্ঞানে আমায় সম্ভাষণ করিতেছে। যেরূপ ভাবভঙ্গী দেখিতেছি, তাহাতে বৈদেশিক লোক পাইয়া পরিহাস করিতেছে, সেরূপও প্রতীতি হইতেছে না। আকার প্রকার দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, এ সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, সামান্যা কামিনী নহে। আমি নিতান্ত অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি, আমায় পতিজ্ঞানে সম্ভাষণ করে কেন? আমি কি নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি অথবা ভূতাবেশ বশতঃ আমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই এরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি। যাহা হউক, কোনও অনির্ণীত হেতু বশতঃ আমার দর্শন-শক্তির ও শ্রবণশক্তির সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। এখন কি উপায়ে এ বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাই?

এই সময়ে বিলাসিনী কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি সত্বর বাটীতে গিয়া ভৃত্যদিগকে সমস্ত প্রস্তুত করিতে বল, আমরা বাটীতে গিয়াই আহার করিতে বসিব। তখন কিঙ্কর চিরঞ্জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্থির লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি সবিশেষ না জানিয়া কোথায় আসিয়াছেন? এ বড় সহজ স্থান নহে। এখানকার সকলই মায়া, সকলই ইন্দ্রজাল। আমরা সহজে নিষ্কৃতি পাইব বোধ হয় না। যে রঙ্গ দেখিতেছি, প্রাণ বাঁচাইয়া দেশে যাইব, আমার আর সে আশা নাই। এই মানবরূপিণী ঠাকুরাণীরা যেরূপ মায়াবিনী, তাহাতে ইঁহাদের হস্ত হইতে সহজে নিস্তার পাইবেন, মনে করিবেন না। কি অশুভ ক্ষণেই এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যেরূপ দেখিতেছি, ইঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী হইয়া না চলিলে নিঃসংশয় প্রাণসংশয় ঘটিবেক। অতএব এমন স্থলে কি কর্ত্তব্য, স্থির করুন। কিঙ্করের এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিলাসিনী বলিলেন, অহে কিঙ্কর! তোমায় পরিহাসের অনেক কৌশল আইসে, তাহা আমরা বহু দিন অবধি জানি, আর তোমায় সে বিষয়ে নৈপুণ্য দেখাইতে হইবেক না; আমরা বড় আপ্যায়িত হইয়াছি।

এক্ষণে ক্ষান্ত হও, যা বলি, তা শুন। শুনিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয়! আমার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে; এখন কি করিবেন, করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, কেবল তোমার নয়, আমিও দেখিয়া শুনিয়া তোমার মত হতবুদ্ধি হইয়াছি। তখন চন্দ্রপ্রভা, চিরঞ্জীবের হস্তে ধরিয়া আর কেন, গৃহে চল; চাকর মনিবে মন্ত্রণা করিয়া আজ আমার যথেষ্ট লাঞ্ছনা করিলে। সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, আর বিলম্বে কাজ নাই। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে বল পূর্ব্বক গৃহে লইয়া চলিলেন। চিরঞ্জীব, অয়স্কান্তে আকৃষ্ট লৌহের ন্যায় নিতান্ত অনায়ত্ত হইয়া, আপত্তি বা অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীতে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা কিঙ্করকে বলিলেন, দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখ; যদি কেহ তোমার প্রভুর অনুসন্ধান করে, বলিবে, আজ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক না; এবং যে কেন হউক না, কাহাকেও কোনও কারণে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। অনন্তর চিরঞ্জীবকে বলিলেন, নাথ! আজ আমি তোমায় আর বাড়ীর বাহির হইতে দিব না; তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। চিরঞ্জীব দেখিয়া শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, আজ আমার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল। আমি পৃথিবীতে আছি, কি স্বর্গে রহিয়াছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত রহিয়াছি, প্রকৃতিস্থ আছি, কি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি; কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এক্ষণে কি করি; অথবা ইহাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলি, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই ঘটিবেক। তাঁহাকে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতে দেখিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! আমি কি দ্বারদেশে বসিয়া থাকিব? চিরঞ্জীব কোনও উত্তর দিলেন না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, দেখিও যেন কেহ বাটীতে প্রবেশ করিতে না পায়; ইহার অন্যথা হইলে আমি তোমার যৎপরোনাস্তি শাস্তি করিব। এই বলিয়া চিরঞ্জীবকে লইয়া তিনি অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

জয়স্থলবাসী কিঙ্কর, চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে দ্বিতীয় বার স্বীয় প্রভুর অন্বেষণে নির্গত হইয়া, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের বিপণিতে তাঁহার দর্শন পাইল এবং বলিল, মহাশয়! এখনও কি আপনকার ক্ষুধাবোধ হয় নাই; সত্বর বাটীতে

চলুন ; কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনকার জন্ম অস্থির হইয়াছেন। আপনি ইতঃপূর্ব্বে সাক্ষাৎকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, এবং অকারণে আমায় যে প্রহার করিয়াছিলেন, আমি সে সমস্ত তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আজ কখন তোমার সঙ্গে দেখা হইল, কখন বা তোমায় কি কথা বলিলাম, এবং কখনই বা তোমায় প্রহার করিলাম? সে যাহা হউক, গৃহিণীর নিকট কি কথা বলিয়াছ, বল। সে বলিল, কেন আপনি বলিয়াছিলেন, আমি কোথায় যাইব, আমার বাটী নাই, আমি বিবাহ করি নাই, আমার স্ত্রী নাই। এই সকল কথা আমি তাঁহার নিকটে বলিয়াছি। তৎপরে তিনি পুনরায় আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইলেন ; বলিয়া দিলেন, যেরূপে পার তাঁহাকে সত্বর বাটীতে লইয়া আইস।

শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুমি কোথায় এমন মাতলামি শিখিয়াছ? কতকগুলি কল্পিত কথা শুনাইয়া অকারণে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছ। তোমার এরূপ করিবার তাৎপর্য্য কি, বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সঙ্গে দেখা নাই, অথচ আমার নাম করিয়া তুমি তাঁহার নিকট এই সকল কথা বলিয়াছ। কিঙ্কর বলিল, আমি তাঁহাকে একটিও অলীক কথা শুনাই নাই ; আপনে সাক্ষাৎকালে যাহা বলিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, আমি তাহার অতিরিক্ত কিছুই বলি নাই। আপনি যখন যাহাতে সুবিধা দেখেন তাহাই বলেন, তাহাই করেন। আপনি আমায় যে প্রহার করিয়াছেন, কর্ণমূলে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। এখন কি প্রহার পর্য্যন্ত অপলাপ করিতে চাহেন? চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তোমায় আর কি বলিব, তুমি গর্দ্দভ। কিঙ্কর বলিল, তাহার সন্দেহ কি; গর্দ্দভ না হইলে এত প্রহার সহ্য করিতে পারিব কেন। গর্দ্দভ প্রহৃত হইলে নিরুপায় হইয়া পদপ্রহার করে ; অতঃপর আমিও সেই পথ অবলম্বন করিব ; তাহা হইলে আপনি সতর্ক হইবেন, আর কথায় কথায় আমায় প্রহার করিতে চাহিবেন না।

চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া তাহার কথার আর উত্তর না দিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকারকে বলিলেন, দেখ, আমার গৃহপ্রতিগমনে বিলম্ব হইলে গৃহিণী অত্যন্ত আক্ষেপ ও বিরক্তপ্রকাশ করেন, এবং নানাবিধ সন্দেহ করিয়া আমার সহিত বিবাদ ও বাদানুবাদ করিয়া থাকেন। অতএব, তুমি সঙ্গে চল ; তাঁহার নিকটে বলিবে, তাঁহার জন্তে যে হার গড়িতেছ, তাহা এই সময়ে প্রস্তুত হইবার কথা ছিল ; প্রস্তুত হইলেই লইয়া যাইব এই আশায় আমি তোমার বিপণিতে বসিয়াছিলাম ; কিন্তু এ বেলা প্রস্তুত হইয়া উঠিল না ; সায়ংকালে নিঃসন্দেহ

প্রস্তুত হইবেক, এবং কল্য প্রাতে তুমি তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবে। তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সন্নিহিত রত্নদত্ত শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, আপনিও চলুন, আজ সকলে এক সঙ্গে আহার করিব; অনেক দিন আপনি আমার বাটীতে আহার করেন নাই। রত্নদত্ত ও বসুপ্রিয় সম্মত হইলেন; চিরঞ্জীব উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে বাটীর সন্নিকৃষ্ট হইয়া চিরঞ্জীব দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ রহিয়াছে; তখন কিঙ্করকে বলিলেন; তুমি অগ্রসর হইয়া আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বে দ্বার খুলাইয়া রাখ। কিঙ্কর সত্বর গমনে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া অপরাপর ভৃত্যদিগের নামগ্রহণ পূর্ব্বক দ্বার খুলিয়া দিতে বলিল। চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে হেমকূটবাসী কিঙ্কর ঐ সময়ে দ্বারবানের কার্য্যসম্পাদন করিতেছিল, সে বলিল, তুমি কে, কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছ; গৃহস্বামিনী যেরূপ অনুমতি দিয়াছেন, তাহাতে আমি কখনই দ্বার খুলিব না, এবং কাহাকেও বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না। অতএব তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও আর ইচ্ছা হয়, রাস্তায় বসিয়া রোদন কর। এইরূপ উদ্ধত ও অবজ্ঞাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, তুই কে, কোথাকার লোক, তোর কেমন আচরণ? প্রভু পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তুই দ্বার খুলিয়া দিবি না। হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, তোমার প্রভুকে বল, তিনি যেখান হইতে আসিয়াছেন, সেই খানে ফিরিয়া যান। আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে এ বাটীতে প্রবেশ করিতে দিব না।

কিঙ্করের কথায় দ্বার খুলিল না দেখিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, কে ও বাটীর ভিতরে কথা কও হে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও। পরিহাসপ্রিয় হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি কখন দ্বার খুলিয়া দিব, তাহা আমি আপনাকে পরে বলিব; আপনি কি জন্যে দ্বার খুলিতে বলিতেছেন, তাহা আমায় আগে বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আহারের জন্যে; আজ এ পর্য্যন্ত আমার আহার হয় নাই। কিঙ্কর বলিল, এখন এখানে আপনকার আহারের কোনও সুবিধা নাই; ইচ্ছা হয়, পরে কোনও সময়ে আসিবেন। তখন চিরঞ্জীব কোপান্বিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে হে, যে আমায় আমার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, আমি এই সময়ের জন্য দ্বাররক্ষার ভার পাইয়াছি, আমার নাম কিঙ্কর। এই কথা শুনিয়া জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, অরে দুরাত্মন্! তুই আমার নাম ও পদ উভয়েরই অপহরণ করিয়াছিস; যদি ভাল চাহিস, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে, প্রভু কতক্ষণ পথে দাঁড়াইয়া থাকিবেন? হেমকূটবাসী

কিঙ্কর তথাপি দ্বার খুলিয়া দিল না। তখন জয়স্থলবাসী কিঙ্কর স্বীয় প্রভুকে বলিল, মহাশয়! আজ ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না; সহজে দ্বার খুলিয়া দেয় এরূপ বোধ হয় না। ধাক্কা মারিয়া দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলুন, আর কত ক্ষণ এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন? বিশেষতঃ, আপনকার নিমন্ত্রিত এই দুই মহাশয়ের অতিশয় কষ্ট হইতেছে।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা অভ্যন্তর হইতে বলিলেন, কিঙ্কর! ওরা সব কে, কি জন্যে দরজায় জমা হইয়া গোল করিতেছে? হেমকূটবাসী কিঙ্কর বলিল, ঠাকুরাণি! গোলের কথা কেন বলেন, আপনাদের এই নগরটি উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ; এখানে গোলের অপ্রতুল কি। চন্দ্রপ্রভার স্বর শুনিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, গিন্নি! আজকার এ কি কাণ্ড? এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রপ্রভা কোপে জ্বলিত হইয়া বলিলেন, তুই কোথাকার হতভাগা, দূর হয়ে যা, দরজার কাছে গোল করিস না, লক্ষ্মীছাড়ার আস্পর্দ্ধা দেখ না, রাস্তায় দাঁড়াইয়া আমায় গিন্নি বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছে। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! বড় লজ্জার কথা, এঁরা দুজন দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা দরজা খুলাইতে পারিলাম না। যাহাতে শীঘ্র খুলিয়া দেয়, তাহার কোনও উপায় করুন। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আমি দেখিয়া শুনিয়া একে বারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, আজকার কাণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন কিঙ্কর বলিল, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, অতঃপর সেই পরামর্শই ভাল; দরজা ভাঙ্গা বই আর উপায় দেখিতেছি না। যেখানে পাও, সত্বর দুই তিন খান কুঠার লইয়া আইস। কিঙ্কর, যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল।

এই সময়ে রত্নদত্ত বলিলেন, মহাশয়! ধৈর্য অবলম্বন করুন। কোনও ক্রমে দরজা ভাঙ্গা হইবেক না। যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহাতে ক্রোধসংবরণ করা সহজ নয়। রক্ত মাংসের শরীরে এত সহ্য হয় না। কিন্তু সংসারী ব্যক্তিকে অনেক বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে হয়। এখন আপনি ক্রোধভরে এক কর্ম্ম করিবেন; কিন্তু ক্রোধশান্তি হইলে যার পর নাই অনুতাপ-গ্রস্ত হইবেন। অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া কোনও কর্ম্ম করা পরামর্শসিদ্ধ নয়। যদি এই দিবা দ্বিপ্রহরের সময় আপনি দ্বারভঙ্গে প্রবৃত্ত হন, রাজপথবাহী সমস্ত লোক সমবেত হইয়া কত কুতর্ক উপস্থিত করিবেক। আপনকার কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবেক না। মানবজাতি নিরতিশয় কুৎসাপ্রিয়; লোকের কুৎসা করিবার নিমিত্ত কত অমূলক গল্পের কল্পনা করে, এবং কল্পিত গল্পের আকর্ষণী

শক্তির সম্পাদনের নিমিত্ত উহাতে কত অলঙ্কার যোজিত করিয়া দেয়। যদি কোনও ব্যক্তির প্রশংসা করিবার সহস্র হেতু থাকে, অধিকাংশ লোকে ভুলিয়াও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না; কিন্তু কুৎসা করিবার অণুমাত্র সোপান পাইলে মনের আমোদে সেই দিকে ধাবমান হয়। আপনি নিতান্ত অমায়িক: মনে ভাবেন কখনও কাহারও অপকার করেন নাই, যথাশক্তি সকলের হিতচেষ্টা করিয়া থাকেন; সুতরাং কেহ আপনকার বিপক্ষ ও বিদ্বেষী নাই; সকলেই আপনকার আত্মীয় ও হিতৈষী। কিন্তু আপনকার সে সংস্কার সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। আপনি প্রাণপণে যাঁহাদের উপকার করিয়াছেন, এবং যে সকল ব্যক্তিকে আত্মীয় বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আপনকার বিষম বিদ্বেষী। ঐ সকল ব্যক্তি আপনকার যার পর নাই কুৎসা করিয়া বেড়ান। আপনকার যথার্থ গুণগ্রাহী কতকগুলি নিরপেক্ষ লোক আছেন; তাঁহারা আপনকার দয়া সৌজন্য প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি অতি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এক্ষণে জয়স্থলে বিলক্ষণ মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছেন; এজন্য, যে সকল লোক সচরাচর ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই অন্তঃকরণ ঈর্য্যারসে নিরতিশয় কলুষিত হইয়া আছে। তাঁহারা আপনকার অনুষ্ঠিত কর্ম্মমাত্রেরই এক এক অভিসন্ধি বহিষ্কৃত করেন; আপনি কোনও কর্ম্ম ধর্ম্মবুদ্ধিতে করিয়া থাকেন, তাহা কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতে দেন না। আমি অনেক বার অনেক স্থলে দেখিয়াছি, আপনকার অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, তাঁহাদের নিতান্ত অসহ্য হয়; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তত্তৎ কর্ম্মকে অসদভিসন্ধিপ্রযোজিত বা স্বার্থানুসন্ধানমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান; অবশেষে, যাহা কখনও সম্ভব নয় এরূপ গল্প তুলিয়া আপনকার নির্ম্মল চরিতে কুৎসিত কলঙ্ক যোজিত করিয়া থাকেন। এমন স্থলে, কুৎসা করিবার এরূপ সোপান পাইলে ঐ সকল মহাত্মাদের আমোদের সীমা থাকিবেক না; তাঁহারা আপনারে এক বারে নরকে নিক্ষিপ্ত করিবেন। আর, আমরা আপনকার গৃহিণীকে বিলক্ষণ জানি। তিনি নির্ব্বোধ নহেন। তিনি যে এ সময়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না, অবশ্যই ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে; আপনি এখন তাহা জানেন না, পরে সাক্ষাৎ হইলে তিনি অবশ্যই আপনাকে বুঝাইয়া দিবেন। অতএব আমার কথা শুনুন, আর এখানে দাঁড়াইয়া গোল করিবার প্রয়োজন নাই;

চলুন, এ বেলা আমরা স্থানান্তরে গিয়া আহার করি। অপরাহ্নে একাকী আসিয়া এই বিসদৃশ ঘটনার কারণানুসন্ধান করিবেন।

রত্নদত্তের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্ব করিয়া রহিলেন; অনন্তর বলিলেন, আপনি সৎপরামর্শের কথাই বলিয়াছেন; ধৈর্য অবলম্বন করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাওয়াই সর্বাংশে শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। যাহা বলিলেন, আমার স্ত্রী কোনও ক্রমে নির্বোধ নহেন। কিন্তু তাঁহার একটি বিষম দোষ আছে। আমার বাটীতে আসিতে বিলম্ব হইলে তিনি নিতান্ত অস্থির ও উন্মত্তপ্রায় হন, এবং মনে নানা কুতর্ক উপস্থিত করিয়া অকারণে আমার সঙ্গে কলহ করেন। আজ বিশেষতঃ কিঙ্কর তাঁহাকে অতিশয় রাগাইয়া দিয়াছে, তাহাতেই এই অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি। অনন্তর বসুপ্রিয়কে বলিলেন, বোধ করি এত ক্ষণে হার প্রস্তুত হইয়াছে; তুমি অবিলম্বে বাটীতে প্রতিগমন কর; আমি অপরাজিতার আবাসে থাকিব, হার লইয়া তথায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, দেখিও, যেন কোনও মতে বিলম্ব না হয়। ঐ হার আমি অপরাজিতাকে দিব, তাহা হইলেই গৃহিণী বিলক্ষণ শিক্ষা পাইবেন, এবং আর কখনও আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন না। বসুপ্রিয় বলিলেন, যত সত্বর পারি হার লইয়া সাক্ষাৎ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলে চিরঞ্জীব ও রত্নদত্ত অভিপ্রেত স্থানে গমন করিলেন।

এ দিকে, আহারের সময় হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব প্রায়ই মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, চন্দ্রপ্রভা বা বিলাসিনীর কোনও কথার উত্তর দিলেন না; এবং কোথায় আসিয়াছি, কি করিতেছি, অবশেষেই বা কি বিপদে পড়িব, এই দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া ভাল রূপে আহারও করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া চন্দ্রপ্রভা স্থির করিলেন, তিনি তাঁহার প্রতি এক বারেই নির্মম ও অনুরাগশূন্য হইয়াছেন। তদনুসারে, তিনি শিরে করাঘাত ও রোদন করিতে করিতে গৃহান্তরে প্রবেশ পূর্বক ভূতলশায়িনী হইলেন। চিরঞ্জীব ব্যতিরিক্ত আর কেহ সেখানে নাই দেখিয়া বিলাসিনী তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, দেখ ভাই! তুমি তাঁহার স্বামী নও তিনি তোমার স্ত্রী নন, বারংবার যে এই সকল কথা বলিতেছ, ইহার কারণ কি? তুমি এত বিরক্ত হইতে পার, আমি ত দিদির তেমন কোনও অপরাধ দেখিতেছি না। এই তোমাদের প্রণয়ের সময়; যাহাতে উত্তরোত্তর প্রণয়ের বৃদ্ধি হয়, উভয়েরই প্রাণপণে সেই চেষ্টা করা উচিত। প্রণয়বর্দ্ধনের কথা দূরে থাকুক, তুমি এক-

বারে পরিণয়ের অপলাপপর্য্যন্ত করিতেছ। যদি কেবল ঐশ্বর্য্যের অনুরোধে দিদির পাণিগ্রহণ করিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ঐশ্বর্য্যের অনুরোধেই দিদির প্রতি দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শিত করা উচিত। আজ তোমার যেরূপ ভাব দেখিতেছি, তাহাতে দিদির উপর তোমার যে কিছুমাত্র দয়া বা মমতা আছে, এরূপ বোধ হয় না। তুমি আমার স্ত্রী নও, আমি তোমার পতি নই, আমি তোমার পাণিগ্রহণ করি নাই; বাটীর সকল লোকের সমক্ষে দিদির মুখের উপর এ সকল কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়। স্বামীর মুখে এরূপ কথা শুনা অপেক্ষা, স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর আর কিছুই নাই। বলিতে কি, আজ তুমি দিদির সঙ্গে নিতান্ত ইতরের ব্যবহার করিতেছ। যদি মনে অনুরাগ না থাকে, মৌখিক প্রণয় ও সৌজন্য দেখাইবার হানি কি? তাহা হইলেও দিদির মন অনেক তুষ্ট থাকে। যা হউক, ভাই! আজ তুমি বড় ঢলাঢলি করিলে। স্ত্রীপুরুষে এরূপ ঢলাঢলি করা কেবল লোক হাসান মাত্র। তোমার আজকার আচরণ দেখিলে তুমি যেন সে লোক নও বোধ হয়। কি কারণে আজ এত বিরস বদনে রহিয়াছ, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখ দেখিলে বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া আছে। এখন আমার কথা শুন, ঘরের ভিতরে গিয়া দিদির সান্ত্বনা কর। বলিবে, পূর্ব্বে যাহা কিছু বলিয়াছি, সে সব পরিহাসমাত্র; তোমার মনের ভাবপরীক্ষা ভিন্ন তাহার আর কোনও অভিসন্ধি নাই। যদি দুটা মিষ্ট কথা বলিলে তাঁহার অভিমান দূর হয়, ও খেদনিবারণ হয়, তাহাতে তোমার আপত্তি কি।

বিলাসিনীর বচনবিন্যাস শ্রবণগোচর করিয়া হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, অয়ি চারুশীলে! আমি দেখিয়া শুনিয়া এক কালে হতজ্ঞান হইয়াছি; আমার বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না। তোমার কথার কি উত্তর দিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। তুমি যে পথে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এত ক্ষণ আমায় উপদেশ দিলে, আমি সে পথের পথিক নই, প্রাণান্তেও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমরা দেবী কি মানবী, আমি এ পর্য্যন্ত তাহা স্থির করিতে পারি নাই। যদি দেবযোনিসম্ভবা হও, আমায় স্বতন্ত্র বুদ্ধি ও স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি দাও; তাহা হইলে তোমাদের অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারি; নতুবা, এখন আমার যেরূপ প্রবৃত্তি আছে, তদনুসারে আমি কোনও ক্রমে পরকীয় মহিলার সংস্রবে যাইতে পারিব না। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, তোমার ভগিনী আমার পত্নী নহেন, আমি কখনও উঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই। তিনি অধীরা হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, সত্য বটে; কিন্তু

তাঁহার খেদাপনয়নের নিমিত্তে তুমি এত ক্ষণ আমায় যে উপদেশ দিলে, আমি প্রাণান্তেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিব না। আমি বিনয় করিয়া বলিতেছি, তুমি আর আমায় ওরূপ উপদেশ দিও না। যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনি বিবাহিতা কামিনী। জানিয়া শুনিয়া কি রূপে অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, বল। আমি অবিবাহিত পুরুষ; তুমিও অদ্যাপ অবিবাহিতা আছে, বোধ হইতেছে। যদি তোমার অভিপ্রায় থাকে, ব্যক্ত কর; আমি সহধর্ম্মিণীভাবে তোমার পরিগ্রহে প্রস্তুত আছি; প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পরস্পর যথাবিধি পরিণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে প্রাণপণে তোমার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব। প্রেয়সি! বলিতে কি, তোমার রূপলাবণ্যদর্শনে ও বচনমাধুরীশ্রবণে আমার মন এমন মোহিত হইয়াছে যে, তোমার সম্মতি হইলে আমি এই দণ্ডে তোমার পাণিগ্রহণ করি। বিলাসিনী শুনিয়া চকিত হইয়া বলিলেন, আমি তোমার প্রেয়সী নই, দিদি তোমার প্রেয়সী, তাঁহার প্রতি এই প্রিয়সম্ভাষণ করা উচিত। চিরঞ্জীব বলিলেন, যাহার প্রতি মনের অনুরাগ জন্মে, সেই প্রেয়সী; তোমার প্রতি আমার মন অনুরক্ত হইয়াছে, অতএব তুমিই আমার প্রেয়সী: তোমার দিদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? তিনি আমার প্রেয়সী নহেন। এই কথা শুনিয়া বিলাসিনী বলিলেন, বলিতে কি, ভাই! তুমি যথার্থই পাগল হইয়াছ, নতুবা এমন কথা কেমন করিয়া মুখে আনিলে। ছি ছি! কি লজ্জার কথা; আর যেন কেহ ও কথা শুনে না। দিদি শুনিলে আত্মঘাতিনী হইবেন। আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন। তোমার যে ভাব দেখিতেছি, আমি একাকিনী আর তোমার নিকটে থাকিতে পারিব না।

এই বলিয়া বিলাসিনী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। হেমকূটের চিরঞ্জীব, হতবুদ্ধি হইয়া একাকী সেইস্থানে বসিয়া গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটবাসী কিঙ্কর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া চিরঞ্জীবের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং আকুল বচনে বলিতে লাগিল, মহাশয়! আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি, রক্ষা করুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, ব্যাপার কি বল। সে বলিল, এ বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেরূপ, পরিচারিণীগুলিও অবিকল সেইরূপ চরিত্রের লোক। কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেমন আপনাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে চাহেন, পাকশালায় যে পরিচারিণী আছে, সে আমাকে পতি বলিয়া অধিকার করিতে

চাহে। সে আমার নাম জানে, আমার শরীরের কোন্ স্থানে কি চিহ্ন আছে, সমুদয় জানে। সে কি রূপে এ সমস্ত জানিতে পারিল, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। সে সহসা আমার নিকটে উপস্থিত হইল এবং প্রণয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিল, এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছ? পাক-শালায় আইস, আমোদ আহ্লাদ করিব। সে এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার মনে এমন ভয় জন্মিল যে, আমি কোনও ক্রমে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। সে যেমন বিশ্রী, তেমনই স্থূলকায় ও দীর্ঘাকার। আমি আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক মূর্ত্তি দেখি নাই; আমার বোধ হয়, সে রাক্ষসী, মানুষী নয়। আমি যমালয়ে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু প্রাণান্তেও পাকশালায় প্রবিষ্ট হইতে পারিব না। অধিক কি বলিব, তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি পাকশালায় যাইতে যত অসম্মত হইতে লাগিলাম, সে উত্তরোত্তর ততই উৎপীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে পলাইয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি; যাহাতে আমি তাহার হস্ত হইতে নিস্তার পাই তাহা করুন।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, কিঙ্কর! আমি কি রূপে তোমার নিস্তার করিব, বল; আমার নিস্তার কে করে, তাহার ঠিকানা নাই। এ দেশের সকলই অদ্ভুত কাণ্ড। পাকশালার পরিচারিণী কি রূপে তোমার নাম ও শরীরগত চিহ্ন সকল জানিতে পারিল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, সত্বর পলায়ন ব্যতিরেকে নিস্তারের পথ নাই। তুমি এক মুহূর্ত্তেও বিলম্ব করিও না; এখনই চলিয়া যাও এবং অনুসন্ধান করিয়া জান, আজ কোনও জাহাজ এখান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছে কি না। তুমি এই সংবাদ লইয়া আপণে যাইবে, আমিও ইতিমধ্যে তথায় উপস্থিত হইতেছি। অথবা বিলম্বের প্রয়োজন কি? এখন এখানে কেহ নাই, এক সঙ্গেই পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে সেই ভবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং তাহাকে অর্ণবপোতের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া দ্রুত পদে আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের আদেশ অনুসারে হার আনিতে গিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে হার লইয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইয়া জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব

বোধ করিয়া বলিলেন, এই যে চিরঞ্জীব বাবুর সহিত পথেই সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন, হাঁ আমার নাম চিরঞ্জীব বটে। বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনকার নাম আমি বিলক্ষণ জানি. আপনারে আর সে পরিচয় দিতে হইবেক না; এ নগরে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আপনকার নাম জানে। আমি হার আনিয়াছি, লউন। এই বলিয়া সেই হার তিনি চিরঞ্জীবের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাস করিলেন, আপনি আমায় এ হার দিতেছেন কেন, আমি হার লইয়া কি করিব? বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? আপনকার যাহা ইচ্ছা হয়, করিবেন; হার আপনকার আদেশে আপনকার জন্যে প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, কই, আমি ত আপনাকে হার গড়িতে বলি নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, সে কি মহাশয়! এক বার নয়, দুই বার নয়, অন্ততঃ বিশ বার আপনি আমায় এই হার গড়িতে বলিয়াছেন। কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে, এই হারের জন্যে আমার বাটীতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল বসিয়া ছিলেন, এবং আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে, আমায় এই হার লইয়া আপনকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, পরিহাস শুনিবার সময় নাই। আপনি হার লইয়া যান; আমি পরে সাক্ষাৎ করিব এবং হারের মূল্য লইয়া আসিব। তিনি বলিলেন, যদি নিতান্তই আমায় হার লইতে হয়. আপনি উহার মূল্য লউন; হয় ত, অতঃপর আর আপনি আমার দেখা পাইবেন না; সুতরাং এখন না লইলে পরে আর হারের মূল্য পাওয়ার সম্ভবনা নাই। বসুপ্রিয় বলিলেন, আমার সঙ্গে এত পরিহাস কেন।

এই বলিয়া তিনি দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন। চিরঞ্জীব হার লইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার এক অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। এখানকার লোকের ভাব বুঝাই ভার। এ ব্যক্তির সহিত কস্মিন্ কালেও আমার দেখা শুনা নাই, অথচ বহু মূল্যের হার আমার হস্তে দিয়া চলিয়া গেল; মূল্য লইতে বলিলাম, তাহাও লইল না। এ কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা এখানকার সকলই অদ্ভুত ব্যাপার। যাহা হউক, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকা বিধেয় নহে; জাহাজ স্থির হইলেই প্রস্থান করিব। সত্বর আপণে যাই; বোধ করি, কিঙ্কর এত ক্ষণে সেখানে আসিয়াছে। এই বলিতে বলিতে তিনি আপণ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বসুপ্রিয় স্বর্ণকার এক বিদেশীয় বণিকের নিকট পাঁচ শত টাকা ধার লইয়াছিলেন। যে সময়ে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার ছিল, তাহা অতীত হইয়া যায়, তথাপি বণিক্ টাকার জন্য বসুপ্রিয়কে উৎপীড়িত করেন নাই। পরে দূর দেশান্তরে যাইবার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে, সহজে টাকা পাওয়া দুর্ঘট বিবেচনা করিয়া এক জন রাজপুরুষ সঙ্গে লইয়া তিনি বসুপ্রিয়ের আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, আজ আমি এখান হইতেই প্রস্থান করিব; সমুদায় আয়োজন হইয়াছে; জাহাজে আরোহণ করিলেই হয়; যে জাহাজে যাইব, উহা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে জয়স্থল হইতে চলিয়া যাইবেক। আমি যে প্রয়োজনে যাইতেছি, তাহাতে সঙ্গে কিছু অধিক টাকা থাকা আবশ্যক। অতএব আমার প্রাপ্য টাকা গুলি এখনই দিতে হইবেক; না দেন, আপনাকে এই রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করিব। বসুপ্রিয় বলিলেন, টাকা দিতে আমার এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তেও আপত্তি বা অনিচ্ছা নাই। আপনি আমার নিকটে যত টাকা পাইবেন, চিরঞ্জীব বাবুর নিকট আমার তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়ানা আছে। তাঁহাকে এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছি; তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই ঐ হারের মূল্য পাইব। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে চলুন; সেখানে যাইবামাত্র আপনি টাকা পাইবেন। তিনি অগত্যা সম্মত হইলে, বসুপ্রিয় তাঁহাকে ও তাঁহার আনীত রাজপুরুষকে সমভিব্যাহারে লইয়া চিরঞ্জীবের আলয়ে চলিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব অপরাজিতার আবাসে আহার করিয়াছিলেন। অপরাজিতার অঙ্গুলিতে একটি অতি সুন্দর অঙ্গুরীয় ছিল; চিরঞ্জীব তদীয় অঙ্গুলি হইতে ঐ অঙ্গুরীয়টি খুলিয়া লয়েন, বলেন, আমি এটি আর ফিরিয়া দিব না; ইহার পরিবর্ত্তে আপনারে এক ছড়া নূতন হার দিব। হারের বর্ণনা শুনিয়া অপরাজিতা, ভাবিয়া দেখিলেন, অঙ্গুরীয় অপেক্ষা হারের মূল্য অন্ততঃ দশগুণ অধিক। এজন্য তিনি এই বিনিময়ে সম্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, আমি হার কখন পাইব। চিরঞ্জীব বলিয়াছিলেন, স্বর্ণকারের সহিত অবধারিত কথা আছে, হার লইয়া তিনি অবিলম্বে এখানেই আসিবেন। আপনি চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে হার পাইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল; তথাপি স্বর্ণকার

উপস্থিত হইলেন না। চিরঞ্জীব অতিশয় অপ্রতিভ হইলেন, এবং, আমি স্বয়ং স্বর্ণকারের বাটীতে গিয়া হার আনিয়া দিতেছি, এই বলিয়া কিঙ্করকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া চিরঞ্জীব কিঙ্করকে বলিলেন, দেখ! আজ গৃহিণী যে আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, তাহার পুরস্কারস্বরূপ, হারের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এক গাছা মোটা দড়ি দিব; তিনি ও তাঁহার মন্ত্রিণীরা ঐরূপ হার পাইবারই উপযুক্ত পাত্র। তুমি ঐরূপ দড়ির সংগ্রহ করিয়া রাখিবে, এবং আমি বাটীতে যাইবামাত্র আমার হস্তে দিবে; দেখিও, যেন বিলম্ব না হয়। এই বলিয়া রজ্জুক্রয়ের নিমিত্ত একটি টাকা দিয়া তিনি তাহাকে বিদায় করিতেছেন, এমন সময়ে স্বর্ণকার, বণিক্, ও রাজপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যথাকালে হার না পাওয়াতে চিরঞ্জীব স্বর্ণকারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমার বাক্যনিষ্ঠ দর্শনে আজ আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমায় বারংবার বলিয়া দিলাম, এই সময়ের মধ্যে আমরা নিকটে হার লইয়া যাইবে; না তুমি গেলে, না হার পাঠাইলে, কিছুই করিলে না, এজন্য আজ আমি বড অপ্রস্তুত হইয়াছি; তোমার কথায় যে বিশ্বাস করে, তাহার ভদ্রস্থতা নাই। তুমি অতি অন্যায় করিয়াছ। এ পর্য্যন্ত তুমি না যাওয়াতে আমি হারের জন্য তোমার বাটী যাইতেছিলাম।

বসুপ্রিয়, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্থির করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে তাঁমার হস্তে হার দিয়াছিলেন। সুতরাং, প্রকৃত ব্যক্তিকে হার দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার সংস্কার ছিল। এজন্য তিনি বলিলেন, মহাশয়! এখন পরিহাস রাখুন; আপনকার হারের হিসাব প্রস্তুত করিরা আনিয়াছি, দৃষ্টি করুন। এই বলিয়া সেই হিসাবের ফর্দ্দ তাঁহার হস্তে দিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনার নিকট আমার পাওয়ানা পাঁচ শত পঞ্চাশ টাকা। আমি এই বণিকের পাঁচ শত টাকা ধারি। ইনি অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিতেছেন। এত ক্ষণ কোন্ কালে জাহাজে চড়িতেন, কেবল এই টাকার জন্যে যাইতে পারিতেছেন না। অতএব আপনি হারের হিসাবে আমায় আপাততঃ পাঁচ শত টাকা দিউন।

তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, আমার সঙ্গে কি টাকা আছে যে এখনই দিব। বিশেষতঃ, আমার কতকগুলি বরাত আছে; সে সব শেষ না করিয়াও বাটী যাইতে পারিব না। অতএব তুমি এই মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া আমার বাটীতে

যাও, আমার স্ত্রীর হস্তে হার দিয়া আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ টাকা দিবেন; আর, বোধ করি, আমিও ঐ সময়ে বাটীতে উপস্থিত হইতেছি। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার আপনকার নিকটে থাকুক, আপনিই তাঁহাকে দিবেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, না, সে কথা ভাল নয়, হয় ত আমি যথাসময়ে পঁহুছিতে পারিব না, অতএব তুমিই হার লইয়া যাও। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, হার কি আপনকার সঙ্গে আছে? চিরঞ্জীব চকিত হইয়া বলিলেন, ও কেমন কথা! তুমি কি আমায় হার দিয়াছ যে, হার আমার সঙ্গে আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতেছে। বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! এ পরিহাসের সময় নয়; ইঁহার প্রস্থানের সময় বহিয়া যাইতেছে, আর বিলম্ব করা চলে না। অতএব আমার হস্তে হার দেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি যে হারের বিষয়ে আমার নিকট অঙ্গীকাররক্ষা করিতে পার নাই, সেই দোষ ঢাকিবার জন্যে বুঝি এই সকল ছল করিতেছ। আমি কোথায় সে জন্যে তোমায় ভৎর্সনা করিব মনে করিয়াছি, না হইয়া তুমি কলহপ্রিয়া কামিনীর ন্যায় অগ্রেই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে।

এই সময়ে বণিক্ বসুপ্রিয়কে বলিলেন, সময় অতীত হইয়া যাইতেছে, আর আমি কোনও মতে বিলম্ব করিতে পারি না। তখন বসুপ্রিয় চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! শুনিলেন ত, উনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না। চিরঞ্জীব বলিলেন, হার লইয়া আমার স্ত্রীর নিকটে গেলেই টাকা পাইবে। শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, মহাশয়! আপনি কেমন কথা বলিতেছেন, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি আপনকার হস্তে হার দিয়াছি, আমার নিকটে আর কেমন করিয়া হার থাকিবেক। হয় হার পাঠাইয়া দেন, নয় লিখিয়া দেন। এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তোমার কৌতুক আর ভাল লাগিতেছে না, হার কেমন হইয়াছে, দেখাও।

উভয়ের এইরূপ বিবাদ দর্শনে ও বাদানুবাদ শ্রবণে, যার পর নাই বিরক্ত হইয়া বণিক্ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আপনাদের বাক্‌চাতুরী আর আমার সহ্য হইতেছে না; আপনি টাকা দিবেন কি না, স্পষ্ট বলুন; যদি না দেন, আমি ইঁহাকে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করি। চিরঞ্জীব বলিলেন, আপনকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি যে, আপনি এত রূঢ় ভাবে আমার সহিত আলাপ করিতেছেন। তখন বসুপ্রিয় বলিলেন, আপনি হারের হিসাবে আমার টাকা ধারেন, সেই সম্পর্কে উনি এরূপ আলাপ করিতেছেন। সে যাহা হউক, টাকা এই দণ্ডে দিবেন কি না, বলুন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যত ক্ষণ হার না পাইতেছি,

তোমায় এক কপর্দ্দকও দিব না। বসুপ্রিয় বলিলেন, কেন, আমি আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনকার হস্তে হার দিয়াছি। চিরঞ্জীব বলিলেন, তুমি কখনই আমায় হার দাও নাই। এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করা বড় অন্যায়। উহাতে আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করা হইতেছে। বসুপ্রিয় বলিলেন, হার পাওয়ার অপলাপ করিয়া আপনি আমার অধিকতর অনিষ্ট করিতেছেন; চির কালের জন্যে আমার সম্ভ্রম যাইতেছে।

সত্বর টাকা পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বণিক্ রাজপুরুষকে বলিলেন, আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। রাজপুরুষ বসুপ্রিয়কে অবরুদ্ধ করিলে তিনি চিরঞ্জীবকে বলিলেন, দেখুন, আপনকার দোষে চির কালের জন্যে আমার মান সম্ভ্রম যাইতেছে; আপনি টাকা দিয়া আমায় মুক্ত করুন; নতুবা আমিও আপনাকে এই দণ্ডে অবরুদ্ধ করাইব। শুনিয়া সাতিশয় কুপিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! আমি হার না পাইয়া টাকা দিব কেন? তোমার সাহস হয়, আমায় অবরুদ্ধ করাও। তখন বসুপ্রিয় রাজপুরুষের হস্তে অবরোধনের খরচ দিয়া বলিলেন, দেখুন, ইনি আমার নিকট হইতে এক ছড়া বহুমূল্য হার লইয়া মূল্য দিতেছেন না; অতএব আপনি ইঁহাকে অবরুদ্ধ করুন। সহোদরও যদি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করে, আমি তাহাকেও ক্ষমা করিতে পারি না। স্বর্ণকারের অভিপ্রায় বুঝিয়া রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে অবরুদ্ধ করিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি যে পর্য্যন্ত টাকা জমা করিতে বা জামীন দিতে না পারিতেছি, তাবৎ আপনকার অবরোধে থাকিব। এই বলিয়া তিনি বসুপ্রিয়কে বলিলেন, অরে দুরাত্মন্! তুমি যে অকারণে আমার অবমাননা করিলে, তোমায় তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হইবেক; অধিক আর কি বলিব, এই অপরাধে তোমার সর্ব্বস্বান্ত হইবেক। বসুপ্রিয় বলিলেন, ভাল দেখা যাইবেক। জয়স্থল নিতান্ত অরাজক স্থান নহে। যখন উভয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হইব, আপনকার সমস্ত গুণ এরূপে প্রকাশিত করিব যে, আপনি আর লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারিবেন না। আপনি অধিরাজ বাহাদুরের প্রিয় পাত্র বলিয়া এরূপ গর্ব্বিত কথা বলিতেছেন। কিন্তু তিনি যেরূপ ন্যায়পরায়ণ, তাহাতে কখনই অন্যায় বিচার করিবেন না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব স্বীয় সহচর কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। সমুদয় স্থির করিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত চিত্তে সে স্বীয় প্রভুকে এই সংবাদ দিতে যাইতেছিল; পথিমধ্যে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে

পাইয়া স্বপ্রভুজ্ঞানে তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিতে লাগিল, মহাশয়! আর আমাদের ভাবনা নাই, মলয়পুরের এক জাহাজ পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে আমাদের যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি। ঐ জাহাজ অবিলম্বে প্রস্থান করিবেক; অতএব পান্থনিবাসে চলুন, দ্রব্যসামগ্রী সমুদয় লইয়া এ পাপিষ্ঠ স্থান হইতে চলিয়া যাই। শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নির্বোধ! অরে পাগল! মলয়পুরের জাহাজের কথা কি বলিতেছ। সে বলিল, কেন মহাশয়! আপনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমায় জাহাজের কথা বলি নাই, দড়ি কিনিতে পাঠাইয়াছিলাম। সে বলিল, না মহাশয়! আপনি দড়ি কিনিবার কথা কখন বলিলেন? জাহাজ দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন। তখন চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! এখন আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা করিতে পারি না; যখন সচ্ছন্দ চিত্তে থাকিব, তখন করিব, এবং যাহাতে উত্তরকালে আমার কথা মন দিয়া শুন, তাহাও ভাল করিয়া শিখাইয়া দিব। এখন সত্বর তুমি বাটী যাও, এই চাবিটি চন্দ্রপ্রভার হস্তে দিয়া বল, পাঁচ শত টাকার জন্য আমি পথে অবরুদ্ধ হইয়াছি; আমাব বাক্সের ভিতরে যে স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, তাহা তোমা দ্বারা অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি অবরোধ হইতে মুক্ত হইব। আর দাঁড়াইও না, শীঘ্র চলিয়া যাও। এই বলিয়া কিঙ্করকে বিদায় করিয়া তিনি রাজপুরুষকে বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! যত ক্ষণ টাকা না আসিতেছে, আমায় কারাগারে লইয়া চল। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে কারাগার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিঙ্কর মনে মনে বলিতে লাগিল, আমায় চন্দ্রপ্রভার নিকটে যাইতে বলিলেন, সুতরাং, আজ আমরা যে বাটীতে আহার করিয়াছিলাম, আমায় তথায় যাইতে হইবেক। পাকশালার পরিচারিণীর ভয়ে সে বাটীতে প্রবেশ করিতে আমার সাহস হইতেছে না। কিন্তু প্রভু যে অবস্থায় যে জন্যে আমায় পাঠাইতেছেন, না গেলে কোনও মতে চলিতেছে না। এই বলিতে বলিতে সে সেই বাটীর উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

এ দিকে, বিলাসিনী হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের সমক্ষ হইতে পলাইয়া চন্দ্রপ্রভার নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং চিরঞ্জীবের সহিত যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, সবিশেষ সমস্ত শুনাইলেন। চন্দ্রপ্রভা শুনিয়া কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বিলাসিনি! তিনি যে তোমার উপর অনুরাগপ্রকাশ এবং পরিশেষে পরিণয়প্রস্তাব ও প্রলোভনবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার বাস্তবিক বলিয়া বোধ হইল? আমার

অনুভব হয়, তিনি পরিহাস করিয়াছেন। বিলাসিনী বলিলেন, না দিদি! পরিহাস নয়; আমার উপর তাঁহার যে বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিয়াছে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই; অন্তঃকরণে বিলক্ষণ অনুরাগ-সঞ্চার না হইলে পুরুষদিগের সেরূপ ভাবভঙ্গী ও সেরূপ কথাপ্রণালী হয় না। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে কখনই তোমার নিকট এই কথার উল্লেখ করিতাম না। শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রপ্রভা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল, তিনি কি কি কথা বলিলেন? বিলাসীনি বলিলেন, তিনি বলিলেন, তোমার সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্ক নাই, তিনি তোমার পাণিগ্রহণ করেন নাই, তোমার উপর তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই, তিনি বৈদেশিক ব্যক্তি জয়স্থলে তাঁহার বাস নয়; পরে আমার উপর স্পষ্ট বাক্যে অনুরাগপ্রকাশ ও স্পষ্টতর বাক্যে পরিণয়প্রস্তাব করিলেন; অবশেষে, তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়া আমি পলাইয়া আসিলাম।

সমুদয় শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি! তোমার মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে এ জন্মে আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে হয় না। তিনি যে এমন নীচ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি এক বারও মনে করি নাই। কিন্তু আমার মন কেমন, বলিতে পারি না। দেখ, তিনি কেমন মমতাশূন্য হইয়াছেন এবং কেমন নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন; আমি কিন্তু তাঁহার প্রতি সেরূপ মমতাশূন্য হইতে বা সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিতে পারিতেছি না; এখনও আমার অনুরাগ অণুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা খেদ করিতে আরম্ভ করিলেন, বিলাসীনি প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে হেমকূটের কিঙ্কর তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া জয়স্থলের কিঙ্কর বোধ করিয়া বিলাসিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কিঙ্কর! তুমি হাঁপাইতেছ কেন? সে বলিল, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়াছি, তাহাতেই হাঁপাইতেছি। বিলাসিনী বলিলেন, তোমার প্রভু কোথায়, তিনি ভাল আছেন ত? তোমার ভাব দেখিয়া ভয় হইতেছে; কেমন, কোনও অনিষ্ট-ঘটনা হয় নাই ত? সে বলিল, তিনি রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত হইয়াছেন; সে তাঁহারে অবরুদ্ধ করিয়া কারাগারে লইয়া যাইতেছে। শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, কিঙ্কর! কাহার অভিযোগে তিনি অবরুদ্ধ হইলেন? সে বলিল, আমি তাহার কিছুই জানি না; আমার এক কর্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন; কর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র, তিনি

আমার হস্তে এই চাবিটি দিয়া আপনকার নিকটে আসিতে বলিলেন; বলিয়া দিলেন, তাঁহার বাক্সের মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি আছে, আপনি চাবি খুলিয়া তাহা বাহির করিয়া আমার হস্তে দেন; ঐ টাকা দিলে তিনি অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। শুনিবামাত্র, বিলাসিনী চিরঞ্জীবের বাক্স হইতে স্বর্ণমুদ্রার থলি আনিয়া কিঙ্করের হস্তে দিলেন এবং বলিলেন, অবিলম্বে তোমার প্রভুকে বাটীতে লইয়া আসিবে। সে স্বর্ণমুদ্রা লইয়া দ্রুত পদে প্রস্থান করিল; তাঁহারা দুই ভগিনীতে দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া বিষম অসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

হেমকূটের চিরঞ্জীব, কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধান পাঠাইয়া, বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত উৎসুক চিত্তে তদীয় প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিলেন, এবং সমধিক বিলম্ব দর্শনে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিঙ্করকে সত্বর সংবাদ আনিতে বলিয়াছিলাম, সে এখনও আসিল না কেন? যে জন্যে পাঠাইয়াছি, হয় ত তাহারই কোনও স্থিরতা করিতে পারে নাই, নয় ত পথিমধ্যে কোনও উৎপাতে পড়িয়াছে; নতুবা, যে বিষয়ের জন্য গিয়াছে, তাহাতে উপেক্ষা করিয়া বিষয়ান্তরে আসক্ত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না; কারণ, জয়স্থল হইতে পলাইবার নিমিত্ত সে আমা অপেক্ষাও ব্যস্ত হইয়াছে। অতএব, পুনরায় কোনও উপদ্রব ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ নগরের যে রঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে উপদ্রবঘটনার অপ্রতুল নাই। রাজপথে নির্গত হইলে সকল লোকেই আমার নামগ্রহণ পূর্ব্বক সম্বোধন ও সংবর্দ্ধনা করে; অনেকেই চিরপরিচিত সুহৃদয়ের ন্যায় প্রিয় সম্ভাষণ করে; কেহ কেহ এরূপ ভাবপ্রকাশ করে, যেন আমি নিজ অর্থ দ্বারা তাহাদের অনেক আনুকূল্য করিয়াছি, অথবা আমার সহায়তায় তাহারা বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়াছে; কেহ কেহ আমায় টাকা দিতে উদ্যত হয়; কেহ কেহ আহারের নিমন্ত্রণ করে; কেহ কেহ পরিবারের কুশলজিজ্ঞাসা করে; কেহ কেহ কহে, আপনি যে দ্রব্যের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা সংগৃহীত হইয়াছে, আমার দোকানে গিয়া দেখিবেন, না বাটীতে পাঠাইয়া দিব? পান্থনিবাসে আসিবার সময় এক দরজী পীড়াপীড়ি করিয়া দোকানে লইয়া গেল, এবং, আপনকার চাপকানের জন্যে এই গরদের থান আনিয়াছি বলিয়া, আমার গায়ের মাপ লইয়া ছাড়িয়া দিল; আবার এক স্বর্ণকার আমার হস্তে বহু মূল্যের হার দিয়া মূল্য না লইয়া চলিয়া গেল। কেহই আমায় বৈদেশিক বিবেচনা করে না। আমি যেন জয়স্থলের এক জন গণনীয় ব্যক্তি। আর মধ্যাহ্ন কালে দুই স্ত্রীলোক যে কাণ্ড

করিলেন, তাহা অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব। এ স্থানে মাদৃশ বৈদেশিক ব্যক্তির কোনও ক্রমে ভদ্রস্থতা নাই। এখানকার ব্যাপার বুঝিয়া উঠা ভার। যদি আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্থান করিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল। কিন্তু কিঙ্কর কি জন্যে এত বিলম্ব করিতেছ? যাহা হউক, তাহার প্রতীক্ষায় থাকিলে চলে না, অন্বেষণ করিতে হইল।

এই বলিয়া পান্থনিবাস হইতে বহির্গত হইয়া চিরঞ্জীব রাজপথে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর সত্বর গমনে তাঁহার সন্নিহিত হইল এবং বলিল; যে স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য আমায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই। ইহা বলিয়া সে স্বর্ণমুদ্রার থলি তাঁহার হস্তে দিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি রূপে সেই ভীষণমূর্ত্তি রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন; সে যে বড় টাকা না পাইয়া ছাড়িয়া দিল? তিনি স্বর্ণমুদ্রা দর্শনে ও কিঙ্করের কথা শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এ স্বর্ণমুদ্রা কোথায় পাইলে, এবং কি জন্যেই বা আমার হস্তে দিলে, বল; আমি ত তোমায় স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্যে পাঠাই নাই। কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়! রাজপুরুষ আপনার কারাগারে লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে আপনি আমায় দেখিতে পাইয়া আমার হস্তে একটি চাবি দিয়া বলিলেন, বাক্সের মধ্যে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণমুদ্রা আছে, চন্দ্রপ্রভার হস্তে এই চাবি দিলে তিনি তাহা বহিষ্কৃত করিয়া তোমার হস্তে দিবেন; তুমি ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না করিয়া আমার নিকটে আনিবে। তদনুসারে আমি এই স্বর্ণমুদ্রা আনিয়াছি। বোধ হয় আপনকার স্মরণ আছে, আমরা মধ্যাহ্ন কালে যে স্ত্রীলোকের আলয়ে আহার করিয়াছিলাম, তাঁহার নাম চন্দ্রপ্রভা। তিনি ও তাঁহার ভগিনী অবরোধের কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, এবং সত্বর আপনারে লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনকার যেরূপ অভিরুচি। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও আর সে বাটীতে প্রবেশ করিব না। আপনি বিপদে পড়িয়াছিলেন, কেবল এই অনুরোধে স্বর্ণমুদ্রা আনিতে গিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, আপনি যে এই অবান্ধব দেশে সহজে রাজপুরুষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, ইহাতে আমি বড় আহ্লাদিত হইয়াছি। তদপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই এক উপলক্ষে পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা অনায়াসে হস্তগত হইল।

এই সমস্ত কথা শুনিয়া, পরিহাসরসিক কিঙ্কর কৌতুক করিতেছে ইহা ভাবিয়া, চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে নরাধম! আমি তোমায় যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কোনও কথা না বলিয়া কেবল পাগলামি করিতেছ। এখান

হইতে অবিলম্বে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ, এই পরামর্শ স্থির করিয়া তোমায় জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলাম। অতএব বল, আজ কোনও জাহাজ জয়স্থল হইতে প্রস্থান করিবেক কি না, এবং তাহাতে আমাদের যাওয়া ঘটিবেক কি না। কিঙ্কর বলিল, সে কি মহাশয়! আমি যে এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আপনাকে সে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছি। তখন অবরোধের হঙ্গামে পড়িয়াছিলেন, সে জন্যেই হউক, আর অন্য কোনও কারণেই হউক, আপনি সে কথায় মনোযোগ করিলেন না, বরং আমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। নতুবা, এত ক্ষণ আমরা দ্রব্যসামগ্রী লইয়া জাহাজে উঠিতে পারিতাম। কিঙ্করের কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হতভাগ্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই পাগলের মত এত অসম্বদ্ধ কথা বলিতেছে; অথবা, উহারই বা অপরাধ কি, আমিও ত স্থানমাহাত্ম্যে অবিকল ঐরূপ হইয়াছি। উভয়েরই তুল্যরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। তিনি মনে মনে এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে কিঙ্কর একটি স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া চকিত হইয়া আকুল বচনে বলিল, মহাশয়! সাবধান হউন, ঐ দেখুন, আবার কে এক ঠাকুরাণী আসিতেছেন। উনি যাহাতে আহারের লোভ দেখাইয়া, অথবা অন্য কোনও ছলে বা কৌশলে ভুলাইয়া, আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারেন, তাহা করিবেন। পূর্ব্ব বারে যেমন পতিসম্ভাষণ করিয়া হাত ধরিয়া এক ঠাকুরাণী আপন বাটীতে লইয়া গেলেন, আপনি একটিও কথা না বলিয়া চোরের মত চলিয়া গেলেন, এ বার যেন সেরূপ না হয়।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব, স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিতে না পাইয়া, মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতানাম্নী যে কামিনীর বাটীতে আহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গুলি হইতে একটি মনোহর অঙ্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া লয়েন, এবং সেই অঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তাঁহাকে বসুপ্রিয়নির্ম্মিত মহামূল্য হার দিবার অঙ্গীকার করেন। হার যথাকালে উপস্থিত না হওয়াতে, লজ্জিত হইয়া তিনি স্বয়ং স্বর্ণকারের বিপণি হইতে হার আনিতে যান। অপরাজিতা, তাঁহার সমধিক বিলম্ব দর্শনে তদীয় অন্বেষণে নির্গত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ পরে হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে দেখিতে পাইলেন, এবং জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়া তাঁহার সন্নিহিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আমায় যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনকার গলায় এ কি সেই হার? এ বেলা আমার বাটীতে আহার করিতে হইবেক; আপনাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। এ আবার কোথাকার আপদ্ উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া, চিরঞ্জীব রোষকষায়িত লোচনে

সাতিশয় পরুষ বচনে বলিলেন, অরে মায়াবিনি ! তুমি দূর হও ; তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি, আমায় কোনও প্রকারে প্রলোভনপ্রদর্শন করিও না। কিঙ্কর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া স্বীয় প্রভুকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহাশয় ! সাবধান হইবেন, যেন এ রাক্ষসীর মায়ায় ভুলিয়া উহার বাটীতে আহার করিতে না যান।

উভয়ের ভাবদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে অপরাজিতা বিস্মিত না হইয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, মহাশয় ! আপনি যেমন পরিহাসপ্রিয়, আপনকার ভৃত্যটি আবার তদপেক্ষা অধিক। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাটীতে যাইবেন কি না, বলুন , আমি আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয় ! আমি পুনরায় সাবধান করিতেছি, আপনি কদাচ এই পিশাচীর মায়ায় ভুলিবেন না। তখন চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন অরে পাপীয়সি ! তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক যে, তুমি আমায় আহার করিতে ডাকিতেছ। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এখানকার স্ত্রীলোক মাত্রেই ডাকিনী। স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি ভাল চাও, অবিলম্বে আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবের সহিত এই স্ত্রীলোকের বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল ; তিনি যে তাঁহার প্রতি এবংবিধ অযুক্ত আচরণ করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। চিরঞ্জীববাবুব নিকট এরূপে অপমানিত হইলাম, এই ভাবিয়া তিনি সাতিশয় রোষপ্রকাশ ও অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন, এত কাল আপনাকে ভদ্র বলিয়া জানিতাম ; কিন্তু আপনি যেমন ভদ্র, আজ তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম। সে যাহা হউক, মধ্যাহ্নে আহারের সময় আমার অঙ্গুলি হইতে যে অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন, হয় তাহা ফিরিয়া দেন, নয় উহার বিনিময়ে যে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা দেন ; দুয়ের এক পাইলেই আমি চলিয়া যাই ; তৎপরে আর এ জন্মে আপনকার সহিত আলাপ করিব না, এবং প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও কোনও সংস্রব রাখিব না। এই সকল কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, অন্য অন্য ডাইন, ছাড়িবার সময়, ঝাঁটা, কুলো, শিল, নোড়া, বা ছেঁড়া জুতা পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া যায়, এ দিব্যাঙ্গনা ডাইনটির অধিক লোভ, দেখিতেছি ; ইনি হয় হার; নয় আঙটি, দুয়ের একটি না পাইলে যাইবেন না। মহাশয় ! সাবধান, কিছুই দিবেন না ; দিলেই অনর্থপাত হইবেক। অপরাজিতা কিঙ্করের কথার উত্তর না দিয়া চিরঞ্জীবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয় ! হয় হার, নয় আঙটি দেন। বোধ করি, আমায় ঠকান আপনকার অভিপ্রেত

নহে। চিরঞ্জীব উত্তরোত্তর অধিকতর কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, আরে ডাকিনি! দূর হও। এই বলিয়া কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

এইরূপে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া অপরাজিতা কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; অনন্তর মনে মনে বলিতে লাগিলেন, চিরঞ্জীববাবু নিঃসন্দেহ উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন, নতুবা উঁহার আচরণ এরূপ বিসদৃশ হইবেক কেন? চির কাল আমরা উঁহাকে সুশীল, সুবোধ, দয়ালু, ও অমায়িক লোক বলিয়া জানি; কেহ কখনও কোনও কারণে উঁহারে ক্রোধের বশীভূত হইতে দেখি নাই; আজ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। উন্মাদ ব্যতিরেকে এরূপ ভাবান্তর কোনও ক্রমে সম্ভবে না। ইনি বিনিময়ে হার দিবার অঙ্গীকার করিয়া অঙ্গুরীয় লইয়াছেন; এখন আমায় কিছু দিতে চাহিতেছেন না। ইনি সহজ অবস্থায় এরূপ করিবার লোক নহেন। মধ্যাহ্নকালে আমার আলয়ে আহার করিবার সময় বলিয়াছিলেন, চন্দ্রপ্রভা আজ উঁহাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তখন এ কথার ভাব বুঝিতে পারি নাই। এখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন বলিয়াই তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন আমি কি করি? অথবা উঁহার স্ত্রীর নিকটে গিয়া বলি, আপনকার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়া মধ্যাহ্নকালে আমার বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং বল পূর্ব্বক আমার অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন করিয়াছেন। ইহা শুনিলে তিনি অবশ্যই আমার অঙ্গুরীয়প্রতিপ্রাপ্তির কোনও উপায় করিবেন। আমি অকারণে এক শত টাকা মূল্যের বস্তু হারাইতে পারি না। এই স্থির করিয়া তিনি চিরঞ্জীবের আলয় অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব মনে করিয়াছিলেন, কিঙ্কর সত্বর স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিবেক। কিন্তু বহু ক্ষণ পর্য্যন্ত সে না আসাতে তিনি অবরোধকারী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি অকারণে আমায় কষ্ট দিতেছ; যে টাকার জন্য আমি অবরুদ্ধ হইয়াছি, বাটী যাইবামাত্র তাহা দিতে পারি। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চল। আর, আমি কারাগার হইতে বহির্গত হইলে পথে তোমার হাত ছাড়াইয়া পলাইব, সে আশঙ্কা করিও না। আমি নিতান্ত সামান্য লোকও নই, এবং তোমার অথবা অন্য কোনও রাজপুরুষের নিতান্ত অপরিচিতও নই। কিঙ্কর টাকা না লইয়া আসিবার দুই কারণ বোধ হইতেছে, প্রথম এই যে, আমি জয়স্থলে কোনও কারণে অবরুদ্ধ হইব, আমার স্ত্রী সহজে তাহাতে বিশ্বাস করিবেন না; সুতরাং, কিঙ্করের কথা শুনিয়া উপহাস করিয়াছেন। দ্বিতীয় এই যে, কি কারণে বলিতে পারি না, তিনি আজ সম্পূর্ণ বিকলচিত্ত হইয়া

আছেন ; হয় ত সেই জন্যে কিঙ্করের কথিত বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই। রাজপুরুষ সম্মত হইলেন ; চিরঞ্জীব তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বীয় ভবনের দিকে চলিলেন।

কিয়ৎ দূর গমন করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া চিরঞ্জীব রাজপুরুষকে বলিলেন, ঐ আমার লোক আসিতেছে। ও টাকার সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আর তোমায় আমার বাটী পর্য্যন্ত যাইতে হইবেক না। অল্প ক্ষণের মধ্যেই কিঙ্কর সম্মুখবর্ত্তী হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন কিঙ্কর! যে জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সংগ্রহ হইয়াছে কি না। সে বলিল, হাঁ মহাশয়! তাহার সংগ্রহ না করিয়া আমি আপনকার নিকটে আসি নাই। এই বলিয়া সে ক্রীত রজ্জু তাঁহাকে দেখাইল। চিরঞ্জীব বলিলেন, বলি, টাকা কোথায়? সে বলিল, আর টাকা আমি কোথায় পাইব? আমার নিকটে যাহা ছিল, তাহা দিয়া এই দড়ি কিনিয়া আনিয়াছি। তিনি বলিলেন, এক গাছা দড়ি কিনিতে কি পাঁচ শত টাকা লাগিল। এখন পাগলামি ছাড়; বল, আমি যে জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ীতে পাঠাইলাম, তাহার কি হইল। সে বলিল, আপনি আমায় দড়ি কিনিয়া বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন; দড়ি কিনিয়াছি এবং তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতেছি। চিরঞ্জীব সাতিশয় কুপিত হইয়া কিঙ্করকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সমভিব্যাহারী রাজপুরুষ চিরঞ্জীবকে বলিলেন, মহাশয়! এত অধৈর্য্য হইবেন না; সহিষ্ণুতা যে কত বড় গুণ, তাহা কি আপনি জানেন না? এই কথা শুনিয়া কিঙ্কর বলিল, উঁহারে সহিষ্ণু হইবার উপদেশ দিবার প্রয়োজন কি? যে কষ্টভোগ করে, তাহারই সহিষ্ণুতা গুণ থাকা আবশ্যক; আমি প্রহারের কষ্টভোগ করিতেছি; আমায় বরং আপনি ঐ উপদেশ দেন। তখন রাজপুরুষ রোষপ্রদর্শন করিয়া বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! যদি ভাল চাও, মুখ বন্ধ কর। কিঙ্কর বলিল, আমায় মুখ বন্ধ করিতে বলা অপেক্ষা উঁহাকে হস্ত বন্ধ করিতে বলিলে ভাল হয়।

এই সকল কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্রোধান্বিত হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে অচেতন নরাধম! আর আমার বিরক্ত করিও না। সে বলিল, আমি অচেতন হইলে আমার পক্ষে ভাল হইত। যদি অচেতন হইতাম, আপনি প্রহার করিলে কষ্টের অনুভব করিতাম না। তিনি বলিলেন, তুমি অন্য সকল বিষয়ে অচেতন, কেবল প্রহারসহন বিষয়ে নহে; সে বিষয়ে তোমায় ও গর্দ্দভে কোনও অংশে প্রভেদ নাই। সে বলিল, আমি যে গর্দ্দভ, তার

সন্দেহ কি ; গর্দ্দভ না হইলে আমার কান লম্বা হইবেক কেন। এই বলিয়া রাজপুরুষকে সম্ভাষণ করিয়া কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! জন্মাবধি প্রাণপণে ইঁহার পরিচর্য্যা করিতেছি ; কিন্তু কখনও প্রহার ভিন্ন অন্য পুরস্কার পাই নাই। শীতবোধ হইলে প্রহার করিয়া গরম করিয়া দেন ; গরম বোধ হইলে প্রহার করিয়া শীতল করিয়া দেন ; নিদ্রাবেশ হইলে প্রহার করিয়া সজাগর করিয়া দেন ; বসিয়া থাকিলে প্রহার করিয়া উঠাইয়া দেন ; কোনও কাজে পাঠাইতে হইলে প্রহার করিয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া দেন ; কার্য্যসমাধা করিয়া বাটীতে আসিলে প্রহার করিয়া আমার সংবর্দ্ধনা করেন ; কথায় কথায় কান ধরিয়া টানেন, তাহাতেই আমার কান এত লম্বা হইয়াছে। বলিতে কি মহাশয়! কেহ কখনও এমন গুণের মনিব ও এমন সুখের চাকরি পাইবেক না ; আমি ইঁহার আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাইতেছি।

এই সময়ে চিরঞ্জীব দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী কতকগুলি লোক সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। তখন তিনি কিঙ্করকে বলিলেন, অরে বানর! আর তোমার পাগলামি করিবার প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট হইয়াছে ; যদি ভাল চাও, এখন এখান হইতে চলিয়া যাও ; আমার গৃহিণী আসিতেছেন। কিঙ্কর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণী! শীঘ্র আসুন ; বাবু আজ আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিবেন ; হারের পরিবর্ত্তে এক রমণীয় উপহার পাইবেন। এই বলিয়া হস্তস্থিত রজ্জু উত্তোলিত করিয়া সে তাঁহাকে দেখাইতে লাগিল। চিরঞ্জীব ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অপরাজিতার মুখে চিরঞ্জীবের উন্মাদের সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া, চন্দ্রপ্রভা বিদ্যাধরনামক এক ব্যক্তিকে ডাকাইয়া আনেন। বিদ্যাধর ঐ পাড়ার গুরুমহাশয় ছিল ; কিন্তু অবসরকালে পাড়ায় পাড়ায় চিকিৎসা করিয়া বেড়াইত। অনেকে বিশ্বাস করিত, ভূতে পাইলে কিংবা ডাইনে খাইলে সে অনায়াসে প্রতিকার করিতে পারে ; এ জন্য সে ঐ পল্লীর স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের নিকট বড় মান্য ও আদরণীয় ছিল। বিখ্যাত বিজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসা করিলেও, বিদ্যাধর না দেখিলে তাহাদের মনের সন্তোষ হইত না। ফলতঃ ঐ সকল লোকের নিকটে বিদ্যাধরের প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সে উপস্থিত হইলে চন্দ্রপ্রভা স্বামীর পীড়ার বৃত্তান্ত বলিয়া তাহার হস্তে ধরিয়া বলেন, তুমি সত্বর তাঁহাকে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও, তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। সে বলে, আপনি কোনও ভাবনা করিবেন না।

আমি অনেক বিদ্যা জানি ; আমার পিতা মাতা না বুঝিয়া আমায় বিদ্যাধর নাম দেন নাই। সে যাহা হউক, অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে আনা আবশ্যক। চলুন, আমি সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু উন্মত্ত ব্যক্তিকে আনা সহজ ব্যাপার নহে ; অতএব লোক সঙ্গে লইতে হইবেক। চন্দ্রপ্রভা পাঁচ সাত জন লোকের সংগ্রহ করিয়া, বিদ্যাধর, বিলাসিনী, ও অপরাজিতাকে সঙ্গে লইয়া চিরঞ্জীবের অন্বেষণে নির্গত হইয়াছিলেন।

যে সময়ে চিরঞ্জীব ক্রোধে অধীর হইয়া কিঙ্করকে প্রহার ও তিরস্কার করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। অপরাজিতা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ, তোমার স্বামী উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন কি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, উঁহার ব্যবহার ও আকার প্রকার দেখিয়া আমার আর সে বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে না। ইহা কহিয়া তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, দেখ, তুমি অনেক মন্ত্র, অনেক ঔষধ, এবং চিকিৎসার অনেক কৌশল জান ; এক্ষণে সত্বর উঁহারে প্রকৃতিস্থ কর ; তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই দিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিব। বিলাসিনী সাতিশয় দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, হায়! কোথা হইতে এমন সর্ব্বনাশিয়া রোগ আসিয়া জুটিল ; উঁহার সে আকার নাই, সে মুখশ্রী নাই ; কখনও উঁহার এমন বিকট মূর্ত্তি দেখি নাই, উঁহার দিকে তাকাইতেও ভয় হইতেছে। বিদ্যাধর চিরঞ্জীবকে বলিল, বাবু! তোমার হাতটা দাও, নাড়ীর গতি কিরূপ দেখিব। চিরঞ্জীব যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া বলিলেন, এই আমার হাত, তুমি কানটি বাড়াইয়া দাও। তখন বিদ্যাধর স্থির করিল, চিরঞ্জীবের শরীরে ভূতাবেশ বশতঃ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তদনুসারে সে কতিপয় মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া তাঁহার দেহগত ভূতকে সম্বোধিয়া বলিতে লাগিল, অরে দুরাত্মন্ পিশাচ! আমি তোরে আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে উঁহার কলেবর হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান কর। চিরঞ্জীব শুনিয়া নিরতিশয় ক্রোধভরে বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! অরে পাপিষ্ঠ! অরে অর্থপিশাচ! চুপ কর, আমি পাগল হই নাই। শুনিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বাষ্পাকুল লোচনে অতি দীন বচনে বলিলেন, পূর্ব্বে ত তুমি এরূপ ছিলে না ; আমার নিতান্ত পোড়া কপাল বলিয়া আজ অকস্মাৎ এই বিষম রোগ তোমার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। চন্দ্রপ্রভার বাক্যশ্রবণে চিরঞ্জীবের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহারে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অরে পাপীয়সি! এই নরাধম বুঝি আজ কাল তোর অন্তরঙ্গ

হইয়াছে? এই দুরাত্মার সঙ্গে আহার বিহারের আমোদে মত্ত হইয়াই বুঝি দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি, এবং আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দিস্ নাই? শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা চকিত হইয়া বলিলেন, ও কি কথা বলিতেছ, তোমার আসিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল বটে, তার পরে ত সকলে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি। তুমি আহারের পর বরাবর বাটীতে ছিলে, কিঞ্চিৎ কাল পূর্ব্বে কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিয়াছ। এখন কি কারণে এরূপ ভৎ´সনা করিতেছ ও এরূপ কুৎসিত কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব স্বীয় অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে কিঙ্কর! আজ আমি কি মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আহার করিয়াছি? সে বলিল, না মহাশয়! আজ আপনি বাটীতে আহার করেন নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আমি আজ যখন আহার করিতে যাই, বাটীর দ্বার রুদ্ধ ছিল কি না, এবং আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছিল কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হ্যাঁ, বাটীর দ্বার রুদ্ধ করা ছিল এবং আপনাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, আচ্ছা, উনি নিজে অভ্যন্তর হইতে আমাকে গা´ল দিয়াছিলেন কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হ্যাঁ, উনি অত্যন্ত কটু বাক্য বলিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসিলেন, তৎপরে আমি অবমানিত বোধ করিয়া ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যাই কি না? সে বলিল, আজ্ঞা হাঁ, তার পর আপনি ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া যান।

এই প্রশ্নোত্তরপরম্পরা শ্রবণগোচর করিয়া চন্দ্রপ্রভা আপেক্ষবচনে কিঙ্করকে বলিলেন, তুমি বিলক্ষণ প্রভুভক্ত; প্রভুর যথার্থ হিতচেষ্টা করিতেছ। যাহাতে উঁহার মনের শান্তি হয়, সে চেষ্টা না করিয়া কেবল রাগবৃদ্ধি করিয়া দিতেছ। বিদ্যাধর বলিল, আপনি উঁহার অন্যায় তিরস্কার করিতেছেন; ও অবিবেচনার কর্ম্ম করিতেছে না। ও ব্যক্তি উঁহার রীতি ও প্রকৃতি বিলক্ষণ জানে। এরূপ অবস্থায় চিত্তের অনুবর্ত্তন করিলে যেরূপ উপকার দর্শে, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হয় না। চিরঞ্জীব চন্দ্রপ্রভার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুই স্বর্ণকারের সহিত যোগ দিয়া আমায় কয়েদ করাইয়াছিস; নতুবা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইলি না কেন। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, সে কি নাথ! এমন কথা বলিও না; কিঙ্কর আসিয়া অবরোধের উল্লেখ করিবামাত্র আমি উহা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছি। কিঙ্কর চকিত হইয়া বলিল, আমা দ্বারা পাঠাইয়াছেন। আপনকার যাহা ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই বলিতেছেন। এই বলিয়া সে চিরঞ্জীবকে বলিল, না মহাশয়! আমার হস্তে

এক পয়সাও দেন নাই; আপনি উঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন না। তখন চিরঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি স্বর্ণমুদ্রা আনিবার জন্য উঁহার নিকটে যাও নাই? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, ও আমার নিকটে গিয়াছিল, বিলাসিনী তদ্দণ্ডে উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছে। বিলাসিনীও বলিলেন, আমি স্বয়ং উহার হস্তে স্বর্ণমুদ্রার থলি দিয়াছি। তখন কিঙ্কর বলিল, পরমেশ্বর জানেন এবং যে রজ্জু বিক্রয় করে সে জানে, আপনি দড়ি কেনা বই আজ আমায় আর কোনও কর্ম্মে পাঠান নাই।

এই সমস্ত কথোপকথন শ্রবণগোচর করিয়া বিদ্যাধর চন্দ্রপ্রভাকে বলিল, দেখুন, প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই ভূতাবিষ্ট হইয়াছেন, আমি উভয়ের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। বন্ধন করিয়া অন্ধকারগৃহে রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে প্রতিকার হইবেক না। চন্দ্রপ্রভা সম্মতিপ্রদান করিলেন। শুনিয়া কোপে কম্পমান হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, অরে মায়াবিনি! অরে দুশ্চারিণি! তুই এত দিন আমায় এমন মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলি যে, তোরে নিতান্ত পতিপ্রাণা কামিনী স্থির করিয়া রাখিযাছিলাম, এখন দেখিতেছি, তুই ভয়ঙ্কর কালভুজঙ্গী; অসৎ অভিপ্রায়ের সাধনের নিমিত্ত, এই সকল দুরাচারদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমার প্রাণবধের চেষ্টা দেখিতেছিল এবং উন্মাদের প্রচার করিয়া বন্ধন পূর্ব্বক অন্ধকারময় গৃহে রাখিবি, এই মনস্থ করিয়া আসিয়াছিস। আমি তোর দুরভিসন্ধির সমুচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি কোপজ্বলিত লোচনে উদ্ধত গমনে চন্দ্রপ্রভার দিকে ধাবমান হইলেন। চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া সন্নিহিত লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছ; তোমাদের কি আচরণ বুঝিতে পারিতেছি না; শীঘ্র উঁহার বন্ধন কর, আমার নিকটে আসিতে দিও না। তখন চিরঞ্জীব বলিলেন, যেরূপ দেখিতেছি, তুই নিতান্তই আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিস।

অনন্তর চন্দ্রপ্রভার আদেশ অনুসারে সমভিব্যাহারী লোকেরা বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে, চিরঞ্জীব নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া রাজপুরুষকে বলিলেন, দেখ, আমি এক্ষণে তোমার অবরোধে আছি; এ অবস্থায় আমায় কি রূপে ছাড়িয়া দিবে? ছাড়িয়া দিলে তুমি সম্পূর্ণ অপরাধী হইবে। তখন রাজপুরুষ চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, আপনি উঁহারে আমার নিকট লইয়া যাইতে পারিবেন না, উনি অবরোধে আছেন। এই কথা শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অহে রাজপুরুষ! তুমি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিতেছ ও স্বকর্ণে শুনিতেছ, তথাপি

কোন্ বিবেচনায় উঁহারে ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছ না? উঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, বোধ করি, তোমার আমোদ হইতেছে। রাজপুরুষ বলিলেন, আপনি অন্যায় অনুযোগ করিতেছেন; উঁহাকে ছাড়িয়া দিলে আমি পাঁচ শত টাকার দায়ে পড়িব। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি আমায় উঁহারে লইয়া যাইতে দাও; আমি ধর্ম্মপ্রমাণ অঙ্গীকার করিতেছি, উঁহার ঋণপরিশোধ না করিয়া তোমার নিকট হইতে যাইব না। তুমি আমায় উঁহার উত্তমর্ণের নিকটে লইয়া চল। কি জন্যে ঋণ হইল, তাঁহার মুখে শুনিয়া টাকা দিব। তদনন্তর তিনি বিদ্যাধরকে বলিলেন, তুমি উঁহারে সাবধানে বাটীতে লইয়া যাও, আমি এই রাজপুরুষের সঙ্গে চলিলাম। বিলাসিনি! তুমি আমার সঙ্গে এস। বিদ্যাধর! তোমরা বিলম্ব করিও না, চলিয়া যাও; সাবধান, যেন কোনও রূপে বন্ধন খুলিয়া পলাইতে না পারেন! অনন্তর, বিদ্যাধর দৃঢ়বদ্ধ চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া প্রস্থান করিল।

বিদ্যাধর প্রভৃতি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে চন্দ্রপ্রভা রাজপুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কোন্ ব্যক্তির অভিযোগে অবরুদ্ধ হইয়াছেন, বল। তিনি বলিলেন, বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের; আপনি কি তাঁহাকে জানেন। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন হ্যাঁ আমি তাঁহাকে জানি; তিনি কি জন্যে কত টাকা পাইবেন, জান। রাজপুরুষ বলিলেন, স্বর্ণকার এক ছড়া হার গড়িয়া দিয়াছেন, তাহার মূল্য পান নাই। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার জন্যে হার গড়িতে দিয়াছেন, শুনিয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্যন্ত হার দেখি নাই। অপরাজিতা বলিলেন, আজ আমার বাটীতে আহার করিতে গিয়া, উনি আমার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয় লইয়া পলায়ন কলিলে পর, কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে পথে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; তখন উঁহার গলায় এক ছড়া নূতন গড়া হার দেখিয়াছি! চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, যাহা বলিতেছ অসম্ভব নয়। কিন্তু আমি কখনও সে হার দেখি নাই। যাহা হউক, অহে রাজপুরুষ! সত্বর আমায় স্বর্ণকারের নিকটে লইয়া চল; তাঁহার নিকট সবিশেষ না শুনিলে প্রকৃত কথা জানিতে পারিতেছি না।

হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব, ভৎর্সনা ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা অপরাজিতাকে দূর করিয়া দিয়া, কিঙ্কর সমভিব্যাহারে যে রাজপথে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতিও সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। বিলাসিনী দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, দিদি! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ঐ দেখ, তিনি ও কিঙ্কর উভয়েই বন্ধন খুলিয়া পলাইয়া

আসিয়াছেন। এখন কি উপায় হয়? চন্দ্রপ্রভা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া রাজপথবাহী লোকদিগকে ও সমভিব্যাহারী রাজপুরুষকে বলিতে লাগিলেন, যে রূপে পার, তোমরা উঁহারে বদ্ধ করিয়া আমার নিকটে দাও। এই উপলক্ষে বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হইল। চিরঞ্জীব দেখিলেন, যে মায়াবিনী মধ্যাহ্নকালে ধরিয়া বাটীতে লইয়া গিয়াছিল, সে এক্ষণে এক রাজ-পুরুষ সঙ্গে করিয়া আসিতেছে। ইহাতেই তিনি ও তাঁহার সহচর কিঙ্কর বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছিলেন; পরে, তাঁহারা, বন্ধন করিয়া লইয়া যাইবার পরামর্শ করিতেছেন জানিতে পারিয়া, তরবারিনিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রহারের অভিপ্রায়ে তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, চন্দ্রপ্রভা ও তাঁহার ভগিনীকে সম্ভাষণ করিয়া রাজপুরুষ বলিলেন, একে উঁহাদের উন্মাদ অবস্থা তাহাতে আবার হস্তে তরবারি; এ সময়ে বন্ধনের চেষ্টা পাইলে অনেকের প্রাণহানির সম্ভাবনা। আমি এ পরামর্শে নাই, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি হয়, কর; আমি চলিলাম, আর এখানে থাকিব না; আমার বোধে তোমাদেরও পলায়ন করা ভাল। এই বলিয়া রাজপুরুষ চলিয়া গেলে চন্দ্রপ্রভা ও বিলাসিনী অধিক লোকের সংগ্রহের নিমিত্ত প্রয়াণ করিলেন।

সকলকে আকুল ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া, চিরঞ্জীব স্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কিঙ্কর! এখানকার ডাকিনীরা তরবারি দেখিলে ভয় পায়। ভাগ্যে আমাদের সঙ্গে তরবারি ছিল; নতুবা পুনরায় আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত, এবং অবশেষে কি করিত, বলিতে পারি না। কিঙ্কর বলিল, মহাশয়! যিনি মধ্যাহ্নকালে আপনকার স্ত্রী হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, দেখিলাম, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক ভয় পাইয়াছেন এবং সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিয়াছেন। তরবারি ডাইন তাড়াইবার এমন মন্ত্র, তাহা আমি এত দিন জানিতাম না। চিরঞ্জীব বলিলেন, দেখ কিঙ্কর! যত শীঘ্র জাহাজে উঠিতে পারি ততই মঙ্গল; একানকার যেরূপ কাণ্ড তাহাতে কখন কি উপস্থিত হয় বলা যায় না। অতএব চল, পান্থনিবাসে গিয়া দ্রব্যসামগ্রী লইয়া সন্ধ্যার মধ্যেই জাহাজে উঠিব। কিঙ্কর বলিল, আপনি এত ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আজকার রাত্রি এখানে থাকুন। উহারা কখনই আমাদের অনিষ্ট করিবেক না। আমরা প্রথমে উহাদিগকে যত ভয়ঙ্কার ভাবিয়াছিলাম, উহারা সেরূপ নহে। দেখুন; কেমন মিষ্ট কথা কয়; বাটীতে লইয়া গিয়া কেমন উত্তম আহার করায়; কখনও দেখা শুনা নাই, তথাপি পতিসম্ভাষণ করিয়া প্রণয় করিতে চায়; আবার, প্রয়োজন জানাইলে অকাতরে স্বর্ণমুদ্রাপ্রদান করে।

ইহাতেও যদি আমরা উহাদিগকে অভদ্র বলি, লোকে আমাদিগকে কৃতঘ্ন বলিবেক। আমি ত আপনকার সঙ্গে অনেক দেশ বেড়াইয়াছি, কোথাও এরূপ সৌজন্য ও এরূপ বদান্যতা দেখি নাই। বলিতে কি মহাশয়! আমি উহাদের ব্যবহার দেখিয়া এত মোহিত হইয়াছি যে, যদি পাকশালার হস্তিনী আমার স্ত্রী হইতে না চাহিত, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ আহ্লাদিত চিত্তে এই রাজ্যে বাস করিতাম। চিরঞ্জীব শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! অধিক আর কি বলিব, যদি এ রাজ্যের অধিরাজপদ পাই, তথাপি আমি কোনও ক্রমে এখানে রাত্রিবাস করিব না। চল, আর বিলম্বে কাজ নাই; সন্ধ্যার মধ্যেই অর্ণবপোতে আরোহণ করিতে হইবেক। এই বলিয়া উভয়ে পান্থনিবাস অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাজপুরুষ জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীবকে লইয়া তদীয় আলয় অভিমুখে প্রয়াণ করিলে পর, উত্তমর্ণ বণিক্ অধমর্ণ স্বর্ণকারকে বলিলেন, তোমায় টাকা দিয়া পাইতে এত কষ্ট হইবেক, তাহা আমি এক বারও মনে করি নাই। হয় ত এই টাকার গোলে আজ আমার যাওয়া না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইব। এখন বোধ হইতেছে, সে সময়ে তোমার উপকার করিয়া ভাল করি নাই। স্বর্ণকার সাতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আর আমায় লজ্জা দিবেন না; আমি আপনকার আবশ্যক সময়ে টাকা দিতে না পারিয়া মরিয়া রহিয়াছি। চিরঞ্জীববাবু যে আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিবেন, ইহা স্বপ্নের অগোচর। উনি যে হার লইয়া পাই নাই বলিবেন, অথবা টাকা দিতে আপত্তি করিবেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হয় নাই। আপনি এ সন্দেহ করিবেন না যে আমি উহাকে হার দি নাই, কেবল আপনকার সঙ্গে ছল করিতেছি। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, চারি দণ্ড পূর্ব্বে আমি নিজে উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি সে সময়ে মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন; আমার কুবুদ্ধি, আমি বলিলাম এখন কার্য্যান্তরে যাইতেছি; পরে সাক্ষাৎ করিব ও মূল্য লইব। উনি কিন্তু সে সময়ে বলিয়াছিলেন, এখন না লও, পরে আর পাইবার

সম্ভাবনা থাকিবেক না। তৎকালে কি অভিপ্রায়ে উনি এ কথা বলিয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু কার্য্যগতিকে উঁহার কথাই ঠিক হইতেছে।

স্বর্ণকারের এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বলি, চিরঞ্জীববাবু লোক কেমন? বসুপ্রিয় বলিলেন, উনি জয়স্থলে সর্ব্ব বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যক্তি। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উঁহাকে জানে এবং সকলেই উঁহাকে ভাল বাসে। উনি সকল সমাজে সমান আদরণীয় ও সর্ব্ব প্রকারে প্রশংসনীয় ব্যক্তি। ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য বিষয়ে এ রাজ্যে উঁহার তুল্য লোক নাই। কখনও কোনও বিষয়ে উঁহার কথা অন্যথা হয় না। পরোপকারার্থে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। উনি যে আজ আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিলেন, শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবেক না। এই সকল কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আমরা আর এখানে অনর্থক বসিয়া থাকি কেন? চল, উঁহার বাটীতে যাই; তাহা হইলে শীঘ্র টাকা পাইব, এবং হয় ত আজই যাইতে পারিব। অনন্তর বসুপ্রিয় ও বণিক্ উভয়ে চিরঞ্জীবের ভবন অভিমুখে গমন করিলেন।

এই সময়ে, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব কিঙ্কর সমভিব্যাহারে পান্থনিবাসে প্রতিগমন করিতেছিলেন। বণিক্ দূর হইতে দেখিতে পাইয়া বসুপ্রিয়কে বলিলেন, আমার বোধ হয় চিরঞ্জীববাবু আসিতেছেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ তিনিই বটে; আর, আমার নির্ম্মিত হারও উঁহার গলায় রহিয়াছে, দেখিতেছি; অথচ, দেখুন, আপনকার সমক্ষে উনি স্পষ্ট বাক্যে বারংবার হার পাই নাই বলিলেন, এবং আমার সঙ্গে কত বিবাদ ও কত বাদানুবাদ করিলেন। এই বলিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া বসুপ্রিয় বলিলেন, চিরঞ্জীববাবু! আমি আজ আপনকার আচরণ দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। আপনি কেবল আমায় কষ্ট দিতেছেন ও অপদস্থ করিতেছেন, এরূপ নহে; আপনকারও বিলক্ষণ অপযশ হইতেছে। এখন হার পরিয়া রাজপথে বেড়াইতেছেন; কিন্তু তখন অনায়াসে শপথ পূর্ব্বক হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিলেন। আপনকার এরূপ ব্যবহারে এই এক ভদ্র লোকের কত কার্য্যক্ষতি হইল, বলিবার নয়। উনি স্থানান্তরে যাইবার সমুদয় স্থির করিয়াছিলেন; এত ক্ষণ কোন্ কালে চলিয়া যাইতেন; কেবল আমাদের বিবাদের জন্যে যাইতে পারিলেন না। তখন অনায়াসে হারপ্রাপ্তির অপলাপ করিয়াছেন, এখনও কি করিবেন?

বসুপ্রিয়ের এই কথা শুনিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে এই হার পাইয়াছি বটে; কিন্তু এক বারও তাহার অস্বীকার করি নাই; তুমি সহসা আমার উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছ কেন? তখন বণিক্ বলিলেন,

হা আপনি অস্বীকার করিয়াছেন, এবং হার পাই নাই বলিয়া বারংবার শপথ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি শপথ অস্বীকার করিয়াছি; তাহা কে শুনিয়াছে? বণিক্ বলিলেন, আমি নিজে স্বকর্ণে শুনিয়াছি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে, আপনকার মত নরাধমেরা ভদ্রসমাজে প্রবেশ করিতে পায়। শুনিয়া কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, তুই বেটা বড় পাজি ও বড় ছোট লোক; অকারণে আমায় কটু বলিতেছিস। আমি ভদ্র কি অভদ্র, তাহা এখনই তোরে শিখাইতেছি। মর বেটা পাজি, যত বড মুখ তত বড় কথা। এই বলিয়া তিনি তরবারি নিষ্কাশিত করিলেন; এবং বণিকও তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইলেন।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা কতকগুলি লোক সঙ্গে করিয়া সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং, বণিকের সহিত হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবের দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া, স্বীয় পতি জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এই বোধে, সাতিশয় কাতরতাপ্রদর্শন পূর্ব্বক বণিক্কে বলিলেন, দোহাই ধর্ম্মের, উঁহারে প্রহার করিবেন না, উনি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় কোনও কারণে উঁহার উপর রাগ করা উচিত নয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতেছি, দয়া করিয়া ক্ষান্ত হউন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা কৌশল করিয়া উঁহার হাত হইতে তরবারি ছাড়াইয়া লও, এবং প্রভু ও ভৃত্য উভয়কে বদ্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া চল। চন্দ্রপ্রভাকে সহসা সমাগত দেখিয়া ও তদীয় আদেশবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিঙ্কর চিরঞ্জীবকে বলিল, মহাশয়! আমার সেই মায়াবিনী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন; আর এখানে দাঁড়াইবেন না, পলায়ন করুন, নতুবা নিস্তার নাই। এই বলিয়া সে চারি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া বলিল, মহাশয়! আসুন, এই দেবালয়ে প্রবেশ করি; তাহা হইলে আমাদের উপর কেহ আর অত্যাচার করিতে পারিবেক না। তৎক্ষণাৎ উভয়ে দৌড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। চন্দ্রপ্রভা, বিলাসিনী, ও তাহাদের সমভিব্যাহারের লোক সকল দেবালয়ের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। এই গোলযোগ উপস্থিত দেখিয়া রাজপথবাহী লোক সকলও তথায় সমবেত হইতে লাগিল।

ঐ দেবালয়ের কার্য্যপর্য্যবেক্ষণের সমস্ত ভার এক বর্ষীয়সী তপস্বিনীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইনি যার পর নাই সুশীলা ও নিরতিশয় দয়াশীলা ছিলেন, এবং সুচারুরূপে দেবালয়ের কার্য্যসম্পাদন করিতেন; এজন্য, জয়স্থলবাসী যাবতীয় লোকের বিলক্ষণ ভক্তিভাজন ও সাতিশয় শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। অভ্যন্তর হইতে অকস্মাৎ বিষম গোলযোগ শুনিয়া, কারণ জানিবার নিমিত্ত তিনি দেবালয়

হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত লোকদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্তে তোমরা এখানে গোলযোগ করিতেছ। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আমার উন্মাদগ্রস্ত স্বামী পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন. আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে ও আমার লোকদিগকে ভিতরে যাইতে দেন; আমরা তাঁহারে বদ্ধ করিয়া বাটী লইয়া যাইব। তপস্বিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, কত দিন তিনি এই দুর্দ্দান্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, পাঁচ সাত দিন হইতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই বিরক্ত, অন্যমনস্ক, ও দুর্ভাবনায় অভিভূত দেখিতাম; কিন্তু আজ আড়াই প্রহরের সময় অবধি এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছেন। এই বলিয়া তিনি সঙ্গের লোকদিগকে বলিলেন, তোমরা ভিতরে গিয়া তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বদ্ধ করিয়া সাবধানে লইয়া আইস। তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তোমার একটি লোকও দেবালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেক না। তখন চন্দ্রপ্রভা বলিলেন. তবে আপনকার লোকদিগকে বলুন, তাহারাই বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আমার নিকটে আনিয়া দিউক। তপস্বিনী বলিলেন, তাহাও হইবেক না, তিনি যখন এই দেবালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন. তখন যত ক্ষণ বা যত দিন ইচ্ছা হয়, তিনি স্বচ্ছন্দে এখানে থাকিবেন; সে সময়ে তোমার বা অন্য কোনও ব্যক্তির তাঁহার উপর কোনও অধিকার থাকিবেক না। আমি তাঁহার চিকিৎসার ও শুশ্রূষার সমস্ত ভার লইতেছি। তিনি সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইলে আপন আলয়ে যাইবেন। এ অবস্থায় আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে তোমার হস্তে সমর্পিত করিতে পারিব না।

এই সকল কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, আপনি অন্যায় আজ্ঞা করিতেছেন; আমি যেমন যত্ন পূর্ব্বক চিকিৎসা করাইব ও পরিচর্য্যা করিব, অন্যের সেরূপ করা সম্ভব নহে। আপনি তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পিত করুন। তখন তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! এত উতলা হইতেছ কেন, ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি অনেকবিধ মন্ত্র, ঔষধ, ও চিকিৎসা জানি, এবং এ পর্য্যন্ত শত শত লোকের শারীরিক ও মানসিক রোগের শান্তি করিয়াছি। যেরূপ শুনিতেছি, আমি অল্প কালের মধ্যেই তোমার স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিব; তখন তিনি স্বেচ্ছাক্রমে আপন ভবনে প্রতিগমন করিবেন। আমাদের তপস্যার ও ধর্ম্মচর্য্যার যেরূপ নিয়ম, এবং দেবালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তদনুসারে, যখন তোমার স্বামী এখানে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনিচ্ছায় বল পূর্ব্বক তাঁহাকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারি না। অতএব, বৎসে প্রস্থান কর;

যাবৎ তিনি আরোগ্যলাভ না করিতেছেন, আমার নিকটেই থাকুন; তাঁহার চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিষয়ে কোনও অংশে অণুমাত্র ত্রুটি হইবেক না, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি কখনও এখান হইতে যাইব না। আমার অনিচ্ছায় ও অসম্মতিতে আমার স্বামীকে এখানে রুদ্ধ করিয়া রাখা কোনও মতে আপনকার উচিত হইতেছে না। আপনি সকল বিষয়ের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই আমায় এখান হইতে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তপস্বিনী বলিলেন, বৎসে! তুমি এ বিষয়ে অনর্থক আগ্রহপ্রকাশ করিতেছ; তোমার সঙ্গে বৃথা বাদানুবাদ করিব না। আমি এক কথায় বলিতেছি, তোমার স্বামী সুস্থ না হইলে তুমি কখনও তাঁহাকে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না; এখন আপন আলয়ে প্রতিগমন কর।

এই বলিয়া তপস্বিনী দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। তদীয় আদেশ অনুসারে দেবালয়ের দ্বার রুদ্ধ হইল; সুতরাং আর কাহারও তথায় প্রবেশ করিবার পথ রহিল না। চন্দ্রপ্রভার এইরূপ অবমাননা দর্শনে বিলাসিনী অতিশয় রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, দিদি! আর এখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলে ও বৃথা কালহরণ করিলে কি ফল হইবেক বল; চল আমরা অধিরাজ বাহাদুরের নিকটে গিয়া এই অহঙ্কারিণী তপস্বিনীর অন্যায় আচরণ বিষয়ে অভিযোগ করি; তিনি অবশ্যই বিচার করিবেন। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, বিলাসিনি! তুমি বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা বলিয়াছ; চল তাঁহার নিকটেই যাই। তিনি যত ক্ষণ না স্বয়ং এখানে আসিয়া আমার স্বামীকে বল পূর্ব্বক দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া আমার হস্তে দিতে সম্মত হন, তাবৎ আমি কোনও ক্রমে তাঁহাকে ছাড়িব না, তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিব এবং অবিশ্রামে অশ্রুবিসর্জ্জন করিব। এই কথা শুনিয়া বণিক্ বলিলেন, আপনারা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিলে এই খানেই অধিরাজ বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক। আমি অবধারিত জানি, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি এই পথ দিয়া বধ্যভূমিতে যাইবেন। বেলার অবসান হইয়াছে, সায়ংকাল আগতপ্রায়; তাঁহার আসিবার আর বড় বিলম্ব নাই। বসুপ্রিয় জিজ্ঞাসিলেন, তিনি কি জন্যে এ সময়ে বধ্যভূমিতে যাইবেন? বণিক্ বলিলেন, আপনি কি শুনেন নাই, হেমকূটের এক বৃদ্ধ বণিক্ জয়স্থলের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে; তাঁহার শিরশ্ছেদনকালে অধিরাজ বাহাদুর স্বয়ং বধ্যভূমিতে উপস্থিত থাকিবেন। বিলাসিনী চন্দ্রপ্রভাকে বলিলেন, অধিরাজ বাহাদুর দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত

হইলেই তুমি তাঁহার চরণে ধরিয়া বিচারপ্রার্থনা করিবে, কোনও মতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না।

কিয়ৎ ক্ষণ পরেই, অধিরাজ বিজয়বল্লভ, রাজপুরুষগণ ও বধ্যবেশধারী সোমদত্ত প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিবা-মাত্র চন্দ্রপ্রভা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ! এই দেবালয়ের কর্ত্রী তপস্বিনী আমার উপর যার পর নাই অত্যাচার করিয়াছেন; আপনারে অনুগ্রহ করিয়া বিচার করিতে হইবেক। শুনিয়া বিজয়বল্লভ বলিলেন; তিনি অতি সুশীলা ধর্ম্মশীলা প্রবীণা নারী, কোনও ক্রমে অন্যায় আচরণ করিবার লোক নহেন; তুমি কি কারণে তাঁহার নামে অত্যাচারের অভিযোগ করিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! আমি মিথ্যা অভিযোগ করিতেছি না; কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়া আমার নিবেদন শুনিতে হইবেক। আপনি যে ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার পরিচারক কিঙ্কর উভয়ে উন্মাদ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, এবং রাজপথে ও লোকের বাটীতে অনেকপ্রকার অত্যাচার করিতেছেন; এই সংবাদ পাইয়া এক বার অনেক যত্নে বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, কোনও কার্য্যবশতঃ বসুপ্রিয় স্বর্ণকারের আলয়ে যাইতেছিলাম, ইতোমধ্যে দেখিতে পাইলাম, তিনি ও কিঙ্কর বাটী হইতে পলাইয়া আসিয়াছেন। আমি পুনরায় তাঁহাদিগকে বাটীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাইলাম। উভয়েই এক বারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য; আমাদিগকে দেখিবামাত্র উভয়েই তরবারি হস্তে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তৎকালে আমার সঙ্গে অধিক লোক ছিল না, এজন্য আমি তৎক্ষণাৎ বাটী গিয়া লোক-সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে ও কিঙ্করকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলাম। এবার আমাদিগকে দেখিয়া ভয় পাইয়া উভয়ে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, এমন সময়ে এখানকার কর্ত্রী তপস্বিনী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। অনেক বিনয় করিয়া বলিলাম; কিন্তু তিনি কোনও ক্রমে আমায় তাঁহাকে লইয়া যাইতে দিবেন না। আমি তাঁহাকে এ অবস্থায় এখানে রাখিয়া কেমন করিয়া বাটীতে নিশ্চিন্ত থাকিব? মহারাজ! যাহাতে আমি অবিলম্বে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাইতে পারি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপায় করিয়া দেন; নতুবা আমি আপনাকে যাইতে দিব না।

এই বলিয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজের চরণে নিপতিত হইয়া রহিলেন, এবং

অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুরুষকে বলিলেন, তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে আমার নমস্কার জানাইয়া এক বার ক্ষণকালের জন্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বল; অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভার হস্তে ধরিয়া ভূতল হইতে উঠাইলেন; বলিলেন বৎসে! শোকসংবরণ কর; এ বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া আমি এখান হইতে যাইতেছি না।

এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া অতি আকুল বচনে চন্দ্রপ্রভাকে বলিতে লাগিল, মা ঠাকুরাণি! যদি প্রাণ বাঁচাইতে চান, অবিলম্বে কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকুন। কর্ত্তা মহাশয় ও কিঙ্কর উভয়ে বন্ধনচ্ছেদন করিয়াছেন, এবং দাস দাসীদিগকে প্রহার করিয়া দৃঢ় রূপে বন্ধন পূর্ব্বক বিদ্যাধর মহাশয়ের দাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছেন, পরে আগুন নিবাইবার জন্য ময়লা জল আনিয়া তাঁহার মুখে ঢালিয়া দিতেছেন। বিদ্যাধর মহাশয়ের উপর প্রভুর যেরূপ রাগ দেখিলাম, তাহাতে হয় ত তাঁহার প্রাণবধ করিবেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন এবং আপনি সাবধান হউন। শুনিয়া চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, অরে নির্ব্বোধ! তুই মিথ্যা বলিতেছিস, তোর প্রভু ও কিঙ্কর উভয়ে কিছু পূর্ব্বে এই দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমি মিথ্যা বলিতেছি না। তিনি বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে, আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে চিরঞ্জীবের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া সে বলিল, মা ঠাকুরাণি! আমি তাঁহার চীৎকার শুনিতে পাইতেছি; বোধ হয়, এখানেই আসিতেছেন, আপনি সাবধান হউন। তিনি বারংবার বলিয়াছেন, আপনাকে পাইলে নাক কান কাটিয়া হতশ্রী করিয়া দিবেন। সত্বর পলায়ন করুন, কদাচ এখানে থাকিবেন না। চন্দ্রপ্রভা ভয়ে অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, বৎসে! ভয় নাই; আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াও। এই বলিয়া তিনি রক্ষকদিগকে বলিলেন, কাহাকেও নিকটে আসিতে দিও না।

চিরঞ্জীবকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রপ্রভা অধিরাজ বাহাদুরকে সম্বোধিয়া বলিলেন, মহারাজ! কি আশ্চর্য্য দেখুন। প্রথমতঃ আমি উঁহারে দৃঢ় রূপে বদ্ধ করাইয়া বাটীতে পাঠাই; কিঞ্চিৎ পরেই রাজপথে দেখিতে পাই; তত অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক রাজপথে উপস্থিত হওয়া কোনও মতে সম্ভব নহে। তৎপরে পলাইয়া এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন।

দেবালয়ে প্রবেশনির্গমের এক বই পথ নাই ; বিশেষতঃ আমরা সকলে দ্বারদেশে সমবেত আছি ; ইতোমধ্যে কেমন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি মহারাজ! উঁহার আজকার কাজ সকল মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনার অগম্য। এই সময়ে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব উন্মত্তের ন্যায় বিশৃঙ্খল বেশে অধিরাজের সম্মুখদেশে উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, দোহাই মহারাজের! আজ আমার উপর ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে ; আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও এরূপ অপদস্থ ও অপমানিত হই নাই, এবং কখনও এরূপ লাঞ্ছনাভোগ ও এরূপ যাতনাবোধ করি নাই। আমার স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা নিতান্ত সাধুশীলার ন্যায় আপনকার নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন ; কিন্তু আমি উঁহার তুল্য দুশ্চারিণী নারী আর দেখি নাই। কতক-গুলি ইতরের সংসর্গে কালযাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; এবং তাহাদের কুমন্ত্রণায় আজ আমায় যে যন্ত্রণা দিয়াছেন, এবং আমার যে দুরবস্থা করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিবার নয়। আপনারে নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিতে হইবেক ; নতুবা আমি আত্মঘাতী হইব।

চিরঞ্জীবের অভিযোগ শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, তোমার উপর কি অত্যাচার হইয়াছে, বল ; যদি বাস্তবিক হয়, অবশ্য প্রতিকার করিব। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আজ মধ্যাহ্নকালে আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই, এবং সেই সময়ে কতকগুলি ইতর লোক লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন। শুনিয়া অধিরাজ বাহাদুর বলিলেন, এ কথা যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। অনন্তর তিনি চন্দ্রপ্রভাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! এ বিষয়ে তোমার কিছু বলিবার আছে ? চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, মহারাজ! উনি অমূলক কথা বলিতেছেন। আজ মধ্যাহ্নকালে, উনি, আমি, বিলাসিনী, তিন জনে একত্র আহার করিয়াছি ; এ কথা যদি অন্যথা হয়, আমার যেন নরকেও স্থান না হয়। বিলাসিনী বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমরা তিন জনে এক সঙ্গে আহার করিয়াছি ; দিদি আপনকার নিকট একটিও অলীক কথা বলেন নাই। উভয়ের কথা শুনিয়া বসুপ্রিয় স্বর্ণকার বলিলেন, মহারাজ! আমি ইহাদের তুল্য মিথ্যাবাদিনী কামিনী ভূমণ্ডলে দেখি নাই ; উভয়েই সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিতেছেন। চিরঞ্জীববাবু আজ উন্মাদগ্রস্তই হউন, আর যাই হউন, উনি যে অভিযোগ করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। আপনি এই দুই দুশ্চারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর, চিরঞ্জীব নিজ দুরবস্থার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নির্দ্দিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! আমি মত্ত বা উন্মত্ত কিছুই হই নাই। কিন্তু, আজ আমার উপর যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, যাহার উপর সেরূপ হইবেক, সেই উন্মত্ত হইবেক। প্রথমতঃ আহারের সময় দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমায় বাটীতে প্রবেশ করিতে দেন নাই; তৎকালে বসুপ্রিয় স্বর্ণকার ও রত্নদত্ত বণিক্ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি ক্রোধভরে দ্বারভঙ্গে উদ্যত হইয়াছিলাম; রত্নদত্ত অনেক বুঝাইয়া, আমায় ক্ষান্ত করিলেন। পরে আমি বসুপ্রিয়কে সত্বর আমার নিকট হার লইয়া যাইতে বলিয়া রত্নদত্ত সমভিব্যাহারে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিলাম। বসুপ্রিয়ের আসিতে অনেক বিলম্ব হওয়াতে আমি উঁহার অন্বেষণে নির্গত হইলাম। পথিমধ্যে উঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তৎকালে ঐ বণিক্‌টি উঁহার সঙ্গে ছিলেন। বসুপ্রিয় বলিলেন, কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি তোমায় হার দিয়াছি, টাকা দাও। কিন্তু, জগদীশ্বর সাক্ষী, আমি এ পর্য্যন্ত হার দেখি নাই। উনি তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষ দ্বারা আমায় অবরুদ্ধ করাইলেন। পরে নিরুপায় হইয়া আমার পরিচারক কিঙ্করকে দেখিতে পাইয়া টাকা আনিবার জন্য বাটীতে পাঠাইলাম। সে যে গেল, সেই গেল, আর ফিরিয়া আসিল না। আমি অনেক বিনয়ে সম্মত করিয়া, রাজপুরুষকে সঙ্গে লইয়া, বাটী যাইতেছিলাম, এমন সময়ে আমার স্ত্রী ও উঁহার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেখিলাম, উঁহাদের সঙ্গে কতকগুলি ইতর লোক রহিয়াছে; আর, আমাদের পল্লীতে বিদ্যাধর নামে একটা হতভাগা গুরুমহাশয় আছে, তাহাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন। সে, লোকের নিকট, চিকিৎসক বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। তাহার মত দুশ্চরিত্র নরাধম ভূমণ্ডলে নাই। সেই দুরাত্মা আজ কাল আমার স্ত্রীর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছে। সে আমায় দেখিয়া বলিল, আমি উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছি। অনন্তর, তদীয় উপদেশ অনুসারে আমাকে ও কিঙ্করকে বদ্ধ করিয়া বাটীতে লইয়া গেল, এবং এক দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারময় গৃহে বদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া দিল। আমরা অনেক কষ্টে দন্ত দ্বারা বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক পলাইয়া আপনকার সমীপে সমুদয় নিবেদন করিতে যাইতেছিলাম; ভাগ্যক্রমে এই স্থানে আপনকার সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার, এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচারের কর্ত্তা। আমার প্রার্থনা এই, যথার্থ বিচার করিয়া অপরাধীর সমুচিত দণ্ডবিধান করেন। আমি আপনকার সমক্ষে যে সকল কথা বলিলাম, যদি ইহার একটিও মিথ্যা হয়, আপনি আমার প্রাণদণ্ড করিবেন।

এই বলিয়া চিরঞ্জীব বিরত হইবামাত্র বসুপ্রিয় বলিলেন, মহারাজ! উনি আহারের সময় বাটীতে প্রবেশ করিতে পান নাই, এবং বাটীতে আহার করেন নাই, আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি; তৎকালে আমি উঁহার সঙ্গে ছিলাম। অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উঁহারে হার দিয়াছ কি না, বল। বসুপ্রিয় বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি স্বয়ং উঁহার হস্তে হার দিয়াছি। উনি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যখন পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন উঁহার গলায় ঐ হার ছিল, ইঁহারা সকলে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। বণিক্ বলিলেন, মহারাজ! যখন উঁহার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখন এক বারে হারপ্রাপ্তির অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু, দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎকারকালে, হার পাইয়াছি বলিয়া স্পষ্ট বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। আমি উঁহার স্বীকার ও অস্বীকার উভয়ই স্বকর্ণে শুনিয়াছি। তৎপরে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়েই তরবারি লইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে উদ্যত হইয়াছিলাম; এমন সময়ে উনি পলাইয়া দেবালয়ে প্রবেশ করেন; এক্ষণে দেবালয় হইতে বহির্গত হইয়া আপনকার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! এ জন্মে আমি এ দেবালয়ে প্রবেশ করি নাই; বণিকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই; বসুপ্রিয় কখনই আমার হস্তে হার দেন নাই। উঁহারা আমার নামে এ তিনটি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

এই সমস্ত অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ শ্রবণগোচর করিয়া অধিরাজ বলিলেন, ঈদৃশ দুরূহ বিষয় কখনও আমার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই। আমার বোধ হয়, তোমাদের সকলেরই দৃষ্টিক্ষয় ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তোমরা সকলেই বলিতেছ, চিরঞ্জীব এইমাত্র দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছে; যদি দেবালয়ে প্রবেশ করিত, এখনও দেবালয়েই থাকিত। তোমরা বলিতেছ, চিরঞ্জীব উন্মত্ত হইয়াছে; যদি উন্মত্ত হইত, তাহা হইলে এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা সহকারে এত ক্ষণ আমার সমক্ষে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ করিতে পারিত না। তোমরা দুই ভগিনীতে বলিতেছ, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করিয়াছে; কিন্তু বসুপ্রিয় তৎকালে তাহার সঙ্গে ছিল; সে বলিতেছে, চিরঞ্জীব বাটীতে আহার করে নাই। এই বলিয়া তিনি কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কি রে, তুই কি জানিস বল্। সে বলিল, মহারাজ! কর্ত্তা আজ মধ্যাহ্নকালে অপরাজিতার বাটীতে আহার করিয়াছেন। অপরাজিতা বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আজ চিরঞ্জীববাবু আমার বাটীতে আহার করিয়াছিলেন; ঐ সময়ে আমার অঙ্গুলি হইতে একটি অঙ্গুরীয় খুলিয়া লইয়াছেন। চিরঞ্জীব বলিলেন, হাঁ মহারাজ! আমি এই

অঙ্গুরীয়টি উহার অঙ্গুলি হইতে খুলিয়া লইয়াছি, যথার্থ বটে। অধিরাজ অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, তুমি কি চিরঞ্জীবকে দেবালয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ? অপরাজিতা বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ মহারাজ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি. সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রবণগোচর করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিরাজ বলিলেন, আমি এমন অদ্ভুত কাণ্ড কখনও দেখি নাই ও শুনি নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তোমরা সকলেই উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছ। অনন্তর তিনি এক রাজপুরুষকে বলিলেন, আমার নাম করিয়া তুমি দেবালয়ের কর্ত্রীকে অবিলম্বে এখানে আসিতে বল; দেখা যাউক, তিনিই বা কিরূপ বলেন। রাজপুরুষ, যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া, দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

চিরঞ্জীব অধিরাজের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র, সোমদত্ত তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যদি শোকে ও দুরবস্থায় পড়িয়া আমার নিতান্তই বুদ্ধির ভ্রংশ ও দর্শনশক্তির ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এ ব্যক্তি আমার পুত্র চিরঞ্জীব, ও অপর ব্যক্তি উহার পরিচারক কিঙ্কব, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। তিনি চিরঞ্জীবকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়াছিলেন, কেবল অভিযোগের ও প্রত্যভিযোগের গোল-যোগে অবকাশ পান নাই; এক্ষণে অধিরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি অনুমতি হয়, কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। অধিরাজ বলিলেন, যাহা ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে বল; কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। সোমদত্ত বলিলেন, মহারাজ! এত ক্ষণের পর এই জনতার মধ্যে আমি একটি আত্মীয় দেখিতে পাইয়াছি; বোধ করি, তিনি টাকা দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিতে পারেন। অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত! যদি কোনও রূপে তোমার প্রাণরক্ষা হয়, আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হই, বলিতে পারি না। তুমি তোমার আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমায় প্রাণরক্ষার্থে এই মুহূর্ত্তে পাঁচ সহস্র টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন কি না। তখন সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন গো বাবা! তোমার নাম চিরঞ্জীব ও তোমার পরিচারকের নাম কিঙ্কর বটে? বধ্যবেশধারী অপরিচিত বৈদেশিক ব্যক্তি অকস্মাৎ এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন, ইহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া চিরঞ্জীব এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সোমদত্ত বলিলেন, তুমি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় আমার দিকে চাহিয়া রহিলে কেন? তুমি ত আমায় বিলক্ষণ জান। চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয়! আপনারে চিনিতে

পারিতেছি না, এবং ইহার পূর্ব্বে কখনও আপনাকে দেখিয়াছি এরূপ মনে হইতেছে না। সোমদত্ত বলিলেন, তোমার সঙ্গে শেষ দেখার পর শোকে ও দুর্ভাবনায় আমার আকৃতির এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে, আমায় চিনিতে পারা সম্ভব নহে ; কিন্তু তুমি কি আমার স্বর চিনিতে পারিতেছ না ? চিরঞ্জীব বলিলেন, না মহাশয় ! আমি আর কখনও আপনকার স্বর শুনি নাই। তখন সোমদত্ত কিঙ্করকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন কিঙ্কর ! তুমিও কি আমায় চিনিতে পারিতেছ না। কিঙ্কর বলিল, যদি আমার কথায় বিশ্বাস করেন, তবে বলি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না। অনন্তর সোমদত্ত চিরঞ্জীবকে বলিলেন, আমার নিশ্চত বোধ হইতেছে তুমি আমায় চিনিতে পারিয়াছ। চিরঞ্জীব বলিলেন, আমারও নিশ্চিত বোধ হইতেছে, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না ; চিনিলে অস্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আর, যখন আমি বারংবার বলিতেছি, আমি আপনারে চিনিতে পারিতেছি না, তখন আমার কথায় অবিশ্বাস করিবারও কোনও কারণ দেখিতেছি না।

চিরঞ্জীবের কথা শুনিয়া, সোমদত্ত বিষণ্ণ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাত বৎসরে আমার স্বরের ও আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, একমাত্র পুত্র চিরঞ্জীবও আজ আমায় চিনিতে পারিল না। যদিও আমি জরায় জীর্ণ ও শোকে শীর্ণ হইয়াছি, এবং আমার বুদ্ধিশক্তি, দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তির প্রায় লোপাপত্তি হইয়াছে, তথাপি তোমার স্বর শুনিয়া ও আকৃতি দেখিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে, তুমি আমার পুত্র ; এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় হইতেছে না। শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয় ! আপনি সাত বৎসরের কথা কি বলিতেছেন, জ্ঞান হওয়া অবধি আমার পিতাকে দেখি নাই। সোমদত্ত বলিলেন, বৎস ! যা বল না কেন, সাত বৎসর মাত্র তুমি হেমকূট হইতে প্রস্থান করিয়াছ ; এই অল্প সময়ে এক কালে সমস্ত বিস্মৃতি হইয়াছ, ইহাতে আমি আশ্চর্য্যজ্ঞান করিতেছি। অথবা, আমার অবস্থার বৈগুণ্য দর্শনে, এত লোকের সমক্ষে আমায় পিতা বলিয়া অঙ্গীকার করিতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে। চিরঞ্জীব বলিলেন, মহাশয় ! আমি জন্মাবচ্ছেদে কখনও হেমকূট নগরে যাই নাই ; অধিরাজ বাহাদুর নিজে, এবং নগরের যে সকল লোক আমায় জানেন, সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন ; আমি আপনার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছি না। তখন অধিরাজ বলিলেন, সোমদত্ত ! চিরঞ্জীব বিংশতি বৎসর আমার নিকটে রহিয়াছে, এই বিংশতি বৎসরের মধ্যে ও কে

কখনও হেমকূট নগরে যায় নাই, আমি তাহার সাক্ষী। আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, শোকে, দুর্ভাবনায় ও প্রাণদণ্ডভয়ে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, তাহাতেই তুমি সমস্ত অসম্বদ্ধ কথা বলিতেছ। সোমদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া নিরস্ত হইলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

এই সময়ে, দেবালয়ের কর্ত্রী, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া অধিরাজের সম্মুখবর্ত্তিনী হইলেন, এবং বহুমান পুরঃসর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! এই দুই বৈদেশিক ব্যক্তির উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছে, আপনাকে তাহার বিচার করিতে হইবেক। ভাগ্যক্রমে ইঁহারা দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন; নতুবা ইঁহাদের প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারিত।

এক কালে দুই চিরঞ্জীব ও দুই কিঙ্কর দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র, সমবেত ব্যক্তিবর্গ বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইয়া অবিচলিত নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভা দুই স্বামী উপস্থিত দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব সোমদত্তকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এবং তদীয় দুরবস্থা দর্শনে সজল নয়নে জিজ্ঞাসিলেন, পিতঃ! আমি সাত বৎসর মাত্র আপনকার সহিত বিযোজিত হইয়াছি, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে আপনকার আকৃতির এত বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে যে, সহসা চিনিতে পারা যায় না। সে যাহা হউক, আপনকার শরীরে বধ্যবেশ লক্ষিত হইতেছে কেন? হেমকূটবাসী কিঙ্করও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে জিজ্ঞাসিল, মহাশয়! কে আপনারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বলুন। দেবালয়ের কর্ত্রীও কিয়ৎ ক্ষণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া সোমদত্তকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে কিঙ্করের কথা শুনিয়া বাষ্পাকুল লোচনে শোকাকুল বচনে বলিলেন, যে বন্ধন করুক, আমি উঁহার বন্ধনমোচন করিতেছি। অনন্তর তিনি সোমদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন মহাশয়! আপনকার স্মরণ হয়, আপনি লাবণ্যময়ীনাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; ঐ দুর্ভগার গর্ভে সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই যমজ কুমার জন্মগ্রহণ করে। আমি সেই হতভাগা লাবণ্যময়ী, অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি। এ জন্মে আর যে আপনকার দর্শন পাইব, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার সে আশা ছিল না। যদি পূর্ব্ব বৃত্তান্তের স্মরণ থাকে,—

এই বলিতে বলিতে লাবণ্যময়ীর কণ্ঠরোধ হইল। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

সহসা চিরঞ্জীবের মুখ দেখিয়া ও তদীয় অমৃতময় সম্ভাষণবাক্য শুনিয়া, সোমদত্তের হৃদয়কন্দর অনির্বচনীয় আনন্দসলিলে উচ্ছলিত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার লাবণ্যময়ীর উদ্দেশ পাইয়া যেন তিনি অমৃতসাগরে অবগাহন করিলেন, এবং বাষ্পাকুল লোচনে গদগদ বচনে বলিলেন, প্রিয়ে! আমি যেরূপ হতভাগ্য; তাহাতে পুনরায় তোমার ও চিরঞ্জীবের মুখনিরীক্ষণ করিব, কোনও রূপে সম্ভব নহে। তোমাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বটে, কিন্তু তুমি যে বাস্তবিক লাবণ্যময়ী, আর ও যে বাস্তবিক চিরঞ্জীব, এখনও আমার সে বিশ্বাস হইতেছে না; বলিতে কি, আমি এই সমস্ত স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতেছি। যাহা হউক, যদি তুমি যথার্থই লাবণ্যময়ী হও, আমায় বল; যে পুত্রটির সহিত এক গুণবৃক্ষে বদ্ধ হইয়া সমুদ্রে ভাসিয়াছিলে, সে কোথায় গেল? সে কি অদ্যাপি জীবিত আছে? এই কথার শ্রবণ মাত্র লাবণ্যময়ীর নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল; কিয়ৎ ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার বাক্য-নিঃসরণ হইল না। পরে কিঞ্চিৎ অংশে শোকাবেগের সংবরণ করিয়া তিনি নিরতিশয় করুণ স্বরে বলিলেন, নাথ! তোমার কথা শুনিয়া আমার চির-প্রসুপ্ত শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমরা তীরে উত্তীর্ণ হইলে পর, কর্ণপুরের লোকেরা চিরঞ্জীব ও কিঙ্করকে লইয়া পলায়ন করিল। আমি তোমার ও তনয়দিগের শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া অহোরাত্র হাহাকার করিয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে কিঞ্চিৎ অংশে শোকসংবরণ করিয়া তোমাদের অন্বেষণে নির্গত হইলাম। কত কষ্টে কত দেশ পর্য্যটন করিলাম, কিন্তু কোনও স্থানে কোনও সন্ধান পাইলাম না, পরিশেষে তোমাদের পুনর্দর্শন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরাশ্বাস হইয়া স্থির করিলাম, আর আমার প্রাণধারণের প্রয়োজন নাই। এত ক্লেশে অসারদেহভারবহন করা বিড়ম্বনা-মাত্র; অতএব আত্মঘাতিনী হই, তাহা হইলে এক কালে সকল ক্লেশের অবসান হইবেক। পরে আত্মঘাতিনী হওয়া সর্ব্বদা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তপস্যা ও দেবকার্য্যে নিয়োজিত করাই সৎপরামর্শ বলিয়া অবধারিত করিলাম। অবশেষে জয়স্থলে আসিয়া এই দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তপস্বিনীভাবে কালহরণ করিতেছি। জ্যেষ্ঠ চিরঞ্জীব ও তাহার সহচর কিঙ্কর অদ্যাপি জীবিত আছে কি না, আর যদিই জীবিত থাকে, কোথায় আছে, কিছুই বলিতে পারি না। অনন্তর লাবণ্যময়ী ও সোমদত্ত উভয়ে নিস্পন্দ নয়নে পরস্পর মুখনিরীক্ষণ ও প্রভূতবাষ্পবারিবিসর্জন করিতে লাগিলেন।

সর্ব্বাংশে একাকৃতি দুই চিরঞ্জীব ও কিঙ্কর নয়নগোচর করিয়া, অধিরাজ বাহাদুরও কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, সন্দিহান চিত্তে কত কল্পনা করিতে-ছিলেন; এক্ষণে লবণ্যময়ী ও সোমদত্তের আলাপশ্রবণে সর্ব্বাংশে ছিন্নসংশয় হইয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, সোমদত্ত! তুমি প্রাতঃকালে আত্মবৃত্তান্তের

যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলে, তাহার অনেক অংশে আমার বিলক্ষণ সংশয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে তোমাদের স্ত্রীপুরুষের কথোকপথন শুনিয়া সকল অংশে সম্পূর্ণ রূপে সংশয়নিরাকরণ হইল। লাবণ্যময়ীর উপাখ্যান দ্বারা তোমার বর্ণিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ সমর্থন হইতেছে। এখন আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, দুই চিরঞ্জীব তোমাদের যমজ সন্তান; দুই কিঙ্কর তোমাদের ক্রীতদাস। আমাদের চিরঞ্জীব অতি শৈশব অবস্থায় তোমাদের সহিত বিযোজিত হইয়াছিলেন, এজন্য তোমায় চিনিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কিছুই বলিতে পারা যায় না। তুমি যাহাদের অদর্শনে এত কাল জীবন্মৃত হইয়া ছিলে, এক কালে সেই সকলগুলির সহিত অসম্ভাবিত সমাগম হইল। তুমি এত দিন আপনাকে অতি হতভাগ্য জ্ঞান করিতে, কিন্তু এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, তোমার তুল্য সৌভাগ্যশালী মনুষ্য অতি বিরল। শেষ দশায় তোমার অদৃষ্টে যে এরূপ সুখ ও এরূপ সৌভাগ্য ঘটিবেক, ইহা স্বপ্নের অগোচর।

সোমদত্তকে এইরূপ বলিয়া, হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জয়স্থলবাসী জ্ঞান করিয়া, অধিরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চিরঞ্জীব! তুমি প্রথম কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, না মহারাজ! আমি নই; আমি হেমকূট হইতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া অধিরাজ সস্মিত বদনে বলিলেন হাঁ বুঝিলাম, তুমি আমাদের চিরঞ্জীব নও, তুমি এই দিকে স্বতন্ত্র দাঁড়াও, তোমাদের কে কোন্ ব্যক্তি, চিনা ভার। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ! আমি কর্ণপুর হইতে আসিয়াছিলাম; আপনকার পিতৃব্য বিখ্যাত বীর বিজয়বর্ম্মা আমায় সঙ্গে আনিয়াছিলেন। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, আমি উঁহার সঙ্গে আসি। বিজয়বল্লভ বলিলেন, তোমরা দুজনে এক সঙ্গে এক দিকে দাঁড়াও।

এই সময়ে চন্দ্রপ্রভা চিরঞ্জীবদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমাদের দুজনের মধ্যে কে আজ মধ্যাহ্নকালে আমার সঙ্গে আহার করিয়াছিলে। হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি। চন্দ্রপ্রভা বলিলেন, তুমি কি আমার স্বামী নও। তিনি বলিলেন, না, আমি তোমার স্বামী নই; কিন্তু তুমি স্বামী স্থির করিয়া আমায় বল পূর্ব্বক বাটীতে লইয়া গিয়াছিলে, এবং সেই সংস্কারে আমায় অনেক অনুযোগ করিয়াছিলে। তোমার ভগিনীও আমায় ভগিনীপতিজ্ঞানে পূর্ব্বাপর সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু আদ্যোপান্ত বলিয়াছিলাম, জয়স্থলে আমার বাস নয়, আমি তোমার পতি নই, আমি এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই। তোমরা তৎকালে আমার সে সকল কথাই বিশ্বাস কর নাই। আমিই তোমার পতি, তোমার উপর বিরক্ত হইয়া ঐরূপ বলিতেছি, তোমরা দুই ভগিনীতেই পূর্ব্বাপর সেই জ্ঞান করিয়াছিলে। এই বলিয়া তিনি বিলাসিনীকে সম্ভাষণ করিয়া সস্মিত বদনে বলিলেন, আমি তৎকালে পরিণয়প্রস্তাব করাতে তুমি বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলে, এবং আমায় যথোচিত ভর্ৎসনা ও বহুবিধ আপত্তির উত্থাপন করিয়া-

ছিলে ; এখন বোধ হয় তোমার আর সে সকল আপত্তি হইতে পারে না। বিলাসিনী শুনিয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিলেন। কিন্তু তদীয় আকার প্রকার দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিলেন, চিরঞ্জীবের প্রস্তাবে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। এই পরিণয়প্রসঙ্গ শ্রবণে নিরতিশয় পরিতোষ-প্রদর্শন করিয়া, অধিরাজ বিজয়বল্লভ প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, শুভ কার্য্যের বিলম্বে প্রয়োজন নাই ; চিরঞ্জীব ! বিলাসিনী কন্যা তোমার সহধর্ম্মিনী হইবেন।

অনন্তর বসুপ্রিয় স্বর্ণকার হেমকূটবাসী চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসিলেন, আমি আপনাকে যে হার দিয়েছিলাম, আপনার গলায় এ সেই হার কি না। তিনি বলিলেন, এ সেই হার বটে ; আমি এক বারও তাহা অস্বীকার করি নাই। তখন জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব স্বর্ণকারকে বলিলেন, তুমি কিন্তু এই হারের জন্যে আমায় অবরুদ্ধ করাইয়াছিলে। বসুপ্রিয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হাঁ মহাশয় ! আমি আপনারে রাজপুরুষের হস্তে সমর্পিত করিয়াছিলাম। কিন্তু, পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনি আমায় অপরাধী করিতে পারেন না। চন্দ্রপ্রভা স্বীয় পতিকে জিজ্ঞাসিলেন, তোমার অবরোধের সংবাদ পাইয়া কিঙ্কর দ্বারা যে স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়াছিলাম, তুমি কি তাহা পাও নাই। জয়স্থলবাসী কিঙ্কর বলিল, কই, আপনি আমার দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা পাঠান নাই। তখন হেমকূটবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, আমি কিঙ্করকে জাহাজের অনুসন্ধানে পাঠাইয়া পান্থনিবাসে বসিয়া উৎসুকচিত্তে তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় সে আসিয়া তোমার প্রেরিত বলিয়া আমার হস্তে এই স্বর্ণমুদ্রার থলি দেয়। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আপনার নিকটে রাখিয়াছিলাম।

এইরূপে সংশয়াপনোদনকাণ্ড সমাপিত হইলে জয়স্থলবাসী চিরঞ্জীব বলিলেন, মহারাজ ! আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে সায়ংকালের মধ্যে দণ্ডের টাকা দিলেও আমার পিতা প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবেন, আপনি দয়া করিয়া এই আদেশপ্রদান করিয়াছেন ; অনুমতি হইলে ঐ টাকা আনাইয়া দিই। বিজয়বল্লভ বলিলেন, চিরঞ্জীব ! তোমাদের এই অসম্ভাবিত সমাগম দর্শনে আমি যে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করিয়াছি তাহাতে আমার সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রাপ্তি অপেক্ষাও অধিকতর লাভবোধ হইয়াছে, অতএব তোমার পিতা দণ্ডপ্রদান ব্যতিরেকেই প্রাণদান পাইলেন। এই বলিয়া তিনি সন্নিহিত রাজপুরুষদিগকে সোমদত্তের বন্ধনমোচন ও বধ্যবেশের অপসারণ করিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপে সকল বিষয়ের সমাধান হইলে, লাবণ্যময়ী গলবস্ত্রা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া বিজয়বল্লভকে বলিলেন, মহারাজ ! আমার কিছু প্রার্থনীয় আছে, কৃপা করিয়া শ্রবণ করিতে হইবেক। বিজয়বল্লভ বলিলেন, লাবণ্যময়ি ! যাহা ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে বল, সঙ্কুচিত হইবার অণুমাত্র আবশ্যকতা নাই, আজ তোমার কোনও কথাই অরক্ষিত হইবার বা কোনও প্রার্থনাই অপরি-

পূরিত থাকিবার আশঙ্কা নাই। শুনিয়া সাতিশয় হর্ষিত ও উৎসাহিত হইয়া লাবণ্যময়ী বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি এত কাল মনে করিতাম, আমার মত হতভাগ্যা মানবী ভূমণ্ডলে আর নাই, কিন্তু আজ দেখিতেছি, আমার মত ভাগ্যবতী অতি অল্প আছে। চিরবিয়োগের পর, এই অতর্কিত পতিপুত্রসমাগম দ্বারা আমি যে আজ কি হইয়াছি, বলিতে পারি না, আমার কলেবরে আনন্দপ্রবাহের সমাবেশ হইতেছে না। মহারাজ! আজ আমার কি উৎসবের দিন, আপনি অনায়াসে তাহার অনুভব করিতে পারিতেছেন। বলিতে কি মহারাজ! এখনও এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বপ্নদর্শনবৎ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার প্রথম প্রার্থনা এই, অনুগ্রহ-প্রদর্শন পূর্ব্বক আমায় পতি, পুত্রবধূ লইয়া দেবালয়ে এই উৎসব-রজনী অতিবাহিত করিবার অনুমতি প্রদান করেন। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই, যে সকল ব্যক্তি আজ এই অদ্ভুত ঘটনার সংস্রবে ছিলেন, তাঁহারা সকলে, দেবালয়ে উপস্থিত থাকিয়া কিয়ৎকাল আমোদ-আহ্লাদ করেন। তৃতীয় প্রার্থনা এই, মহারাজ নিজে উৎসব-সময়ে দেবালয়ে অধিষ্ঠান করেন। চতুর্থ প্রার্থনা এই, আমার তৃতীয় প্রার্থনা যেন ব্যর্থ না হয়।

লাবণ্যময়ীর প্রার্থনা শ্রবণে বিজয়বল্লভ সহাস্য-বদনে বলিলেন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছি, জন্মাবচ্ছেদে কখনও তাদৃশ আনন্দ অনুভব করি নাই এবং উত্তরকালেও যে কখনও আর তদ্রূপ আনন্দলাভ ঘটিবে তাহা সম্ভাবিত বোধ হইতেছে না। অধিক আর কি বলিব, তোমরা আজ যেরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছ, আমিও নিঃসন্দেহে সেইরূপ বরং তদপেক্ষা অধিক আনন্দ অনুভব করিতেছি। চীরঞ্জীব! আমি যে পুত্র নির্বিশেষে তোমায় লালন-পালন করিয়াছিলাম, আজ তাহা সর্বতোভাবে সার্থক হইল। বোধ হয় আমি পিতৃব্যের নিকট আগ্রহপূর্ব্বক তোমায় না লইলে আজিকার এই অভূতপূর্ব্ব সংঘটন দেখিতে ও তন্নিবন্ধন এই অননুভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব করিতে পারিতাম না। যাহা হউক, লাবণ্যময়ি! আমি স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের সকলকে আমার আলয়ে লইয়া গিয়া এবং রাজধানীর সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোককে সমবেত করিয়া আমোদ-আহ্লাদে এই উৎসবের রজনী অতিবাহিত করিব। কিন্তু তোমার ইচ্ছা শ্রবণগোচর করিয়া আমার সে ইচ্ছা বিসর্জন দিলাম। আজ তোমার যে সুখের দিন তাহাতে কোনও অংশে তোমার মনে অসুখের সঞ্চার হইতে দেওয়া উচিত নহে। ইচ্ছা বিঘাত হইলে পাছে তোমার অন্তঃকরণে অণুমাত্রও অসুখ জন্মে, এই আশঙ্কায় আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইলাম। আজ সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছাই বলবতী থাকিবে।

এই বলিয়া রাজপুরুষদিগের প্রতি রাজধানীস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের নিমন্ত্রণের ও উপস্থিত মহোৎসবের উপযোগী আয়োজনের আদেশ দিয়া অধিরাজ-বিজয়বল্লভ সোমদত্ত পরিবারের সহিত দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

প্রভাবতী সম্ভাষণ

ভূমিকা

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যকা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৭৮২ শাকের ২৩শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয়; ১৭৮৫ শাকের ৪ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাবতীকে অপত্য নির্বিশেষে ভাল বাসিতেন। এই সময়, নানা কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়া ছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই প্রভাবতীর স্মৃতি চির জাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

১লা বৈশাখ, ১৭৮৬ শক } শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

প্রভাবতীসম্ভাষণ

বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। প্রতি ক্ষণেই, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে—

১। যেন, তুমি, বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 'নীনা' (১) বলিয়া, করপ্রসারণপূর্ব্বক, কোলে লইতে বলিতেছ।

২। যেন, তুমি; উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, 'আয় না' বলিয়া, সলীল করসঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ।

৩। যেন, আমি আহার করিতে গিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবীকে, প্রভাবতী কোথায়, এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি শ্রবণমাত্র, সত্বর পদসঞ্চারে আসিয়া, 'এই আমি এসেছি' বলিয়া প্রফুল্লবদনে, আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছ।

৪। যেন, তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'মাগী শোলো' (২) বলিয়া, আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছ।

৫। যেন, আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ; আর সকলে, সাতিশয় আহ্লাদিত মনে, সহাস্য বদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন (৩)।

৬। যেন, আমি, বিকালে, বাড়ীর ভিতরে জল খাইতেছি; তুমি, ক্রোড়ে বসিয়া, আমার সঙ্গে জল খাইতেছ; এবং, জল খাওয়ার পর, আমি মুখে সুপারী দিবামাত্র, তুমি 'তুখুনি (৪) দে' বলিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা, আমার মুখ হইতে সুপারী বহিষ্কৃত করিয়া লইতেছ।

---

(১) নেনা।

(২) মাগী শুইল। আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম; তদনুসারে, তুমিও মাগীশব্দে আত্মনির্দ্দেশ করিতে। তোমার এই দৈনন্দিন মঞ্জুল শয়ন-লীলা নয়নগোচর করিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইতেন।

(৩) তুমি, এই নিয়মিত কৃত্রিম ঝগড়ার সময়ে, এরূপ স্বরভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস, ও অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে, যে তদ্দর্শনে নিতান্ত পামরেরও হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে ও ও অননুভূতপূর্ব্ব কৌতুকরসে উচ্ছলিত হইত। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার এত মধুর ও এত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত, যে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, অনেকে তৎপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন।

(৪) তুখানি।

৭। যেন, তুমি, বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং, সিঁড়ি নামিবার পূর্ব্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্ব্বক, আকুল চিত্তে বলিতেছ, 'নাফাস্‌নি, পড়ে যাব।' আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি, না আমি লাফাব। তুমি অমনি, ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, "দেখ্‌দিখি মা আমার কথা শোনে না' (৫)।

৮। যেন, তোমার দাদারা, উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না, এই বলিয়া ভয়-প্রদর্শন করিতেছে। তুমি তাহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি আর না ভালবাসি, এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বসবি' (৬), এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালনসহকারে, বারংবার বলিতেছ (৭)।

৯। যেন, আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছি। তুমি, 'এই খা' বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। তুমি, 'তবে এই খা' বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে, তুমি আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।

এইরূপে, আমি, সর্ব্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপদ অনুষ্ঠান সকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ

---

(৫) তুমি এমন ভীরুস্বভাবা ছিলে, যে কখনও, সাহস করিয়া, গাড়ীতে চড়িতে পার নাই; এবং, সেই ভীরুস্বভাবতাবশতঃ, পড়িয়া যাইবার ভয়ে, সিঁড়ি নামিবার পূর্ব্বক্ষণে আমায় সাবধান করিয়া দিতে।

(৬) ভাল বাসিবি, ভাল বাসিবি।

(৭) এই বিষয়ে, এক দিনের ব্যাপার মনে হইলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ীর ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া, আমার সঙ্গে কথোপথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না।' তুমি অমনি, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি,' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতি বারেই, 'না ভাল বস্‌বি,' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্তিহীন বদনে 'তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বস্‌বো,' এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরস সহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি, এই চিরস্মরণীয় ব্যাপার কস্মিন্ কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। দৈবযোগে, একদিন, দিবাভাগে, আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণ কালের জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এই আকস্মিক মর্ম্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা সে দিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে। তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

* * *

বৎসে! কিছু দিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই. কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্বশরীর, তক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানিং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টিগোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায়

আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু, কোনও পরিবারেই, তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সর্ব্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্য্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তুমি যে স্বল্পকাল সংসারে ছিলে, তাহা আদরে আদরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছ, অস্নেহ বা অনাদর কাহাকে বলে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, তোমায় তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই।

কিন্তু, এই নৃশংস সংসারে দীর্ঘ কাল অবস্থিত করিলে, উত্তর কালে, তোমার ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হয় ত, ভাগ্যগুণে সৎ পাত্রে প্রতিপাদিতা ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা, হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে; নয় ত, ভাগ্যদোষে, অসৎ পাত্রের হস্তগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া, অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে হইত। যদি, পরম যত্নে ও পরম আদরে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, পরিশেষে, তুমি অবস্থার বৈগুণ্যনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিতেছ, ইহা দেখিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বোধ হয়, তোমার অতর্কিত অন্তর্ধান নিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা, সে যাতনা বহু সহস্র গুণে গরীয়সী হইত। তুমি, স্বল্পকালে সংসারব্রতের উদযাপন করিয়া, আমাদের সেই সম্ভাবিত অতি বিষম আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ। তোমায় যে, ক্ষণ কালের জন্য, কাহারও নিকটে, কোনও অংশে, অণুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না। অনাদরে আদরে নরলীলা সম্পন্ন করিয়া গেলে, ইহা ভাবিয়া, আমি আমার অবোধ মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিব।

বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, প্রৌঢ় অবস্থায়, তোমায় যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত, নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই, তুমি তৎসমুদয় সম্যক্ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রভাববলে, তুমি শ্বশুরালয় প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলে (৮)।

১। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শন পূর্ব্বক, ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে।

২। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া, দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ন বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে।

---

(৮) তুমি শ্বশুরালয়ের নাম কৃষ্ণনগর, স্বামীর নাম গোবর্দ্ধন, শাশুড়ীর নাম ভাগ্যবতী, পুত্রের নাম নদে রাখিয়াছিলে।

৩। কখনও কখনও, 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে।

৪। কখনও কখনও, 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া, সঙ্কুচিত ভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে; এবং সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে।

৫। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত,' এই বলিয়া সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতাপ্রদর্শন করিতে।

৬। কখনও কখনও, 'শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে (১)।

এইরূপে, তুমি সংসারযাত্রাসংক্রান্ত সকল লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই, ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধসেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু, আমি, ইচ্ছানুরূপ জলপ্রদানের পরিবর্ত্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনা-

(১) তুমি, স্বকপোলকল্পিত সাংসারিক কাণ্ড লইয়া, যে সমস্ত লীলা করিয়াছ, তৎসমুদায় প্রায় প্রবীণতা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। * * * কখনও কখনও, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবী, তোমার কল্পিত স্বামীর উল্লেখপূর্ব্বক, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসিতেন, 'কেমন প্রভা, সে এসেছিল?' তুমি অমনি, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, 'কাল এসেছিল' বলিয়া, উত্তর দিতে। পর ক্ষণেই তিনি, 'কি দিয়ে গেল,' এই জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি, 'চারি পয়সা ও সিকি পয়সার শাঁক,' এই উত্তর দিতে।

প্রদানে চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই, তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, নিঃসন্দেহ, তোমার উৎকটপিপাসানিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপ্রার্থনাকালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদগ্ধ শল্যের ন্যায়, চির দিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না! যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমার মত পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভাল বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিক ক্ষণ না দেখিলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও আমায় অধিক ক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যার পর নাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ, এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এত দিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কি না, জানিতে পারিতেছি না; আর, হয় ত, এত দিনে, আমায় সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু, আমি তোমায়, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চির দিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যার পর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব; তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

রামের রাজ্যাভিষেক

ভূমিকা

পূজ্যপাদ পিতৃদেব, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, চরম বয়সে, 'রামের রাজ্যাভিষেক' নাম দিয়া, একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিয়দংশ লিখিত হইলে, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়-এর 'রামের রাজ্যাভিষেক' প্রকাশিত হয়। এজন্য, পিতৃদেব, তদীয় উদ্যম হইতে বিরত হয়েন।

আমি, মধ্যে, পিতৃদেব লিখিত অংশ সন্নিবেশিত করিয়া,—'রামের অধিবাস' নাম দিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম।

১৩১৫

বিনীত—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

রামের রাজ্যাভিষেক

আমি দীর্ঘ কাল অকণ্টকে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিলাম। লোকে, যে সমস্ত সুখসম্ভোগের অভিলাষ করে, আমি তদ্বিষয়ে পূর্ণাভিলাষ হইয়াছি। এইরূপে সর্ব্ব-সুখসম্পন্ন হইয়াও, এক বিষয়ে অসুখী ছিলাম; ভাবিয়াছিলাম, সংসারাশ্রমসংক্রান্ত সকল সুখের সারভূত পুত্রমুখসন্দর্শনসুখে বঞ্চিত থাকিতে হইল। সৌভাগ্যক্রমে, চরম বয়সে, সেই সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছি। পুত্র অনেকের জন্মে, কিন্তু কোনও ব্যক্তিই আমার সমান সৌভাগ্যশালী নহেন। কেহ কখনও রামসম সর্ব্বগুণাস্পদ পুত্র লাভ করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, সকল বিষয়েই আমার বাসনা সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ হইয়াছে; কোনও বিষয়েই আমার আর প্রার্থয়িতব্য নাই, কেবল রামকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিলেই, সকল সুখের একশেষ হয়। গুণ, বয়স, লোকানুরাগ বিবেচনা করিলে, রাম আমার সর্ব্বতোভাবে সিংহাসনের যোগ্য হইয়াছে; তাহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, স্বয়ং রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হই। শরীর ক্ষণভঙ্গুর, বিশেষতঃ, আমার চরম দশা উপস্থিত; কখন কি ঘটে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব, এ বিষয়ে আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে। যদি, এক দিনের জন্য রামকে সিংহাসনারূঢ় দেখিয়া, এই জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, তাহা হইলেই, আমার জীবনযাত্রা সফল হয়।

মনে মনে এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, দশরথ অমাত্যগণের নিকট অতি সঙ্গোপনে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, মহারাজ উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন; আমাদের মতে আর কালাতিপাত করা কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয় সম্পন্ন হইলে যে কেবল মহারাজের সুখের একশেষ হইবে, এরূপ নহে, রামচন্দ্র যেরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও সর্ব্বলোকপ্রিয়, বোধ করি, সসাগরা ধরা মধ্যে এরূপ ব্যক্তি নাই যে, সে তদীয় রাজ্যাভিষেকশ্রবণে অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবে না। অতএব, মহারাজ! আর সদসৎপরামর্শ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেচনা নাই; বিলম্ব করাই অপরামর্শ ও অকর্ত্তব্য। রাজা কহিলেন, তোমরা যে আমার অভিপ্রেত বিষয়ের অনুমোদন করিলে, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, বলিতে পারি না। তোমরা প্রত্যেকে বুদ্ধি ও নীতিবিদ্যায় অদ্বিতীয়। আমি, তোমাদের বুদ্ধিকৌশলে ও নীতিজ্ঞানপ্রভাবে, পূর্ব্বাপর সর্ব্ব বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়াছি; সর্ব্বকাল তোমাদের

অনুমোদিত বিষয়ে অসন্দিহানচিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; আর, আপাততঃ সাতিশয় প্রিয় বোধ হইলেও, তোমাদের অননুমোদিত বিষয় হইতে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়াছি। যখন তোমাদের মতে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক সর্ব্বথা কর্ত্তব্য স্থির হইতেছে, তখন আর তদ্বিষয়ে বিলম্ব করা কোনও মতে উচিত নহে। কিন্তু, তোমরা পূর্ব্বাপর শুনিয়া আসিতেছ, ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা যার পর নাই লোকানুরাগপ্রিয় ছিলেন ; বরং প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি লোকবিরাগসংগ্রহের কার্য্য করিতে পারেন নাই। আমি সেই প্রশংসনীয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ; সুতরাং, আমার কুলব্রত প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। আমার এই আশঙ্কা হইতেছে, রামকে এরূপ তরুণ বয়সে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে, পাছে প্রজালোকে, অপরিণতবয়স্ক বালক বলিয়া, তাহার প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করে ; এবং পাছে মনে ভাবে, আমি তাহাদের হিতাহিতচিন্তায় বিসর্জ্জন দিয়া, কেবল স্নেহের বশীভূত হইয়া, এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার এক সুকুমার শিশুর হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহারা অনায়াসেই আমায় অবিমৃষ্যকারী ও সদসৎপরিবেদনাবিহীন বিবেচনা করিতে পারে। আমি অভিলষিত বিষয়ে তোমাদের সম্মতি লাভ করিলাম ; এক্ষণে আমার একান্ত মানস, পৌরগণের জানপদবর্গের এবং অনুগত ও শরণাগত নৃপতিমণ্ডলের, মতামত পরিজ্ঞানার্থে, সকলকে সমবেত করিয়া, তাঁহাদের নিকট আত্ম অভিলাষ ব্যক্ত করি ; তাঁহারা যেরূপ কহিবেন, তদনুসারে কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।

রাজার এইরূপ নিরক্ষেপ ও সদ্বিবেচনাপূর্ণ বচনপ্রপঞ্চ শ্রবণগোচর করিয়া, অমাত্যগণ চমৎকৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি যে অত্যুচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার এ উক্তি তদুপযুক্তই বটে। এরূপ না হইলেই বা, সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ এত প্রশংসনীয় ও প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন কেন। ইতিহাসপ্রবন্ধে অনেকানেক রাজবংশের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় ; কিন্তু, প্রজারঞ্জনবিষয়ে সূর্য্যবংশীয়দিগের সমকক্ষ লক্ষিত হয় না। ফলতঃ, কোনও রাজবংশই এরূপ দিগন্তব্যাপিনী ও কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মহারাজ! আপনি অভিলষিত বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের মতামত পরিজ্ঞানের যে প্রসঙ্গ করিলেন, তাহার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় করিতে পারি না ; বরং, তদ্ব্যতিরেকে রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিলে, চিরনির্ম্মল রঘুকুলে কলঙ্ক স্পর্শিবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু, মহারাজ! তদুপলক্ষে অনর্থ কালহরণ করা হইবে না ; আপনি এই আসনেই অনুমতি প্রদান করুন ; আমরা অবিলম্বে যাবতীয় নৃপতিগণ ও পৌরজানপদবর্গ সমবেত করিতেছি। মহারাজ! "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি", শুভ কার্য্যের অনেক বিঘ্ন ; যাহা মনস্থ করিয়াছেন, তৎসম্পাদনে বিলম্ব করা বিধেয় নহে। এ বিষয়ে

আর অধিক বলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন। সকল বিষয়ে মহারাজের ইচ্ছাই বলবতী। মহারাজ নিজে যাহা বিধেয় বোধ করিবেন, তাহাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অমাত্যগণের এইরূপ মনোনুকূল অনুমোদনবাক্য আকর্ণন করিয়া, নরপতির হৃদয়-কন্দর আহ্লাদসলিলে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, আনন্দগদগদ স্বরে, সকলকে সমবেত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। অমাত্যগণ, আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র, অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, নৃপতিসমীপে বিদায় লইলেন, এবং কালাতিপাত ব্যতিরেকে, সর্ব্বদেশীয় নরপতিগণের নিকট নিরূপিত দিবসে অযোধ্যায় আসিবার আহ্বানসূচক রাজনামাঙ্কিত পত্র প্রেরণ করিলেন। প্রধান প্রধান পৌরগণ ও জানপদবর্গও, ঐ সময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, আহূত হইলেন।

নির্দ্ধারিত দিবস উপস্থিত হইল। নানাদেশীয় নৃপতিমণ্ডল, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, যথাকালে রাজসভায় সমাগত হইয়া, যথাযোগ্য স্থানে উপবেশন করিলেন। প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, সকলে উৎসুক চিত্তে দশরথের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, মেঘগম্ভীর স্বরে, সকলকে সম্বোধন করিয়া, রাজা দশরথ কহিতে লাগিলেন, তোমরা সবিশেষ অবগত আছ, আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কিরূপ সুপ্রণালীতে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে, এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার আমার দুর্ব্বল হস্তে পতিত হইলে, আমি, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া, লোকরক্ষা-ব্যাপার নির্ব্বাহে প্রাণপণে যত্ন করিয়া আসিয়াছি; কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তোমরা বলিতে পার। এক্ষণে আমার চরম দশা উপস্থিত; জরাজীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হইয়াছি; অতঃপর, আমা দ্বারা এ দুরূহ ব্যাপারের সম্যক সমাধা হওয়া দুর্ঘট। যদি, তোমরা একবাক্য হইয়া অনুমোদন কর, তাহা হইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া, জীবনের স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ বিশ্রামসুখসেবায় যাপন করি। এ বিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইবার মানসে, সলককে সমবেত করিয়াছি; তোমরা, মুখাপেক্ষা না করিয়া, অসঙ্কুচিতচিত্তে স্ব স্ব অভিপ্রায় ব্যক্ত কর।

দশরথ বিরত হইবামাত্র, সমবেত নৃপতিমণ্ডল, পৌরগণ ও জানপদবর্গ, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে গদ গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আপনি এইদণ্ডে রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার প্রদান করুন। এ বিষয়ে আমাদের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখিয়াছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, ইহাতে কাহার অনাহ্লাদ আছে। মহারাজ! সকলেই সমবেত হইয়াছি; শুভ দিন শুভ লগ্ন, নিরূপণ করুন; আমরা এই যাত্রাতেই রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিয়া

প্রতিগমন করিব। এইরূপ অভিলাষানুরূপ বাক্যগুলি শ্রবণ করিয়া, রাজার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি কিয়ৎ ক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, বিশেষরূপে তাহাদের মনঃপরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কহিলেন, তোমরা যে আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুমোদন করিলে, বোধ হইতেছে, তাহা কেবল আমার মুখাপেক্ষায় করিয়াছ; নতুবা, রাম নিতান্ত বালক ও একান্ত অনভিজ্ঞ; তাহার হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত হইলে, তোমাদের মনঃপূত হইবে, ইহা কোনও ক্রমে আমার অন্তঃকরণে হইতেছে না। অতএব, তোমাদের যথার্থ মনোগত কি, অকপটে আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

মহীপতির মুখ হইতে এই কথা নিঃসৃত হইলে, সভাস্থ সমস্ত লোকের সম্মতিক্রমে, মহামতি মগধরাজ কহিতে আরম্ভ করিলেন, মহারাজ! আমরা সরল অন্তঃকরণে বলিতেছি, কেবল মহারাজের সন্তোষার্থে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে অনুমোদন করিতেছি না। আমরা তদীয় রমণীয় গুণগ্রাম দর্শনে নিরতিশয় মুগ্ধ হইয়া আছি। মানবকলেবরে গুণসমুদয়ের ঈদৃশ সমবায় অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা। রামচন্দ্র যেমন অনুপম রূপলাবণ্যে পরিপূর্ণ, তেমনই নিরুপম গুণরত্নশোভায় বিভূষিত; স্বভাবতঃ সাতিশয় সৌম্যমূর্ত্তি; মুখারবিন্দ সর্ব্বদাই প্রসন্ন ও প্রফুল্ল রহিয়াছে, দেখিলেই অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি জন্মে, সম্ভাষণকালে যাদৃশ মৃদু মধুর বচন বিন্যাস করেন, তাহাতে কাহার কর্ণকুহর অমৃতরসে অভিষিক্ত না হয়; রূঢ় বা গর্ব্বিত, অসার বা অশ্লীল ভাষা কখনও মুখ হইতে নির্গত হয় না; কোনও বিষয়ে কদাচ বাচালতা বা চপলতা দেখিতে পাওয়া যায় না; সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ লোকের সহিত সমুচিত সমাদর পূর্ব্বক আলাপ করেন, সুতরাং নিকটে গিয়া কেহ কখনও ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হয় না; যে সকল বিষয় ঘটিলে লোক ক্রোধে অন্ধ হয়, তাদৃশ বিষয়েও অন্তঃকরণে বিকারমাত্র জন্মে না; কেহ কখনও সামান্যরূপ উপকার করিলে, উহা মহোপকার বোধে সর্বকাল স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকে; কেহ ভয়ানক অপকার করিলেও, অন্তঃকরণে রোষের বা অসন্তোষের সঞ্চার হয় না, উহা অবুদ্ধিপূর্ব্বকৃত বা অনবধানকৃত বিবেচনা করিয়া, উপেক্ষা প্রদর্শন করেন; কখনও কোনও বিষয়ে অহিত, অসদৃশ, অপ্রমিত বা অপ্রীতিকর আচরণ করেন না; বিষয়মাত্রেই দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া চলেন; নিজমুখে কখনও পরের গ্লানি করেন না, অন্যের মুখেও পরের গ্লানি শুনিতে ভাল বাসেন না; সচরাচর, রাজকুমারেরা বিলক্ষণ বিলাসী ও ভোগাভিলাষী হইয়া থাকেন, কিন্তু বিলাস ও ভোগাভিলাষ কাহাকে বলে, তাহা অবগত নহেন; অভিপ্রায়মাত্রই শুভ, অশুভ শব্দে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তাদৃশ অভিপ্রায় মনে স্থান পায় না; যার পর নাই দ্রুতদর্শী ও ক্ষিপ্রকারী, সমদর্শী ও শুদ্ধচারী সূক্ষ্মদর্শী ও

সারগ্রাহী, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, অমায়িক ও নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল ও বিমৃষ্যকারী, পরিণামদর্শী ও পরগুণগ্রাহী ; বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রই মাননীয়, ধর্ম্মশীল ব্যক্তিমাত্রই পূজনীয়, গুণবান্ ব্যক্তিমাত্রই আদরণীয় ; হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, কৌটিল্য, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দোষে একান্ত অনাঘ্রাতচিত্ত ; কখনও অসাধু বা অর্ব্বাচীন লোকের সংসর্গে থাকেন না, সতত সৎসংসর্গে ও পণ্ডিতসহবাসে কাল যাপন করেন ; অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্, অসাধারণ মেধাবী, অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী, অথচ মনে অভিমানমাত্র নাই ; দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, ধৈর্য্য. গাম্ভীর্য্য, গুরুভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণপরম্পরার নিরুপম আশ্রয়স্থল ; কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কদাচ অনবহিত বা উপেক্ষাকারী নহেন ; হিতাহিতনিরূপণে, গুরুলঘু-বিবেচনে ও স্বপরপরিদর্শনে অতি প্রবীণ ; অন্যের অনিষ্টপাত শ্রবণে অতিশয় দুঃখিত হন, অন্যের সুখসমৃদ্ধিদর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হন ; ফলতঃ তত্তুল্য পরসুখে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী কখনও দেখা যায় নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত, অস্ত্রবিদ্যায় অদ্বিতীয় হইয়াছেন ; বল, বিক্রম, সাহস, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই, তাড়কানিধনে, হরকোদণ্ডখণ্ডনে ও জামদগ্ন্যদর্পদলনে তৎসমুদয় বিলক্ষণ পরীক্ষিত হইয়াছে ; সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে যেরূপ চাতুর্য্য জন্মিয়াছে, তাহা কাহার অবিদিত আছে। এইরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও নিরতিশয় নম্রপ্রকৃতি ; ইহাতে তাঁহার অলৌকিক গুণসমুদয়ের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে। বিনয় সদ্গুণের শোভা সম্পাদন করে, এই চিরন্তনী কথা যথার্থরূপে রামচন্দ্রে যেরূপ বর্ত্তিয়াছে, অন্যত্র কুত্রাপি সেরূপ লক্ষিত হয় না। মহারাজ! বলিতে গেলে ধৃষ্টতাপ্রদর্শন হয়, কিন্তু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আপনার সৌভাগ্যের অবধি নাই ; রামচন্দ্রসদৃশ পুত্র লাভ অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে। আমরা অকপট হৃদয়ে বলিতেছি, আপনি রামচন্দ্রকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিলে, আমরা আন্তরিক পরিতোষ লাভ করিব ; অধিক আর কি বলিব, পরশ্রীকাতর পামরেরাও অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। অনেক দিন অবধি আমাদের মানস ছিল, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত, সকলে সমবেত হইয়া, মহারাজের নিকট প্রার্থনা জানাইব। কিন্তু পাছে, মহারাজের অন্তঃকরণে বিরুদ্ধ ভাবের আবির্ভাব হয়, এই ভয়ে সাহস করিয়া সে বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারি নাই। এক্ষণে, মহারাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা আহ্লাদে গদগদ হইয়াছি ; দিন নির্দ্ধারিত করিয়া অভিষেকসংক্রান্ত আয়োজনের আদেশ প্রদান করিলেই চরিতার্থ হই।

রামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে সভাস্থ সমস্ত লোকে ঈদৃশ আগ্রহ দর্শনে, রাজা পরম

পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন; এবং আর কালাতিপাত করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া, পার্শ্বোপবিষ্ট কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, যাবতীয় রাজমণ্ডল, এবং পৌরগণ ও জানপদবর্গ অদ্যকার সভায় সমবেত হইয়াছেন। ইঁহারা একবাক্য হইয়া রামের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিতেছেন; সকলেরই মানস, ত্বরায় কার্য্য সম্পন্ন হয়। অতএব, বিবেচনা করিয়া বলুন, কোন্ দিন উপস্থিত ব্যাপার সমাধানের পক্ষে সর্ব্বাংশে শুভ। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! আপনার অভিমত হইলে, অদ্য অপরাহ্ণে অধিবাস,কল্য প্রভাতে অভিষেকক্রিয়া, সম্পন্ন হইতে পারে। রাজা কহিলেন, তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, তদুপযোগী আয়োজনের আদেশ প্রদান করুন্। বশিষ্ঠ, তথাস্তু বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রামচন্দ্র কি রাজগণ, কি পুরবাসিগণ; কি জানপদগণ, সকলেরই সমান প্রিয় ছিলেন, তিনি কল্য রাজা হইবেন, তাহার সমুদয় আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল, ইহা দেখিয়া, তাঁহারা যেন অমৃতহ্রদে অবগাহন করিলেন। তদীয় আনন্দকোলাহলে সভামণ্ডল পরিপূরিত হইয়া উঠিল।

কর্ম্মচারীদিগের প্রতি অভিষেকসংক্রান্ত যাবতীয় আয়োজনের ভারপ্রদান করিয়া, বশিষ্ঠদেব সভামণ্ডপে প্রত্যাগত হইলে, দশরথ স্বীয় সারথি মহামতি সুমন্ত্রের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি অবিলম্বে রামচন্দ্রকে একবার এই স্থানে উপস্থিত কর। সুমন্ত্র, নরপতির আদেশ প্রাপ্তিমাত্র, দ্রুত গমনে রামভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং রামের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ আপনাকে স্মরণ করিয়াছেন। রামচন্দ্র, আকর্ণনমাত্র, সভাগমনের উপযোগী বেশভূষা সমাধান করিয়া, সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে পিতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা, প্রাণাধিকপ্রিয় পুত্রকে সমাগত দেখিয়া, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিলেন এবং পার্শ্বস্থিত মহার্হ আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। রাম উপবিষ্ট হইলেন, এবং অঞ্জলিবন্ধ পূর্ব্বক বিনীত ভাবে, আদেশ-প্রতীক্ষায়, পিতৃবদনে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, নরপতি রামকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস, আমি দীর্ঘ কাল প্রজাপালনকার্য্যে ব্যাপৃত আছি; এক্ষণে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়াছি; জরার আবেশবশতঃ আমার শরীরে আর এরূপ সামর্থ্য নাই যে, অতঃপর আমা দ্বারা এ দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন হয়। সমস্ত রাজগণ ও যাবতীয় পৌরজানপদগণ সভায় সমবেত হইয়াছেন; সকলেরই একান্ত অভিলাষ, তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, আমি রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হই। তদনুসারে স্থির

করিয়াছি, কল্য প্রভাতে, তোমার হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিব। অধিবাসের ও অভিষেকের আয়োজনার্থ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্য অপরাহ্ণে অধিবাস। তুমি, স্নান আহ্নিক সমাপন করিয়া, পূত ও সংযত হইয়া থাকিবে। বৎস! আমার সকল সুখভোগ সম্পন্ন হইয়াছে; তোমায় সিংহাসনে সন্নিবিষ্ট দেখিলেই, জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ ফললাভ হয়। এই বলিয়া, স্নেহভরে তদীয় মুখচন্দ্র চুম্বন করিয়া, রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রাম, পিতার চরণসরসীরুহে প্রণতি ও অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক, স্বভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজাও, সমবেত সর্ব্বসাধারণ লোকদিগকে অপরাহ্ণে অধিবাস দর্শনের নিমন্ত্রণ করিয়া, সভাভঙ্গ করিলেন।

রাম সভামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলে, সর্ব্বাগ্রে প্রাণাধিক লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি, তাঁহাকে অভিষেকবৃত্তান্ত কহিয়া, তৎসমভিব্যাহারে স্বীয় জননীর বাসভবনে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, তিন জনে, একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, হৃষ্ট মনে কথোপকথন করিতেছেন। সন্নিহিত হইয়া, রাম, মাতা ও বিমাতার চরণে প্রণাম করিলেন, এবং কৌশল্যাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! পিতা কহিলেন, কল্য প্রাতে আমায় প্রজাপালন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অধিবাসের ও অভিষেকের আয়োজন হইতেছে। অদ্য অপরাহ্ণে অধিবাস। অতএব, সে বিষয়ের যে কিছু ইতিকর্ত্তব্যতা থাকে, তাহার উদ্যোগ কর। এই সংবাদ শুনিয়া, কৌশল্যার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া, গদগদ বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! রঘুকুলদেবতারা তোমায় নিরাময় ও দীর্ঘজীবী করুন্। কি শুভ ক্ষণেই আমি তোমায় গর্ভে ধরিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। আমার গর্ভের সন্তান সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি। তোমায় সিংহাসনে সন্নিবেশিত দেখিয়া, যদি এক মুহূর্ত্তও প্রাণধারণ করি, তাহা হইলেই আমার মানবজন্ম সফল হইল। এই বলিয়া, কৌশল্যা দেবতাদিগের নিকট পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাম, মাতা ও বিমাতার চরণে পুনরায় প্রণাম করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত স্বীয় নিকেতনে গমন করিলেন।

অদ্য অধিবাস, কল্য রাম রাজা হইবেন, এই সংবাদ সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইবামাত্র, সমস্ত অযোধ্যানগর শঙ্খধ্বনি ও আনন্দধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি শিশু কি বৃদ্ধ, কি ধনী কি দরিদ্র, কি মূর্খ কি পণ্ডিত, সর্ব্বপ্রকার লোক এককালে আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। গৃহে গৃহে মহোৎসব ও মঙ্গলাচার হইতে আরম্ভ

হইল। রাজপথ সকল মার্জিত ও সুগন্ধ সলিলে সংসিক্ত হইতে লাগিল। সহকারশাখা ও সুশোভিত কুসুমমালা, দ্বারে দ্বারে লম্বিত হইতে লাগিল। পূর্ণ কলস, দ্বারদেশের উভয় পার্শ্বে, সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। প্রত্যেক ভবনের উপরিভাগে, পতাকা সকল উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

বিদ্যাসাগর চরিত

(স্বরচিত)

ভূমিকা

এই পুস্তক প্রকাশের তারিখ ১৮৪৮ সংবৎ, ৯ই আশ্বিন—অর্থাৎ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। বিদ্যারত্ন মহাশয় "বিজ্ঞাপনে" জানাইতেছেন যে, ইহাতে "তাঁহার পূর্বপুরুষগণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত, ও স্বীয় শৈশবের সামান্য বিবরণ মাত্র···লিপিবদ্ধ আছে।"

—সম্পাদক

বিদ্যাসাগর চরিত

প্রথম পরিচ্ছেদ

শকাব্দাঃ ১৭৪২, ১২ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, দিবা দ্বিপ্রহরের সময়, বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনকজননীর প্রথম সন্তান।

বীরসিংহের আধক্রোশ অন্তরে, কোমরগঞ্জ নামে এক গ্রাম আছে; ঐ গ্রামে, মঙ্গলবারে ও শনিবারে, মধ্যাহ্নসময়ে, হাট বসিয়া থাকে। আমার জন্ম সময়ে পিতৃদেব বাটীতে ছিলেন না, কোমরগঞ্জে হাট করিতে গিয়াছিলেন। পিতামহদেব তাঁহাকে আমার জন্মসংবাদ দিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বলিলেন "একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে"। এই সময়ে, আমাদের বাটীতে, একটি গাই গর্ভিণী ছিল, তাহারও আজ কাল, প্রসব হইবার সম্ভবনা। এজন্য, পিতামহদেবের কথা শুনিয়া, পিতৃদেব মনে করিলেন, গাইটি প্রসব হইয়াছে। উভয়ে বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতৃদেব, এঁড়ে বাছুর দেখিবার জন্য, গোয়ালের দিকে চলিলেন। তখন পিতামহদেব হাস্যমুখে বলিলেন, "ও দিকে নয়, এদিকে এস; আমি তোমায় এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিতেছি"। এই বলিয়া, সূতিকা গৃহে লইয়া গিয়া, তিনি এঁড়ে বাছুর দেখাইয়া দিলেন।

এই অকিঞ্চিৎকর কথার উল্লেখের তাৎপর্য্য এই যে, আমি বাল্যকালে, মধ্যে মধ্যে, অতিশয় অবাধ্য হইতাম। প্রহার ও তিরস্কার দ্বারা, পিতৃদেব আমার অবাধ্যতা দূর করিতে পারিতেন না। ঐ সময়ে, তিনি, সন্নিহিত ব্যক্তিদের নিকট পিতামহদেবের পূর্ব্বোক্ত পরিহাস বাক্যের উল্লেখ করিয়া, বলিতেন, "ইনি সেই এঁড়ে বাছুর; বাবা পরিহাস করিয়াছিলেন, বটে; কিন্তু, তিনি সাক্ষাৎ ঋষি ছিলেন; তাঁহার পরিহাস বাক্যেও বিফল হইবার নহে; বাবাজি আমার, ক্রমে এঁড়ে গরু অপেক্ষাও এক গুঁইয়া হইয়া উঠিতেছেন"। জন্মসময়ে, পিতামহদেব, পরিহাস করিয়া, আমায় এঁড়ে বাছুর বলিয়াছিলেন; জ্যোতিশাস্ত্রের গণনা অনুসারে বৃষরাশিতে আমার জন্ম হইয়াছিল; আর, সময়ে সময়ে, কার্য্য দ্বারাও, এঁড়ে গরুর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ, আমার আচরণে, বিলক্ষণ আবির্ভূত হইত।

বীরসিংহগ্রামে আমার জন্ম হইয়াছে; কিন্তু, এই গ্রাম আমার পিতৃপক্ষীয় অথবা মাতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বাসস্থান নহে। জাহানাবাদের ঈশান কোণে, তথা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে, বনমালিপুর নামে যে গ্রাম আছে, উহাই আমার পিতৃপক্ষীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান। যে ঘটনাসূত্রে পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থানে বিসর্জন দিয়া, বীরসিংহ গ্রামে আমাদের বসতি ঘটে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান, জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্যপ্রয়োগে, তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন, অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিত করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।

বীরসিংহগ্রামে, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ব্যাকরণে সবিশেষ পারদর্শিতা বশতঃ, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, রাঢ়দেশে অদ্বিতীয় বৈয়াকবণ বলিয়া, পরিগণিত হইয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে, মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষ, মহাসমারোহে, মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায়, নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ শঙ্কর তর্কবাগীশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, স্বীয় ব্যাকরণবিদ্যার বিশিষ্টরূপ পরিচয় দিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়কে সাতিশয় সন্তুষ্ট করেন। তর্কবাগীশ মহাশয়, মুক্তকণ্ঠে, সাধুবাদপ্রদান, ও সবিশেষ আদব সহকারে, আলিঙ্গনদান করিয়াছিলেন। এই ঘটনা দ্বারা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, সর্বত্র, যার পর নাই, মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের, দুই পুত্র ও চারি কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস, জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।

রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলেন; দুর্গাদেবী, পুত্র কন্যা লইয়া, বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনাভোগ ও তদীয় পুত্র কন্যাদের উপর কর্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর, এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল যে দুর্গাদেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যাচতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয় যাইতে হইল। তদীয় ভ্রাতৃশ্বশুর প্রভৃতির আচরণের পরিচয় পাইয়া, তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সাতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং তাঁহার পুত্রকন্যাদের উপর যথোচিত স্নেহ-প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য, সংসারের কর্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভূষণের হস্তে ছিল। সুতরাং, তিনিই বাটীর প্রকৃত কর্তা, ও তাঁহার গৃহিণীই বাটীর প্রকৃত কর্ত্রী। দেশাচার অনুসারে, তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তৎকালে, সাক্ষিগোপাল স্বরূপ ছিলেন; কোনও বিষয়ে তাঁহাদের কর্তৃত্ব খাটিত না; সাংসারিক সমস্ত ব্যাপার, রামসুন্দর ও তাঁহার গৃহিণীর অভিপ্রায় অনুসারেই, সম্পাদিত হইত।

কিছু দিনের মধ্যেই, পুত্র কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে কালযাপন করা, দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ, অনিয়ত কালের জন্যে, সাতজনের ভরণপোষণের ভারবহনে, তাঁহারা কোনও মতে, সম্মত নহেন। তাঁহারা দুর্গাদেবী ও তদীয় পুত্রকন্যাদিগকে গলগ্রহবোধ করিতে লাগিলেন। রামসুন্দরের বনিতা, কথায় কথায়, দুর্গাদেবীর অবমাননা করিতে আরম্ভ করিলেন। যখন নিতান্ত অসহ্য বোধ হইত, দুর্গাদেবী স্বীয় পিতা তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের গোচর করিতেন। তিনি, সাংসারিক বিষয়ে, বার্দ্ধক্য নিবন্ধন ঔদাসীন্য অথবা কর্ত্তৃত্ববিরহ বশতঃ, কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেন না। অবশেষে, দুর্গাদেবীকে, পুত্রকন্যা লইয়া, পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় সাতিশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া, সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে, টেকুয়া ও চরখায় সুত কাটিয়া, সেই সুত বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। তিনি, একাকিনী হইলে অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা, অবলীলাক্রমে, দিনপাত করিতে পারিতেন। কিন্তু, তাদৃশ স্বল্প আয় দ্বারা, নিজের, দুইপুত্রের, ও চারি কন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা, সময়ে সময়ে, যথাসম্ভব, সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের, আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে, ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি, মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র, জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়লঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায়, কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস, এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া, আত্মপরিচয় দিলেন, এবং কি জন্যে আসিয়াছেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন; এমন দুর্দ্দশাপন্ন আসন্ন জ্ঞাতি-সন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি, সাতিশয় দয়া ও সবিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন পূর্ব্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয়প্রদান করিলেন।

ঠাকুরদাস, প্রথমতঃ বনমালিপুরে, তৎপরে বীরসিংহে, সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি, ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে, রীতিমত সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন করিবেন, প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা স্থির হইয়াছিল, এবং তিনিও তাদৃশ অধ্যয়ন বিষয়ে, সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু, যে উদ্দেশে, তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সংস্কৃতপাঠে নিযুক্ত হইলে, তাহা সম্পন্ন হয় না। তিনি, সংস্কৃত

পড়িবার জন্য, সবিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, যথার্থ বটে, এবং সর্ব্বদাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেন, যত কষ্ট, যত অসুবিধা হউক না কেন, সংস্কৃতপাঠে প্রাণপণে যত্ন করিব। কিন্তু জননীকে ও ভাই ভগিনীগুলিকে কি অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছেন, যখন তাহা মনে হইত, তখন সে ব্যগ্রতা ও সে প্রতিজ্ঞা, তদীয় অন্তঃকরণ হইতে, একবারে অপসারিত হইত। যাহা হউক, অনেক বিবেচনার পর, অবশেষে ইহাই অবধারিত হইল, যাহাতে তিনি শীঘ্র উপার্জনক্ষম হন, সেরূপ পড়াশুনা করাই কর্ত্তব্য।

এই সময়ে, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে, অনায়াসে কর্ম্ম হইত। এজন্য, সংস্কৃত না পড়িয়া, ইঙ্গরেজী পড়াই, তাঁহার পক্ষে, পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল। কিন্তু, সে সময়ে, ইঙ্গরেজী পড়া সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন, এখনকার মত, প্রতি পল্লীতে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল না। তাদৃশ বিদ্যালয় থাকিলেও, তাহার ন্যায় নিরুপায় দীন বালকের তথায় অধ্যয়নের সুবিধা ঘটিত না। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের পরিচিত এক ব্যক্তি কার্য্যোপযোগী ইঙ্গরেজী জানিতেন। তাঁহার অনুরোধে, ঐ ব্যক্তি ঠাকুরদাসকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে সম্মত হইলেন। তিনি বিষয়কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং, দিবাভাগে, তাঁহার পড়াইবার অবকাশ ছিল না। এজন্য, তিনি ঠাকুরদাসকে, সন্ধ্যার সময়, তাঁহার নিকটে যাইতে বলিয়া দিলেন। তদনুসারে ঠাকুরদাস প্রত্যহ সন্ধ্যার পর, তাঁহার নিকটে গিয়া, ইঙ্গরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

ন্যায়লঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে, সন্ধ্যার পরেই, উপরিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস, ইঙ্গরেজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না, যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি, দিন দিন, শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। এক দিন, তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছ, কেন? তিনি, কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে, সেই স্থানে, শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোনও মতে চলিতেছে না। যদি তুমি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, ঠাকুরদাস যার পর নাই, আহ্লাদিত হইলেন, এবং, পর দিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই সদাশয় দয়ালু মহাশয়ের দয়া ও সৌজন্য যেরূপ ছিল আয় সেরূপ ছিল না। তিনি, দালালি করিয়া, সামান্যরূপ উপার্জন করিতেন। যাহা হউক, এই ব্যক্তির আশ্রয়ে আসিয়া, ঠাকুরদাসের, নির্বিঘ্নে, দুই বেলা আহার ও ইঙ্গরেজী পড়া চলিতে লাগিল। কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে, তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া গেল; সুতরাং, তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত

ঠাকুরদাসের, অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি, প্রতি দিন, প্রাতঃকালে, বহির্গত হইতেন, এবং কিছু হস্তগত হইলেও, কোনও দিন দেড়প্রহরের, কোন দিন দুই প্রহরের কোন দিন আড়াই প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন, যাহা আনিতেন, তাহা দ্বারা, কোনও দিন কষ্টে কোনও দিন বা সচ্ছন্দে, নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন, তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন, ঠাকুরদাসকে, সমস্ত দিন, উপবাসী থাকিতে হইত।

ঠাকুরদাসের সামান্যরূপ এক খানি পিতলের থালা ও একটি ছোট ঘটি ছিল। থালাখানিতে ভাত ও ঘটীতে জল খাইতেন। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক পয়সার সালপাত কিনিয়া রাখিলে, ১০।১২ দিন ভাত খাওয়া চলিবেক, সুতরাং থালা না থাকিলে, কাজ আটকাইবেক না, অতএব, থালাখানি বেচিয়া ফেলি, বেচিয়া যাহা পাইব, তাহা আপনার হাতে রাখিব। যে দিন, দিনের বেলায় আহারের যোগাড় না হইবেক, এক পয়সার কিছু কিনিয়া খাইব। এই স্থির করিয়া, তিনি সেই থালাখানি, নূতন বাজারের, কাঁসারিদের দোকানে বেচিতে গেলেন। কাঁসারিরা বলিল, আমরা অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিতে পারিব না। পুরাণ বাসন কিনিয়া, কখনও কখনও, বড় ফেসাতে পড়িতে হয়। অতএব, আমরা তোমার, থালা লইব না। এইরূপে কোনও দোকানদারই সেই থালা কিনিতে সম্মত হইল না। ঠাকুরদাস, বড় আশা করিয়া, থালা বেচিতে গিয়েছিলেন এক্ষণে, সে আশায় বিসর্জন দিয়া, বিষণ্ণ মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

এক দিন, মধ্যাহ্ন সময়ে, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া, এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন, যে আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং, ব্রাহ্মণের ছেলেকে সুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহা এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না, মা আজ আমি, এখন পর্য্যন্ত, কিছুই খাই নাই। তখন, সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া, নিকবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে

পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন, পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যে দিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।

পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্যপ্রদর্শন করিতেন না। যাহা হউক যে যে দিন, দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে, তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া, ফলার করিয়া আসিতেন।

ঠাকুরদাস, মধ্যে মধ্যে, আশ্রয়দাতাকে বলিতেন, যাহাতে আমি, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া, মাসিক কিছু কিছু পাইতে পারি, আপনি, দয়া করিয়া, তাহার কোনও উপায় করিয়া দেন। আমি ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, যাঁহার নিকট নিযুক্ত হইব, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, এবং প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণ করিব না। আমার উপকার করিয়া, আপনাকে কদাচ লজ্জিত হইতে, বা কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবেক না। জননী ও ভাই ভগিনীগুলির কথা যখন মনে হয়, তখন আর ক্ষণকালের জন্যেও, বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। এই বলিতে বলিতে, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত।

কিছু দিন পরে, ঠাকুরদাস, আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে, কোনও স্থানে নিযুক্ত হইলেন। এই কর্ম্ম পাইয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পূর্ব্ববৎ আশ্রয়দাতার আশ্রয়ে থাকিয়া, আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও, বেতনের দুইটি টাকা, যথা নিয়মে, জননীর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যার পর নাই পরিশ্রমী ছিলেন, এবং কখনও কোনও ওজর না করিয়া, সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন, এজন্য, ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।

দুই তিন বৎসরের পরেই, ঠাকুরদাস মাসিক পাঁচ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জননীর ও ভাই ভগিনীগুলির, অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে, কষ্ট দূর হইল। এই সময়ে, পিতামহদেবও দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি প্রথমতঃ বনমালিপুরে গিয়াছিলেন; তথায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা দেখিতে না পাইয়া, বীরসিংহে আসিয়া, পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। সাত আট বৎসরের পর, তাঁহার সমাগমলাভে, সকলেই আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন। শ্বশুরালয়ে বা শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে, বাস করা তিনি অবমাননা জ্ঞান করিতেন, এজন্য, কিছুদিন পরেই, পরিবার লইয়া, বনমালিপুরে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু, দুর্গাদেবীর মুখে ভ্রাতাদের আচরণের পরিচয় পাইয়া, সে উদ্যম হইতে বিরত হইলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, বীরসিংহে অবস্থিতি বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। এইরূপে, বীরসিংহগ্রামে আমাদের বাস হইয়াছিল।

বীরসিংহে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া তর্কভূষণ মহাশয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র

ঠাকুরদাসকে দেখিবার জন্য, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। ঠাকুরদাসের আশ্রয়দাতার মুখে, তদীয় কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির প্রভূত পরিচয় পাইয়া, তিনি যথেষ্ট আশীর্ব্বাদ ও সবিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বড়বাজারের দয়েহাঁটায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন, আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি ; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার, কোনও অংশে, অসুবিধা ঘটিবেক না।

এই প্রস্তাব শুনিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন ; এবং ঠাকুরদাসকে সিংহ মহাশয়ের আশ্রয়ে রাখিয়া, বীরসিংহে প্রতিগমন করিলেন। এই অবধি, ঠাকুরদাসের আহারক্লেশের অবসান হইল। যথা সময়ে আবশ্যকমত, দুই বেলা আহার পাইয়া, তিনি পুনর্জন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভঘটনা দ্বারা, তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে ; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায়, মাসিক আট টাকা বেতনে এক স্থানে নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরদাসের আট টাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া, তদীয় জননী দুর্গাদেবীর আহ্লাদের সীমা রহিল না।

এই সময়ে, ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয় গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতীদেবীর সহিত, তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী-দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতীদেবী, শৈশবকালে, মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি পিতৃহীনা ছিলেন না ; তথাপি, কি কারণে, তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইতে হইয়াছিল, তাহা প্রদর্শিত, ও তৎসমভিব্যাহারে তদীয় মাতুলকুলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত, হইতেছে।

পাতুলনিবাসী মুখটী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের চারি পুত্র ও দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় ; জ্যেষ্ঠা গঙ্গা, কনিষ্ঠা তারা। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিজ বাটীতেই চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে, তিনি স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তিনি, স্বগ্রামে ও চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে, সবিশেষ আদরণীয় ও সাতিশয় মাননীয় ছিলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা বিবাহযোগ্যা হইলে, বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, গোঘাটে একটি সুপাত্র আছে, এই সংবাদ পাইয়া, ঐ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাত্রের নাম রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমান ও নিরতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন ; অবাধে অধ্যয়ন করিয়া, একুশ, বাইশ বৎসরে, ব্যাকরণে ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন, এবং তর্কবাগীশ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে অন্নদান এবং ব্যাকরণে ও স্মৃতি-শাস্ত্রে শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, এই পাত্রের বুদ্ধি, বিদ্যা ও ব্যবসায়ের

পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিতচিত্তে, কন্যাদানে সম্মত হইলেন, এবং বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক, পুত্রদের সহিত পরামর্শ করিয়া, রামকান্ত তর্কবাগীশের সহিত, জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গার বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে, গঙ্গাদেবীর গর্ভে, তর্কবাগীশ মহাশয়ের দুই কন্যা জন্মিল, জ্যেষ্ঠা লক্ষ্মী, কনিষ্ঠা ভগবতী। কিছু দিন পরে, তর্কবাগীশ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে, তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশীলনে সবিশেষ মনোনিবেশ করিলেন। অতঃপর, অধ্যাপনাকার্য্যে তাঁহার তাদৃশ যত্ন রহিল না। তাঁহার অযত্ন দেখিয়া ছাত্রেরা, ক্রমে ক্রমে, তদীয় চতুষ্পাঠী হইতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত না হইয়া, অব্যাঘাতে তন্ত্র-শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে পারিব, এই ভাবিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়, অবশেষে, শবসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, অল্প দিনের মধ্যেই শবসাধনের সমুচিত ফললাভ করিলেন। শবের উপর উপবিষ্ট হইয়া, জপ করিতে করিতে, তিনি, তুড়ি দিয়া, "মঞ্জুর" বলিয়া, গাত্রোত্থান করিলেন। ফলকথা এই, সেই অবধি, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে, উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর, কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসিলে, তিনি, তুড়ি দিয়া ও মঞ্জুর বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতেন। সময়ে সময়ে, ইহাও অবলোকিত হইত, যখন তিনি একাকী উপবিষ্ট আছেন, কেবল তুড়ি দিতেছেন, ও মঞ্জুর মঞ্জুর বলিতেছেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর বা অন্য কোনও অভিভাবক ছিলেন না। গঙ্গাদেবী, দুই শিশু কন্যা ও উন্মাদগ্রস্ত স্বামী লইয়া, বড় বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিরুপায় ভাবিয়া, স্বীয় পিতা পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের নিকট, এই বিপদের সংবাদ পাঠাইলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, কন্যা, জামাতা ও দুই দৌহিত্রীকে আপন বাটীতে আনিলেন। এক স্বতন্ত্র চণ্ডীমণ্ডপ উন্মাদগ্রস্ত জামাতার বাসার্থে নিয়োজিত হইল; তিনি তথায় অবস্থিতি করিলেন; কন্যা ও দুই দৌহিত্রী পরিবারের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জামাতার বিশিষ্টরূপ চিকিৎসা করাইলেন; কিছুতেই কোনও উপকার দর্শিল না। অল্প দিনের মধ্যেই অবধারিত হইল, জামাতা, এজন্মে আর প্রকৃতিস্থ হইতে পারিবেন না। অতঃপর, কন্যা, জামাতা, ও দুই দৌহিত্রীর ভরণপোষণ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের ভার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উপরেই বর্ত্তিল। তিনিও যথোচিত যত্ন ও স্নেহ সহকারে, তাঁহাদের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অবিদ্যমান হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধামোহন বিদ্যাভূষণ সংসারের কর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, মধ্যম রামধন ন্যায়রত্ন পিতার চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ ও চতুর্থ বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বিষয়কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। চারি সহোদরে, যাবজ্জীবন, একান্নবর্ত্তী ছিলেন; যিনি যে উপার্জন করিতেন, জ্যেষ্ঠের হস্তে দিতেন। জ্যেষ্ঠ, যার পর নাই, সমদর্শী ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। স্বীয় পরিবারের উপর, তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও যেরূপ যত্ন ছিল, ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, তিনি বরং তাহা অপেক্ষা অধিক স্নেহ ও অধিক যত্ন করিতেন। ফলকথা এই, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব কালে, কেহ কখনও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবার কোনও কারণ দেখিতে পান নাই।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, একান্নবর্ত্তী ভ্রাতাদের, অধিক দিন, পরস্পর সদ্ভাব থাকে না, যিনি সংসারে কর্ত্তৃত্ব করেন, তাঁহার পরিবার যেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকেন, অন্য অন্য ভ্রাতাদের পরিবারের পক্ষে, সেরূপ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকা, কোনও মতে, ঘটিয়া উঠে না। এজন্য, অল্প দিনেই, ভ্রাতাদের পরস্পর মনান্তর ঘটে, অবশেষে, মুখদেখাদেখি বন্ধ হইয়া, পৃথক হইতে হয়। কিন্তু, সৌজন্য ও মনুষ্যত্ব বিষয়ে চারি জনেই সমান ছিলেন, এজন্য, কেহ, কখনও, ইঁহাদের চারি সহোদরের মধ্যে, মনান্তর বা কথান্তর দেখিতে পান নাই। স্বীয় পরিবারের কথা দূরে থাকুক, ভগিনী, ভাগিনেয়ী ভাগিনেয়ীদের পুত্রকন্যাদের উপরেও, তাঁহাদের অণুমাত্র বিভিন্ন ভাব ছিল না। ভাগিনেয়ীরা, পুত্রকন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে গিয়া, যেরূপ সুখে সমাদরে, কালযাপন করিতেন, কন্যারা, পুত্র কন্যা লইয়া, পিত্রালয়ে গিয়া, সচরাচর সেরূপ সুখ ও সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে, সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, ঐ অঞ্চলের কোনও পরিবার এ বিষয়ে এই পরিবারের ন্যায়, প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ফলকথা এই, অন্নপ্রার্থনায়, রাধামোহন বিদ্যাভূষণের দ্বারস্থ হইয়া, কেহ কখনও প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন, ইহা কাহারও নেত্রগোচর বা কর্ণগোচর হয় নাই। আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে অবস্থার লোক হউক, লোকের সংখ্যা যত হউক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আবাসে আসিয়া, সকলেই পরম সমাদরে, অতিথিসেবা ও অভ্যাগতপরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবদ্দশায়, এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের, স্বগ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুতর গ্রামে, আধিপত্যের সীমা ছিল না। এই সমস্ত গ্রামের লোক বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। অনুগত গ্রামবৃন্দের লোকদের বিবাদভঞ্জন, বিপদ্‌মোচন, অসময়ে সাহায্যদান প্রভৃতি কার্য্যই বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবনযাত্রার সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অনেক অর্থ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; কিন্তু, সেই অর্থের সঞ্চয়, অথবা স্বীয় পরিবারের সুখসাধনে প্রয়োগ, এক দিন একক্ষণের জন্যেও, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। কেবল অন্নদান ও সাহায্যদানেই সমস্ত বিনিযোজিত ও পর্য্যবসিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রাতঃস্মরণীয় রাধামোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত, অমায়িক, পরোপকারী, ও ক্ষমতাপন্ন পুরুষ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তদীয় পরিবারবর্গের নিকট, আমরা, অশেষ প্রকারে, যে প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পরিশোধ হইতে পারে না। আমার যখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, মাতৃদেবী, পুত্র কন্যা লইয়া, মাতুলালয়ে যাইতেন, এবং এক যাত্রায়, ক্রমান্বয়ে, পাঁচ ছয় মাস বাস করিতেন; কিন্তু এক দিনের জন্যেও, স্নেহ, যত্ন ও সমাদরের ত্রুটি হইত না। বস্তুতঃ, ভাগিনেয়ী ও ভাগিনেয়ীর পুত্রকন্যাদের উপর এরূপ স্নেহপ্রদর্শন অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার। জ্যেষ্ঠা ভাগিনেয়ীর মৃত্যু হইলে, তদীয় একবর্ষীয় দ্বিতীয় সন্তান, বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত, আদ্যন্ত অবিচলিতস্নেহে, প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি পঞ্চমবর্ষীয় হইলাম। বীরসিংহে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালা ছিল। গ্রামস্থ বালকগণ ঐ পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিত। আমি তাঁহার পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় পরিশ্রমী এবং শিক্ষাদান বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ও সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। ইঁহার পাঠশালার ছাত্রেরা, অল্প সময়ে, উত্তমরূপ শিক্ষা করিতে পারিত; এজন্য, ইনি উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া, বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, পূজ্যপাদ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গুরুমহাশয় দলের আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

পাঠশালায় এক বৎসর শিক্ষার পর, আমি ভয়ঙ্কর জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। আমি এ যাত্রা রক্ষা পাইব, প্রথমতঃ এরূপ আশা ছিল না। কিছু দিনের পর, প্রাণনাশের আশঙ্কা নিরাকৃত হইল; কিন্তু, একেবারে বিজ্বর হইলাম না। অধিক দিন জ্বরভোগ করিতে করিতে, প্লীহার সঞ্চার হইল। জ্বর ও প্লীহা উভয় সমবেত হওয়াতে, শীঘ্র আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা রহিল না। ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিন্তু, রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল।

জননীদেবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল, রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, আমার পীড়াবৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া বীরসিংহে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিয়া শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, আমাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। মাতুলের সন্নিকটে কোটরীনামে যে গ্রাম আছে, তথায় বৈদ্যজাতীয় উত্তম চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহাদের অন্যতমের হস্তে আমার চিকিৎসার ভার অর্পিত হইল। তিন মাস চিকিৎসার পর, সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলাম। এই সময়ে, আমার উপর, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ও তদীয় পরিবারবর্গের স্নেহ ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে, বীরসিংহে প্রতিপ্রেরিত হইলাম। এবং পুনরায়, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়র পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া, আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, তথায় শিক্ষা করিলাম। আমি গুরুমহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলাম। আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, পাঠশালার সকল ছাত্র অপেক্ষা, আমার উপর তাঁহার অধিকতর স্নেহ ছিল। আমি তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার দেহাত্যয়ের কিছু দিন পূর্ব্বে একবার মাত্র, তাঁহার উপর আমার ভক্তি বিচলিত হইয়াছিল।

—শাকে, কার্ত্তিক মাসে, পিতামহদেব, রামজয় তর্কভূষণ, অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনও অংশে, কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনও প্রকারে,

অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি, সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়েব অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার প্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। তিনি নিতান্ত নিস্পৃহ ছিলেন, এজন্য, অন্যের উপাসনা বা আনুগত্য, তাঁহার পক্ষে, কস্মিন্ কালেও আবশ্যক হয় নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তর্কভূষণ মহাশয়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক, বীরসিংহবাসে সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার শ্যালক, রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ, গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরেব অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না, তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে, সময়ে সময়ে, প্রকৃত-প্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।

তাঁহার শ্যালক প্রভৃতি গ্রামের প্রধানেরা নিরতিশয় স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন; আপন ইষ্টসাধন বা অভিপ্রেত সম্পাদনের জন্য, না করিতে পারিতেন, এমন কর্ম্মই নাই। এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে এমন নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেন, যে তাঁহাদের কিছুমাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এরূপ বোধ হইত না। এজন্য, তর্কভূষণ মহাশয়, সর্ব্বদা, সর্ব্বসমক্ষে, মুক্ত-কণ্ঠে বলিতেন, এ গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সকলই গরু। এক দিন, তিনি এক স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ঐ স্থানে, লোকে মলত্যাগ করিত। প্রধান কল্পের এক ব্যক্তি বলিলেন, তর্কভূষণ মহাশয় ওস্থানটা দিয়া যাইবেন না। তিনি বলিলেন, দোষ কি। সে ব্যক্তি বলিলেন, ঐ স্থানে বিষ্ঠা আছে। তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, বলিলেন, এখানে বিষ্ঠা কোথায়, আমি গোবর ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না; যে গ্রামে একটাও মানুষ নাই, সেখানে বিষ্ঠা কোথা হইতে আসিবেক।

তর্কভূষণ মহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোট, কি বড়, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটবাচী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি

স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে, বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য করিতেন, আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্, ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।

ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, বটে; কিন্তু, তদীয় আকারে, আলাপে, বা কার্য্যপরম্পরায় তাঁহার ক্রোধ জন্মিয়াছে বলিয়া, কেহ বোধ করিতে পারিতেন না। তিনি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, ক্রোধবিষয়ীভূত ব্যক্তির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগে, অথবা তদীয় অনিষ্ট চিন্তনে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। নিজে যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারা যায়, তাহাতে তিনি অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা করিতেন না, এবং কোনও বিষয়ে, সাধ্যপক্ষে পরাধীন বা পরপ্রত্যাশী হইতে চাহিতেন না। তিনি একাহারী নিরামিষাশী, সদাচারপূত, ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। এজন্য, সকলেই তাঁহাকে, সাক্ষাৎ ঋষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বনমালিপুর হইতে প্রস্থান করিয়া, যে আট বৎসর অনুদ্দেশপ্রায় হইয়াছিলেন, ঐ আট বৎসরকাল কেবল তীর্থ-পর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি দ্বারকা, জ্বালামুখী, বদরিকাশ্রম পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় অতিশয় বলবান, নিরতিশয় সাহসী, এবং সর্ব্বোতোভাবে অকুতোভয় পুরুষ ছিলেন। এক লৌহদণ্ড তাঁহার চিরসহচর ছিল; উহা হস্তে না করিয়া তিনি কখনও বাটীর বাহির হইতেন না। তৎকালে পথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল। স্থানান্তরে যাইতে হইলে, অতিশয় সাবধান হইতে হইত। অনেক স্থলে, কি প্রত্যুষে কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, অল্পসংখ্যক লোকের প্রাণনাশ অবধারিত ছিল। এজন্য অনেকে সমবেত না হইয়া, ঐ সকল স্থল দিয়া যাতায়াত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তর্কভূষণ মহাশয়, অসাধারণ বল, সাহস, ও চিরসহচর লৌহদণ্ডের সহায়তায়, সকল সময়ে, ঐ সকল স্থল দিয়া, একাকী নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেন। দস্যুরা দুই চারি বার আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্তরূপ আক্কেলসেলামি পাইয়া, আর তাহাদের তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহস হইত না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য হিংস্র জন্তুকেও তিনি ভয়ানক জ্ঞান করিতেন না।

একুশ বৎসর বয়সে, তিনি একাকী মেদিনীপুর যাইতেছিলেন। তৎকালে ঐ

অঞ্চলে অতিশয় জঙ্গল ও বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ভয়ানক উপদ্রব ছিল। এক স্থলে খাল পার হইয়া, তীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র, ভালুকে আক্রমণ করিল। ভালুক নখর-প্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাঁহার প্রাণসংহার করিলেন। এইরূপে, এই ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেন, বটে; কিন্তু তৎকৃত ক্ষত দ্বারা শরীরের শোণিত অনবরত বিনির্গত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই স্থান হইতে মেদিনীপুর প্রায় চারি ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। ঐ অবস্থাতে তিনি অনায়াসে পদব্রজে, মেদিনীপুরে পঁহুছিলেন, এক আত্মীয়ের বাসায়, দুই মাস কাল, শয্যাগত থাকিলেন, এবং ক্ষত সকল সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে, বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। ঐকল সকল ক্ষতের চিহ্ন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে প্রতীয়মান হইত।

পিতৃদেবের ও পিতামহীদেবীর মুখে, সময়ে সময়ে পিতামহদেবসংক্রান্ত যে সকল গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহারই স্থূলবৃত্তান্ত উপরিভাগে লিপিবদ্ধ হইল।

পিতামহদেবের দেহাত্যয়ের পর, পিতৃদেব আমায় কলিকাতায় আনা স্থির করিলেন। তদনুসারে, ১২৩৫ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিংহ পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্ত্তা। এই সময়ে, জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার এক পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন; সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে, বড় দিদি ও ছোট দিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া, পরের বাটীতে আছি বলিয়া, এক দিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি. কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও অবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক

দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে, আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এপর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতীম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহীদেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমতঃ কিছু দিন, তাঁহাব জন্য, যার পর নাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে, তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের অনেক অংশ নিরাকরণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব, মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকোনিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতী জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদদার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন, প্রাতে এক প্রহরের সময়, কর্ম্ম-স্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময়, বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায়, অন্যত্র বাসা হইলে, আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে, কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণবণিক ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়েরা, ও আর তিন চারিটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই, আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ পৌষ, মাঘ, এই তিন মাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালার শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা, শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধ হয়, অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসাররোগে আক্রান্ত হইলাম। ঐ পল্লীতে

দুর্গাদাস কবিরাজ নামে চিকিৎসক ছিলেন; তিনি আমার চিকিৎসা করিলেন। রোগের নিবৃত্তি না হইয়া, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিলে, আরোগ্যলাভের সম্ভবনা নাই, এই স্থির করিয়া, পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র, পিতামহীদেবী, অস্থির হইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এবং দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই, আমি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলাম।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে, আমি পুনরায় কলিকাতায় আনীত হইলাম। প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, একজন ভৃত্য সঙ্গে আসিয়াছিল। কিয়ৎ ক্ষণ চলিয়া, আর চলিতে না পারিলে, ঐ ভৃত্য খানিক আমায় কাঁধে করিয়া লইয়া আসিত। এবার আসিবার পূর্ব্বে, পিতৃদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন চলিয়া যাইতে পারিবে, না লোক লইতে হইবেক। আমি বাহাদুরি করিয়া বলিলাম, লোক লইতে হইবেক না, আমি অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারিব। তদনুসারে আর লোক লওয়া আবশ্যক হইল না, পিতৃদেব আমায় লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। মাতৃদেবীর মাতুলালয় পাতুল বীরসিংহ হইতে ছয় ক্রোশ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিলাম। সে দিন পাতুলে অবস্থিতি করিলাম।

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগর নামক গ্রাম আমার কনিষ্ঠা পিতৃস্বসা অন্নপূর্ণাদেবীর শ্বশুরালয়। ইতিপূর্ব্বে অন্নপূর্ণাদেবী অসুস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য, পিতৃদেব, কলিকাতায় আসিবার সময়, তাঁহাকে দেখিয়া যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন। তদনুসারে, আমরা পরদিন প্রাতঃকালে, রামনগর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। রামনগর পাতুল হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রথম দুই তিন ক্রোশ অনায়াসে চলিয়া আসিলাম। শেষ তিন ক্রোশে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। তিন ক্রোশ চলিয়া, আমার পা এত টাটাইল, যে আর ভূমিতে পা পাতিতে পারা যায় না। ফলকথা এই, আর আমার চলিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র রহিল না। অনেক কষ্টে চারি পাঁচ দণ্ডে আধ ক্রোশের অধিক চলিতে পারিলাম না। বেলা দুই প্রহরের অধিক হইল, এখনও দুই ক্রোশের অধিক পথ বাকী রহিল।

আমার এই অবস্থা দেখিয়া, পিতৃদেব বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িলেন। আগের মাঠে ভাল তরমুজ পাওয়া যায়, শীঘ্র চলিয়া আইস, ঐখানে তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইব। এই বলিয়া তিনি লোভপ্রদর্শন করিলেন; এবং অনেক কষ্টে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে, তরমুজ কিনিয়া খাওয়াইলেন। তরমুজ বড় মিষ্ট লাগিল। কিন্তু পার টাটানি

কিছুই কমিল না। বরং খানিক বসিয়া থাকাতে, দাঁড়াইবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত রহিল না। ফলতঃ, আর এক পা চলিতে পারি, আমার সেরূপ ক্ষমতা রহিল না। পিতৃদেব অনেক ধমকাইলেন, এবং তবে তুই এই মাঠে একলা থাক, এই বলিয়া, ভয় দেখাইবার নিমিত্ত, আমায় ফেলিয়া খানিক দূর চলিয়া গেলেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। পিতৃদেব সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, কেন তুই লোক আনিতে দিলি না, এই বলিয়া যথোচিত তিরস্কার করিয়া, দুই একটা থাবড়াও দিলেন।

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, পিতৃদেব আমার কাঁধে করিয়া লইয়া চলিলেন। তিনি স্বভাবতঃ দুর্বল ছিলেন, অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে লইয়া অধিক দূর যাওয়া তাহার ক্ষমতার বহির্ভূত। সুতরাং খানিক গিয়া আমায় স্কন্ধ হইতে নামাইলেন এবং বলিলেন, বাবা খানিক চলিয়া আইস, আমি পুনরায় কাঁধে করিব। আমি চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই চলিতে পারিলাম না। অতঃপর, আর আমি চলিতে পারিব, সে প্রত্যাশা নাই দেখিয়া, পিতৃদেব খানিক আমায় স্কন্ধে করিয়া লইতে লাগিলেন, খানিক পরেই ক্লান্ত হইয়া, আমায় নামাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুই ক্রোশ পথ যাইতে প্রায় দেড়প্রহর লাগিল। সায়ং-কালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমরা রামনগরে উপস্থিত হইলাম, এবং তথায় সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়া, পরদিন শ্রীরামপুরে থাকিয়া, তৎপর দিন কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যত দূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্য্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃ-পর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন। শিক্ষা বিষয়ে আমার কিরূপ ক্ষমতা আছে, এ বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। সেই সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে, পিতৃদেব মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান বলিলেন। সে উপাখ্যান এই—

প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধারাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতুহলা-বিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিল পোতা আছে কেন। তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়, উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইল ষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটি ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটি পাথর পোতা

আছে, উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে, এই পাথরের অঙ্ক উনিশ, ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান থেকে কলিকাতা উনিশ মাইল, অর্থাৎ, সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন।

নামতায় "একের পিঠে নয় উনিশ" ইহা শিখিয়াছিলাম। দেখিবামাত্র আমি প্রথমে এক অঙ্কের, তৎ পরে নয় অঙ্কের উপর হাত দিয়া বলিলাম, তবে এইটি ইঙ্গরেজীর এক, আর এইটি ইঙ্গরেজীর নয়। অনন্তর বলিলাম, তবে বাবা, ইহার পর যে পাথরটি আছে তাহাতে আঠার, তাহার পরটিতে সতর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে এক পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইব। তিনি বলিলেন, আজ দুই পর্য্যন্ত অঙ্ক দেখিতে পাইবে, প্রথম মাইল ষ্টোন যেখানে পোতা আছে, আমরা সে দিক যাইব না। যদি দেখিতে চাও, এক দিন দেখাইয়া দিব। আমি বলিলাম, সেটি দেখিবার আব দরকার নাই; এক অঙ্ক এইটিতেই দেখিতে পাইয়াছি। বাবা, আজ যাইতে যাইতেই, আমি ইঙ্গরেজীর অঙ্কগুলি চিনিয়া ফেলিব।

এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, প্রথম মাইল ষ্টোনের নিকটে গিয়া, আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটিতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল। পিতৃদেব বলিলেন, কেমন চিনিয়াছ, তাহার পরীক্ষা করিতেছি। এই বলিয়া, তিনি নবম, অষ্টম, সপ্তম, এই তিনটি মাইল ষ্টোন ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, আমি এটি নয়, এটি আট, এটি সাত, এইরূপ বলিলাম। পিতৃদেব ভাবিলেন, আমি যথার্থই অঙ্কগুলি চিনিয়াছি, অথবা নয়ের পর আট, আটের পর সাত অবধারিত আছে, ইহা জানিয়া, চালাকি করিয়া, নয়, আট, সাত বলিতেছি। যাহা হউক, ইহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত, কৌশল করিয়া, তিনি আমাকে ষষ্ঠ মাইল ষ্টোনটি দেখিতে দিলেন না, অনন্তর, পঞ্চম মাইল ষ্টোনটি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কোন মাইল ষ্টোন বল দেখি। আমি দেখিয়া বলিলাম, বাবা, এই মাইল ষ্টোনটি খুদিতে ভুল হইয়াছে; এটি ছয় হইবেক; না হইয়া পাঁচ খুদিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া, পিতৃদেব ও তাঁহার সমভিব্যাহারীরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বীরসিংহের গুরু-মহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ও ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি আমার চিবুকে ধরিয়া "বেস বাবা বেস" এই কথা বলিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং পিতৃ-দেবকে সম্বোধিয়া বলিলেন, দাদামহাশয়, আপনি ঈশ্বরের লেখা পড়া বিষয়ে যত্ন করিবেন। যদি বাঁচিয়া থাকে, মানুষ হইতে পারিবেক। যাহা হউক, আমার

এই পরীক্ষা করিয়া, তাঁহারা সকলে যেমন অহ্লাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আহ্লাদ দেখিয়া, আমি তদনুরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম।

মাইল ষ্টোনের উপাখ্যান শুনিয়া, পিতৃদেবের পরামর্শদাতা আত্মীয়েরা একবাক্য হইয়া, "তবে ইহাকে রীতিমত ইঙ্গরেজী পড়ান উচিত" এই ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিলেন। কর্ণওয়ালিশ স্ত্রীটে, সিদ্ধেশ্বরী তলায় ঠিক পূর্ব্বদিকে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় ছিল। উহা হের সাহেবের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরামর্শদাতারা ঐ বিদ্যালয়ের উল্লেখ করিয়া, বলিলেন, উহাতে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা পাইয়া থাকে; ঐ স্থানে ইহাকে পড়িতে দাও; যদি ভাল শিখিতে পারে, বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইবেক, হিন্দু কালেজে পড়িলে ইঙ্গরেজীর চূড়ান্ত হইবেক। আর যদি তাহা না হইয়া উঠে, মোটামুটি শিখিতে পারিলেও, অনেক কাজ দেখিবেক, কারণ, মোটামুটি ইঙ্গরেজী জানিলে, হাতের লেখা ভাল হইলে, ও যেমন তেমন জমাখরচ বোধ থাকিলে, সওদাগর সাহেবদিগের হৌসে সাহেবদের বড় বড় দোকানে অনায়াসে কর্ম্ম করিতে পারিবেক।

আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃতব্যবসায়ী, পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য বশতঃ, ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিয়শ ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এজন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জনক্ষম হইয়া, আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক। এই বলিয়া, তিনি আমায় ইঙ্গরেজী স্কুলে প্রবেশ বিষয়ে, আন্তরিক অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন, তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না।

মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক, আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে, সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া যাহারা ল কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা, আদালতে জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, আমার বিবেচনায়, ঈশ্বরকে সংস্কৃত কালেজে পড়িতে দেওয়াই উচিত। চতুষ্পাঠী অপেক্ষা কালেজে রীতিমত সংস্কৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। বাচস্পতি মহাশয় এই বিষয় বিলক্ষণ রূপে পিতৃদেবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। অনেক বিবেচনার পর, বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।

বিদ্যাসাগর রচনাবলী

বাঙ্গালার ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ

[১৮৮৫ সনে মুদ্রিত ষড়্‌বিংশ সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

বাঙ্গালার ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীযুক্ত মার্শমন সাহেবের রচিত ইঙ্গরেজী গ্রন্থের শেষ নয় অধ্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক, সঙ্কলিত, ঐ গ্রন্থের অবিকল অনুবাদ নহে। কোনও কোনও অংশ, অনাবশ্যক বোধে, পরিত্যক্ত হইয়াছে, এবং কোনও কোনও বিষয়, আবশ্যক বোধে, গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক, সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকে, অতি দুরাচার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সিংহাসনারোহণ অবধি, চিরস্মরণীয় লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয়ের অধিকারসমাপ্তি পর্য্যন্ত, বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সিরাজ উদ্দৌলা, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন; আর, লার্ড বেণ্টিক, ১৮৩৫ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সুতরাং, এই পুস্তকে, একোন অশীতি বৎসরের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ১০ই এপ্রিল, সিরাজ উদ্দৌলা বাঙ্গালা ও বিহারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। তৎকালে, দিল্লীর অধীশ্বর এমন দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন যে, নূতন নবাব তাঁহার নিকট সনন্দ প্রার্থনা করা আবশ্যক বোধ করিলেন না।

তিনি, রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রথমতঃ, আপন পিতৃব্যপত্নীর সমুদয় সম্পত্তি হরণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য নিবাইশ মহম্মদ, ষোল বৎসর ঢাকার অধিপতি থাকিয়া, প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার পত্নী তদীয় সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। ঐ বিধবা নারী, আপন সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, যে সৈন্য রাখিয়াছিলেন, তাহারা কার্য্যকালে পলায়ন করিল, সুতরাং, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি, নির্ব্বিবাদে, নবাবের প্রাসাদে প্রেরিত হইল, এবং তিনিও সহজে আপন বাসস্থান হইতে বহিষ্কৃতা হইলেন।

রাজবল্লভ ঢাকায় নিবাইশ মহম্মদের সহকারী ছিলেন, এবং মুসলমানদিগের অধিকারসময়ের প্রথা অনুসারে, প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, নিবাইশ পরলোক যাত্রা করেন। তৎকালে আলিবর্দ্দি সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য বশতঃ, হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঐ সময়ে মুরশিদাবাদে উপস্থিত থাকাতে, সিরাজ উদ্দৌলা, তাঁহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া, তদীয় সম্পত্তি রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত, ঢাকায় লোক প্রেরণ করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, অগ্রে সংবাদ জানিতে পারিয়া, সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, নৌকারোহণ পূর্ব্বক, গঙ্গাসাগর অথবা জগন্নাথ যাত্রার ছলে, কলিকাতায় পলায়ন করেন; এবং, ১৭ই মার্চ্চ, তথায় উপস্থিত হইয়া, তথাকার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অনুমতি লইয়া, নগর মধ্যে বাস করেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, যাবৎ পিতার মুক্তিসংবাদ না পান, তত দিন ঐ স্থানে অবস্থিত করিবেন।

রাজবল্লভের সম্পত্তি এইরূপে হস্তবহির্ভূত হওয়াতে, সিরাজ উদ্দৌল্লা সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন; এক্ষণে, সিংহাসনারূঢ় হইয়া, কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবেক, এই দাওয়া করিয়া, কলিকাতায় দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ঐ দূত বিশ্বাসযোগ্য পত্রাদির প্রদর্শন করিতে না পারিবাতে, ড্রেক সাহেব তাহাকে নগর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন।

কিছু দিন পরে, য়ুরোপ হইতে এই সংবাদ আসিল, অল্প দিনের মধ্যেই, ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তৎকালে ফরাসিরা, করমণ্ডল উপকূলে, অতিশয় প্রবল ও পরাক্রান্ত ছিলেন; আর কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের যত য়ুরোপীয় সৈন্য ছিল, চন্দন নগরে ফরাসিদের তদপেক্ষা দশ গুন অধিক থাকে। এই সমস্ত কারণে, কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা আপনাদের দুর্গের সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যাপার, অনতিবিলম্বে, অল্পবয়স্ক উদ্ধতস্বভাব নবাবের কর্ণগোচর হইল। ইঙ্গরেজদিগের উপর তাঁহার সবিশেষ দ্বেষ ছিল; এজন্য, তিনি, ভয় প্রদর্শন পূর্বক, ড্রেক সাহেবকে এই পত্র লিখিলেন, আপনি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে পাইবেন না; পুরাতন যাহা আছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, এবং অবিলম্বে, কৃষ্ণদাসকে আমার লোকের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

আলিবর্দ্দির মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্ব্বে, সিরাজ উদ্দৌলার দ্বিতীয় পিতৃব্য সায়দ মহম্মদের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র সকতজঙ্গ তদীয় সমস্ত সৈন্য, সম্পত্তি, ও পূর্ণিয়ার রাজত্বের অধিকারী হয়েন। সুতরাং, সকতজঙ্গ, সিরাজ উদ্দৌলার সুবাদার হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপ নির্বোধ, নৃশংস, ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন; সুতরাং, অধিক কাল, তাঁহাদের পরস্পর সম্প্রীত ও ঐকবাক্য থাকিবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না.

সিরাজ উদ্দৌলা, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, মাতামহের পুরাণ কর্মচারী ও সেনাপতিদিগকে পদচ্যুত করিলেন। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক কতিপয় অল্পবয়স্ক দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। তাহারা, প্রতিদিন, তাঁহাকে কেবল অন্যায্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে শরামর্শ দিতে লাগিল। ঐ সকল পরামর্শের এই ফল দর্শিয়াছিল যে, তৎকালে, প্রায় কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি বা কোনও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা পায় নাই।

রাজ্যের প্রধান প্রধান লোকেরা, এই সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পরিবর্ত্তে, অন্য কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা, আপাততঃ, সকতজঙ্গকেই লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত জানিতেন, তিনি সিরাজ উদ্দৌলা অপেক্ষা ভদ্র নহেন; কিন্তু, মনে মনে এই আশা করিয়াছিলেন, আপাততঃ, এই উপায় দ্বারা, উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে, কোনও যথার্থ ভদ্র ব্যক্তিকে সিংহাসনে নিবিষ্ট করিতে পারিবেন।

এ বিষয়ে সমুদয় পরামর্শ স্থির হইলে, সকতজঙ্গের সুবাদারীর সনন্দপ্রার্থনায়, দিল্লীতে দূত প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রে বার্ষিক কোটি মুদ্রা কর প্রদানের প্রস্তাব থাকাতে, অনায়াসেই তাহাতে সম্রাটের সম্মতি হইল।

সিরাজ উদ্দৌলা, এই চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সকতজঙ্গের প্রাণদণ্ডার্থে, পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সৈন্য সকল, রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, গঙ্গা পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে, নবাব কলিকাতার ড্রেক সাহেবের নিকট হইতে, আপন পূর্ব্বপ্রেরিত পত্রের এই উত্তর পাইলেন, আমি আপনকার আজ্ঞায় কদাচ সম্মত হইতে পারি না।

এই উত্তর পাইয়া, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের বিরুদ্ধাচারীদিগকে আশ্রয় দিতেছে, এবং, আমার অধিকারের মধ্যে, দুর্গ নির্মাণ করিয়া, আপনাদিগকে দৃঢ়ীভূত করিতেছে; অতএব, আমি তাহাদিগকে নির্মূল করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, সৈন্যদিগকে, অবিলম্বে শিবির ভঙ্গ করিয়া, কলিকাতা যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। কাশিম বাজারে ইঙ্গরেজদিগের যে কুঠি ছিল, আগমনকালে তাহা লুঠ করিলেন; এবং, তথায় যে য়ুরোপীয়দিগকে দেখিতে পাইলেন, সকলকেই কারারুদ্ধ করিলেন।

কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা, ষাটি বৎসরের অধিক কাল, নিরুপদ্রবে ছিলেন; সুতরাং, বিশেষ আস্থা না থাকাতে, তাঁহাদের দুর্গ একপ্রকার নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে এত নিঃশঙ্ক ভাবিয়াছিলেন যে, দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে বিংশতি ব্যামের মধ্যেও, অনেক গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তৎকালে, দুর্গমধ্যে একশত সত্তর জন মাত্র সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে কেবল ষাটি জন য়ুরোপীয়। বারুদ পুরাণ ও নিস্তেজ; কামান সকল মরিচাধরা। এ দিকে, সিরাজ উদ্দৌলা, চল্লিশ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য ও উত্তম কামান লইয়া, কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। ইঙ্গরেজেরা দেখিলেন, আক্রমণ নিবারণের কোনও সম্ভাবনা নাই; অতএব, সন্ধি প্রার্থনায়, বারংবার পত্র, প্রেরণ করিতে লাগিলেন, এবং বহুসংখ্যক মুদ্রা প্রদানেরও প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু, নবাবের অন্য কোনও বিষয়ে কর্ণ দিতে ইচ্ছা ছিল না; তিনি ইঙ্গরেজদিগকে এক বারে উচ্ছিন্ন করিবার মানস করিয়াছিলেন; অতএব, পত্রের কোনও উত্তর না দিয়া, অবিশ্রামে কলিকাতা অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

১৬ই জুন, তাঁহার সৈন্যের অগ্রসর ভাগ চিতপুরে উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, ইতঃপূর্ব্বে, তথায় এক উপদুর্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা, নবাবের সৈন্যের উপর, এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে, তাহারা, হটিয়া গিয়া, দমদমায় অবস্থিতি করিল।

নবাবের সৈন্যেরা, ১৭ই জুন, নগর বেষ্টন করিয়া, তৎপর দিন, এক কালে চারি দিকে আক্রমণ করিল। তাহারা, ভিত্তির সন্নিহিত গৃহ সকল অধিকার করিয়া,

এমন ভয়ানক গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল যে, এক ব্যক্তিও, সাহস করিয়া, গড়ের উপর দাঁড়াইতে পারিল না। ঐ দিবস অনেক ব্যক্তি হত ও অনেক ব্যক্তি আহত হইল, এবং দুর্গের বহির্ভাগ বিপক্ষের হস্তগত হওয়াতে, ইঙ্গরেজদিগকে দুর্গের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিতে হইল। রাত্রিতে, বিপক্ষেরা দুর্গের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী অতি বৃহৎ কতিপয় গৃহে অগ্নি প্রদান করিল, ঐ সকল গৃহ অতি ভয়ানক রূপে জ্বলিত হইতে লাগিল।

অতঃপর কি করা উচিত, ইহার বিবেচনা করিবার নিমিত্ত, দুর্গস্থিত ইংরেজেরা একত্র সমবেত হইলেন। তৎকালীন সেনাপতিদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিও কার্য্যজ্ঞ ছিলেন না। তাঁহারা সকলে কহিলেন, পলায়ন ব্যতিরেকে পরিত্রাণ নাই। বিশেষতঃ, এত অধিক এতদ্দেশীয় লোক দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল যে, তন্মধ্যে যে আহারসামগ্রী ছিল, তাহাতে এক সপ্তাহ চলিতে পারিত না। অতএব নির্দ্ধারিত হইল, গড়ের নিকট যে সকল নৌকা প্রস্তুত আছে, পর দিন প্রত্যূষে, নগর পরিত্যাগ করিয়া, তদ্দ্বারা পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু দুর্গ মধ্যে, এক ব্যক্তিও এমন ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না যে, এই ব্যাপার সুশৃঙ্খল রূপে সম্পন্ন করিয়া ওঠেন। সকলেই আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত; কেহই আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত নহে।

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ স্ত্রীলোক সকল প্রেরিত হইলেন। অনন্তর, দুর্গস্থিত সমুদয় লোক ও নাবিকগণ ভয়ে অতিশয় অভিভূত হইল। সকল ব্যক্তিই তীরাভিমুখে ধাবমান। নাবিকেরা নৌকা লইয়া পলাইতে উদ্যত। ফলতঃ, সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত। যে, যে নৌকা সম্মুখে পাইল, তাহাতেই আরোহণ করিল। সর্বাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব, ও সৈন্যাধ্যক্ষ সাহেব, সর্বাগ্রে পলায়ন করিলেন। যে কয়েক খান নৌকা উপস্থিত ছিল, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে, কতক জাহাজের নিকটে, কতক হাবড়া পারে, চলিয়া গেল; কিন্তু, সৈন্য ও ভদ্র লোক অর্দ্ধেকেরও অধিক দুর্গ মধ্যে রহিয়া গেল।

সর্বাধ্যক্ষ সাহেবের পলায়নসংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, একত্র সমবেত হইয়া, হলওয়েল সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ স্থির করিলেন। পলায়িতেরা, জাহাজে আরোহণ করিয়া, প্রায় এক ক্রোশ ভাটিয়া গিয়া, নদীতে নঙ্গর করিয়া রহিল। ১৯এ জুন, নবাবের সৈন্যেরা পুনর্বার আক্রমণ করিল; কিন্তু পরিশেষে অপসারিত হইল।

দুর্গবাসীরা, দুই দিবস পর্য্যন্ত, আপনাদের রক্ষা করিল, এবং জাহাজস্থিত লোকদিগকে অনবরত এই সঙ্কেত করিতে লাগিল, তোমরা আসিয়া আমাদের উদ্ধার কর। এই উদ্ধারক্রিয়া অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, পলায়িত ব্যক্তিরা, পরিত্যক্ত-

ব্যক্তিদের উদ্ধারার্থে, এক বারও উদ্যোগ করিল না। যাহা হইক, তখনও তাহাদের অন্য এক আশা ছিল। রয়েল জর্জ্জ নামে একখানা জাহাজ, চিতপুরের নীচে, নঙ্গর করিয়া ছিল। হলওয়েল সাহেব, ঐ জাহাজ গড়ের নিকটে আনিবার নিমিত্ত, দুই জন ভদ্র লোককে পাঠাইয়া দিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে, উহা আসিবার সময় চড়ায় লাগিয়া গেল। এই রূপে, দুর্গস্থিত হতভাগ্যদিগের শেষ আশাও উচ্ছিন্ন হইল।

১৯এ জুন, রাত্রিতে, নবাবের সৈন্যরা, দুর্গের চতুর্দ্দিকই অবশিষ্ট গৃহ সকলে অগ্নি প্রদান করিয়া, ২০এ পুনর্ব্বার, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাক্রম সহকারে, আক্রমণ করিল। হলওয়েল সাহেব, আর নিবারণচেষ্টা করা ব্যর্থ বুঝিয়া, নবাবের সেনাপতি মাণিকচাঁদের নিকট পত্র দ্বারা সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। দুই প্রহর চারিটার সময় নবাবের পক্ষের এক সৈনিক পুরুষ, কামান বন্ধ করিতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, ইঙ্গরেজেরা, সেনাপতির উত্তর আসিল ভাবিয়া, আপনাদের কামান ছোড়া রহিত করিলেন। তাহারা এইরূপ করিবা মাত্র, বিপক্ষেরা প্রাচীরের নিকট দৌড়াইয়া আসিল, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল; এবং, তৎপরে এক ঘণ্টার মধ্যে, দুর্গ অধিকার করিয়া, লুঠ আরম্ভ করিল।

বেলা পাঁচটার সময় সিরাজ উদ্দৌলা, চৌপালায় চড়িয়া, দুর্গ মধ্যে উপস্থিত হইলে, য়ুরোপীয়েরা তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। হলওয়েল সাহেবের দুই হস্ত বদ্ধ ছিল, নবাব, খুলিয়া দিতে আজ্ঞা দিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, তোমার একটি কেশও স্পৃষ্ট হইবেক না; অনন্তর, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, এত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, কি রূপে, চারিশত গুণ অধিক সৈন্যের সহিত, এতক্ষণ যুদ্ধ করিল। পরে, এক অনাবৃত প্রদেশে সভা করিয়া, তিনি কৃষ্ণদাসকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। নবাব যে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করেন, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেওয়া তাহার এক প্রধান কারণ। তাহাতে সকলে অনুমান করিয়াছিল, তিনি কৃষ্ণদাসের গুরুতর দণ্ড করিবেন, কিন্তু তিনি, তাহা না করিয়া, তাঁহাকে এক মহামূল্য পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন।

বেলা ছয় সাত ঘণ্টার সময়, নবাব, সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া শিবিরে গমন করিলেন। সমুদয়ে এক শত ছচল্লিশ জন য়ুরোপীয় বন্দী ছিল। সেনাপতি, যে রাত্রি তাহাদিগকে যেখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, এমন স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তৎকালে, দুর্গের মধ্যে, দীর্ঘে বার হাত, প্রস্থে নয় হাত, এরূপ এক গৃহ ছিল। বায়ুসঞ্চারের নিমিত্ত, ঐ গৃহের এক এক দিকে এক এক মাত্র গবাক্ষ থাকে,। ইঙ্গরেজেরা কলহকারী দুর্বৃত্ত সৈনিকদিগকে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া

রাখিতেন। নবাবের সেনাপতি, দারুণ গ্রীষ্ম কালে, সমস্ত য়ুরোপীয় বন্দীদিগকে ঐ ক্ষুদ্র গৃহে নিক্ষিপ্ত করিলেন।

সে রাত্রিতে যন্ত্রণার পরিসীমা ছিল না। বন্দীরা, অতি ত্বরায়, ঘোরতর পিপাসায় কাতর হইল। তাহারা রক্ষকদিগের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিয়া, যে জল পাইল, তাহাতে কেবল তাহাদিগকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিল। প্রত্যেক ব্যক্তি, সম্যক রূপে নিশ্বাস আকর্ষণ করিবার আশয়ে, গবাক্ষের নিকটে যাইবার নিমিত্ত, বিবাদ করিতে লাগিল; এবং যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, রক্ষীদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল, তোমরা গুলি করিয়া, আমাদের এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান কর। এক এক জন করিয়া, ক্রমে ক্রমে, অনেকে পঞ্চত্ব পাইয়া ভূতলশায়ী হইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা, শবরাশির উপর দাঁড়াইয়া, নিশ্বাস আকর্ষণের অনেক স্থান পাইল, এবং তাহাতেই কয়েক জন জীবিত থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে, ঐ গৃহের দ্বার উদঘাটিত হইলে দৃষ্ট হইল, একশত ছচল্লিশের মধ্যে, তেইশ জন মাত্র জীবিত আছে। অন্ধকূপহত্যা নামে যে অতি ভয়ঙ্কক ব্যাপার প্রসিদ্ধ আছে, সে এই। এই হত্যার নিমিত্তই, সিরাজ উদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ শুনিতে এত ভয়ানক হইয়া রহিয়াছে; উক্ত ঘোরতর অত্যাচার প্রযুক্তই, এই বৃত্তান্ত লোকের অন্তঃকরণে অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে এবং সিরাজ উদ্দৌলাও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এই ব্যাপারের বিন্দু বিসর্গ জানিতেন না। সে রাত্রিতে সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে দুর্গের ভার অর্পিত ছিল; অতএব তিনিই এই সমস্ত দোষের ভাগী।

২১শে জুন, প্রাতঃকালে, এই নিদারুণ ব্যাপার নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অতিশয় অনবধান প্রদর্শন করিলেন। অন্ধকূপে রুদ্ধ হইয়া, যে কয় ব্যক্তি জীবিত থাকে, হলওয়েল সাহেব তাহাদের মধ্যে একজন। নবাব, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া, ধনাগার দেখাইয়া দিতে কহিলেন। তিনি দেখাইয়া দিলেন; কিন্তু ধনাগারের মধ্যে পঞ্চাশ সহস্রের অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

সিরাজ উদ্দৌলা, নয় দিবস, কলিকাতার সান্নিধ্যে থাকিলেন, অনন্তর, কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া, মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন। ২রা জুলাই, গঙ্গা পার হইয়া, তিনি হুগলীতে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং লোক দ্বারা ওলন্দাজ ও ফরাসি দিগের নিকট কিছু কিছু টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন, যদি অস্বীকার কর, তোমাদেরও ইঙ্গরেজদের মত দুরবস্থা করিব। তাহাতে ওলন্দাজেরা সাড়ে চারি লক্ষ, আর ফরাসিরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়া পরিত্রাণ পাইলেন।

যে বৎসর কলিকাতা পরাজিত হইল, ও ইঙ্গরেজেরা বাঙালী হইতে দূরীকৃত হইলেন, সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে দিনামারেরা, এই দেশে বাসের অনুমতি পাইয়া, শ্রীরামপুর নগর সংস্থাপিত করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া, পূর্ণিয়ার অধিপতি পিতৃব্যপুত্র সকতজঙ্গকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। বিবাদ উত্থাপন করিবার নিমিত্ত, আপন এক ভৃত্যকে ঐ প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া পিতৃব্যপুত্রকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি অবিলম্বে ইহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের ভার দিবে। ঐ উদ্ধত যুবা, পত্র পাঠে ক্রোধান্ধ ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া, উত্তর লিখিলেন, আমি সমস্ত প্রদেশের যথার্থ অধিপতি, দিল্লী হইতে সনন্দ পাইয়াছি, অতএব আজ্ঞা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুরশিদাবাদ হইতে চলিয়া যাও।

এই উত্তর পাইয়া সিরাজ উদ্দৌলা, ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন, এবং অতি ত্বরায়, সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পূর্ণিয়া যাত্রা করিলেন। সকতজঙ্গও, এই সংবাদ পাইয়া, সৈন্য লইয়া, তদভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু শকতজঙ্গ নিজে যুদ্ধের কিছুই জানিতেন না এবং কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না। তাঁহার সেনাপতিরা সৈন্য সহিত এক দৃঢ় স্থানে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানের সম্মুখে জলা, পার হইবার নিমিত্ত মধ্যে এক মাত্র সেতু ছিল। সৈন্য সকল সেই স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। কিন্তু তদীয় সৈন্য মধ্যে, এক ব্যক্তিও উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন না, এবং অনুষ্ঠানেরও কোনও পরিপাটী ছিল না। প্রত্যেক সেনাপতি, আপন আপন সুবিধা অনুসারে, পৃথক পৃথক স্থানে সেনা নিবেশিত করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য ঐ জলার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সকতজঙ্গের সৈন্যের উপর গোলা চালাইতে লাগিল। বড় বড় কামানের গোলাতে তদীয় সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইলে, তিনি নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায়, স্বীয় অশ্বারোহীদিগকে, জলা পার হইয়া বিপক্ষ সৈন্য আক্রমণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহারা অতি কষ্টে কর্দম পার হইয়া শুষ্ক স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র সিরাজ উদ্দৌলার সৈন্য অতি ভয়ানক রূপে তাহাদিগকে আক্রমন করিল।

ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমন সময়ে সকতজঙ্গ স্বীয় শিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং অত্যধিক সুরাপান করিয়া, এমন মত্ত হইলেন যে, আর সোজা হইয়া বসিতে পারেন না। তাঁহার সেনাপতিরা আসিয়া তাঁহাকে রণস্থলে উপস্থিত থাকিবার নিমিত্ত অতিশয় অনুরোধ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে, ধরিয়া থাকিবার নিমিত্ত এক ভৃত্য সমেত, তাঁহাকে হস্তীতে আরোহণ করাইয়া, জলার প্রান্ত ভাগে উপস্থিত করিলেন। তথায়

উপস্থিত হইবা মাত্র, শত্রুপক্ষ হইতে এক গোলা আসিয়া তাঁহার কপালে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সৈন্যরা, তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখিয়া, শ্রেণী ভঙ্গ পূর্বক পলায়ন করিল। তুই দিবস পরে, নবাবের সেনাপতি মোহনলাল পূর্ণিয়া অধিকার করিলেন, এবং তথাকার ধনাগারে প্রাপ্ত ন্যূনাধিক নবতি লক্ষ টাকা ও সকতজঙ্গের যাবতীয় অন্তঃপুরিকাগণ মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, সাহস করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, বস্তুতঃ, তিনি রাজমহলের অধিক যান নাই; কিন্তু, এই জয়ের সমুদয় বাহাত্বরি আপনার বোধ করিয়া, মহাসমারোহে মুরশিদাবাদ প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে ড্রেক সাহেব, কাপুরুষত্ব প্রদর্শন পূর্বক, পলায়ন করিয়া, স্বীয় অনুচরবর্গের সহিত নদীমুখে জাহাজে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায়, অনেক ব্যক্তি, রোগাভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিলে, তথাকার গবর্ণর ও কৌন্সিলের সাহেবেরা যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং চারিদিকে বিপদসাগর দেখিতে লাগিলেন। সেই সময়ে ফরাসিদিগের সহিত ত্বরায় যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। ফরাসিরা তৎকালে পণ্ডিচরীতে অতিশয় প্রবল ছিলেন; ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য অতি অল্প মাত্র ছিল। তথাপি তাঁহারা বাঙ্গালার সাহায্য করাই সর্বাগ্রে কর্তব্য স্থির করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা অতি ত্বরায় কতিপয় যুদ্ধজাহাজ ও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং এডমিরল ওয়াট্‌সন সাহেবকে জাহাজের কর্তৃত্ব দিয়া আর কর্ণেল ক্লাইব সাহেবকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইলেন।

ক্লাইব, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কোম্পানীর কেরানি নিযুক্ত হইয়া, ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করেন, সাংগ্রামিক ব্যাপারে গাঢ়তর অনুরাগ থাকাতে, প্রার্থনা করিয়া সেনাসংক্রান্ত কর্মে নিবিষ্ট হয়েন, এবং, অল্পকাল মধ্যে, একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। এই সময় তিনি বয়সে যুবা, কিন্তু অভিজ্ঞতাতে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে উদ্যোগ করিতে অনেক সময় নষ্ট হয়; এজন্য জাহাজ সকল অক্টোবরের পুর্বে বহির্গত হইতে পারিল না। তৎকালে উত্তরপূর্ব্বীয় বায়ুর সঞ্চার আরব্ধ হইয়াছিল; এ প্রযুক্ত, জাহাজ সকল, ছয় সপ্তাহের ন্যূনে, কলিকাতায় উপস্থিত হইতে পারিল না, তন্মধ্যে তুই খানার আরও অধিক বিলম্ব হইয়াছিল।

কলিকাতার উদ্ধারার্থে মান্দ্রাজ হইতে সমুদয় ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাই প্রেরিত হয়। তাহারা, ২০-এ ডিসেম্বর ফলতায় ও ২৮এ মায়াপুরে পঁহুছিল। তৎকালে মায়াপুরে মুসলমানদিগের এক দুর্গ ছিল। কর্ণেল ক্লাইব শেষোক্ত দিবসে রজনীযোগে স্বীয় সমস্ত

সৈন্য তীরে অবতীর্ণ করিলেন, কিন্তু পথদর্শকদিগের দোষে, অরুনোদয়ের পূর্বে ঐ দুর্গের নিকট পহুছিতে পারিলেন না।

নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদ, কলিকাতা হইতে একস্মাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে, নবাবের সৈন্যরা যদি প্রকৃত রূপে কার্য সম্পাদন করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজেরা নিঃসন্দেহ পরাজিত হইতেন। যাহা হউক, ক্লাইব অতি ত্বরায় কামান আনাইয়া শত্রুপক্ষের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তন্মধ্যে এক গোলা মাণিকচাঁদের হাওদার ভিতর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে, তিনি যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। পরিশেষে, কলিকাতায় থাকিতেও সাহস না হওয়াতে, তথায় কেবল পাঁচ শত সৈন্য রাখিয়া, আপন প্রভুর নিকটস্থ হইবার মানসে, তিনি অতি সত্বর মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর, ক্লাইব স্থলপথে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। জাহাজ সকল তাঁহার উপস্থিতির পূর্বেই তথায় পঁহুছিযাছিল। ওয়াট্‌সন সাহেব, কলিকাতার উপর ক্রমাগত দুই ঘণ্টা কাল, গোলাবৃষ্টি করিয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২রা জানুয়ারী ঐ স্থান অধিকার করিলেন। এইরূপে, ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার কলিকাতার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অথচ স্বপক্ষীয় এক ব্যক্তিরও প্রাণহানি হইল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্লাইব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ভয়প্রদর্শন না করিলে, নবাব কদাচ সন্ধি করিতে চাহিবেন না। অতএব তিনি কলিকাতা উদ্ধারের দুই দিবস পরে, যুদ্ধজাহাজ ও সৈন্য পাঠাইয়া হুগলী অধিকার করিলেন। তৎকালে এই নগর প্রধান বাণিজ্যস্থান দিল।

বোধ হইতেছে, কলিকাতা অধিকার হইবার অব্যবহিত পরে, ক্লাইব মুরশিদাবাদের শেঠদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, মধ্যস্থ হইয়া, নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সন্ধি করিয়া দেন। তদনুসারে তাঁহারা সন্ধির প্রস্তাব করেন। সিরাজ উদ্দৌলাও, প্রথমতঃ, প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব, হুগলী অধিকার করিয়া, তথাকার বন্দর লুঠ করিয়াছেন, ইহা শুনিবা মাত্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া, সসৈন্যে অবিলম্বে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তিনি ৩০-এ জানুয়ারি, হুগলীর ঘাটে গঙ্গা পার হইলেন, এবং ২রা ফেব্রুয়ারি, কলিকাতার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, ক্লাইবের ছাউনির এক পোয়া অন্তরে শিবির নিবেশিত করিলেন।

ক্লাইব ৭০০ গোরা ও ১২০০ সিপাই, এই মাত্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র।

সিরাজ উদ্দৌলা পঁহুছিবা মাত্র ক্লাইব, সন্ধিপ্রার্থনায়, তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। নবাবের সহিত দূতদিগের অনেকবার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হইল। তাহাতে তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, নবাব যদিও মুখে সন্ধির কথা কহিতেছেন, তাঁহার অন্তকরণ সেরূপ নহে। বিশেষতঃ, তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া কলিকাতার চারি দিকের লোক ভয়ে পলায়ন করাতে, ইঙ্গরেজদিগের আহারসামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হইতে লাগিল। অতএব ক্লাইব, এক উদ্যমেই, নবাবকে আক্রমণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রাত্রিতে, ওয়াট্সন সাহেবের জাহাজে গিয়া, তাঁহার নিকট ছয়শত জাহাজী গোরা চাহিয়া লইলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া, রাত্রি একটার সময়, তীরে উত্তীর্ণ হইলেন। দুইটার সময়, সমুদয় সৈন্য স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল, এবং চারিটার সময় এক বারে নবাবের ছাউনির দিকে যাত্রা করিল। সৈন্য সমুদয়ে ১৩৫০ গোরা ও ৮০০ সিপাই। অকুতোভয় ক্লাইব, সাহসে নির্ভর করিয়া, এইমাত্র সৈন্য লইয়া, বিংশতি গুণ অধিক সৈন্য আক্রমণ করিতে চলিলেন।

শীত কালের শেষে, প্রায় প্রতিদিন কুজ্ঝটিকা হইয়া থাকে। সে দিবসও, প্রভাত হইবা মাত্র, এমন নিবিড় কুজ্ঝটিকা হইল যে, কোনও ব্যক্তি, আপনার সম্মুখের বস্তুও দেখিতে পায় না। যাহা হউক, ইঙ্গরেজেরা, যুদ্ধ করিতে করিতে, বিপক্ষের শিবির ভেদ করিয়া চলিয়া গেলেন। হত ও আহত সমুদয়ে তাঁহাদের দুই শত বিংশতি জন মাত্র সৈন্য নষ্ট হয়। কিন্তু নবাবের তদপেক্ষায় অনেক অধিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল।

নবাব ক্লাইবের ঈদৃশ অসম্ভব সাহস দর্শনে, অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন, কেমন ভয়ানক শত্রুর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব, তিনি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে চারিক্রোশ দূরে গিয়া ছাউনি করিলেন। ক্লাইব দ্বিতীয়বার আক্রমণের সমুদয় উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু নবাব, তদীয় অসম্ভব সাহস ও অকুতোভয়তা দর্শনে, যুদ্ধের বিষয়ে এত ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন যে, সন্ধির বিষয়ে সম্মত হইয়া, ৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

এই সন্ধিদ্বারা ইঙ্গরেজেরা, পূর্ব্বের ন্যায়, সমুদয় অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অধিকন্তু, কলিকাতায় দুর্গনির্মাণ ও টাকশালস্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন; আর, তাঁহাদের পণ্য দ্রব্যের শুল্কদান রহিত হইল। নবাব ইহাও স্বীকার করিলেন, কলিকাতা আক্রমণ কালে যে সকল দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে, সমুদয় ফিরিয়া দিবেন; আর যাহা যাহা নষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয় যথোপযুক্ত মূল্য ধরিয়া দিবেন।

ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধ জয়ী হইয়াছেন, এই ভাবিয়া, নবাব এই সকল নিয়ম তৎকালে অতিশয় অনুকূল বোধ করিলেন। আর ক্লাইবও এই বিবেচনা করিয়া সন্ধিপক্ষে নির্ভর করিলেন যে, য়ুরোপে ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যুদ্ধ আরব্ধ হইয়াছে, আর, কলিকাতায় ইঙ্গরেজদিগের মত য়ুরোপীয় সৈন্য আছে, চন্দন নগরে ফরাসিদিগেরও তত আছে। অতএব চন্দন নগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে নবাবের সহিত নিষ্পত্তি করিয়া, সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হওয়া আবশ্যক।

ইঙ্গরেজ ও ফরাসি, এই উভয় জাতির য়ুরোপে পরস্পর যুদ্ধ আরব্ধ হইবার সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, ক্লাইব, চন্দননগরবাসী ফরাসিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন, য়ুরোপে যেরূপ হউক, ভারতবর্ষে আমরা কেহ কোনও পক্ষকে আক্রমণ করিব না। তাহাতে চন্দন নগরের গবর্ণর উত্তর দিলেন যে, আপনকার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু যদি প্রধান পদারূঢ় কোনও ফরাসি সেনাপতি আইসেন, তিনি এরূপ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন।

ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, যাহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, এরূপ নিষ্পত্তি হওয়া অসম্ভব। আর যতদিন চন্দন নগরে ফরাসিদের অধিক সৈন্য থাকিবেক, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা নিরাপদে হইবেক না। তিনি ইহাও নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, সিরাজ উদ্দৌলা কেবল ভয় প্রযুক্ত সন্ধি করিয়াছেন, সুযোগ পাইলে, নিঃসন্দেহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। বস্তুতঃ, সিরাজ উদ্দৌলা, এ পর্য্যন্ত, ক্রমাগত ফরাসিদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের উচ্ছেদের মন্ত্রণা করিতেছিলেন, এবং যুদ্ধকালে ফরাসিদিগের সাহায্যার্থে কিছু সৈন্য ও পাঠাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, ক্লাইব বিবেচনা করিলেন, নবাবের অনুমতি ব্যতিরেকে, ফরাসিদিগকে আক্রমণ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। কিন্তু এ বিষয়ে অনুমতির নিমিত্ত, তিনি যতবার প্রার্থনা করিলেন, প্রত্যেক বারেই নবাব কোনও স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। পরিশেষে, ওয়াট্সন সাহেব নবাবকে এইভাবে পত্র লিখিলেন, আমার যত সৈন্য আসিবার কল্পনা ছিল, সমুদয় আসিয়াছে, এখানে আপনকার রাজ্যে এমন প্রবল যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিব যে, সমুদয় গঙ্গার জলেও ঐ যুদ্ধানলের নির্বাণ হইবেক না। সিরাজ উদ্দৌলা এই পত্র পাঠে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১০ই মার্চ, বিনয় করিয়া, এক পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষে এই কথা লিখিত ছিল, যাহা আপনকার উচিত বোধ হয় করুন।

ক্লাইব ইহাকেই ফরাসিদিগকে আক্রমণ করিবার অনুমতি গণ্য করিয়া লইলেন এবং অবিলম্বে সৈন্য সহিত স্থলপথে, চন্দন নগর যাত্রা করিলেন। ওয়াট্সন সাহেবও সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ সহিত জলপথে প্রস্থান করিয়া ঐ নগরের নিকটে নঙ্গর করিলেন। ইঙ্গরেজ–

দিগের সৈন্যচন্দন নগর অবরোধ করিল। ক্লাইব স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতা সহকারে, অশেষবিধ চেষ্টা করিলেন; কিন্তু জাহাজী সৈন্যের প্রযত্নেই ঐ স্থান হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজেরা এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে অনেক যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা ভয়ানক। নয় দিন অবরোধের পর, চন্দন নগর পরাজিত হয়।

এরূপ প্রবাদ আছে, ইঙ্গরেজেরা ফরাসী সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করেন, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতাতেই চন্দন নগর পরাজিত হয়। এই প্রবাদের মূল এই ফরাসি গবর্ণর ইঙ্গরেজদিগের জাহাজের গতির প্রতিরোধের নিমিত্ত, নৌকা ডুবাইয়া গঙ্গার প্রায় সমুদায় অংশ রুদ্ধ করিয়া, কেবল এক অল্প পরিসর পথ রাখিয়াছিলেন। এই বিষয় অতি অল্প লোকে জানিত। ফরাসিদিগের এক কর্মচারী ছিল, তাহার নাম টেরেনো। টেরেনো, কোনও কারণ বশতঃ ফরাসি গবর্ণর রেনড সাহেবের উপর বিরক্ত হইয়া, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসে এবং ক্লাইবকে ঐ পথ দেখাইয়া দেয়। উত্তরকালে, ঐ ব্যক্তি ইঙ্গরেজদিগের নিকট কর্ম করিয়া কিছু উপার্জন করে এবং ঐ উপার্জিত অর্থের কিয়ৎ অংশ ফ্রান্সে আপন বৃদ্ধ পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু তাহার পিতা এই টাকা গ্রহণ করেন নাই, বিশ্বাসঘাতকের দত্ত বলিয়া ঘৃণা প্রদর্শনপূর্বক ফিরিয়া পাঠান। ইহাতে টেরেনোর অন্তঃকরণে এমন নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় যে, সে উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করে।

সিরাজ উদ্দৌলার সহিত যে সন্ধি হয় তদ্বারা ইঙ্গরেজেরা টাকশাল ও দুর্গ নির্মাণ করিবার অনুমতি পান। ষাটি বৎসর অধিক হইবেক, তাঁহারা এই দুই বিষয়ের নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কলিকাতার যে পুরাতন দুর্গ নবাব অনায়াসে অধিকার করেন, তাহা অতি গোপনে নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে, ক্লাইব, এই সন্ধির পরেই এতদ্দেশীয় সৈন্যে পরাজয় করিতে না পারে এরূপ এক দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সমাধান বিষয়ে সবিশেষ সত্বর ও সযত্ন হইলেন। যখন নক্সা প্রস্তুত করিয়া আনে, তখন তিনি, তাহাতে কত ব্যয় হইবেক, বুঝিতে পারেন নাই। কার্য আরব্ধ হইলে, ক্রমে দৃষ্ট হইল, দুই কোটি টাকার ন্যূন নির্বাহ হইবেক না। কিন্তু তখন আর তাহার কোনও পরিবর্ত করিবার উপায় ছিল না। কলিকাতার বর্তমান দুর্গ, এইরূপে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই এক টাকশাল নির্মিত এবং আগষ্ট মাসের ঊনবিংশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের টাকা প্রথম মুদ্রিত হয়।

ক্লাইব, এইরূপে পরাক্রম দ্বারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকার পুনঃস্থাপিত করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন, পরাক্রম ব্যতীত অন্য কোনও উপায় এ অধিকারের রক্ষা হইবেক না। তিনি, প্রথম অবধিই, নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা নিশ্চিত থাকিলে চলিবেক না

অবশ্য তাহাদিগকে অন্য অন্য উপায় দেখিতে হইবেক। আর ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য পাইলে, নবাব দুর্জয় হইয়া উঠিবেন। অতএব যাহাতে ফরাসিরা পুনরায় বাঙ্গলাতে প্রবেশ করিতে না পায়, এ বিষয়ে তিনি সবিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট ছিলেন।

তৎকালে, দক্ষিণ রাজ্যে ফরাসিদিগের বুসি নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তিনি, অনেক দেশ জয় করিয়া, সাতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। সিরাজ উদ্দৌলা, ইঙ্গরেজদিগের প্রতি মুখে বন্ধুত্ব দর্শাইতেন; কিন্তু, ঐ ফরাসি সেনাপতিকে, সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় আসিয়া, ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, পত্র দ্বারা বারংবার আহ্বান করিতেছিলেন। নবাব এ বিষয়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক খান ক্লাইবের হস্তে আইসে। ইঙ্গরেজেরা সিরাজ উদ্দৌলাকে খর্ব্ব করিয়াছিলেন; এজন্য, তিনি তাঁহাদের প্রতি অক্রোধ হইতে পারেন নাই। সময়ে সময়ে, তাঁহার ক্রোধ উদ্বেল হইয়া উঠিত। অর্বাচীন নির্বোধ নবাব, ক্রোধোদয় কালে, উন্মত্তপ্রায় হইতেন; কিন্তু, ক্রোধ নিবৃত্ত হইলে, ইঙ্গরেজদিগের ভয় তাঁহার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইত। ওয়াট্স নামে এক সাহেব, তাঁহার দরবারে, ইঙ্গরেজদিগের রেসিডেণ্ট ছিলেন। নবাব, এক দিন, শূলে দিব বলিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন; দ্বিতীয় দিন, তাঁহার নিকট মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার পাঠাইতেন; এক দিন, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, ক্লাইবের পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতেন; দ্বিতীয় দিন, বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে পত্র লিখিতেন।

ইঙ্গরেজেরা বুঝিতে পারিলেন, যাবৎ এই দুর্দান্ত বালক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবেক, তাবৎ কোনও প্রকারে ভদ্রস্থতা নাই। অতএব, তাঁহারা, কি উপায়ে নিরাপদ হইতে পারেন, মনে মনে এ বিষয়ের আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, দিল্লীর সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা নবাবের সর্ব্বাধিকারী রাজা রায়দুর্লভ, সৈন্যদিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীর জাফর, এবং উমিচাঁদ ও খোজা বাজীদ নামক দুই জন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক, ইত্যাদি কতিপয় প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিলেন।

সিরাজ উদ্দৌলা, নিষ্ঠুরতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দ্বারা, তাঁহাদের অন্তঃকরণে নিরতিশয় বিরাগোৎপাদন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহারা আপনাদের ধন, মান, জীবন সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতেন। পূর্ব্ব বৎসর, সকতজঙ্গকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার নিমিত্ত, সকলে একবাক্য হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে উদ্যোগ বিফল হইয়া যায়। এক্ষণে তাঁহারা, সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় গোপনে পত্র প্রেরণ করেন।

ইঙ্গরেজেরা বিবেচনা করিলেন, আমরা সাহায্য না করিলেও, এই রাজবিপ্লব ঘটিবেক; সাহায্য করিলে, আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু, তৎকালের কৌন্সিলের মেম্বরেরা প্রায় সকলেই ভীরুস্বভাব ছিলেন; এমন গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। এডমিরেল ওয়াটসন সাহেবও বিবেচনা করিয়াছিলেন, যাহারা এ পর্য্যন্ত কেবল সামান্যাকারে বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের পক্ষে দেশাধিপতিকে পদচ্যুত করিতে উদ্যত হওয়া অত্যন্ত অসমসাহসের কর্ম। কিন্তু ক্লাইব অকুতোভয় ও অত্যন্ত সাহসী ছিলেন; সঙ্কট পড়িলে, তাঁহার ভয় না জন্মিয়া, বরং সাহস ও উৎসাহের বৃদ্ধি হইত। তিনি উপস্থিত প্রস্তাবে সম্মত হইতে, কোনও ক্রমে, পরাঙ্মুখ হইলেন না।

ক্লাইব, এপ্রিল মে দুই মাস, মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট ওয়াট্স সাহেব দ্বারা নবাবের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; এত গোপন যে, সিরাজ উদ্দৌলা কিছুমাত্র বুঝিতে পারেন নাই। এক বার মাত্র তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি মীর জাফরকে ডাকাইয়া, কোরান স্পর্শ করাইয়া, শপথ করান। জাফরও যথোক্ত প্রকারে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আমি কখনও কৃতঘ্ন হইব না।

সমুদায় প্রায় স্থির হইয়াছে, এমন সময়ে উমিচাঁদ সমস্ত উচ্ছিন্ন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণ কালে, তাঁহার অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল; এ নিমিত্ত, মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে যথেষ্ট টাকা দিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু তিনি, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া, এক দিন বিকালে, ওয়াট্স সাহেবের নিকটে গিয়া কহিলেন, মীর জাফরের সহিত ইঙ্গরেজদিগের যে প্রতিজ্ঞাপত্র হইবেক, তাহাতে আমাকে আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিয়া দেখাইতে হইবেক; নতুবা, আমি এখনই, নবাবের নিকটে গিয়া, সমুদয় পরামর্শ ব্যক্ত করিব। উমিচাঁদ এরূপ করিলে, ওয়াট্স প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রাণদণ্ড হইত। ওয়াট্স সাহেব, কালবিলম্বের নিমিত্ত, উমিচাঁদকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া, অবিলম্বে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া, ক্লাইব প্রথমতঃ এক বারে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, ধূর্ত্ততা ও প্রতারকতা বিষয়ে, উমিচাঁদ অপেক্ষা অধিক পণ্ডিত ছিলেন; অতএব, বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, উমিচাঁদ গর্হিত উপায় দ্বারা অর্থলাভের চেষ্টা করিতেছে; এ ব্যক্তি সাধারণের শত্রু; ইহার দুষ্টতাদমনের নিমিত্ত, যে কোনও প্রকার চাতুরী করা অন্যায় নহে। অতএব, আপাততঃ, ইহার দাওয়া অঙ্গীকার করা যাউক। পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তে আসিবেক। তখন ইহাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবেক না। এই স্থির

করিয়া তিনি ওয়াট্‌স সাহেবকে উমিচাঁদের দাওয়া স্বীকার করিতে আজ্ঞা দিয়া দুই খান প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন, এক খান শ্বেত বর্ণের, দ্বিতীয় লোহিত বর্ণের। লোহিত বর্ণের পত্রে উমিচাঁদকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লেখা রহিল, শ্বেত বর্ণের পত্রে সে কথার উল্লেখ রহিল না। ওয়াট্‌সন সাহেব ক্লাইবের ন্যায়, নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিলেন না। তিনি, প্রতারণাঘটিত লোহিত বর্ণের প্রতিজ্ঞাপত্রে, স্বীয় নাম স্বাক্ষরিত করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু উমিচাঁদ অতিশয় চতুর ও অতিশয় সতর্ক, তিনি, প্রতিজ্ঞাপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম সাক্ষরিত না দেখিলে, নিঃসন্দেহ সন্দেহ করিবেন। ক্লাইব কোনও কর্ম্ম অঙ্গহীন করিতেন না, এবং অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই করিতে পারিতেন। তিনি ওয়াট্‌সন সাহেবের নাম জাল করিলেন। লোহিত বর্ণের পত্র উমিচাঁদকে দেখান গেল, এবং তাহাতেই তাঁহার মন সুস্থ হইল। অনন্তর, মীর জাফরের সহিত এই নিয়ম হইল, ইঙ্গরেজেরা যেমন অগ্রসর হইবেন, তিনি, স্বীয় প্রভুর সৈন্য হইতে আপন সৈন্য পৃথক করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত মিলিত হইবেন।

এই রূপে সমুদয় স্থিরীকৃত হইলে, ক্লাইব সিরাজ উদ্দৌলাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে, আপনি ইঙ্গরেজদিগের অনেক অনিষ্ট করিয়াছেন, সন্ধিপত্রের নিয়মলঙ্ঘন করিয়াছেন, যে যে ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা করেন নাই, এবং ইঙ্গরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, ফরাসিদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। অতএব, আমি স্বয়ং মুরশিদাবাদে যাইতেছি, আপনকার সভার প্রধান প্রধান লোকদিগের উপর ভার দিব, তাঁহারা সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন।

নবাব, এই পত্রের লিখনভঙ্গী দেখিয়া, এবং ক্লাইব স্বয়ং আসিতেছেন ইহা পাঠ করিয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, এবং ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ অপরিহরণীয় স্থির করিয়া, অবিলম্বে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক, কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্লাইবও, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসের আরম্ভেই, আপন সৈন্য লইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি, ১৭ই জুন, কাটোয়াতে উপস্থিত হইলেন, এবং পর দিন তথাকার দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন।

১৯এ জুন, ঘোরতর বর্ষার আরম্ভ হইল। ক্লাইব, নদী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করি, কি ফিরিয়া যাই, মনে মনে এই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি তৎকাল পর্য্যন্ত মীর জাফরের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না, এবং তাঁহার এক খানি পত্রিকাও প্রাপ্ত হইলেন না। তখন তিনি, স্বীয় সেনাপতিদিগকে সমবেত করিয়া, পরামর্শ করিতে বসিলেন। তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের বিষয়ে অসম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। ক্লাইবও, প্রথমতঃ তাঁহাদের সিদ্ধান্তই গ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে, অভিনিবেশ

পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া, ভাগ্যে যাহা থাকে ভাবিয়া, যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন, যদি এত দূর আসিয়া, এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে, বাঙ্গালাতে ইঙ্গরেজদিগের অভ্যুদয়ের আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইবেক।

২২এ জুন, সূর্য্যোদয় কালে, সৈন্য সকল গঙ্গা পার হইতে আরম্ভ করিল। দুই প্রহর চারিটার সময়, সমুদয় সৈন্য অপর পারে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা, অবিশ্রান্ত গমন করিয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়, পলাশির বাগানে উপস্থিত হইল।

প্রভাত হইবা মাত্র, যুদ্ধ আরব্ধ হইল। ক্লাইব, উৎকণ্ঠিত চিত্তে, মীর জাফরের ও তদীয় সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তখন পর্যন্ত, তাঁহার ও তদীয় সৈন্যের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। যুদ্ধক্ষেত্রে নবাবের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ ও পঞ্চত্রিংশৎ সহস্র পদাতি সৈন্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি স্বয়ং, চাটুকারবর্গে বেষ্টিত হইয়া, সকলের পশ্চাদ্ভাগে তাঁবুর মধ্যে ছিলেন। মীর মদন নামক একজন সেনাপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মীর জাফর, আত্মসৈন্য সহিত, তথায় উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময়, কামানের গোলা লাগিয়া, সেনাপতি মীর মদনের দুই পা উড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ নবাবের তাঁবুতে নীত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তদৃষ্টে নবাব যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। তখন, তিনি মীর জাফরকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁহার চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপিত করিয়া, অতিশয় দীনতা প্রদর্শন পূর্বক, এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, অন্ততঃ আমার মাতামহের অনুরোধে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া, এই বিষম বিপদের সময়, সহায়তা কর।

জাফর অঙ্গীকার করিলেন, আমি আত্মধর্ম প্রতিপালন করিব; এবং তাহার প্রমাণ স্বরূপ, নবাবকে পরামর্শ দিলেন, অদ্য বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, সৈন্য সকল ফিরাইয়া আনুন। যদি জগদীশ্বর কৃপা করেন, কল্য আমরা, সমুদয় সৈন্য একত্র করিয়া, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইব। তদনুসারে, নবাব সেনাপতিদিগকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার আজ্ঞা পাঠাইলেন। নবাবের অপর সেনাপতি মোহনলাল ইঙ্গরেজদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু, নবাবের এই আজ্ঞা পাইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্বক নিবৃত্ত হইলেন। তিনি অকস্মাৎ ক্ষান্ত হওয়াতে, সৈন্যদিগের উৎসাহভঙ্গ হইল। তাহারা, ভঙ্গ দিয়া, চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং, ক্লাইবের অনায়াসে সম্পূর্ণ জয়লাভ হইল। যদি মীর জাফর বিশ্বাসঘাতক না হইতেন, এবং ঈদৃশ সময়ে এরূপ প্রতারণা না করিতেন, তাহা হইলে, ক্লাইবের, কোনও ক্রমে, জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর, সিরাজ উদ্দৌলা, এক উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া, দুই সহস্র অশ্বারোহ সমভিব্যাহারে, সমস্ত রাত্রি গমন করতঃ. পর দিন বেলা ৮টার সময়, মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, এবং উপস্থিত হইয়াই, আপনার প্রধান প্রধান ভৃত্য ও অমাত্যবর্গকে সন্নিধানে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহারা সকলেই স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে সময়ে. তাঁহার শ্বশুর পর্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

নবাব, সমস্ত দিন, একাকী আপন প্রাসাদে কালযাপন করিলেন; পরিশেষে নিতান্ত হতাশ হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে, মহিষীগণ ও কতিপয় প্রিয়পাত্র সমভিব্যাহারে করিয়া, শকটারোহণ পূর্বক ভগবানগোলায় পলায়ন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, ফরাসি সেনাপতি লা সাহেবের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, তিনি নৌকারোহণ পূর্বক জলপথে প্রস্থান করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে, তিনি, ঐ সেনাপতিকে পাটনা হইতে আসিতে পত্র লিখিয়াছিলেন।

পলাশির যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের, হত আহত সমুদয়ে, কেবল কুড়ি জন গোরা ও পঞ্চাশ জন সিপাই নষ্ট হয়। যুদ্ধসমাপ্তির পর, মীর জাফর, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার রণজয় নিমিত্ত সভাজনও হর্ষপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর, উভয়ে একত্র হইয়া মুরশিদাবাদ চলিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, মীর জাফর রাজকীয় প্রাসাদ অধিকার করিলেন।

রাজধানীর প্রধান প্রধান লোক ও প্রধান প্রধান রাজকীয় কর্মচারী সমবেত হইলেন। অবিলম্বে এক দরবার হইল। ক্লাইব, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মীর জাফরের কর গ্রহণপূর্বক সিংহাসনে বসাইয়া. তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সম্ভাষণ ও বন্দনা করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে, কয়েকজন ইঙ্গরেজ এবং ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও তাঁহার মুন্সী নবকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, ধনাগারে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ে দুই কোটি টাকার অধিক দেখিতে পাইলেন না।

তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন যে, উহা কেবল বাহ্য ধনাগার মাত্র। এতদ্ভিন্ন, অন্তঃপুরে আর এক ধনাগার ছিল; ক্লাইব, তাহার কিছু মাত্র সন্ধান পান নাই। ঐ কোষে স্বর্ণ, রজত, ও রত্নে আট কোটি টাকার ন্যূন ছিল না। মীর জাফর, আমির বেগ খাঁ, রামচাঁদ, নবকৃষ্ণ, এই কয় জনে ঐ ধন যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লয়েন। এই নির্দ্দেশ নিতান্ত অমূলক বা অসম্ভব বোধ হয় না; কারণ রামচাঁদ তৎকালে ষাটি টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু দশ বৎসর পরে, তিনি এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার

বিষয় রাখিয়া মরেন। মুন্সী নবকৃষ্ণেরও মাসিক বেতন ষাটি টাকার অধিক ছিল না। কিন্তু তিনি, অল্প দিন পরে, মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। এই ব্যক্তিই পরিশেষে, রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, রাজা নবকৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

এক্ষণে ইঙ্গরেজেরা সকল সঙ্কট হইতে মুক্ত হইলেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহাদের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন, বাণিজ্যের উচ্ছেদ এবং কর্মচারীদিগের প্রাণদণ্ড হয়। বস্তুতঃ, তাঁহারা বাঙ্গালাতে এক বারে সর্ব প্রকারে সম্বন্ধশূন্য হইয়াছিলেন। কিন্তু, ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, তাঁহারা কেবল আপনাদের কুঠি সকল পুনর্বার অধিকার করিলেন, এমন নহে; আপনাদের বিপক্ষ সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং অনুগত এক ব্যক্তিকে নবাবী পদ দিলেন, আর তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসিরা বাঙ্গালা হইতে দূরীকৃত হইলেন।

নবাব কলিকাতা আক্রমণ করাতে, কোম্পানি বাহাদুরের, এবং ইঙ্গরেজ, বাঙ্গালি, ও আরমানি বণিকদিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল; সেই ক্ষতির পূরণ স্বরূপ, কোম্পানি বাহাদুর, এক কোটি টাকা পাইলেন, ইঙ্গরেজ বণিকেরা পঞ্চাশ লক্ষ, বাঙ্গালি বণিকেরা বিশ লক্ষ, আরমানি বণিকেরা সাত লক্ষ, এ সমস্ত ভিন্ন, সৈন্যসংক্রান্ত লোকেরা অনেক পারিতোষিক পাইলেন। আর, কোম্পানির যে সকল কর্মচারীরা মীর জাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বঞ্চিত হইলেন না। ক্লাইব ষোল লক্ষ টাকা পাইলেন, কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা, কিছু কিছু ন্যূন পরিমাণে, পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। ইহাও নির্দ্ধারিত হইল, পূর্বে ইঙ্গরেজদিগের যে যে অধিকার ছিল, সে সমস্ত বজায় থাকিবেক, মহারাষ্ট্রখাতের অন্তর্গত সমুদয় স্থান ও তাহার বাহে ছয় শত ব্যাম পর্য্যন্ত, ইঙ্গরেজদিগের হইবেক, কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ কোম্পানির জমীদারী হইবেক, আর, ফরাসিরা কোনও কালে, এ দেশে বাস করিবার অনুমতি পাইবেন না।

এ দিকে, সিরাজ উদ্দৌলা, ভগবানগোলা হইতে রাজমহলে পঁহুছিয়া, আপন স্ত্রী ও কন্যার জন্য অন্ন পাক করিবার নিমিত্ত, এক ফকীরের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে ঐ ফকীরের উপর তিনি অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি তাঁহার অনুসন্ধানকারীদিগকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পঁহুছসংবাদ দিলে, তাহারা আসিয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিল। সপ্তাহ পূর্ব্বে, তিনি ঐ সকল ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেন না; এক্ষণে, অতি দীন বাক্যে, তাহাদের নিকট বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা, তদীয় বিনয়বাক্য শ্রবণে বধির হইয়া, তাঁহার সমস্ত স্বর্ণ ও রত্ন লুটিয়া লইল, এবং তাঁহাকে মুরশিদাবাদে প্রত্যানয়ন করিল।

যৎকালে, তিনি রাজধানীতে আনীত হইলেন, তখন মীর জাফর, অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবন করিয়া, তন্দ্রাবেশে ছিলেন; তাঁহার পুত্র পাপাত্মা মীরন, সিরাজ উদ্দৌলার উপস্থিতিসংবাদ শুনিয়া, তাঁহাকে আপন আলয়ের সন্নিধানে রুদ্ধ করিতে আজ্ঞা দিল, এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই, স্বীয় বয়স্যগণের নিকট তাঁহার প্রাণবধের ভার লইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু, তাহারা একে একে সকলেই অস্বীকার করিল। মহম্মদিবেগ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিল; পরিশেষে সেই দুরাত্মাই এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানের ভারগ্রহণ করিল। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, হতভাগ্য নবাব, তাহার আগমনের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, করুণ স্বরে কহিলেন, আমি যে, বিনা অপরাধে, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমায় অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিতে হইবেক। তিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র, দুরাচার মহম্মদিবেগ তরবারি প্রহার দ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিল। উপর্য্যুপরি কতিপয়, আঘাতের পর, তিনি, হুসেন কুলি খাঁর প্রাণদণ্ডের প্রতিফল পাইলাম, এই বলিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত ও ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, মীরনের আজ্ঞাবহেরা নবাবের মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিল; এবং, অযত্ন ও অবজ্ঞা পূর্ব্বক, হস্তিপৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জনাকীর্ণ রাজপথ দিয়া, গোর দিবার নিমিত্ত লইয়া চলিল। ঐ সময়ে সকলে লক্ষ্য করিয়াছিল, কোনও কারণ বশতঃ, পথের মধ্যে মাহুতের থামিবার আবশ্যক হওয়াতে, আঠার মাস পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলা যে স্থানে হুসেন কুলি খাঁর প্রাণবধ করিয়াছিলেন, ঐ হস্তী ঠিক সেই স্থানে দণ্ডায়মান হয়; এবং, যে ভূভাগে, বিনা অপরাধে, তিনি হুসেনের শোণিতপাত করিয়াছিলেন, ঠিক সেই স্থানে তাঁহার খণ্ডিত কলেবর হইতে কতিপয় রুধিরবিন্দু নিপতিত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

মীর জাফরের প্রভুত্ব এক কালে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, তিন প্রদেশে অব্যাহত রূপে অঙ্গীকৃত হইল। কিন্তু, অতি অল্প কালেই, প্রকাশ পাইল, তাঁহার কিছু মাত্র বিষয়বুদ্ধি নাই। তিনি স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর, ও অর্থলোভী ছিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারীরা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের অধিকার কালে, যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তাঁহাদের সর্ব্বস্বহরণ মনস্থ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী রাজা রায়

দুর্লভ কেবল বিলক্ষণ ধনবান ছিলেন, এমন নহে ; তাঁহার নিজের ছয় সহস্র সৈন্যও ছিল ; মীর জাফর সর্বাগ্রে তাঁহাকেই লক্ষ্য করিলেন।

মীর জাফরকে সিংহাসনে নিবেশিত করিবার বিষয়ে, রাজা রায় দুর্লভ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। যখন সিরাজ উদ্দৌলাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত চক্রান্ত হয়, রায় দুর্লভই চক্রান্তকারীদিগের নিকট প্রস্তাব করেন যে, মীর জাফরকে নবাব করা উচিত। তথাপি মীর জাফর, সর্বাগ্রে, রায় দুর্লভের সর্বনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফলতঃ, তাঁহার উপর মীর জাফরের এমন বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল যে, তাহার সহিত সিরাজ উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বন্ধুতা আছে, এই সন্দেহ করিয়া, সেই অল্পবয়স্ক নিরপরাধ রাজকুমারের প্রাণবধ করিলেন। রায় দুর্লভও, কেবল ইঙ্গরেজদিগের শরণাগত হইয়া, সে যাত্রা পরিত্রাণ পাইলেন।

রাজা রামনারায়ণ, বহুকাল অবধি, বিহারের ডেপুটি গবর্ণর ছিলেন। নবাব মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় সমুদয় সম্পত্তি অপহরণ করিবেন, ও আপন ভ্রাতাকে গবর্ণরী পদ দিবেন। ক্লাইবের মতে, মীর জাফরের ভ্রাতা মীর জাফর অপেক্ষাও নির্বোধ ছিলেন। নবাব মেদিনীপুরের গবর্ণর রাজা রাম সিংহের ভ্রাতাকে কারাগারে রুদ্ধ করিলেন ; তাহাতে রাম সিংহও তাহার প্রতি ভগ্নস্নেহ হইলেন। পূর্ণিয়ার ডেপুটি গবর্ণর অদল সিংহ, মন্ত্রীদিগের কুমন্ত্রণা অনুসারে, রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিলেন।

এই রূপে, মীর জাফরের সিংহাসনারোহণের পর, পাঁচ মাসের মধ্যে, তিন প্রদেশে তিন বিদ্রোহ ঘটিল। তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া, বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত, ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তৎকালে ক্লাইব বাঙ্গালাতে সকলেরই বিশ্বাসভাজন ছিলেন। এই বিশ্বাস অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। তিনি, উপস্থিত তিন বিদ্রোহের শান্তি করিলেন, অথচ এক বিন্দু রক্তপাত হইল না।

নবাব বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করাতে, ক্লাইব, পাটনা যাইবার সময়, মুরশিদাবাদ হইয়া যান। নবাব, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত, তাহার অধিকাংশই পরিশোধিত হয় নাই। ক্লাইব, রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া, নবাবকে জানাইলেন যে, সে সকলের পরিশোধ করিবার কোনও বন্দোবস্ত করিতে হইবেক। নবাব, তদানুসারে, দেয়-পরিশোধ স্বরূপ, বর্দ্ধমান, নদীয়া, হুগলী, এই তিন প্রদেশের রাজস্ব তাঁহাকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলে পর, ক্লাইব ও নবাব, স্ব স্ব সৈন্য লইয়া, পাটনা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রামনারায়ণ ক্লাইবের শরণাগত হইয়া কহিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা আমায় অভয়দান করেন, তাহা হইলে, আমি নবাবের

আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে পারি। ক্লাইব বিস্তর বুঝাইলে পর, নবাব রামনারায়ণের উপর অক্রোধ হইলেন। অনন্তর, রামনারায়ণ, মীর জাফরের শিবিরে গিয়া, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। মীর জাফর, এ যাত্রায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন না। পরে, ক্লাইব ও নবাব একত্র হইয়া, মুরশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা রায় দুর্লভ, পূর্ব্বাপর, তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যাবৎ উপস্থিত আছেন, তত দিনই রক্ষার সম্ভাবনা।

পাটনার ব্যাপার এই রূপে নিষ্পন্ন হওয়াতে, জাফরের পুত্র মীরন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহাদের পিতা পুত্রের এই অভিপ্রায় ছিল, পরাক্রান্ত হিন্দুদিগের দমন ও সর্ব্বস্বহরণ করিবেন। কিন্তু, এ যাত্রায়, তাহা না হইয়া, বরং তাঁহাদের পরাক্রমের দৃঢ়ীকরণ হইল। তাঁহারা উভয়েই, ক্লাইবের এইরূপ ক্ষমতা দর্শনে, অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। মীর জাফর, শুনিতে তিন প্রদেশের নবাব ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবিক কিছুই ছিলেন না; ক্লাইবই সকল ছিলেন।

দুই বৎসর পূর্ব্বে, ইঙ্গরেজদিগকে, নবাবের নিকট স্বপক্ষে একটি অনুকুল কথা বলাইবার নিমিত্ত, টাকা দিয়া যে সকল প্রধান লোকের উপাসনা করিতে হইত, এক্ষণে সেই সকল ব্যক্তিকে ইঙ্গরেজদিগের উপাসনা করিতে হইল। মুসলমানেরা দেখিতে লাগিলেন, চতুর হিন্দুরা, অকর্ম্মণ্য নবাবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্লাইবের নিকটেই, সকল বিষয়ে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ক্লাইব, ঐ সকল বিষয়ে, এমন বিজ্ঞতা ও বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন যে যাবৎ তাঁহার হস্তে সকল বিষয়ের কর্তৃত্বভার ছিল, তাবৎ, কোনও অংশে, বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই।

হতভাগ্য দিল্লীশ্বরের পুত্র শাহ আলম, প্রয়াগের ও অযোধ্যার সুবাদারদিগের সহিত সন্ধি করিয়া, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঐ দুই সুবাদারের, এই সুযোগে, বাঙ্গলা রাজ্যের কোনও অংশ আত্মসাৎ করিতে পারা যায় কি না, এই চেষ্টা দেখা যেরূপ অভিপ্রেত ছিল, উক্ত রাজকুমারের সাহায্য করা সেরূপ ছিল না। শাহ আলম ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, যদি আপনি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা করেন, তাহা হইলে, আমি আপনাকে, ক্রমে ক্রমে, এক এক প্রদেশের আধিপত্য প্রদান করিব। কিন্তু ক্লাইব উত্তর দিলেন, আমি মীর জাফরের বিপক্ষতাচরণ করিতে পারিব না। শাহ আলম, সম্রাটের সহিত বিবাদ করিয়া, তদীয় সম্মতি ব্যতিরেকে, বিহারদেশ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত, সম্রাটও ক্লাইবকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি আমার বিদ্রোহী পুত্রকে দেখিতে পাইলে, রুদ্ধ করিয়া, আমার নিকট পাঠাইবে।

মীর জাফরের সৈন্য সকল, বেতন না পাওয়াতে, অতিশয় অবাধ্য হইয়া ছিল; সুতরাং, সে সৈন্য দ্বারা উল্লিখিত আক্রমণের নিবারণ কোনও মতে সম্ভাবিত ছিল না। এজন্য, তাঁহাকে, উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত, পুনর্বার ক্লাইবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। তদনুসারে ক্লাইব, সত্বর হইয়া, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে, পাটনা যাত্রা করিলেন। কিন্তু, ক্লাইবের উপস্থিতির পূর্বেই, এই ব্যাপার এক প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রাজকুমার ও প্রয়াগের সুবাদার, নয় দিবস পাটনা অবরোধ করিয়াছিলেন। ঐ স্থান তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিত; কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন, ইঙ্গরেজেরা আসিতেছেন এবং অযোধ্যার সুবাদার, প্রয়াগের সুবাদারের অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক, তাঁহার রাজধানী অধিকার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, প্রয়াগের সুবাদার, আপনার উপায় আপনি চিন্তা করুন এই বলিয়া, রাজকুমারের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় রাজ্যের রক্ষার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। এই উপলক্ষে যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজকুমারের সৈন্যেরা অনতিবিলম্বে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; কেবল তিন শত ব্যক্তি তাঁহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহিল। পরিশেষে তাঁহার এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তিনি ক্লাইবের নিকট ভিক্ষার্থে লোক প্রেরণ করেন। ক্লাইব, বদান্যতা প্রদর্শন পুর্বক, রাজকুমারকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পাঠাইয়া দেন।

মীর জাফর, এই রূপে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, ক্লাইবকে ওমরা উপাধি দিলেন, এবং কোম্পানিকে নবাব সরকারে কলিকাতার জমীদারীর যে রাজস্ব দিতে হইত, তাহা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ রাজস্ব বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার ন্যূন ছিল না।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে মীর জাফর, কলিকাতায় আসিয়া, ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এবং তিনিও, যৎপরোনাস্তি সমাদর পূর্বক, তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। তিনি তথায় থাকিতে থাকিতে, ওলন্দাজদিগের সাত খান যুদ্ধজাহাজ নদীমুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। ঐ সাত জাহাজে পঞ্চদশ শত সৈন্য ছিল। অতি ত্বরায় ব্যক্ত হইল, ঐ সকল জাহাজ নবাবের সম্মতি ব্যতিরেকে আইসে নাই। ইঙ্গরেজদিগকে দমনে রাখিতে পারে, এরূপ এক দল য়ুরোপীয় সৈন্য আনাইবার নিমিত্ত, তিনি, কিছু দিন অবধি, চুঁচুড়াবাসী ওলন্দাজদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। খোজাবাজীদ নামক কাশ্মীরদেশীয় বণিক এই সকল কুমন্ত্রণার সাধক হইয়াছিলেন।

খোজাবাজীদ আলিবর্দ্দি খাঁর সবিশেষ অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। লবণব্যবসায় তাঁহার একচাটিয়া ছিল। তিনি এমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন যে, সহস্র মুদ্রার ন্যূনে তদীয় দৈনন্দিন ব্যয়ের নির্বাহ হইত না। একদা তিনি নবাবকে পঞ্চদশ লক্ষ টাকা

উপহার দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি মুরশিদাবাদে ফরাসিদিগের এজেণ্ট ছিলেন; পরে, চন্দননগরের পরাজয় দ্বারা তাঁহাদের অধিকার উচ্ছিন্ন হইলে, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে আইসেন।

সিরাজ উদ্দৌলা তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু, উক্ত নবাবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার নিমিত্ত ইঙ্গরেজদিগকে আহ্বান করিবার বিষয়ে, তিনিই প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রাজবিপ্লবের পর, তিনি দেখিলেন যে ইঙ্গরেজদিগের নিকট যে সকল আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না; এজন্য, তাঁহাদের দমন করিবার নিমিত্ত, বহুসংখ্যক ওলন্দাজী সৈন্যের আনয়ন বিষয়ে যত্নবান হইয়াছিলেন।

তৎকালে চুঁচুড়ার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল। গবর্ণর বিসদম সাহেব এক পক্ষের প্রধান। ইনি ক্লাইবের বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিতান্ত বাসনা, কোনও রূপে সন্ধিভঙ্গ না হয়। বর্ণেট নামক এক ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রধান। এই পক্ষের লোকেরা অতিশয় উদ্ধত ছিলেন। তাঁহাদের মত অনুসারে চুঁচুড়ার সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইত। ইতঃপূর্ব্বে, ইঙ্গরেজেরা, আপনাদের মঙ্গলের নিমিত্ত, ওলন্দাজদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন যে, আপনারা এই নদীতে স্বজাতীয় নাবিক রাখিতে পারিবেন না। 'ওলন্দাজেরা', বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, বটেবিয়াতে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন, এ দেশে এক্ষণে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, এই সুযোগে আপনাদের অনেক ইষ্টসাধন করিতে পারা যাইবেক।

এই সৈন্যের উপস্থিতিসংবাদ অবগত হইয়া, ক্লাইব, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে, ওলন্দাজদিগের সহিত ইঙ্গরেজদের সন্ধি ছিল। আর, তাঁহাদের যত য়ুরোপীয় সৈন্য থাকে, ইঙ্গরেজদিগের তাহার তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। যাহা হউক, ক্লাইব, স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ পরাক্রম ও অকুতোভয়তা সহকারে, কার্য্য করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, বাঙ্গালাতে ফরাসিদিগের প্রাধান্যলোপ করিয়া, মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ওলন্দাজদিগকেও প্রবল হইতে দিবেন না। এক্ষণে তিনি মীর জাফরকে কহিলেন, আপনি ওলন্দাজী সৈন্যদিগকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞাপ্রদান করুন। নবাব কহিলেন, আমি স্বয়ং হুগলীতে গিয়া এ বিষয়ের শেষ করিব। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া, তিনি, ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন, আমি ওলন্দাজদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি; প্রস্থানের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই, তাহাদের সমুদয় জাহাজ চলিয়া যাইবেক।

ক্লাইব, এই চাতুরীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া, স্থির করিলেন, ওলন্দাজী জাহাজ সকল আর অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নহে; অতএব, কলিকাতায় দক্ষিণবর্ত্তী টানা নামক স্থানে যে গড় ছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তিনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন,

অগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। ওলন্দাজেরা, দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া, অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সাত শত য়ুরোপীয় ও আট শত মালাই সৈন্য, ভূমিতে অবতীর্ণ করিলেন। ঐ সকল সৈন্য স্থলপথে, গঙ্গার পশ্চিম পার দিয়া, চুঁচুড়া অভিমুখে চলিল। ক্লাইব, ওলন্দাজদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, চুঁচুড়া ও চন্দন নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বেই কর্ণেল ফোর্ড সাহেবকে স্বল্প সৈন্য সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

ওলন্দাজী সৈন্য, ক্রমে অগ্রসর হইয়া, চুঁচুড়ার এক ক্রোশ দক্ষিণে ছাউনি করিল। কর্ণেল ফোর্ড জানিতেন, উভয় জাতির পরস্পর সন্ধি আছে; এজন্য, সহসা তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া, স্পষ্ট অনুমতির নিমিত্ত, কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন। ক্লাইব তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে ফোর্ড সাহেবের পত্র উপস্থিত হইল। তিনি, খেলা হইতে না উঠিয়াই, পেন্সিল দিয়া এই উত্তর লিখিলেন, ভ্রাতঃ! অবিলম্বে তাহাদের সহিত যুদ্ধ কর, কল্য আমি কৌন্সিলের অনুমতি পাঠাইব। ফোর্ড, এই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র, আক্রমণ করিয়া, আধ ঘণ্টার মধ্যেই, ওলন্দাজদিগকে পরাস্ত করিলেন। তাঁহাদের যে সকল জাহাজ নদী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ঐ সময়ে তৎসমুদায়ও ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হইল। এই রূপে ওলন্দাজদিগের ঐ মহোদ্যোগ পরিশেষে ধূমশেষ হইয়া গেল।

এই যুদ্ধের অব্যবহিত পর ক্ষণেই, রাজকুমার মীরন, ছয় সাত সহস্র অশ্বারোহ সৈন্য সহিত চুঁচুড়ায় উপস্থিত হইলেন। ওলন্দাজেরা জয়ী হইলে, তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে, অগত্যা ইঙ্গরেজদের সহিত মিলিত হইয়া ওলন্দাজ-দিগকে আক্রমণ করিলেন। কর্ণেল ফোর্ড, যুদ্ধসমাপ্তির অব্যবহিত পরেই, চুঁচুড়া অবরোধ করিলেন। ঐ নগর ত্বরায় ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইত; কিন্তু ওলন্দাজেরা ক্লাইবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, তিনি উক্ত নগর অধিকার করিলেন না। অনন্তর, তাঁহারা যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় ধরিয়া দিতে স্বীকার করাতে, তিনি তাঁহাদের জাহাজ সকলও ছাড়িয়া দিলেন।

ক্লাইব, ক্রমাগত তিন বৎসর গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, শারীরিক সাতিশয় অপটু হইয়াছিলেন। এজন্য, এই সকল ঘটনার অবসানেই, ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারিতে ধনে মানে পূর্ণ হইয়া, ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। গবর্ণমেণ্টের ভার বান্সিটার্ট সাহেবের হস্তে ন্যস্ত হইল।

বাঙ্গালা দেশ যে এক বারে নিরুপদ্রব হইবেক, তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর নিজপুত্র মীরনের হস্তে রাজ্যশাসনের ভারসমর্পণ করিলেন। যুবরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত সাতিশয় সাহঙ্কার ব্যবহার ও প্রজাগণের উপর অসহ্য অত্যাচার আরম্ভ করাতে, সকলেই তাঁহার শাসনে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে

এরূপ নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সকলে সিরাজ উদ্দৌলার কুক্রিয়া সকল বিস্মৃত হইয়া গেল।

সম্রাটের পুত্র শাহ আলম, সর্বসাধারণের ঈদৃশ অসন্তোষ দর্শনে সাহসী হইয়া, দ্বিতীয় বার বিহার আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। পূর্ণিয়ার গবর্ণর, কাদিম হোসেন খাঁ, স্বীয় সৈন্য লইয়া, তাঁহার সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন। শাহ আলম, কর্মনাশা পার হইয়া, বিহারের সীমায় পদার্পণ মাত্র, সংবাদ পাইলেন, সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী প্রসিদ্ধ ক্রুর ইমাদ উল্‌মুলুক সম্রাটের প্রাণবধ করিয়াছে। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে, শাহ আলম ভারতবর্ষের সম্রাট হইলেন এবং অযোধ্যার স্বাদারকে সাম্রাজ্যের সর্বাধিকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তিনি নামেমাত্র সম্রাট হইলেন; তাঁহার পরাক্রমও ছিল না৷ প্রজাও ছিল না, তৎকালে, তাঁহার রাজধানী পর্য্যন্ত বিপক্ষের হস্তগত ছিল; এবং তিনিও নিজে নিজ রাজ্যে এক প্রকার পলায়িত স্বরূপ ছিলেন।

তিনি পাটনা অভিমুখে যাত্রা করিলে, পারাক্রান্ত রামনারায়ণ নগররক্ষার এক প্রকার উদ্যোগ করিয়া, সাহায্য প্রাপ্তির নিমিত্ত, মুরশিদাবাদে পত্র লিখিলেন। কর্ণেল কালিয়ড তৎকালে সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি ইংলণ্ডীয় সৈন্য লইয়া, তক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন; এবং মীরনও, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মীরন, ইতঃপূর্বে দুই নিজ কর্ম্মকারকের প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, এবং স্বহস্তে দুই ভোগ্যা কামিনীর মস্তকচ্ছেদন করেন। আলিবর্দ্দি খাঁর দুই কন্যা, ঘেসিতি বেগম ও আমান বেগম, আপন আপন স্বামী নিবাইশ মহম্মদ ও সায়দ অহম্মদের মৃত্যুর পর, গুপ্ত ভাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। মীরন, এই যুদ্ধযাত্রা কালে, তাঁহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞাপ্রেরণ করিলেন। ঢাকার গবর্ণর, এই নিষ্ঠুর ব্যাপারের সমাধানে অসম্মত হওয়াতে, তিনি আপন এক ভৃত্যকে এই আজ্ঞা দিয়া পাঠাইলেন যে, তাহাদিগকে, মুরশিদাবাদে আনয়নচ্ছলে, নৌকায় আরোহণ করাইয়া, পথের মধ্যে নৌকা সমেত জলমগ্ন করিবে।

এই নির্দেশ প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রতিপালিত হইল। হত্যাকারীরা, ডুবাইয়া দিবার নিমিত্ত, নৌকার ছিপি খুলিবার উপক্রম করিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী করুণ স্বরে কহিলেন, হে সর্বশক্তিময় জগদীশ্বর! আমরা উভয়েই পাপীয়সী ও অপরাধিনী বটে, কিন্তু মীরনের কখনও কোনও অপরাধ করি নাই; প্রত্যুত, আমরাই তাঁহার এই সমস্ত আধিপত্যের মূল।

মীরন, প্রস্থান কালে, স্বীয় স্মরণপুস্তকে এই অভিপ্রায়ে তিন শত ব্যক্তির নাম লিখিয়াছিলেন যে, প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবেন। কিন্তু আর তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইল না।

কর্ণেল কালিয়ড রামনারায়ণকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাবৎ আমি উপস্থিত না হই, আপনি, কোনও ক্রমে, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু তিনি, এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, নগর হইতে বহির্গমন পূর্বক, সম্রাটের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন। সুতরাং, পাটনা নিতান্ত অশরণ হইল। সম্রাট, এক উদ্যমেই ঐ নগর অধিকার করিতে পারিতেন; কিন্তু অগ্রে তাহার চেষ্টা না করিয়া, দেশলুণ্ঠনেই সকল সময় নষ্ট করিলেন। ঐ সময় মধ্যে, কালিয়ড, স্বীয় সমুদয় সৈন্য সহিত, উপস্থিত হইলেন এবং অবিলম্বে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু মীরন, ফেব্রুয়ারির দ্বাবিংশ দিবসের পূর্বে গ্রহ সকল অনুকূল নহেন, এই বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করাতে, প্রস্তাবিত আক্রমণ স্থগিত রহিল।

২০এ, সম্রাট, তাঁহাদের উভয়ের সৈন্য এক কালে আক্রমণ করিলেন। মীরনের পঞ্চদশ সহস্র অশ্বারোহ সহসা ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু কর্ণেল কালিয়ড, দৃঢ়তা ও অকুতোভয়তা সহকারে, সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়া, অবিলম্বে পরাজিত করিলেন। শাহ আলম, সেই রাত্রিতেই, শিবিরভঙ্গ করিয়া রণক্ষেত্রের পাঁচ ক্রোশ অন্তরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর, তিনি, স্বীয় সেনাপতির পরামর্শ অনুসারে, গিরিমার্গ দ্বারা অতর্কিত রূপে গমন করিয়া, সহসা মুরশিদাবাদ অধিকার করিবার আশয়ে, প্রস্থান করিলেন।

এই প্রয়াণ অতি ত্বরা পূর্ব্বক সম্পাদিত হইল। কিন্তু মীরন, জানিতে পারিয়া দ্রুতগতি পোত দ্বারা, আপন পিতার নিকট এই সম্ভাবিত বিপদের সংবাদ প্রেরণ করিলেন। অল্প কাল মধ্যেই, সম্রাট, মুরশিদাবাদের পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে, পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু সত্বর আক্রমণ না করিয়া, জনপদ মধ্যে অনর্থক কালহরণ করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কর্ণেল কালিয়ডও আসিয়া পঁহুছিলেন। উভয় সৈন্য পরস্পর দৃষ্টিগোচর স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিল। ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধদানে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সম্রাট, সহসা অসম্ভব ত্রাসযুক্ত হইয়া, পাটনা প্রতিগমন পূর্বক, ঐ নগর দৃঢ়রূপে অবরোধ করিলেন। ঐ সময়ে, পূর্ণিয়ার গবর্ণর কাদিম হোসেন খাঁও, তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত, স্বীয় সৈন্য সহিত যাত্রা করিলেন।

সম্রাট, ক্রমাগত নয় দিবস, পাটনা আক্রমণ করিলেন। প্রথমতঃ, নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, উক্ত নগর অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইবেক। কিন্তু, কাপ্তেন নক্স অত্যল্প সৈন্য সহিত সহসা পাটনায় উপস্থিত হওয়াতে, সে আশঙ্কা দূর হইল। তিনি, কর্ণেল কালিয়ড কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, বর্দ্ধমান হইতে ত্রয়োদশ দিবসে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং রাত্রিতে, বিপক্ষের শিবির পরীক্ষা করিয়া, পর দিন, তাহাদের মধ্যাহ্নকালীন নিদ্রাকা

সময়, আক্রমণ করিলেন। সম্রাটের সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। তখন তিনি, আপন শিবিরে অগ্নিদান করিয়া, পলায়ন করিলেন।

দুই এক দিন পরে, কাদিম হোসেন খাঁ, ষোড়শ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে হাজীপুরে পঁহুছিয়া, পাটনা আক্রমণের উপক্রম করিলেন। কিন্তু কাপ্তেন নক্স, সহস্রের অনধিক সৈন্য মাত্র সহিত গঙ্গা পার হইয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। এই জয়লাভকে অসাধারণ সাহসের কার্য বলিতে হইবেক। এই জয়লাভ দর্শনে, এতদ্দেশীয় লোকেরা ইঙ্গরেজদিগকে মহাপরাক্রান্ত নিশ্চয় করিলেন। এই যুদ্ধে, রাজা সিতাব রায় এমন অসাধারণ সাহসিকতা প্রদর্শন করেন যে, তদ্দর্শনে ইঙ্গরেজেরা, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরাজয়ের পর, পূর্ণিয়ার গবর্ণর, সম্রাটের সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত, প্রস্থান করিলেন। কর্ণেল কালিয়ড ও মীরন, উভয়ে একত্র হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বর্ষার আরম্ভ হইল; তথাপি তাঁহারা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলেন না। ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ২রা জুলাই রজনীতে অতিশয় দুর্যোগ হইল। মীরন, আপন পটমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, গল্প শুনিতেছিলেন; দৈবাৎ, ঐ সময়ে, অশনিপাত দ্বারা, তাঁহার ও তাঁহার দুই জন পরিচারকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইল। কর্ণেল কালিয়ড, এই দুর্ঘটনা প্রযুক্ত, কাদিম হোসেনের অনুসরণে বিরত হইলেন এবং পাটনা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, বর্ষার অনুরোধে তথায় শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

মীরন নিতান্ত দুরাচার, কিন্তু নিজ পিতার রাজত্বের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ ছিলেন। তৎকালের মুসলমান ইতিহাসলেখক কহেন, নির্ব্বোধ ইন্দ্রিয়পরায়ণ বৃদ্ধ নবাবের যে কিছু বুদ্ধি ও বিবেচনা ছিল, এক্ষণে তাহা এক বারে লোপ পাইল। অতঃপর রাজকার্যে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। সেনাগণ, পূর্বতন বেতন নিমিত্ত, রাজভবন অবরোধ করিয়া, বিসংবাদে উদ্যত হইল। তখন, নবাবের জামাতা, মীর কাসিম, তাহাদের পুরোবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, স্বধন দ্বারা তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিব। এই বলিয়া, তিনি তাহাদিগকে আপাততঃ ক্ষান্ত করিলেন।

নবাব মীর কাসিমকে, দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইলেন। তথায়, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের নিকটে, তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। তৎকালে, এই দুই সাহেবের মত অনুসারেই, কোম্পানির এতদ্দেশীয় সমুদয় বিষয়কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। দ্বিতীয় বার দূত প্রেরণ আবশ্যক হওয়াতে, মীর কাসিম পুনর্বার প্রেরিত হয়েন। এই রূপে, দুই বার, মীর কাসিমের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দেখিয়া, গবর্ণর সাহেবের অন্তঃকরণে এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, কেবল এই ব্যক্তি অধুনা বাঙ্গালার রাজকার্য্যনির্বাহে সমর্থ। তদনুসারে, তিনি মীর কাসিমকে তিন প্রদেশের ডেপুটি

নাজিমী পদ প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। মীর কাসিম সম্মত হইলেন। অনন্তর, বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস, উভয়ে, এক দল সৈন্য সহিত মুরশিদাবাদ গমন করিয়া, মীর জাফরের নিকট ঐ প্রস্তাব করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, এরূপ হইলে, সমুদয় ক্ষমতা অবিলম্বে জামাতার হস্তে যাইবেক, আমি আপন সভামণ্ডপে পুত্তলিকা প্রায় হইব।

বান্সিটার্ট সাহেব, নবাবের অনিচ্ছা দেখিয়া, দোলায়মানচিত্ত হইলেন। মীর কাসিম এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন, আমি সম্রাটের পক্ষে যাইব। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, এত কাণ্ড করিয়া, কখনই মুরশিদাবাদে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন না। তখন বান্সিটার্ট সাহেব দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডীয় সৈন্যদিগকে রাজভবন অধিকার করিতে আদেশ দিলেন। তদ্দর্শনে শঙ্কিত হইয়া, মীরজাফর অগত্যা সম্মত হইলেন।

অনন্তর, মুরশিদাবাদ ও কলিকাতা, এ উভয়ের অন্যতর স্থানে বৃদ্ধ নবাবকে এক বাসস্থান দিবার প্রস্তব হইল। নবাব বিবেচনা করিলেন, যদি আমি মুরশিদাবাদে থাকি, তাহা হইলে, যেখানে এত কাল আধিপত্য করিলাম, তথায় সাক্ষিগোপাল হইয়া থাকিতে হইবেক, এবং জামাতৃকৃত পরিভব সহ্য করিতে হইবেক। অতএব আমার কলিকাতায় যাওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। তিনি এক সামান্য নর্ত্তকীকে আপন প্রণয়িনী করিয়াছিলেন, এবং তাহারই আজ্ঞাকারী ছিলেন। ঐ কামিনী উত্তরকালে মণিবেগম নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধ হন। মুসলমান পুরাবৃত্তলেখক কহেন, ঐ রমণী ও মীর জাফর, প্রস্থানের পূর্ব্বে, অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্ব পূর্ব্ব নবাবদিগের সঞ্চিত মহামূল্য রত্ন সকল হস্তগত করিয়া কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

১৭৬০ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর ইঙ্গরেজেরা মীর কাসিমকে বাঙ্গালা ও বিহারের সুবাদার করিলেন। তিনি, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোম্পানি বাহাদুরকে বর্দ্ধমান প্রদেশের অধিকার প্রদান করিলেন, এবং কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বরদিগকে বিংশতি লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিলেন। সেই টাকা তাঁহারা সকলে যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইলেন।

মীর কাশিম অতিশয় বুদ্ধিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ়

হইয়া ইঙ্গরেজদিগকে এবং মীর জাফরের ও নিজের সৈন্য ও কর্মচারীদিগকে যত টাকা দিতে হইবেক, প্রথমতঃ তাহার হিসাব প্রস্তুত করিলেন, তৎপরে সেই সকল পরিশোধ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি সকল বিষয়ে ব্যয়ের সঙ্কোচ করিয়া আনিলেন; অভিনিবেশ পূর্বক সমুদয় হিসাব দেখিতে লাগিলেন; এবং মীর জাফরের শিথিল শাসনকালে, রাজপুরুষেরা সুযোগ পাইয়া যত টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন, অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে, সেই সকল টাকা আদায় করিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি, জমীদারদিগের নিকট হইতে, কেবল বাকী আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, সমুদয় জমীদারীর নতুন বন্দোবস্তও করিলেন। তাঁহার অধিকারের পূর্ব্বে, দুই প্রদেশের রাজস্ব বার্ষিক ১৭২৪৫০০০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল, তিনি বৃদ্ধি করিয়া ২৫৬১৪০০০ টাকা করিলেন! এই সকল উপায় দ্বারা তাঁহার ধনাগার অনতিবিলম্বে পরিপূর্ণ হইল। তখন, তিনি সমস্ত পূর্ব্বতন দেয়ের পরিশোধ করিলেন। নিয়মিত রূপে বেতন দেওয়াতে, তদীয় সৈন্য সকল বিলক্ষণ বশীভূত রহিল।

ইঙ্গরেজেরা তাহাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন; কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যদিও আমি সর্বসম্মত নবাব বটে, বাস্তবিক সমুদয় ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ইঙ্গরেজদিগের হস্তেই রহিয়াছে। আর, তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বলপ্রকাশ ব্যতিরেকে, কখনই ইঙ্গরেজদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিবেন না; অতএব, স্বীয় সৈন্যের শুদ্ধি ও বৃদ্ধি বিষয়ে তৎপর হইলেন। যে সকল সৈন্য অকর্মণ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিলেন; সৈন্যদিগকে, ইঙ্গরেজী রীতি অনুসারে, শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং এক আরমানিকে সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।

এই ব্যক্তি পারস্যের অন্তর্গত ইস্পাহান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার নাম গর্গিন খাঁ। ইনি অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। গর্গিন, প্রথমতঃ এক জন সামান্য বস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন; কিন্তু যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিনৈপুণ্য থাকাতে, মীর কাসিম তাঁহাকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাতিশয় অধ্যবসায় সহকারে, স্বীয় স্বামীকে ইঙ্গরেজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। তিনি কামান ও বন্দুক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গোলন্দাজদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্য সকল এমন উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙ্গালাতে কখনও কোনও রাজার সেরূপ ছিল না।

মীর কাসিম, ইঙ্গরেজদিগের অগোচরে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার আরমানি

সেনাপতি বন্দুক ও কামানের কারখানা স্থাপিত করিলেন। বন্দুকের নির্মাণকৌশলের নিমিত্ত, ঐ নগরের অদ্যাপি যে প্রতিষ্ঠা আছে, গর্গিন খাঁ তাহার আদিকারণ। তৎকালে, গর্গিনের বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের অধিক ছিল না।

সম্রাট শাহ আলম, তৎকাল পর্যন্ত, বিহারের পর্যন্তদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। অতএব ১৭৬০ খৃঃ অব্দের বর্ষা শেষ হইবা মাত্র মেজর কার্ণাক, সৈন্য সহিত যাত্রা করিয়া, তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধের পর কার্ণাক সাহেব সন্ধি প্রস্তাব করিয়া রাজা সিতাব রায়কে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সম্রাট তাহাতে সম্মত হইলে ইংলণ্ডীয় সেনাপতি. তদীয় শিবিরে গমন পূর্বক, তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন।

মীর কাসিম, সম্রাটের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিবার্তা শ্রবণে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, এবং আপনার পক্ষে কোনও অপকার না ঘটে, এই নিমিত্ত সত্বর পাটনা গমন করিলেন। মেজর কার্ণাক মীর কাসিমকে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি, কোনও ক্রমে সম্রাটের শিবিরে গিয়া সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে এই নির্দ্ধারিত হইল উভয়েই ইঙ্গরেজদিগের কুঠিতে আসিয়া পরস্পর সাক্ষাৎ করিবেন।

উপস্থিত কার্য্যের নির্বাহের নিমিত্ত, এক সিংহাসন প্রস্তুত হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট তদুপরি উপবেশন করিলেন। মীর কাসিম, সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারী প্রদান করিলে, তিনি প্রতি বৎসর চতুর্বিংশতি লক্ষ টাকা করদান স্বীকার করিলেন। তৎপরে, সম্রাট দিল্লী যাত্রা করিলেন। কার্ণাক সাহেব, কর্মনাশার তীর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন। সম্রাট, কার্ণাকের নিকট বিদায় লইবার সময়, প্রস্তাব করিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই আমি তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা. এই তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রদান করিব। ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে. উড়িষ্যার অধিকাংশ মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে প্রদত্ত হয়, সুবর্ণরেখার উত্তরবর্ত্তী অংশ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তদবধি ঐ অংশই উড়িষ্যা নামে উল্লিখিত হইত।

মীর কাসিম, পাটনার গবর্ণর রামনারায়ণ ব্যতিরিক্ত, সমুদয় জমীদারদিগের সম্পূর্ণ রূপে আপন বশে আনিয়াছিলেন। রামনারায়ণের ধনবান বলিয়া খ্যাতি ছিল; কিন্তু তিনি ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়চ্ছায়াতে সন্নিবিষ্ট ছিলেন। এজন্য, সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করা অবিধেয় বিবেচনা করিয়া, নবাব কৌশলক্রমে তাঁহার সর্বনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ তিন বৎসর হিসাব পরিষ্কার করেন নাই। নবাব ইঙ্গরেজদিগকে লিখিলেন, রামনারায়ণের নিকট বাকীর আদায় না হইলে আমি আপনাদের প্রাপ্যের

পরিশোধ করিতে পারিব না; আর, যাবৎ আপনাদের সৈন্য পাটনাতে থাকিবেক, তাবৎ ঐ বাকীর আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই।

তৎকালে, কলিকাতার কৌন্সিলে দুই পক্ষ ছিল; এক পক্ষ মীর কাসিমের অনুকূল, অন্য পক্ষ তাঁহার প্রতিকূল; গবর্ণর বান্সিটার্ট সাহেব অনুকূল পক্ষে ছিলেন। মীর কাসিমের প্রস্তাব লইয়া উভয় পক্ষের বিস্তর বাদানুবাদ হইল। পরিশেষে বান্সিটার্টের পক্ষই প্রবল হইল। এই পক্ষের মত অনুসারে, ইঙ্গরেজেরা পাটনা হইতে আপনাদের সৈন্য উঠাইয়া আনিলেন; সুতরাং রামনারায়ণ নিতান্ত অসহায় হইলেন; এবং নবাবও তাঁহাকে রুদ্ধ ও কারাবদ্ধ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। গুপ্ত ধনাগার দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত, তাহার কর্মচারীদিগকে অনেক যন্ত্রণা দেওয়া হইল; কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহা আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক টাকা পাওয়া গেল না।

মীর কাসিম এ পর্যন্ত নির্বিবাদে রাজ্যশাসন করিলেন। পরে তিনি কোম্পানির কর্ম্মকারকদিগের আত্মম্ভরিতা দোষে, যে রূপে রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষের যে সকল পণ্য দ্রব্য এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে নীত হইত, তাহার শুল্ক হইতেই রাজস্বের অধিকাংশ উৎপন্ন হইত। এই রূপে রাজস্ব গ্রহণ করা এক প্রকার অসভ্যতার প্রথা বলিতে হইবেক; কারণ ইহাতে বাণিজ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু এই কালে ইহা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল; এবং ইঙ্গরেজেরাও ১৮৩৫ খৃ: অব্দের পূর্বে ইহা রহিত করেন নাই। যখন কোম্পানি বাহাদুর সালিয়ানা তিন হাজার টাকার পেস্কস দিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন তদবধি তদীয় পণ্য দ্রব্যের মাশুল লাগিত না। কলিকাতার গবর্ণর এক দস্তকে স্বাক্ষর করিতেন, মাশুলঘাটায় তাহা দেখাইলেই কোম্পানির বস্তু সকল বিনা মাশুলে চলিয়া যাইত।

এই অধিকার কেবল কোম্পানির নিজের বাণিজ্য বিষয়ে ছিল। কিন্তু যখন ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন তখন কোম্পানির যাবতীয় কর্ম্মকারকেরা বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। যত দিন ক্লাইব এ দেশে ছিলেন তাঁহারা সকলেই দেশীয় বণিকদের ন্যায় রীতিমত শুল্কপ্রদান করিতেন। পরে যখন তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন এবং কৌন্সিলের সাহেবেরা অন্য এক নবাবকে সিংহাসনে বসাইলেন তখন তাঁহারা আরও প্রবল হইয়া বিনা শুল্কেই বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহারা এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনও প্রকার বাধা দিতে নবাবের কর্ম্মকারকদিগের সাহস হইত না।

ইঙ্গরেজদের গোমস্তারা, শুল্কবঞ্চন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা অনুসারে ইঙ্গরেজী নিশান তুলিত এবং দেশীয় বণিক ও রাজকীয় কর্ম্মকারকদিগকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিত। ব্যক্তি-মাত্রেই যে কোনও ইঙ্গরেজের স্বাক্ষরিত দস্তক হস্তে করিয়া, আপনাকে কোম্পানি বাহাদুরের তুল্য বোধ করিত। নবাবের লোকেরা কোনও বিষয়ে আপত্তি করিলে, যুরোপীয় মহাশয়েরা সিপাই পাঠাইয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতেন ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শুল্ক না দিয়া কোনও স্থানে কিছু দ্রব্য লইয়া যাইবার ইচ্ছা হইলে নাবিকেরা নৌকার উপর কোম্পানির নিশান তুলিয়া দিত।

ফলতঃ এই রূপে, নবাবের পরাক্রম এককালে লোপ পাইল। দেশীয় বণিকদিগের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। ইঙ্গরেজ মহাত্মারা বিলক্ষণ ধনশালী হইয়া উঠিলেন। নবাবের রাজস্ব অত্যন্ত ন্যূন হইল; কারণ ইঙ্গরেজরাই কেবল মাশুল দিতেন না, এমন নহে; যাহারা তাঁহাদের চাকর বলিয়া পরিচয় দিত তাহারাও তাঁহাদের নাম করিয়া মাশুল ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল। মীর কাসিম, এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া কলিকাতার কৌন্সিলে অনেকবার অভিযোগ করিলেন। পরিশেষে তিনি এই বলিয়া ভয় দেখাইলেন আপনারা ইহার নিবারণ না করিলে, আমি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিব।

বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব এই সকল অন্যায়ের নিবারণ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কৌন্সিলের অন্যান্য মেম্বরেরা ঐ সকল অবৈধ উপায় দ্বারা উপার্জন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সে সকল চেষ্টা বিফল হইল। পরিশেষে ঐ সকল অবৈধ ব্যবহারের এত বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল যে কোম্পানির গোমস্তাদিগের নির্দ্ধারিত মূল্যেই দেশীয় বণিকদিগকে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত। অতঃপর, মীর কাসীম ইঙ্গরেজদিগকে শত্রুমধ্যে পরিগণিত করিলেন এবং ত্বরায় উভয় পক্ষের পরস্পর যুদ্ধ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।

ইহার নিবারণার্থে বান্সিটার্ট সাহেব স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, নবাবও সৌহৃদ্য ভাবে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে বিষয়কর্মের কথা উত্থাপিত হইলে মীর কাসিম কোম্পানির কর্মকারকদিগের অত্যাচার বিষয়ে যৎপরোনাস্তি অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক অনেক অনুযোগ করিলেন। বান্সিটার্ট সাহেব, তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া প্রস্তাব করিলেন কি দেশীয় লোক কি ইঙ্গরেজ, সকলকেই বস্তুমাত্রের একবিধ মাশুল দিতে হইবেক; কিন্তু আমার স্বয়ং এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব, কলিকাতায় গিয়া, কৌন্সিলের সাহেবদিগকে এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিতে পরামর্শ দিব। নবাব, অত্যন্ত অনিচ্ছা পূর্বক, এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু কহিলেন যদি ইহাতেও এই অনিয়মের নিবারণ না হয়, আমি

মাশুলের প্রথা এক বারে রহিত করিয়া, কি দেশীয়, কি য়ুরোপীয়, উভয়বিধ বণিক্‌দিগকে সমান করিব।

বান্সিটার্ট সাহেব, কৌন্সিলে এই বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত, সত্বর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু মীর কাসিম, কৌন্সিলের মতামত পরিজ্ঞান পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, শুল্কসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকদিগের নিকট এই আজ্ঞা পাঠাইলেন, তোমরা, ইঙ্গরেজদের নিকট হইতেও, শতকরা নয় টাকার হিসাবে মাশুল আদায় করিবে। ইঙ্গরেজেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইলেন এবং নবাবের কর্ম্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। মফঃসলের কুঠীর অধ্যক্ষ সাহেবেরা, কর্ম্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া, সত্বর কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। শতকরা নয় টাকা শুল্কের বিষয়ে বান্সিটার্ট সাহেব যে প্রস্তাব করিলেন, হেষ্টিংস ভিন্ন অন্য সকলেই, অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাঁহারা সকলেই কহিলেন, কেবল লবণের উপর আমরা শতকরা আড়াই টাকা মাত্র শুল্ক দিব।

মীর কাসিম তৎকালে বাঙ্গালায় ছিলেন না, যুদ্ধযাত্রায় নেপাল গমন করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্রবণ করিলেন, কৌন্সিলের সাহেবেরা মাশুল দিতে অসম্মত হইয়াছেন, এবং তাঁহার কর্ম্মকারকদিগকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন তিনি, কিঞ্চিন্মাত্র বিলম্ব না করিয়া, পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞার অনুযায়ী কার্য্য করিলেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা ও বিহারের মধ্যে, পণ্য দ্রব্যের শুল্ক এক বারে উঠাইয়া দিলেন।

কৌন্সিলের মেম্বরেরা শুনিয়া ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, নবাবকে আপন প্রজাদিগের নিকট পূর্ব্বমত শুল্ক লইতে হইবেক এবং ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিতে হইবেক। এ বিষয়ে ঘোরতর বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। হেষ্টিংস সাহেব কহিলেন, মীর কাসিম অধীশ্বর রাজা, নিজ প্রজাগণের হিতানুষ্ঠান কেন না করিবেন। ঢাকার কুঠীর অধ্যক্ষ বাট্‌সন সাহেব কহিলেন, এ কথা নবাবের গোমস্তারা বলিলে সাজে, কৌন্সিলের মেম্বরের উপযুক্ত নহে। হেষ্টিংস কহিলেন, পাজী না হইলে, এরূপ কথা মুখে আনে না।

এইরূপ রোষবশ হইয়া, কৌন্সিলের মেম্বরেরা এবংবিধ গুরুতর বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে এই নির্দ্ধারিত হইল, দেশীয় লোকের বাণিজ্যেই পূর্ব্ব নিরূপিত শুল্ক থাকে, এই বিষয়ে উপরোধ করিবার নিমিত্ত, আমিয়ট ও সাহেব মীর কাসিমের নিকট গমন করুন। তাঁহারা, তথায় পঁহুছিয়া, নবাবের সহিত কয়েক বার সাক্ষাৎ করিলেন। প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, সকল বিষয়েরই নির্ব্বিবাদে নিষ্পত্তি হইতে পারিবেক। কিন্তু, পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের উদ্ধত আচরণ দ্বারা, মীমাংসায়

আশা এক বারে উচ্ছিন্ন হইল। কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারকের মধ্যে, এলিস অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিলেন। নবাব আমিয়ট সাহেবকে বিদায় দিলেন; কিন্তু তাঁহার যে সকল কর্ম্মকারক কলিকাতায় কয়েদ ছিল, হে সাহেবকে তাহাদের প্রতিভূ স্বরূপ আটক করিয়া রাখিলেন। আমিয়ট সাহেব নবাবের হস্তবহির্ভূত হইয়াছেন বোধ করিয়া, এলিস সাহেব অকস্মাৎ পাটনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য সকল সুরাপানে মত্ত ও অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হওয়াতে, এক দল বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া পুনর্বার নগর অধিকার করিল; এলিস ও অন্যান্য য়ুরোপীয়েরা রুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

মীর কাসিম, পাটনার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, বোধ করিলেন, এক্ষণে নিঃসন্দেহ ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘটিবেক। অতএব, তিনি সমস্ত মফঃসল কুঠীর কর্ম্মকারক সাহেবদিগকে রুদ্ধ করিতে ও আমিয়ট সাহেবের কলিকাতা যাওয়া স্থগিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। আমিয়ট সাহেব মুরশিদাবাদে পঁহুছিয়াছেন, এমন সময়ে নগরাধ্যক্ষের নিকট ঐ আদেশ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি ঐ সাহেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সাহেব উক্ত আদেশ অমান্য করাতে, দাঙ্গা উপস্থিত হইল; ঐ দাঙ্গাতে তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। মীর কাসিম, শেঠবংশীয় প্রধান বণিকদিগকে ইঙ্গরেজের অনুগত বলিয়া সন্দেহ করিতেন; এজন্য তাহাদিগকে মুরশিদাবাদ হইতে আনাইয়া মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

আমিয়ট সাহেবের মৃত্যু এবং এলিস সাহেব ও তদীয় সহচরবর্গের কারাবরোধের সংবাদ কলিকাতায় পঁহুছিলে, কৌন্সিলের সাহেবেরা অবিলম্বে যুদ্ধারম্ভ করা নির্দ্ধারিত করিলেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেব, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন যে, মীর কাসিম পাটনায় যে কয়েক জন সাহেবকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের যাবৎ উদ্ধার না হয়, অন্ততঃ, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, ক্ষান্ত থাকা উচিত; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইল। অধিকাংশ মেম্বরের সম্মতি ক্রমে, ইঙ্গরেজদিগের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। সেই সময়ে, মীর জাফর স্বীকার করিলেন, যদি ইঙ্গরেজেরা পুনর্বার আমাকে নবাব করেন, আমি কেবল দেশীয় লোকদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পূর্ব্ব শুল্ক প্রচলিত রাখিব, ইঙ্গরেজদিগকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে দিব। অতএব, কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেই পুনর্বার সিংহাসনে নিবিষ্ট করা মনস্থ করিলেন। বায়াত্তুরিয়া বৃদ্ধ মীর জাফর তৎকালে কুষ্ঠরোগে প্রায় চলৎশক্তিরহিত হইয়াছিলেন, তথাপি, মুরশিদাবাদগামী ইংলণ্ডীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, পুনর্বার নবাব হইতে চলিলেন।

মীর কাসিম, স্বীয় সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত, অশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বাঙ্গালা দেশে, কখনও কোনও রাজার তদ্রূপ উৎকৃষ্ট সৈন্য ছিল

না; তাঁহার সেনাপতি গর্গিন খাঁও যুদ্ধবিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তথাপি উপস্থিত যুদ্ধ অল্প দিনেই শেষ হইল। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯এ জুলাই, কাটোয়াতে নবাবের সৈন্য সকল পরাজিত হইল। মতিঝিলে নবাবের যে সৈন্য ছিল, ইঙ্গরেজেরা, ২৪এ, তাহা পরাজিত করিয়া, মুরশিদাবাদ অধিকার করিলেন। সূতির সন্নিহিত ঘোরিয়া নামক স্থানে, ২রা আগষ্ট, আর এক যুদ্ধ হয়; তাহাতেও মীর কাসিমের সৈন্য পরাজিত হইল। রাজমহলের নিকট, উদয়নালাতে, তাঁহার এক দৃঢ় গড়খাই করা ছিল; নবাবের সৈন্য সকল পলাইয়া তথায় আশ্রয় লইল।

এই সকল যুদ্ধকালে মীর কাসিম মুঙ্গেরে ছিলেন; এক্ষণে উদয়নালার সৈন্য মধ্যে উপস্থিত থাকিতে মনস্থ করিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় যে সমস্ত প্রধান প্রধান লোকদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থানের পূর্ব্বে, তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করিলেন। তিনি পাটনার পূর্ব্ব গবর্ণর রাজা রামনারায়ণকে, গলদেশে বালুকাপূর্ণ গোণী বদ্ধ করিয়া, নদীতে নিক্ষিপ্ত করাইলেন; কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সমুদয় পুত্র সহিত রাজা রাজবল্লভ, রায়রাইয়াঁ রাজা উমেদ সিংহ, রাজা বনিয়াদ সিংহ, রাজা ফতে সিংহ, ইত্যাদি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিলেন, এবং শেঠবংশীয় দুই জন ধনবান বণিককে, মুঙ্গেরের গড়ের বুরুজ হইতে, গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করাইলেন। বহু কাল পর্য্যন্ত, নাবিকেরা, ঐ স্থান দিয়া যাতায়াত কালে, উক্ত হতভাগ্যদ্বয়ের বধস্থান দেখাইয়া দিত।

মীর কাসিম, এই হত্যাকাণ্ডের সমাপন করিয়া, উদয়নালাস্থিত সৈন্য সহিত মিলিত হইলেন। অক্টোবরের আরম্ভে, ইঙ্গরেজেরা, নবাবের শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। পরাজয়ের দুই এক দিবস পরে, তিনি মুঙ্গেরে প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের যে সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তাহার নিবারণ করা অসাধ্য বোধ করিয়া, সৈন্য সহিত পাটনা প্রস্থান করিলেন। যে কয়েক জন ইঙ্গরেজ তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, তিনি তাঁহাদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া গেলেন।

মুঙ্গের পরিত্যাগের পর দিন, তাঁহার সৈন্য রেবাতীরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে, তাঁহার শিবির মধ্যে, হঠাৎ অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হইল। সকল লোকই নদী পার হইয়া পলাইতে উদ্যত। দৃষ্ট হইল, কয়েক ব্যক্তি, এক শব লইয়া, গোর দিতে যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, ইহা সৈন্যাধ্যক্ষ গর্গিন খাঁর কলেবর। বিকালে, তিন চারি জন মোগল, তদীয় পটমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার প্রাণবধ করে। তৎকালে, উল্লিখিত ঘটনার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহারা সেনাপতির নিকট বেতন প্রার্থনা করিতে যায়; তিনি তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দেওয়াতে, তাহারা তরবারির প্রহারে

তাঁহার প্রাণবধ করে। কিন্তু, সে সময়ে তাহাদের কিছুই পাওনা ছিল না। নয় দিবস পূর্ব্বে তাহারা বেতন পাইয়াছিল।

বস্তুতঃ ইহা এক অলীক কল্পনা মাত্র। এই অশুভ ঘটনার প্রকৃত কারণ এই যে, মীর কাসিম, স্বীয় সেনাপতি গর্গিন খাঁর প্রাণবধ করিবার নিমিত্ত, ছল পূর্ব্বক তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। গর্গিনের খোজা পিক্রস নামে এক ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন। বান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস সাহেবের সহিত তাঁহার অতিশয় প্রণয় ছিল। পিক্রস, এই অনুরোধ করিয়া, গোপনে গর্গিনকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তুমি নবাবের কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও; আর, যদি সুযোগ পাও, তাঁহাকে অবরুদ্ধ কর। নবাবের প্রধান চর, এই বিষয়ের সন্ধান পাইয়া, রাত্রি দুই প্রহর একটার সময়ে, আপন প্রভুকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে আপনকার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক। তৎপরে, এক দিবস অতীত না হইতেই, আরমানি সেনাপতি গর্গিন খাঁ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। নবাবের সৈন্য সকল, প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষিত হইয়াও, প্রতিযুদ্ধেই যে, ইঙ্গরেজদিগের নিকট পরাজিত হয়, গর্গিন খাঁর বিশ্বাসঘাতকতাই তাহার এক মাত্র কারণ।

তদনন্তর, মীর কাসিম সত্বর পাটনা প্রস্থান করিলেন। মুঙ্গের ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। তখন নবাব বিবেচনা করিলেন, পাটনাও পরিত্যাগ করিতে হইবেক; এবং পরিশেষে, দেশত্যাগীও হইতে হইবেক। ইঙ্গরেজদের উপর তাঁহার ক্রোধের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে, সমস্ত ইঙ্গরেজ বন্দীদিগের প্রাণদণ্ড নির্দ্ধারিত করিয়া আপন সেনাপতিদিগকে, বন্দীগৃহে গিয়া, তাহাদের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাঁহারা উত্তর করিলেন, আমরা ঘাতক নহি যে, বিনা যুদ্ধে প্রাণবধ করিব। তাহাদের হস্তে অস্ত্র প্রদান করুন, যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা এই রূপে অস্বীকার করাতে, নবাব শমরু নামক এক য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের প্রাণবধের আদেশ দিলেন।

শমরু, পূর্ব্বে, ফরাসিদিগের এক জন সার্জ্জন ছিল, পরে, মীর কাসিমের নিকট নিযুক্ত হয়। সে এই জুগুপ্সিত ব্যাপারের সমাধানের ভারগ্রহণ করিল; এবং কিয়ৎ-সংখ্যক সৈনিক সহিত, কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়া, গুলি করিয়া, ডাক্তার ফুলর্টন ব্যতিরিক্ত সকলেরই প্রাণবধ করিল। আটচল্লিশ জন ভদ্র ইঙ্গরেজ, ও এক শত পঞ্চাশ জন গোরা, এই রূপে, পাটনায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শমরু, তৎপরে, অনেক রাজার নিকট কর্ম্ম করে; পরিশেষে, সিরধানার আধিপত্য প্রাপ্ত হয়। এই হত্যায় যে সকল লোক হত হয়, তন্মধ্যে কৌন্সিলের মেম্বর এলিস, হে, লসিংটন, এই তিন জনও ছিলেন। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দের

৬ই নবেম্বর, পাটনা নগর ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল ; মীর কাসিম, পলাইয়া, অযোধ্যার সুবাদারের আশ্রয় লইলেন।

এই রূপে, প্রায় চারি মাসে, যুদ্ধের শেষ হইল। পর বৎসর, ২২এ অক্টোবর, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি, বক্সারে, অযোধ্যার সুবাদারের সৈন্য সকল পরাজিত করিলেন। জয়ের পর উজীরের সহিত যে বন্দোবস্ত হয়, বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই, এজন্য, এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিয়া, ইহা কহিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক যে, তিনি প্রথমতঃ মীর কাসিমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, পরে, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিয়া, তাড়াইয়া দেন।

মীর জাফর, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, দেখিলেন, ইঙ্গরেজদিগকে যত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহার পরিশোধ করা অসাধ্য। তৎকালে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার রোগ ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, চতুঃসপ্ততি বৎসর বয়সে, মুরশিদাবাদে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করা দিল্লীর সম্রাটের অধিকার। কিন্তু, তৎকালে, সম্রাটের কোনও ক্ষমতা ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের যাহা ইচ্ছা হইল, তাহাই তাঁহারা করিলেন। মণিবেগমের গর্ভজাত নজম উদ্দৌলা নামে মীর জাফরের এক পুত্র ছিল, কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা, অনেক টাকা পাইয়া, তাঁহাকেই নবাব করিলেন। তাঁহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত হইল। ইঙ্গরেজেরা দেশরক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইলেন, এবং নবাবকে, রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত, একজন নায়েব নাজিম নিযুক্ত করিতে কহিলেন।

নবাব অনুরোধ করিলেন, নন্দকুমারকে ঐ পদে নিযুক্ত করা যায়। কিন্তু কৌন্সিলের সাহেবেরা তাহা স্পষ্ট রূপে অস্বীকার করিলেন। অধিকন্তু, বান্সিটার্ট সাহেব, ভাবী গবর্ণরদিগকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারের কুক্রিয়া সকল কৌন্সিলের বহিতে বিশেষ করিয়া লিখিয়া রাখিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁর কুটুম্ব মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারীদিগের কুব্যবহারে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটে, এবং মীর কাসিম ও উজীরের সহিত যে যুদ্ধ ও পাটনায় যে হত্যা হয়, এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া ডিরেক্টরেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা এই ভয় করিতে লাগিলেন, পাছে এই

নবোপার্জ্জিত রাজ্য হস্তবহির্ভূত হয়; এবং ইহাও বিবেচনা করিলেন, যে ব্যক্তির বুদ্ধিকৌশলে ও পরাক্রমপ্রভাবে রাজ্যাধিকার লব্ধ হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি এক্ষণে তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। অতএব, তাঁহারা ক্লাইবকে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে অনুরোধ করিলেন।

তিনি ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা তাঁহার সমুচিত পুরস্কার করেন নাই, বরং তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তথাপি তিনি, তাঁহাদের অনুরোধে পুনরায় ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে, কার্য্যনির্বাহ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, বাঙ্গালার গবর্ণর ও প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন; কহিয়া দিলেন, ভারতবর্ষীয় কর্মচারীদিগের নিজ নিজ বাণিজ্য দ্বারাই এত অনর্থ ঘটিতেছে; অতএব তাহা অবশ্য রহিত করিতে হইবেক। আট বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা উপর্য্যুপরি কয়েক নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়া, দুই কোটির অধিক টাকা উপঢৌকন লইয়াছিলেন। অতএব, তাঁহারা স্থির করিয়া দিলেন, সেরূপ উপঢৌকন রহিত করিতে হইবেক। তাঁহারা আরও আজ্ঞা করিলেন, কি রাজ্যশাসন সংক্রান্ত, কি সেনা সংক্রান্ত, সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে এক এক নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর ও এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক, চারি হাজার টাকার অধিক উপঢৌকন পাইলে, সরকারী ভাণ্ডারে জমা করিয়া দিবেন, এবং গবর্ণরের অনুমতি ব্যতিরেকে, হাজার টাকার অধিক উপহার লইতে পারিবেন না।

এই সকল উপদেশ দিয়া, ডিরেক্টরেরা ক্লাইবকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। তিনি, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের ৩রা মে, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, ডিরেক্টরেরা, যে সকল আপদের আশঙ্কা করিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, সে সমস্ত অতিক্রান্ত হইয়াছে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কৌন্সিলের মেম্বরেরাও কোম্পানির মঙ্গলচেষ্টা করেন না। সমুদয় কর্ম্মচারীর অভিপ্রায় এই, যে কোনও উপায়ে অর্থোপার্জন করিয়া, ত্বরায় ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবেন। সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপ অবিচার। আর, এতদ্দেশীয় লোকদিগের উপর এত অত্যাচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল যে, ইঙ্গরেজ এই শব্দ শুনিলে, তাঁহাদের মনে ঘৃণার উদয় হইত। ফলতঃ, তৎকালে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ভদ্রতার লেশ মাত্র ছিল না।

পূর্ব্ব বৎসর ডিরেক্টরেরা দৃঢ়রূপে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা আর কোনও রূপে উপঢৌকন লইতে পারিবেন না; এই আজ্ঞা উপস্থিত হইবার সময়, বৃদ্ধ নবাব মীর জাফর মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা উক্ত আজ্ঞা কৌন্সিলের পুস্তকে নিবিষ্ট করেন নাই; বরং মীর জাফরের মৃত্যুর পর, এক ব্যক্তিকে নবাব করিয়া

তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপহার গ্রহণ করেন; সেই পত্রে ডিরেক্টরেরা ইহাও আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে নিজ নিজ বাণিজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবেক। কিন্তু, এই স্পষ্ট আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, কৌন্সিলের সাহেবেরা নূতন নবাবের সহিত বন্দোবস্ত করেন, ইঙ্গরেজেরা, পূর্ব্ববৎ বিনা শুল্কে, বাণিজ্য করিতে পাইবেন।

ক্লাইব, উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই, ডিরেক্টরদিগের আজ্ঞা সকল প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা বান্সিটার্ট সাহেবের সহিত যেরূপ বিবাদ করিতেন, তাঁহারও সহিত সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব অন্যবিধ পদার্থে নির্ম্মিত। তিনি জিদ করিতে লাগিলেন, সকল ব্যক্তিকেই, আর উপঢৌকন লইব না বলিয়া, নিয়মপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে হইবেক। যাঁহারা অস্বীকার করিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলেন। তদ্দর্শনে কেহ কেহ নাম স্বাক্ষর করিলেন। আর, যাঁহারা, অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা গৃহপ্রস্থান করিলেন। কিন্তু সকলেই, নির্বিশেষে, তাঁহার বিষম শত্রু হইয়া উঠিলেন।

সমুদয় রাজস্ব যুদ্ধব্যয়েই পর্য্যবসিত হইতেছে, অতএব সন্ধি করা অতি আবশ্যক, এই বিবেচনা করিয়া, ক্লাইব, জুন মাসের চতুর্বিংশ দিবসে, পশ্চিম অঞ্চল যাত্রা করিলেন। নজম উদ্দৌলার সহিত এইরূপ সন্ধি হইল যে, ইঙ্গরেজেরা রাজ্যের সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন; তিনি, আপন ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত, প্রতিবৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাইবেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্ল্লভরাম, ও জগৎ শেঠ, এই তিন জনের মত অনুসারে, ঐ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবেক। কিছু দিন পরে, অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি হইল।

এই যাত্রায় যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে, কোম্পানির নামে তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইঙ্গরেজেরা যখন প্রার্থনা করিবেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে তিন প্রদেশের দেওয়ানী দিবেন। ক্লাইব, এলাহবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঐ প্রতিজ্ঞার পরিপূরণের প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। ১২ই আগষ্ট, সম্রাট কোম্পানি বাহাদুরকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করিলেন; আর ক্লাইব স্বীকার করিলেন, উৎপন্ন রাজস্ব হইতে সম্রাটকে প্রতিমাসে দুই লক্ষ টাকা দিবেন।

তৎকালে, সম্রাট আপন রাজ্যে পলায়িত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় পরিচ্ছদ আদি ছিল না। ইঙ্গরেজদিগের খানা খাইবার দুই মেজ একত্রিত ও কার্পাস বস্ত্রে মণ্ডিত করিয়া, সিংহাসন প্রস্তুত করা হইল। সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট, তদুপরি

উপবিষ্ট হইয়া, বার্ষিক দুই কোটি টাকার রাজস্ব সহিত, তিন কোটি প্রজা ইঙ্গরেজদিগের হস্তে সমর্পিত করিলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে এই ইঙ্গিত করিয়াছেন, পূর্ব্বে, এরূপ গুরুতর ব্যাপারের নির্বাহ কালে, কত অভিজ্ঞ মন্ত্রীর ও কার্য্যদক্ষ দূতের প্রেরণ, এবং কত বাদানুবাদের আবশ্যকতা হইত, কিন্তু, এক্ষণে ইহা এত স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে, একটা গর্দ্দভের বিক্রয়ও ঐ সময় মধ্যে সম্পন্ন হইয়া উঠে না।

পলাশির যুদ্ধের পর, ইঙ্গরেজদিগের পক্ষে যে সকল হিতকর ব্যাপার ঘটে, এই বিষয় সে সকল অপেক্ষা গুরুতর। ইঙ্গরেজেরা, ঐ যুদ্ধ দ্বারা, বাস্তবিক এ দেশের প্রভু হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা, এ পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগকে সেরূপ মনে করিতেন না, এক্ষণে, সম্রাটের এই দান দ্বারা, তিন প্রদেশের যথার্থ অধিকারী বোধ করিলেন। তদবধি, মুরশিদাবাদের নবাব সাক্ষিগোপাল হইলেন। ক্লাইব, এই সকল ব্যাপারের সমাধান করিয়া, ৭ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যে নিজ নিজ বাণিজ্য করিতেন তদুপলক্ষেই অশেষবিধ অত্যাচার ঘটিত। এজন্য, ডিরেক্টরেরা বারংবার এই আদেশ করেন যে, উহা এক বারে রহিত হয়। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা, ঐ সকল আদেশ এ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের অন্তিম আদেশ কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট ছিল, এবং ক্লাইবও বিবেচনা করিলেন যে সিবিল কর্ম্মচারীদিগের বেতন অত্যন্ত অল্প, সুতরাং, তাহারা অবশ্য, গর্হিত উপায় দ্বারা, পোষাইয়া লইবেক। এজন্য, তিনি তাহাদের বাণিজ্য, এক বারে রহিত না করিয়া, ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার মনন করিলেন।

এই স্থির করিয়া, ক্লাইব, লবণ, গুবাক তবাক, এই তিন বস্তুর বাণিজ্য ভদ্র রীতি ক্রমে চালাইবার নিমিত্ত, এক সভা স্থাপিত করিলেন। নিয়ম হইল, কোম্পানির ধনাগারে, শতকরা ৩৫ টাকার হিসাবে, মাশুল জমা করা যাইবেক, এবং ইহা হইতে যে উপস্বত্ব হইবেক, রাজ্যশাসন সংক্রান্ত ও সেনাসম্পর্কীয় সমুদয় কর্মচারীরা ঐ উপস্বত্বের যথাযোগ্য অংশ পাইবেন। কৌন্সিলের মেম্বরেরা অধিক অংশ পাইবেন, তাঁহাদের নীচের কর্মচারীরা অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমানে প্রাপ্ত হইবেন।

ডিরেক্টরদিগের নিকট এই বাণিজ্যপ্রণালীর সংবাদ পাঠাইবার সময়, ক্লাইব তাঁহাদিগকে, গবর্ণরের বেতন বাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত, অনুরোধ করিয়াছিলেন; কারণ তাহা হইলে, তাঁহার এই বাণিজ্য বিষয়ে কোনও সংস্রব রাখিবার আবশ্যকতা থাকিবেক না। কিন্তু, তাঁহারা, তৎপরে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত, এই সৎ পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা উক্ত নূতন সভার স্থাপনের সংবাদ শ্রবণ মাত্র, অতি রূঢ় বাক্যে তাহা অস্বীকার

করিলেন; ক্লাইব এই সভার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যথোচিত তিরস্কার লিখিলেন, এবং এই আদেশ পাঠাইলেন উক্ত সভা রহিত করিতে হইবেক, এবং কোনও সরকারী কর্ম্মচারী বাঙ্গালার বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতে পারিবেন না।

এ কাল পর্য্যন্ত, সমুদয় রাজস্ব কেবল কাজকার্য্যনির্ব্বাহের ব্যয়ে পর্য্যবসিত হইতেছিল। কোম্পানির শুনিতে অনেক আয় ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই ঋণগ্রস্ত ছিলেন কি য়ুরোপীয়, কি এতদ্দেশীয়, সমুদয় কর্মচারীরা কেবল লুঠ করিত, কিছুই দয়া ভাবিত না। ইংলণ্ডে ক্লাইবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কোম্পানির এরূপ আয় থাকিতেও, চির কাল এত অপ্রতুল কেন। তাহাতে তিনি এই উত্তর দেন. কোনও ব্যক্তিকে, কোম্পানি বাহাদুরের নামে, এক বার বিল করিতে দিলেই, সে বিষয় করিয়া লয়।

কিন্তু ব্যয়েব প্রধান কারণ সৈন্য। সৈন্য সকল যাবৎ নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিত, তিনি তত দিন তাহাদিগকে ভাতা দিতেন। এই ভাতাকে ডবলবাটা কহা যাইত। এই পারিতোষিক তাহারা এত অধিক দিন পাইয়া আসিয়াছিল যে, পরিশেষে তাহা আপনাদের ন্যায্য প্রাপ্য বোধ করিত। ক্লাইব দেখিলেন সৈন্যসংক্রান্ত ব্যয়ের লাঘব করিতে না পারিলে, কখনই রাজস্ব বাঁচিতে পারে না। তিনি ইহাও জানিতেন যে, ব্যয়লাঘবের যে কোনও প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহাতেই আপত্তি উত্থাপিত হইবেক। কিন্তু তিনি অতিশয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, অতএব, এক বারেই এই আজ্ঞা প্রচারিত করিলেন, অদ্যাবধি ডবলবাটা রহিত হইল।

এই ব্যাপার শ্রবণগোচর করিয়া, সেনাসম্পর্কীয় কর্মচারীরা যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, আমাদের অস্ত্রবলে দেশজয় হইয়াছে; অতএব ঐ জয় দ্বারা আমাদের উপকার হওয়া সর্ব্বাগ্রে উচিত। কিন্তু ক্লাইবের মন বিচলিত হইবার নহে। তিনি তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু ইহাও স্থির করিয়াছিলেন, সৈন্যের ব্যয়লাঘব করা নিতান্ত আবশ্যক। সেনাপতিরা, ক্লাইবকে আপনাদের অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্ম করাইবার নিমিত্ত, চক্রান্ত করিলেন। তাঁহারা, পরস্পর গোপনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, সকলেই এক দিনে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

তদনুসারে, প্রথম ব্রিগেডের সেনাপতিরা সর্ব্বাগ্রে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ক্লাইব এই সংবাদ পাইয়া, অতিশয় ব্যাকুল হইলেন; এবং সন্দেহ করিতে লাগিলেন, হয় ত সমুদয় সৈন্য মধ্যে এইরূপ চক্রান্ত হইয়াছে। তিনি অনেক বার অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু এমন দায়ে কখনও ঠেকেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; এ দিকে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা অধ্যক্ষহীনা হইল।

কিন্তু ক্লাইব, এরূপ সঙ্কটেও চলচিত্ত না হইয়া, আপন স্বভাবসিদ্ধ সাহস সহকারে, কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি মান্দ্রাজ হইতে সেনাপতি আনিবার আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। বাঙ্গালার যে যে সেনাপতি স্পষ্ট বিদ্রোহী হয়েন নাই, তাহারা ক্ষান্ত হইলেন। ক্লাইব, প্রধান প্রধান বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিয়া, ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। এবংবিধ কাঠিন্যপ্রয়োগ দ্বারা, তিনি সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার বশীভূত করিয়া আনিলেন, এবং গবর্ণমেণ্টকেও এই অভূতপূর্ব ঘোরতর আপদ হইতে মুক্ত করিলেন।

ক্লাইব, ভারতবর্ষে আসিয়া, বিংশতি মাসে, কোম্পানির কার্য্যের সুশৃঙ্খলার স্থাপন ও ব্যয়ের লাঘব করিলেন, তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্তি দ্বারা রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, প্রায় দুই কোটি টাকা বার্ষিক আয় স্থিত করিলেন, এবং সৈন্য মধ্যে যে ঘোরতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহার শান্তি করিয়া, বিলক্ষণ সুরীতি স্থাপিত করিলেন। তিনি এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রম দ্বারা, শারীরিক এরূপ ক্লিষ্ট হইলেন যে, স্বদেশে প্রস্থান না করিলে আর চলে না। অতএব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, তিনি জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ইঙ্গরেজেরা তিন প্রদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্য বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন। য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা এ পর্য্যন্ত বাণিজ্য কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন; ভূমির করসংগ্রহ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুবাদারেরা, হিন্দুদিগকে সাতিশয় সহিষ্ণুস্বভাব ও হিসাবে বিলক্ষণ নিপুণ দেখিয়া, এই সকল বিষয়ের ভার তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন। ইঙ্গরেজেরা এ দেশের তাবৎ বিষয়েই অজ্ঞ ছিলেন; সুতরাং, তাঁহাদিগকেও সমস্ত ব্যাপারই, পূর্ব্ব রীতি অনুসারে, প্রচলিত রাখিতে হইল। রাজা সিতাব রায়, বিহারের দেওয়ানের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, পাটনায় অবস্থিতি করিলেন; মহম্মদ রেজা খাঁ, বাঙ্গালার দেওয়ান হইয়া, মুরশিদাবাদে রহিলেন। প্রায় সাত বৎসর, এই রূপে রাজ্যশাসন সম্পন্ন হয়। পরে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন।

এই কয় বৎসর, রাজ্যশাসনের কোনও প্রণালী বা শৃঙ্খলা ছিল না। জমীদার ও প্রজাবর্গ, কাহাকে প্রভু বলিয়া মান্য করিবেন, তাহার কিছুই জানিতেন না। সমস্ত রাজকার্য্যের নির্বাহের ভার নবাব ও তদীয় অমাত্যবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ইঙ্গরেজেরা, এ দেশের সর্বত্র, এমন প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা, যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিলেও রাজপুরুষেরা তাঁহাদের শাসন করিতে পারিতেন না। আর, পার্লিমেণ্টের বিধান অনুসারে কলিকাতার গবর্ণর সাহেবেরও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, মহারাষ্ট্রখাতের বহির্ভাগে কোনও ব্যক্তি কোনও অপরাধ করিলে, তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারেন। ফলতঃ, ইঙ্গরেজ-

দিগের দেওয়ানী প্রাপ্তির পর, সাত বৎসর, সমস্ত দেশে যার পর নাই বিশৃঙ্খলা ও অতি ভয়ানক অত্যাচার ঘটিয়াছিল।

এই রূপে, রাজশাসন বিষয়ে নিরতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটাতে, সমস্ত দেশে ডাকাইতীর ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সকল জিলাই ডাকাইতের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; তজ্জন্য, কোনও ধনবান ব্যক্তি নিরাপদে ছিলেন না। ফলতঃ, ডাকাইতীর এত বাড়াবাড়ি হইয়াছিল যে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, যখন কোম্পানি বাহাদুর আপন হস্তে রাজশাসনের ভার লইলেন, তখন তাঁহাদিগকে, ডাকাইতীর দমনের নিমিত্ত, অতি কঠিন আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাঁহারা এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, ডাকাইতকে, তাহার নিজ গ্রামে লইয়া গিয়া, ফাঁসী দেওয়া যাইবেক; তাহার পরিবার, চির কালের নিমিত্ত, রাজকীয় দাস হইবেক; এবং সেই গ্রামের সমুদয় লোককে দণ্ডভাজন হইতে হইবেক।

এই অরাজক সময়েই, অধিকাংশ ভূমি নিষ্কর হয়। সম্রাট বাঙ্গালার সমুদয় রাজস্ব ইঙ্গরেজদিগকে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাহা, কলিকাতায় আদায় না হইয়া, মুরশিদাবাদে আদায় হইত। মাল্গের কাছারীও সেইস্থানেই ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভরাম, রাজা কান্ত সিংহ, এই তিন ব্যক্তি বাঙ্গালার রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের নির্বাহ করিতেন। তাঁহারাই সমস্ত বন্দোবস্ত করিতেন, এবং রাজস্ব আদায় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন। তৎকালে, জমীদারেরা কেবল প্রধান করসংগ্রাহক ছিলেন। তাঁহারা, পূর্ব্বোক্ত তিন মহাপুরুষের ইচ্ছাকৃত অনবধানের গুণে, ইঙ্গরেজদিগের চক্ষু ফুটিবার পূর্ব্বে, প্রায় চল্লিশ লক্ষ বিঘা সরকারী ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর দান করিয়া, গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ত্রিশ চল্লিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি করেন।

লার্ড ক্লাইবের প্রস্থানের পর, বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার গবর্ণর হইলেন। পর বৎসর, ডিরেক্টরেরা, কর্ম্মচারীদিগের লবণ ও অন্যান্য বস্তু বিষয়ক বাণিজ্য রহিত করিবার নিমিত্ত, চূড়ান্ত হুকুম পাঠাইলেন। তাঁহারা এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় বাণিজ্য কেবল দেশীয় লোকেরা করিবেক; কোনও য়ুরোপীয় তাহাতে লিপ্ত থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু, য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন অতি অল্প ছিল; এজন্য, তাঁহারা এরূপও আদেশ করিয়াছিলেন, বেতন ব্যতিরিক্ত, সরকারী খাজনা হইতে, তাহাদিগকে শতকরা আড়াই টাকার হিসাব দেওয়া যাইবেক; সেই টাকা সমুদায় সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারীরা যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইবেন।

ক্লাইবের প্রস্থানের পর, কোম্পানির কার্য সকল পুনর্ব্বার বিশৃঙ্খল হইতে লাগিল। আয় অনেক ছিল বটে; কিন্তু ব্যয় তদপেক্ষা অধিক হইতে লাগিল। ধনাগারে দিন দিন বিষম অনটন হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতার গবর্ণর, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে,

হিসাব পরিষ্কার করিয়া দেখিলেন, অনেক দেনা হইয়াছে, এবং আরও দেনা না করিলে চলে না। তৎকালে টাকা সংগ্রহ করিবার এই রীতি ছিল, কোম্পানীর য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা যে অর্থসঞ্চয় করিতেন, গবর্ণর সাহেব, কলিকাতার ধনাগারে তাহা জমা লইয়া, লণ্ডন নগরে ডিরেক্টরদিগের উপর সেই টাকার বরাত পাঠাইতেন। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পণ্য প্রেরিত হইত, তৎসমুদয়ের বিক্রয় দ্বারা অর্থসংগ্রহ ব্যতিরেকে, ডিরেক্টরদিগের ঐ হুণ্ডীর টাকা দিবার কোনও উপায় ছিল না। কলিকাতার গবর্ণর যথেষ্ট ধার করিতে লাগিলেন, কিন্তু, পূর্ব্ব অপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে, পণ্য দ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন, সুতরাং, ঐ সকল হুণ্ডীর টাকা দেওয়া ডিরেক্টরদিগের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এজন্য, তাঁহারা কলিকাতার গবর্ণরকে এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন, আর এরূপ হুণ্ডী না পাঠাইয়া এক বৎসর, কলিকাতাতেই টাকা ধার করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

ইহাতে এই ফল হইল যে সরকারী কর্ম্মচারীরা, ফরাসি, ওলন্দাজ, ও দিনামারদিগের দ্বারা, আপন আপন উপার্জ্জিত অর্থ য়ুরোপে পাঠাইতে লাগিলেন; অর্থাৎ, চন্দন নগর, চুঁচুড়া, ও শ্রীরামপুরের ধনাগারে টাকা জমা করিয়া দিয়া, বিলাতের অন্যান্য কোম্পানির নামে হুণ্ডী লইতে আরম্ভ করিলেন। উক্ত সওদাগরেরা, ঐ সকল টাকায় পণ্য দ্রব্য কিনিয়া য়ুরোপে পাঠাইতেন; হুণ্ডীর মিয়াদ মধ্যেই, ঐ সমস্ত বস্তু তথায় পঁহুছিত ও বিক্রীত হইত। এই উপায় দ্বারা, ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদিগের টাকার অসঙ্গতি নিবন্ধন কোনও ক্লেশ ছিল না; কিন্তু ইঙ্গরেজ কোম্পানি যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পড়িলেন। ডিরেক্টরেরা নিষেধ করিলেও, কলিকাতার গবর্ণর, অগত্যা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ঋণ করিয়া, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, ইংলণ্ডে হুণ্ডী পাঠাইলেন; তাহাতে লণ্ডন নগরে কোম্পানির কার্য্য এক বারে উচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠিল।

নজম উদ্দৌলা, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, নবাব হইয়াছিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইলে, সৈফ উদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বসন্তরোগে তাঁহার প্রাণান্ত হইলে, তদীয় ভ্রাতা মোবারিক উদ্দৌলা তৎপদে অধিরোহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বাধিকারীরা, আপন আপন ব্যয়ের নিমিত্ত, যত টাকা পাইতেন, কলিকাতার কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকেও তাহাই দিতেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, প্রতিবৎসর তাঁহাকে তত না দিয়া, ১৬ লক্ষ টাকা দিবার আদেশ করেন।

১৭৭০ খৃঃ অব্দে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে, দেশ শূন্য হইয়া গিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনার সময়, দরিদ্র লোকেরা যে কি পর্য্যন্ত ক্লেশভোগ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এইমাত্র কহিলে এক প্রকার বোধগম্য হইতে পারিবেক যে ঐ দুর্ভিক্ষে দেশের প্রায় তৃতীয় অংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। ঐ বৎসরেই, ডিরেক্টরদিগের আদেশ অনুসারে,

মুরশিদাবাদে ও পাটনায়, কৌন্সিল অব রেবিনিউ অর্থাৎ রাজস্বসমাজ স্থাপিত হয়। তাঁহাদের এই কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা রাজস্ব বিষয়ক তত্ত্বানুসন্ধান ও দাখিলার পরীক্ষা করিবেন। কিন্তু, রাজস্বের কার্য্যনির্বাহ, তৎকাল পর্য্যন্ত দেশীও লোকদিগের হস্তে ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁ মুরশিদাবাদে, ও রাজা সিতাব রায় পাটনায়, থাকিয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্যনির্বাহ করিতেন। ভূমি সংক্রান্ত সমুদয় কাগজ পত্রে তাঁহাদর সহী ও মোহব চলিত।

বেরিলষ্ট সাহেব, ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরীপদ পরিত্যাগ করাতে, কার্টিয়ব সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হয়েন। কিন্তু কলিকাতার গবর্ণমেণ্টর অকর্মণ্যতা প্রযুক্ত, কোম্পানির কার্য্য অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া উঠে। ডিরেক্টরেরা কুরীতিসংশোধন ও ব্যয়লাঘব করিবার নিমিত্ত, কলিকাতার পূর্ব্ব গবর্ণর বান্সিটার্ট, স্ক্রাফটন, কর্ণেল ফোর্ড, এই তিন জনকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, তাঁহারা যে জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন, অন্তরীপ উত্তীর্ণ হইবার পর আর উহার কোনও উদ্দেশ্য পাওয়া যায় নাই। সকলে অনুমান করেন, ঐ জাহাজ সমুদয় লোক সহিত সমুদ্রে মগ্ন হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কার্টিয়র সাহেব, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, গবর্ণরী পরিত্যাগ করিলে, ওয়ারন হেষ্টিংস সাহেব তৎপদে অধিরূঢ় হইলেন। হেষ্টিংস, ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে, রাজশাসন সংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, আঠার বৎসর বয়ঃক্রমকালে, এ দেশে আইসেন; এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে, এতদ্দেশীয় ভাষা ও রাজনীতি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, ক্লাইব তাঁহাকে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তৎকালে, গবর্ণরের পদ ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা সম্মানের কর্ম্ম আর ছিল না। যখন বান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন কেবল হেষ্টিংস তাঁহার বিশ্বাসপাত্র ছিলেন। ১৭৬১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে, হেষ্টিংস কলিকাতা কৌন্সিলের মেম্বর হন। তৎকালে অন্য সকল মেম্বরই বান্সিটার্ট সাহেবের প্রতিপক্ষ ছিলেন; তিনিই একাকী তাঁহার মতের পোষকতা করিতেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে মান্দ্রাজ কৌন্সিলের দ্বিতীয় পদে অভিষিক্ত করেন, তিনি তথায় নানা সুনিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য ডিরেক্টরেরা তাঁহার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে, কলিকাতার গবর্ণরের পদ

শূন্য হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে, সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, ঐ পদে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে, তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল।

দেশীয় লোকেরা যে রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে ডিরেক্টরেরা অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, আয় ক্রমে অল্প হইতেছে। অতএব, দেওয়ানী প্রাপ্তির সাত বৎসর পরে তাঁহারা যথার্থ দেওয়ান হওয়া, অর্থাৎ রাজস্বের বন্দোবস্তের ভার আপনাদের হস্তে লইয়া য়ুরোপীয় কর্মচারী দ্বারা কার্য্যনির্বাহ করা, মনস্থ করিলেন। এই নূতন নিয়ম হেষ্টিংস সাহেবকে আসিয়াই প্রচলিত করিতে হইল। তিনি ১৩ই এপ্রিল, গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিলেন। ১৪ই মে, কৌন্সিলের সম্মতি ক্রমে, এই ঘোষণা প্রচারিত হইল যে, ইঙ্গরেজেরা স্বয়ং রাজস্বের কার্যনির্বাহ করিবেন; যে সকল য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্বের কর্ম করিবেন, তাঁহাদের নাম কালেক্টর হইবেক; কিছু কালের নিমিত্ত, সমুদয় জমী ইজারা দেওয়া যাইবেক; আর কৌন্সিলের চারি জন মেম্বর, প্রত্যেক প্রদেশে গিয়া, সমস্ত বন্দোবস্ত করিবেন। ইহারা প্রথমে কৃষ্ণনগরে গিয়া, কার্য্যারম্ভ করিলেন। পূর্ব্বাধিকারীরা, অত্যন্ত কম নিরিখে মালগুজারী দিতে চাহিবাতে, তাঁহারা সমুদয় জমী নীলাম করাইতে লাগিলেন। যে জমীদার অথবা তালুকদার ন্যায্য মালগুজারী দিতে সম্মত হইলেন, তিনি আপন বিষয় পূর্ব্ববৎ অধিকার করিতে লাগিলেন; আর যিনি অত্যন্ত কম দিতে চাহিলেন, তাঁহাকে পেন্‌শন দিয়া অধিকারচ্যুত করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে অন্য ব্যক্তিকে অধিকার দেওয়াইলেন। গবর্ণর স্বচক্ষে সমুদয় দেখিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, মালের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হইল।

এইরূপে রাজস্বকর্ম্মের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে, দেশের দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্মেরও নিয়মপরিবর্ত্ত আবশ্যক হইল। প্রত্যেক প্রদেশে, এক ফৌজদারী ও এক দেওয়ানী, দুই বিচালয় সংস্থাপিত হইল। ফৌজদারী আদালতে কালেক্টর সাহেব, কাজী, মুফতি, এই কয় জন একত্র হইয়া বিচার করিতেন। আর দেওয়ানী আদালতেও, কালেক্টর সাহেব মোকদ্দমা করিতেন, দেওয়ান ও অন্যান্য আমলারা তাঁহার সহকারিতা করিত। মোকদ্দমার আপীল শুনিবার নিমিত্ত, কলিকাতায় দুই বিচারালয় স্থাপিত হইল। তন্মধ্যে, যে স্থলে দেওয়ানী বিষয়ে বিচার হইত, তাহার নাম সদর দেওয়ানী আদালত, আর যে স্থানে ফৌজদারী বিষয়ের, তাহার নাম নিজামৎ আদালত, রহিল।

এ পর্য্যন্ত আদালতে যত টাকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইত, প্রাড়্‌বিবাক তাহার চতুর্থ অংশ পাইতেন, এক্ষণে তাহা রহিত হইল; অধিক জরিমানা রহিত হইয়া গেল; মহাজনদিগের, স্বেচ্ছাক্রমে খাতককে রুদ্ধ করিয়া, টাকা আদায় করিবার যে ক্ষমতা ছিল,

তাহাও নিবারিত হইল; আর দশ টাকার অনধিক দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারীর হস্তে অর্পিত হইল। ইঙ্গরেজেরা, আপনাদিগের প্রণালী অনুসারে, বাঙ্গালার শাসন করিবার নিমিত্ত, প্রথমে এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

ডিরেক্টরেরা স্থির করিয়াছিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁর অসৎ আচরণ দ্বারাই, বাঙ্গালার রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে। তাঁহার পদপ্রাপ্তির দিবস অবধি, তাঁহারা তাঁহার চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। তাঁহারা ইহাও বিস্মৃত হয়েন নাই যে, যখন তিনি, মীর জাফরের রাজত্বসময়ে, ঢাকার চাকলায় নিযুক্ত ছিলেন; তখন, তথায় তাঁহার অনেক লক্ষ টাকা তহবীল ঘাটি হইয়াছিল। কেহ কেহ তাঁহার নামে এ অভিযোগও করিয়াছিল যে, তিনি, ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দারুণ অকালের সময়, অধিকতর লাভের প্রত্যাশায়, সমুদায় শস্য একচাটিয়া করিয়াছিলেন। আর সকলে সন্দেহ করিত, তিনি অনেক রাজস্ব ছাপাইয়া রাখিয়াছিলেন, এবং প্রজাদিগেরও অধিক নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন।

যৎকালে তিনি মুরশিদাবাদে কর্ম্ম করিতেন, তখন বাঙ্গালায় তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন; নায়েব সুবাদার ছিলেন, সুতরাং, রাজস্বের সমুদয় বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হস্তে ছিল; আর নায়েব নাজিম ছিলেন, সুতরাং, পুলিশেরও সমুদয় ভার তাঁহারই হস্তে ছিল। ডিরেক্টরেরা বুঝিতে পারিলেন, যত দিন তাঁহার হস্তে এরূপ ক্ষমতা থাকিবেক, কোনও ব্যক্তি তাঁহার দোষপ্রকাশে অগ্রসর হইতে পারিবেক না। অতএব, তাঁহারা এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁকে কয়েদ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় আনিতে, এবং তাঁহার সমুদয় কাগজ পত্র আটক করিতে, হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব গবর্ণরের পদে অধিরূঢ় হইবার দশ দিবস পরেই, ডিরেক্টরদিগের এই আজ্ঞা তাঁহার নিকটে পঁহুছে। যৎকালে ঐ আজ্ঞা পঁহুছিল, তখন অধিক রাত্রি হইয়াছিল; এজন্য, সে দিবস তদনুযায়ী কার্য্য হইল না। পর দিন প্রাতঃকালে, তিনি, মহম্মদ রেজা খাঁকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট মিডিল্টন সাহেবকে পত্র লিখিলেন। তদনুসারে, রেজা খাঁ, সপরিবারে জলপথে, কলিকাতায় প্রেরিত হইলেন। মিডিল্টন সাহেব তাঁহার কার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। রেজা খাঁ চিতপুরে উপস্থিত হইলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, অকস্মাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ জানাইবার নিমিত্ত, এক জন কৌন্সিলের মেম্বর তাঁহার নিকটে প্রেরিত হইলেন। আর, হেষ্টিংস সাহেব এইরূপ পত্র লিখিলেন, আমি কোম্পানির ভৃত্য, আমাকে তাঁহাদের আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে হইয়াছে; নতুবা, আপনকার সহিত আমার যেরূপ সৌহৃদ্য আছে, তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবেক না জানিবেন।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়েরও চরিত্র বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছিল;

এজন্য, তিনিও কলিকাতায় আনীত হইলেন। তাঁহার পরীক্ষা অল্প দিনেই সমাপ্ত হইল। পরীক্ষায় তাঁহার কোনও দোষ পাওয়া গেল না; অতএব তিনি মান পূর্ব্বক বিদায় পাইলেন। তৎকালীন মুসলমান ইতিহাসলেখক, সরকারী কার্য্যের নির্বাহ বিষয়ে, তাঁহার প্রশংসা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও লিখিয়াছেন, প্রধানপদারূঢ় অন্যান্য লোকেরা ন্যায়, তিনিও, অন্যায় আচরণ পূর্ব্বক, প্রজাদিগের নিকট অধিক ধন গ্রহণ করিতেন।

অপরাধী বোধ করিয়া কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহারা যে অমর্য্যাদা হইয়াছিল, তাহার প্রতিবিধানার্থে, কিছু পারিতোষিক দেওয়া উচিত বোধ হওয়াতে কৌন্সিলের সাহেবেরা তাঁহাকে এক মর্য্যাদাসূচক পরিচ্ছদ পুরস্কার দিলেন এবং বিহারের রায় রাইয়াঁ করিলেন। কিন্তু, অপরাধিবোধে কলিকাতায় আনয়ন করাতে, তাঁহার যে অপমানবোধ হইয়াছিল, তাহাতে তিনি এক বারে ভগ্নচিত্ত হইলেন। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্য্যন্ত, এতদ্দেশীয় যত লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহারা রাজা সিতাব রায়ের সর্বদা সবিশেষ গৌরব করিতেন। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে, অপরাধিবোধে অধিকারচ্যুত করা, কয়েদ করিয়া কলিকাতায় আনা, এবং দোষের আশঙ্কা করিয়া পরীক্ষা করা, এই সকল অপমান তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ, পাটনা প্রতিগমন করিয়া, ঐ মনঃপীড়াতেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা কল্যাণ সিংহ তদীয় পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাটনা প্রদেশ, উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষাফলের নিমিত্ত, যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, রাজা সিতাব রায়ই তাহার আদিকারণ। তাঁহার উদ্যোগেই, ঐ প্রদেশে, দ্রাক্ষা ও খরমুজের চাস আরব্ধ হয়।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষায় অনেক সময় লাগিয়াছিল। নন্দকুমার তাঁহার দোষোদঘাটক নিযুক্ত হইলেন। প্রথমতঃ স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সপ্রমাণ হইবেক। কিন্তু, দ্বৈবার্ষিক বিবেচনার পর, নির্দ্ধারিত হইল, মহম্মদ রেজা খাঁ নির্দ্দোষ; নির্দ্দোষ হইলেন বটে, কিন্তু আর পূর্ব্ব কর্ম প্রাপ্ত হইলেন না।

নিজামতে মহম্মদ রেজা খাঁর যে কর্ম্ম ছিল, তিনি পদচ্যুত হইলে পর, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। নবাবকে শিক্ষা দেওয়ার ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল; আর, সমুদয় ব্যয়ের তত্ত্বাবধানার্থে, হেষ্টিংস সাহেব, নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে নিযুক্ত করিলেন। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর এই নিয়োগ বিষয়ে বিস্তর আপত্তি করিলেন; কহিলেন, গুরুদাস নিতান্ত বালক, তাহাকে নিযুক্ত করায় তাহার পিতাকে নিযুক্ত করা হইতেছে; কিন্তু, তাহার পিতাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হেষ্টিংস, তাঁহাদের পরামর্শ না শুনিয়া, গুরুদাসকেই নিযুক্ত করিলেন।

এই সময়ে, ইংলণ্ডে কোম্পানির বিষয়কর্ম্ম অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।

১৭৬৭ সালে লার্ড ক্লাইবের প্রস্থান অবধি, ১৭৭২ সালে হেষ্টিংসের নিয়োগ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষে যেমন ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগের কার্য্যও তেমনই বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। যৎকালে কোম্পানির দেউলিয়া হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাদৃশ সময়ে ডিরেক্টরেরা মূলধনের অধিকারীদিগকে শতকরা সাড়ে বার টাকার হিসাবে মুনাফার অংশ দিলেন। যদি তাঁহাদের কার্য্যের বিলক্ষণ উন্নতি থাকিত তথাপি তদ্রূপ মুনাফা দেওয়া, কোনও মতে উচিত হইত না। যাহা হউক, এইরূপ পাগলামি করিয়া, ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, ধনাগারে এক কপর্দ্দকও সম্বল নাই। তখন তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডের বেঙ্কে, প্রথমতঃ চল্লিশ লক্ষ, তৎপরে আর বিশ লক্ষ, টাকা ধার করিতে হইল। পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া তাঁহাদিগকে এক কোটি টাকা ধার চাহিতে হইয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানির বিষয়কর্ম্মের এবম্প্রকার দুরবস্থা প্রকাশিত হওয়াতে, তাঁহারা সমুদায় ব্যাপার আপনাদের হস্তে আনিতে মনন করিলেন। কোম্পানির শাসনে যে সকল অন্যায় আচরণ হইয়াছিল, তাহার পরীক্ষার্থে এক কমিটী নিয়োজিত হইল। ঐ কমিটি বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলে, রাজমন্ত্রীরা বুঝিতে পারিলেন, সম্পূর্ণ রূপে নিয়মপরিবর্ত না হইলে কোম্পানির পরিত্রাণের উপায় নাই। তাঁহারা, সমস্ত দোষের সংশোধনার্থে পার্লিমেণ্টে নানা প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। ডিরেক্টরেরা তদ্বিষয়ে, যত দূর পারেন আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অসদাচরণ এত স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, ও তাহাতে মনুষ্য মাত্রেরই এমন ঘৃণা জন্মিয়াছিল যে পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা, তাঁহাদের সমস্ত আপত্তির উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজমন্ত্রীর প্রস্তাবিত প্রণালীরই পোষকতা করিলেন।

অতঃপর, ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মের সমুদয় প্রণালী, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানেই, পরিবর্তিত হইল। ডিরেক্টর মনোনীত করণের প্রণালীও কিয়ৎ অংশে পরিবর্তিত হইল। ইংলণ্ডে কোম্পানির কার্য্যে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহার অনেক সংশোধন হইল। ইহাও আদিষ্ট হইল যে, প্রতি বৎসর, ছয় জন ডিরেক্টরকে পদত্যাগ করিতে হইবেক এবং তাঁহাদের পরিবর্তে, আর ছয় জনকে মনোনীত করা যাইবেক। আর, ইহাও আদিষ্ট হইল যে বাঙ্গালার গবর্ণর ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইবেন, অন্যান্য রাজধানীর রাজনীতিঘটিত যাবতীয় ব্যাপার তাঁহার অধীনে থাকিবেক। গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের ক্ষমতা বিষয়ে, সর্বদা বিবাদ উপস্থিত হইত; অতএব নিয়ম হইল, গবর্ণর জেনেরল ফোর্ট উইলিয়মের একমাত্র গবর্ণর ও সেনানী হইবেন। গবর্ণর জেনেরল, কৌন্সিলের মেম্বর ও জজদিগের বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। এজন্য গবর্ণর জেনেরলের আড়াই লক্ষ, ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের আশী হাজার টাকা, বার্ষিক বেতন নির্দ্ধারিত

হইল। ইহাও আজ্ঞপ্ত হইল যে, কোম্পানির অথবা রাজার কার্য্যে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। আর ডিরেক্টরদিগের প্রতি আদেশ হইল যে, ভারতবর্ষ হইতে রাজশাসন সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র আসিবেক, সে সমুদয় তাঁহারা রাজমন্ত্রিগণের সম্মুখে উপস্থিত কবিবেন। বিচারনির্বাহ বিষয়ে, এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামে এক বিচারালয় স্থাপিত হইবেক। তথায়, বার্ষিক অশীতি সহস্র মুদ্রা বেতনে, একজন চীফ জষ্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্ত্তা, ও ষষ্টি সহস্র মুদ্রা বেতনে, তিনজন পিউনি জজ, অর্থাৎ কনিষ্ঠ বিচারকর্তা থাকিবেন। এই জজেরা কোম্পানির অধীন হইবেন না, রাজা স্বয়ং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত কবিবেন। আর, ঐ ধর্ম্মাধিকরণে, ইংলণ্ডীয় ব্যবহারসংহিতা অনুসারে, ব্রিটিশ সজেক্টদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবেক। পরিশেষে, এই অনুমতি হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য্যের নির্বাহ বিষয়ে, পার্লিমেণ্টের অধ্যক্ষেরা প্রথম এই যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন, ১৭৭৪ সালে, ১লা আগষ্ট, তদনুযায়ী কার্য্যারম্ভ হইবেক।

হেষ্টিংস সাহেব, বাঙ্গালার রাজকার্য্যনির্বাহ বিষয়ে, সবিশেষ ক্ষমতাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য, তিনি গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হইলেন। সুপ্রীম কৌন্সিলে তাঁহার সহিত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনার্থে, চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে, বারওয়েল সাহেব, বহুকাল অবধি, এতদ্দেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, আর, কর্ণেল মন্সন, সর জন ক্লবরিং, ও ফ্রান্সিস সাহেব, এই তিন জন, ইহার পূর্ব্বে, কখনও এ দেশে আইসেন নাই।

হেষ্টিংস, এই তিন নূতন মেম্বরের মান্দ্রাজে পঁহুছিবার সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাঁহাদিগকে এক অনুরাগসূচক পত্র লিখিলেন, তাঁহারা খাজরীতে পঁহুছিলে, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বরকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইলেন, এবং তাঁহার এক জন নিজ পারিষদও স্বাগতজিজ্ঞাসার্থে, প্রেরিত হইলেন। কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহাদের যেরূপ সমাদর হইয়াছিল, লার্ড ক্লাইব ও বান্সিটার্ট সাহেবেরও সেরূপ হয় নাই। আসিবা মাত্র, সতরটা সেলামি তোপ হয়, ও তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত, কৌন্সিলের সমুদয় মেম্বর একত্র হন। তথাপি তাঁহাদের মন উঠিল না।

তাঁহারা ডিরেক্টরদিগের নিকট এই অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেন, আমরা সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হই নাই; আমাদের সংবর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত, সৈন্য বহিষ্কৃত করা যায় নাই; সেলামি তোপও উপযুক্ত সংখ্যায় হয় নাই, আমাদের সংবর্দ্ধনা, কৌন্সিলগৃহে না করিয়া, হেষ্টিংসের বাটীতে করা হইয়াছিল; আর, আমরা যে নূতন গবর্ণমেণ্টের অবয়ব স্বরূপ আসিয়াছি, উপযুক্ত সমারোহ পূর্ব্বক, তাহার ঘোষণা করা হয় নাই।

২০এ অক্টোবর, কৌন্সিলের প্রথম সভা হইল; কিন্তু বারওয়েল সাহেব তখন পর্য্যন্ত না পঁহুছিবাতে, সে দিবস কেবল নূতন গবর্ণমেণ্টের ঘোষণা মাত্র হইল, অন্যান্য সমুদয় কর্ম্ম, আগামী সোমবার ২৪এ তারিখে বিবেচনার নিমিত্ত, রহিল। নূতন মেম্বরেরা ভারতবর্ষের কার্য্য কিছুই অবগত ছিলেন না; অতএব, সভার আরম্ভ হইলে, হেষ্টিংস সাহেব কোম্পানির সমুদয় কার্য্য যে অবস্থায় চলিতেছিল, তাহার এক সবিশেষ বিবরণ তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু, প্রথম সভাতেই, এমন বিবাদ উপস্থিত হইল যে, ভারতবর্ষের রাজশাসন, তদবধি প্রায় সাত বৎসর পর্য্যন্ত, অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল। বারওয়েল সাহেব একাকী গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ছিলেন, অন্য তিন মেম্বর, সকল বিষয়ে সর্ব্বদা, তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষেই মত দিতেন। তাঁহাদের সংখ্যা অধিক; সুতরাং গবর্ণর জেনেরল কেবল সাক্ষিগোপাল হইলেন, কারণ, যে স্থলে বহুসংখ্যক ব্যক্তির উপর কোনও বিষয়ের ভার থাকে, তথায় মতভেদ হইলে, অধিকাংশ ব্যক্তির মত অনুসারেই, সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের হস্তেই পতিত হইল। তাঁহাদের ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বে হেষ্টিংস এতদ্দেশে যে সকল ঘোরতর অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এবং হেষ্টিংসকে অতি অপকৃষ্ট লোক স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এজন্য, হেষ্টিংস যাহা করিতেন, ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া এক বারে তাহা অগ্রাহ্য করিতেন, সুতরাং, তাঁহারা যে রাগদ্বেষশূন্য হইয়া কার্য্য করিবেন, তাহার সম্ভাবনা ছিল না।

হেষ্টিংস সাহেব, কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে মিডিল্টন সাহেবকে লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিযাছিলেন, এক্ষণে, নূতন মেম্বরেরা তাঁহাকে, সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন; আর, হেষ্টিংস সাহেব নবাবের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিযা, তাঁহার নিকট নূতন বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, এবং কহিলেন, এরূপ হইলে সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবেক যে, গবর্ণমেণ্ট মধ্যে অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্ণরকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে; এক্ষণে, তাঁহাকে একপ ক্ষমতাশূন্য দেখিলে, সহজে বোধ করিতে পারে যে, রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা, রোষ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না।

দেশীয় লোকেরা, অল্প কাল মধ্যে, কৌন্সিলের এবংবিধ বিবাদের বিষয় অবগত হইলেন, এবং ইহাও জানিতে পারিলেন, হেষ্টিংস সাহেব এত কাল সকলের প্রধান ছিলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোনও ক্ষমতা নাই। অতএব, যে সকল লোক তৎকৃত কোনও

কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিল, তাহারা, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়-মেম্বরদিগের নিকট, তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহারাও, আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে তাহাদের অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। ঐ সময়েই, বর্দ্ধমানের অধিপতি মৃত তিলকচন্দ্রের বনিতা, স্বীয় তনয়কে সমভিব্যাহারে করিয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তিনি এই আবেদনপত্র প্রদান করিলেন, আমি, রাজার মৃত্যুর পর, কোম্পানির ইঙ্গরেজ ও দেশীয় কর্মচারীদিগকে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ দিয়াছি, তন্মধ্যে হেষ্টিংস সাহেব ১৫০০০ টাকা লইয়াছিলেন। হেষ্টিংস বাঙ্গালা ও পারসীতে হিসাব দেখিতে চাহিলেন; কিন্তু রাণী কিছুই দেখাইলেন না। কোনও ব্যক্তিকে সম্মান দান করা এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের প্রধান ব্যক্তির অধিকার ছিল; কিন্তু হেষ্টিংসের বিপক্ষেরা, তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া, আপনারা শিশু রাজাকে খেলাত দিলেন।

অতি শীঘ্র শীঘ্র, হেষ্টিংসের নামে ভূরি ভূরি অভিযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল। এক জন এই বলিয়া দরখাস্ত দিল যে, হুগলীর ফৌজদার বৎসরে ৭২০০ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন; তন্মধ্যে তিনি হেষ্টিংস সাহেবকে ৩৬০০০ ও তাঁহার দেওয়ানকে ৪০০০ টাকা দেন। আমি বার্ষিক, ৩২০০০ টাকা পাইলেই, ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারি। উপস্থিত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, সাক্ষ্য লওয়া গেল। হেষ্টিংসের বিপক্ষ মেম্বরেরা কহিলেন, যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। তদনুসারে, ফৌজদার পদচ্যুত হইলেন। অন্য এক ব্যক্তি, ন্যূন বেতনে, ঐ পদে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু অভিযোক্তার কিছুই হইল না।

এক মাস অতীত না হইতেই, আর এই এক অভিযোগ উপস্থিত হইল, মণিবেগম নয় লক্ষ টাকার হিসাব দেন নাই। পীড়াপীড়ি করাতে, বেগম কহিলেন, হেষ্টিংস সাহেব যখন আমাকে নিযুক্ত করিতে আইসেন, আমোদ উপলক্ষ্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়াছি। হেষ্টিংস কহিলেন, আমি ঐ টাকা লইয়াছি বটে, কিন্তু সরকারী হিসাবে খরচ করিয়া, কোম্পানির দেড় লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছি। হেষ্টিংস সাহেবের এই হেতুবিন্যাস কাহারও মনোনীত হইল না।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইল, অভিযোগ করিলেই গ্রাহ্য হইতে পারে। এই সুযোগ দেখিয়া, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইয়া, মণিবেগমকে ও আমার পুত্র গুরুদাসকে, মুরশিদাবাদে নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে, নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা প্রস্তাব করিলেন, সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত, নন্দকুমারকে কৌন্সিলের সম্মুখে আনীত করা যাউক। হেষ্টিংস উত্তর করিলেন, আমি যে সভার অধিপতি, তথায় আমার অভিযোক্তাকে আসিতে দিব না; বিশেষতঃ, এমন বিষয়ে অপদার্থ ব্যক্তির ন্যায় সম্মত হইয়া, গবর্ণর

জেনেরলের পদের অমর্য্যাদা করিব না; এই সমস্ত ব্যাপার সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করা যাউক। ইহা কহিয়া, হেষ্টিংস গাত্রোত্থান করিয়া কৌন্সিলগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন; বারওয়েল সাহেবও তাঁহার অনুগামী হইলেন।

তাঁহাদের প্রস্থানের পর, ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা নন্দকুমারকে কৌন্সিলগৃহে আহ্বান করিলে, তিনি এক পত্র পাঠ করিয়া কহিলেন, মণিবেগম যখন যাহা ঘুস দিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এই পত্র লিখিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে, বেগম গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লিখিয়াছিলেন; সর জন ডাইলি সাহেব, নন্দকুমারের পঠিত পত্রের সহিত মিলাইবার নিমিত্ত, ঐ পত্র বাহির করিয়া দিলেন। মোহর মিলিল, হস্তাক্ষরের ঐক্য হইল না। যাহা হউক, কৌন্সিলের মেম্বরেরা নন্দকুমারের অভিযোগ যথার্থ বলিয়া স্থির করিলেন এবং হেষ্টিংসকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না।

এই বিষয়ের নিস্পত্তি না হইতেই, হেষ্টিংস নন্দকুমারের নামে, চক্রান্তকারী বলিয়া, সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এই অভিযোগের কিছু দিন পরেই, কামাল উদ্দীন নামে এক জন মুসলমান এই অভিযোগ উপস্থিত করিল, নন্দকুমার এক কাগজে আমার নাম জাল করিয়াছেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, উক্ত অভিযোগ গ্রাহ্য করিয়া, নন্দকুমারকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ফ্রান্সিস ও তৎপক্ষীয়েরা জজদিগের নিকট বারংবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, জামীন লইয়া নন্দকুমারকে কারাগার হইতে মুক্ত করিতে হইবেক। কিন্তু জজেরা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। বিচারের সময় উপস্থিত হইলে, জজেরা ধর্মাসনে অধিষ্ঠান করিলেন, জুরীরা নন্দকুমারকে দোষী নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; জজেরা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে ১৭৭৫ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসে, তাঁহার ফাঁসি হইল।

যে দোষে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারে, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল, তাহা যদি তিনি যথার্থই করিয়া থাকেন, সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবার ছয় বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলেন; সুতরাং তৎসংক্রান্ত অভিযোগ, কোনও ক্রমে, সুপ্রীম কোর্টের গ্রাহ্য ও বিচার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যে আইন অনুসারে এই সুবিচার হইল, ন্যায়পরায়ণ হইলে, প্রধান জজ সর ইলাইজা ইম্পি, কদাচ উপস্থিত ব্যাপারে, ঐ আইনের মর্ম্ম অনুসারে, কর্ম্ম করিতেন না। কারণ, ঐ আইন ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিষয়ে প্রচলিত হইবেক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। ফলতঃ, নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড ন্যায়মার্গ অনুসারে বিহিত হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

এতদ্দেশীয় লোকেরা, এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে, এক বারে হতবুদ্ধি হইলেন। কলিকাতাবাসী ইঙ্গরেজেরা প্রায় সকলেই গবর্ণর জেনেরলের পক্ষ ও তাঁহার প্রতি অতিশয়

অনুরক্ত ছিলেন ; তাঁহারাও, অবিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ ও বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নন্দকুমার এতদ্দেশের এক জন অতি প্রধান লোক ছিলেন। ইঙ্গরেজদিগের সৌভাগ্যদশা উদিত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার এরূপ আধিপত্য ছিল যে, ইঙ্গরেজরাও, বিপদ পড়িলে, সময়ে সময়ে, তাঁহার আনুগত্য করিতেন ও শরণাগত হইতেন। নন্দকুমার দুরাচার ছিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু, ইম্পি ও হেষ্টিংস তাঁহা অপেক্ষা অধিক দুরাচার, তাহার সন্দেহ নাই।

নন্দকুমার, হেষ্টীংসের নামে, নানা অভিযোগ উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস দেখিলেন, নন্দকুমার জীবিত থাকিতে তাঁহার ভদ্রস্থতা নাই ; অতএব যে কোনও উপায়ে, উহার প্রাণবধ করা নিতান্ত আবশ্যক। তদনুসারে, কামাল উদ্দীনকে উপলক্ষ করিয়া, সুপ্রীম কোর্টে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ উপস্থিত করেন। ধর্ম্মাসনারূঢ় ইম্পি, গবর্ণর জেনেরলের পদারূঢ় হেষ্টিংসের পরিতোষার্থে, এক বারেই ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ও ন্যায় অন্যায় বিবেচনায় শূন্য হইয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধ করিলেন। হেষ্টিংস, তিন চারি বৎসর পরে, এক পত্র লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে ইম্পিকৃত এই মহোপকারের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল, এক সময়ে, ইম্পির আনুকূল্যে, আমার সৌভাগ্য ও সম্ভ্রম রক্ষা পাইয়াছে। এই লিখন দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে, নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সে সমস্ত অমূলক নহে ; আর, সুপ্রীম কোর্টের অবিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড না হইলে, তিনি সে সমুদায় সপ্রমাণও করিয়া দিতেন ; সেই ভয়েই হেষ্টিংস, ইম্পির সহিত পরামর্শ করিয়া, নন্দকুমারের প্রাণবধসাধন করেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর পরীক্ষার ফলিতার্থের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা কহিলেন, আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁ সম্পূর্ণ নিরপরাধ। অতএব, তাঁহারা, নবাবের সাংসারিক কর্ম্ম হইতে গুরুদাসকে বহিস্কৃত করিয়া, তৎপদে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত করিতে আদেশপ্রদান করিলেন।

সুপ্রীম কৌন্সিলের সাহেবেরা দেখিলেন, তাঁহাদের এমন অবসর নাই যে, কলিকাতা সদর নিজামৎ আদালতে স্বয়ং অধ্যক্ষতা করিতে পারেন। এজন্য, পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারে, পুনর্ব্বার, ফৌজদারী আদালত ও পুলিসের ভার এক জন দেশীয় লোকের হস্তে সমর্পিত করিতে মানস করিলেন। তদনুসারে, ঐ আদালত কলিকাতা হইতে মুরশিদাবাদে নীত হইল, এবং মহম্মদ রেজা খাঁ তথাকার প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ক্রমে ক্রমে রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, ১৭৭২ সালে, পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত, জমী সকল ইজারা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম বৎসরেই দৃষ্ট হইল, জমীদারেরা যত কর দিতে সমর্থ, তাহার অধিক ইজারা লইয়াছেন। খাজানা, ক্রমে ক্রমে বিস্তর বাকী পড়িল। ফলতঃ এই পাঁচ বৎসরে, এক কোটি আঠার লক্ষ টাকা রেহাই দিয়াও ইজারদারদিগের নিকট এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বাকী রহিল, তন্মধ্যে, অধিকাংশেরই আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অতএব, কৌন্সিলের উভয় পক্ষীয়েরাই নূতন বন্দোবস্তের নিমিত্ত, এক এক প্রণালী প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা উভয়ই অগ্রাহ্য করিলেন। ১৭৭৭ সালে, পাট্টার মিয়াদ গত হইলে, ডিরেক্টরেরা, এক বৎসরের নিমিত্ত, ইজারা দিতে আজ্ঞা করিলেন। এইরূপ বৎসরে বৎসরে ইজারা দিবার নিয়ম, ১৭৮২ সাল পর্য্যন্ত, প্রবল ছিল।

১৭৭৬ সালে, সেপ্টেম্বর মাসে, কর্ণেল মন্সন সাহেবের মৃত্যু হইল। সুতরাং, তাঁহার পক্ষের দুই জন মেম্বর অবশিষ্ট থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেব কৌন্সিলে পুনর্ব্বার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, সমসংখ্য স্থলে, গবর্ণর জেনেরলের মতই বলবৎ হইত।

১৭৭৮ সালের শেষ ভাগে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলা, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, এই প্রার্থনায় কলিকাতার কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন যে, মহম্মদ রেজা খাঁ আমার সহিত সর্ব্বদা কর্কশ ব্যবহার করেন। অতএব, ইঁহাকে স্থানান্তরিত করা যায়। তদনুসারে, হেষ্টিংস সাহেবের মতক্রমে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, নায়েব সুবাদারের পদ রহিত করা গেল, এবং নবাবের রক্ষণাবেক্ষণ এবং আয় ও ব্যয়ের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের ভার মণিবেগমের হস্তে অর্পিত হইল। ডিরেক্টরেরা এই বন্দোবস্তে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি ত্বরায় এই আদেশ পাঠাইলেন, নায়েব সুবাদারের পদ পুনর্ব্বার স্থাপিত করিয়া, তাহাতে মহম্মদ রেজা খাঁকে নিযুক্ত, ও মণিবেগমকে পদচ্যুত, করা যায়।

১৭৭৮ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা অক্ষরে সর্ব্বপ্রথম এক পুস্তক মুদ্রিত হয়। অসাধারণ-বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন হালহেড সাহেব, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত, হইয়া, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, এতদ্দেশে আসিয়া, ভাষাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে কোনও য়ুরোপীয় সেরূপ শিখিতে পারেন নাই। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, রাজকার্য্যনির্ব্বাহের ভার য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীদিগের হস্তে অর্পিত হইলে, হেষ্টিংস সাহেব বিবেচনা করিলেন, এতদ্দেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রে তাঁহাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পরে, তদীয় আদেশে ও আনুকূল্যে, হালহেড সাহেব, হিন্দু ও মুসলমানদিগের সমুদয় ব্যবহারশাস্ত্র দৃষ্টে, ইঙ্গরেজী ভাষাতে এক গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। ঐ গ্রন্থ, ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে, মুদ্রিত হয়। তিনি সাতিশয়

পরিশ্রম সহকারে, বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছিলেন। এবং বোধ হয়, ইঙ্গরেজদের মধ্যে, তিনিই প্রথমে এই ভাষায় বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃ: অব্দে, তিনি বাঙ্গালাভাষায় এক ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। উহাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ। তৎকালে রাজধানীতে ছাপার যন্ত্র ছিল না, উক্ত গ্রন্থ হুগলীতে মুদ্রিত হইল। বিখ্যাত চার্লস উইল্কিন্স সাহেব এ দেশের নানা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি অতিশয় শিল্পদক্ষ ও বিলক্ষণ উৎসাহশালী ছিলেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে, স্বহস্তে খুদিয়া ও ঢালিয়া, বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। ঐ অক্ষরে তাঁহার বন্ধু হালহেড সাহেবের ব্যকরণ মুদ্রিত হয়।

সুপ্রীম কোর্ট নামক বিচারালয়ের সহিত গবর্ণমেণ্টের বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে, অনেক বৎসর পর্য্যন্ত, দেশের অনেক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। ঐ বিচারালয়, ১৭৭৩ খৃ:, অব্দে, স্থাপিত হয়। কোম্পানির রাজশাসনের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ভারতবর্ষে আসিবার সময়, জজদের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রজাদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতেছে, সুপ্রীম কোর্ট তাহাদের ক্লেশনিবারণের এক মাত্র উপায়। তাঁহারা, চাঁদপাল ঘাটে, জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন, দেশীয লোকেরা রিক্ত পদে গমনাগমন করিতেছে। তখন তাঁহাদের মধ্যে এক জন কহিতে লাগিলেন, দেখ ভাই! প্রজাদের ক্লেশের পরিসীমা নাই, আবশ্যক না হইলে আর সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় নাই। আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, আমাদের কোর্ট ছয় মাস চলিলেই, এই হতভাগ্যদিগকে জুতা ও মোজা পরাইতে পারিব।

বিটিস সব্জেক্ট, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ, ও মহারাষ্ট্রখাতের অন্তবর্ত্তী সমস্ত লোক, ঐ কোর্টের এলাকার মধ্যে ছিলেন। আর ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, যে সকল লোক, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায়, কোম্পানি অথবা ব্রিটিস সব্জেক্টের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেক, তাহারাও ঐ বিচারালয়ের অধীন হইবেক। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, এই বিধি অবলম্বন করিয়া, এতদ্দেশীয় দূরবর্ত্তী লোকদিগের বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারা কহিতেন, যে সকল লোক কোম্পানিকে কর দেয়, তাহারাও কোম্পানির চাকর। পার্লিমেণ্টের অত্যন্ত ত্রুটি হইয়া ছিল যে, কোর্টের ক্ষমতার বিষয় স্পষ্ট রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেন নাই। তাঁহারা, এক দেশের মধ্যে, পরস্পরনিরপেক্ষ অথচ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, দুই পরাক্রম স্থাপিত করিয়া, সাতিশয় অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে, উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদানল বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সুপ্রীম কোর্টের কার্য্যারম্ভ হইবা মাত্র, তথাকার বিচারকেরা আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি কোনও ব্যক্তি, ঐ আদালতে গিয়া, শপথ করিয়া বলিত, অমুক জমীদার আমার টাকা ধারেন, তিনি শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী হইলেও, তাঁহার

নামে তৎক্ষণাৎ পরোয়ানা বাহির হইত, এবং কোনও ওজর না শুনিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া জেলখানায় রাখা যাইত ; পরিশেষে, আমি সুপ্রীম কোর্টের অধীন নহি, এই বাক্য বারংবার কহিলেই, সে ব্যক্তি অব্যাহতি পাইতেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার যে ক্ষতি ও অপমান হইত, তাহার কোনও প্রতিবিধান হইত না। এই কুরীতির দোষ, অল্প কাল মধ্যেই, প্রকাশ পাইতে লাগিল। যে সকল প্রজা ইচ্ছা পূর্ব্বক কর দিত না ; তাহারা জমীদার ও তালুকদারদিগকে পূর্বোক্ত প্রকারে কলিকাতায় লইয়া যাইতে দেখিয়া রাজস্ব দেওয়া এক বারেই রহিত করিল। প্রথম বৎসর, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সকল জিলাতেই এইরূপ পরোয়ানা পাঠাইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে, দেশ মধ্যে, সমুদয় লোকেরই চিত্তে যৎপরোনাস্তি ত্রাস ও উদ্বেগের সঞ্চার হইল। জমীদারেরা, এই ঘোরতর নূতন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, সাতিশয়, শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। যে আইন অনুসারে, তাঁহারা বিচারার্থে কলিকাতায় আনীত হইতেন, তাঁহারা তাহার কিছুই জানিতেন না।

সুপ্রীম কোর্ট, ক্রমে ক্রমে, এরূপ ক্ষমতাবিস্তার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে রাজস্ব আদায়ের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। তৎকালে রাজস্ব কার্য্যের ভার প্রবিন্সল কোর্ট অর্থাৎ প্রদেশীয় বিচারালয়ের প্রতি অর্পিত ছিল। পূর্ব্বাবধি এই রীতি ছিল, জমীদারেরা করদান বিষয়ে অন্যথাচরণ করিলে, তাঁহাদিগকে কয়েদ করিয়া আদায় করা যাইত। এই পুরাতন নিয়ম, তৎকাল পর্য্যন্ত, প্রবল ও প্রচলিত ছিল। সুপ্রীম কোর্ট এ বিষয়েও হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। করদানে অমনোযোগী ব্যক্তিরা এই রূপে কয়েদ হইলে, সকলে তাহাদিগকে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিতে পরামর্শ দিত। তাহারাও আপীল করিবা মাত্র, জামীন দিয়া খালাস পাইত। জমীদারেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করিলেই, আর কয়েদ থাকিতে হয় না, অতএব, সকলেই কর দেওয়া রহিত করিলেন। এই রূপে রাজস্বসংগ্রহ প্রায় একপ্রকার রহিত হইয়া আসিল।

সুপ্রীম কোর্ট ক্রমে সর্ব্বপ্রকার বিষয়েই হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। মফঃসলের ভূমিসংক্রান্ত মোকদ্দমাও তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল ; এবং জজেরাও, জিলা আদালতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, ইচ্ছাক্রমে ডিক্রী দিতে ও হুকুম জারী করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, ইজারদার অঙ্গীকৃত কর দিতে অসম্মত হইলে, তাহারা ইজারা বিক্রীত হইত। কিন্তু সে, নূতন ইজারদারকে সুপ্রীম কোর্টে আনিয়া, তাহার সর্বনাশ করিত। জমীদার কোনও বিষয় কিনিলে, যোত্রহীনেরা সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার নামে নালিশ করিত, এবং তিনি আইনমতে খাজনা আদায় করিয়াছেন, এই অপরাধে, দণ্ডনীয় ও অবমানিত হইতেন।

সুপ্রীম কোর্ট প্রদেশীয় ফৌজদারী আদালতের উপরেও ক্ষমতাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আদালতের কার্য্য মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে রাখিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের জজেরা কহিলেন, নবাব মুবারিক উদ্দৌলা সাক্ষীগোপাল মাত্র, সে কিসের রাজা, তাহার সমুদয় রাজ্য মধ্যে আমাদের অধিকার। নবাব ইংলণ্ডের অধিপতির অথবা ইংলণ্ডের আইনের অধীন ছিলেন না; তথাপি সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার নামে পরোয়ানা জারী করা ন্যায্য বিবেচনা করিলেন। জজেরা স্পষ্টই বলিতেন, রাজ্যশাসন অথবা রাজস্বকার্য্যের সহিত যে যে বিষয়ের সম্পর্ক আছে, আমরা সে সমুয়েরই কর্ত্তা; যে ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, তাহার দণ্ডবিধান করিব। কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের অবিচার ও অত্যাচার হইতে দেশীয় লোকদিগের পরিত্রাণ করিবার জন্য, এই বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে; এত অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট না হইলে, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না। ফলতঃ, সুপ্রীম কোর্টকে সর্ব্বপ্রধান ও সুপ্রীম গবর্ণমেণ্টকে অকিঞ্চিৎকর করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

উপরি লিখিত বিষয়ের উদাহরণ স্বরূপ একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা উল্লিখিত হইতেছে।

পাটনানিবাসী এক ধনবান মুসলমান, আপন পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র রাখিয়া, পরলোকযাত্রা করেন। এইরূপ জনরব হইয়াছিল যে, ভ্রাতৃপুত্রকে দত্তক পুত্র করিয়া যান। ধনীর পত্নী ও ভ্রাতৃপুত্র উভয়ে, ধনাধিকার বিষয়ে বিবদমান হইয়া, পাটনার প্রবিন্সল কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। জজেরা, কার্য্যনির্ব্বাহের প্রচলিত রীতি অনুসারে, কাজী ও মুফতীকে ভার দেন যে, তাঁহারা, সাক্ষীর জবানবন্দী হইয়া, মুসলমানদিগের সরা অনুসারে, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। তদনুসারে, তাঁহারা অনুসন্ধান দ্বারা, অবগত হইলেন, বাদী ও প্রতিবাদী যে সকল দলীল দেখায়, সে সমুদায় জাল; তাহাদের এক ব্যক্তিও প্রকৃত উত্তরাধিকারী নহে; সুতরাং ঐ সম্পত্তির বিভাগ সরা অনুসারে করা আবশ্যক। তাঁহারা তদীয় সমস্ত ধনের চতুর্থ অংশ তাহার পত্নীকে দিয়া, অবশিষ্ট বার আনা তাঁহার ভ্রাতাকে দিলেন। এই ভ্রাতার পুত্রকে ধনী দত্তক করিয়া যান।

ঐ অবীরা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিল। এই মোকদ্দমা যে স্পষ্টই সুপ্রীম কোর্টের এলাকার বহির্ভূত, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু জজেরা, আপনাদের অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত, কহিলেন, মৃত ব্যক্তি সরকারী জমা রাখিত, সুতরাং সে কোম্পানির কর্ম্মকারক; সমদয় সরকারী কর্ম্মকারকের উপর আমাদের অধিকার আছে। তাঁহারা ইহাও কহিলেন, ইংলণ্ডের আইন অনুসারে, পাটনার প্রবিন্সল জজদিগের এরূপ ক্ষমতা নাই যে, তাঁহারা কোনও মোকদ্দমা, নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্ত, কাহাকেও সোপর্দ্দ করিতে পারেন। অতএব

তাহারা স্থির করিলেন, এই মোকদ্দমার সানি তজবীজ আবশ্যক। পরে, তাঁহাদের বিচারে ঐ অবীরার পক্ষে জয় হইল, এবং সে তিন লক্ষ টাকা পাইল।

তাঁহারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন, এমন নহে; কাজী, মুফতী, ও ধনীর ভ্রাতৃপুত্রকে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত এক জন সারজন পাঠাইলেন; কহিয়া দিলেন, যদি চারি লক্ষ টাকার জামীন দিতে পারে, তবেই ছাড়িবে, নতুবা গ্রেপ্তার করিয়া আনিবে। কাজী আপন কাছারী হইতে বাটী যাইতেছেন, এমন সময়ে সুপ্রীম কোর্টের লোক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল।

এইরূপ ব্যাপার দর্শনে প্রজাদের অন্তঃকরণে অবশ্যই বিরুদ্ধ ভাব জন্মিতে পারে; এই নিমিত্ত, প্রবিন্সল কোর্টের জজেরা অতিশয় ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা লোপ পাইল, এবং রাজকার্য্যনির্ব্বাহ এক বারেই রহিত হইল। অনন্তর, আর অধিক অনিষ্ট না ঘটে, এজন্য তাঁহারা তৎকালে কাজীর জামীন হইলেন।

যে যে ব্যক্তি, প্রবিন্সল কোর্টের হুকুম অনুসারে, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, সুপ্রীম কোর্ট তাঁহাদের সকলকেই অপরাধী করিলেন, এবং, সকলকেই রুদ্ধ করিয়া আনিবার নিমিত্ত, সিপাই পাঠাইয়া দিলেন, কাজী বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কলিকাতায় আসিবার কালে, পথি মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। মুফতীও অন্যূন চারি বৎসর জেলে থাকিলেন; পরিশেষে, পার্লিমেণ্টের আদেশ অনুসারে, মুক্তি পাইলেন। তাঁহাদের অপরাধ এই, তাঁহারা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জজেরা, ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, প্রবিন্সল কোর্টের জজের নামেও সুপ্রীম কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিয়া, তাঁহার ১৫০০০ টাকা দণ্ড করিলেন; ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগার হইতে দত্ত হইল।

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিষয়ে, যে রূপে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত তাহার এক উত্তম দৃষ্টান্ত। সুপ্রীম কোর্টের এক য়ুরোপীয় উকীল ঢাকায় থাকিতেন। এক জন সামান্য পেয়াদা কোনও কুকর্ম করাতে ঐ নগরের ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার দোষ সপ্রমাণ হইলে, এই আদেশ হইল, সে ব্যক্তি যাবৎ না আত্মদোষের ক্ষালন করে, তাবৎ তাহারে কারাগারে রুদ্ধ থাকিতে হইবেক।

সকলে, তাহাকে পরামর্শ দিয়া, সুপ্রীম কোর্টে দরখাস্ত করাইল। অনন্তর, পেয়াদাকে অকারণে রুদ্ধ করিয়াছে, এই সূত্র ধরিয়া, সুপ্রীম কোর্টের এক জন জজ, ফৌজদারী আদালতের দেওয়ানকে কয়েদ করিয়া আনিবার নিমিত্ত পরোয়ানা বাহির

করিলেন। ফৌজদার, আপন বন্ধুবর্গ ও আদালতের আমলাগণ লইয়া, বসিয়া আছেন, এমন সময়ে পূর্বোক্ত য়ুরোপীয় উকীল এক জন বাঙ্গালিকে তাঁহার বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। সে ব্যক্তি, বাটীতে প্রবেশ পূর্বক, তাঁহার দেওয়ানকে কয়েদ করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু, সকলে প্রতিবাদী হওয়ায়, তাহাকে আপন মনিবের নিকট ফিরিয়া যাইতে হইল। উকীল, এই বৃত্তান্ত শুনিবা মাত্র, কতকগুলি অস্ত্রধারী পুরুষ সঙ্গে লইয়া, বল পূর্ব্বক ফৌজদারের বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যম করিলেন। সেই বাটীতে ফৌজদারের পরিবার থাকিত, এজন্য তিনি তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিলেন না। তাহাতে ভয়ানক দাঙ্গা উপস্থিত হইল। উকীলের এক জন অনুচর, ফৌজদারের পিতার মস্তকে আঘাত করিল, এবং উকীলও নিজে, এক পিস্তল বাহির করিয়া, ফৌজদারের সম্বন্ধীকে গুলি করিলেন, কিন্তু, দৈবযোগে, তাহা মারাত্মক হইল না। সুপ্রীম কোর্টের জজ হাইড সাহেব, এই ব্যাপার শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ ঢাকার সৈন্যাধ্যক্ষে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি উকীলের সাহায্য করিবেন, আর ইহাও লিখিলেন, আপনি উকীলকে জানাইবেন, তিনি যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের যথেষ্ট তুষ্টি জন্মিয়াছে, সুপ্রীম কোর্ট তাঁহার যথোচিত সহায়তা করিবেন। ঢাকার প্রবিন্সল কৌন্সিলের সাহেবেরা গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকে পত্র লিখিলেন, ফৌজদারী আদালতের সমুদয় কার্য্য এক কালে স্থগিত হইল। এরূপ অত্যাচারের পর, সরকারী কর্ম্মের নির্বাহ করিতে আর লোক পাওয়া দুষ্কর হইবেক। গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরেরা দেখিলেন, সুপ্রীম কোর্ট হইতেই গবর্ণমেণ্টের সমুদয় ক্ষমতা লোপ পাইল। কিন্তু কোনও প্রকারে, তাঁহাদের সাহস হইল না যে, কোনও প্রতিবিধান করেন। জজেরা বলিতেন, আমরা ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মকারক অপেক্ষা আমাদের ক্ষমতা অনেক অধিক। যে সকল ব্যক্তি আমাদের আজ্ঞালঙ্ঘন করিবেক, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহীর দণ্ড দিব। যাহা হউক, পরিশেষে এমন এক বিষয় ঘটিয়া উঠিল যে, উভয় পক্ষকেই পরস্পর স্পষ্ট বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

কাশিজোড়ার রাজার কলিকাতাস্থ কর্ম্মাধ্যক্ষ কাশীনাথ বাবু, ১৭৭৯ সালের ১৩ই আগষ্ট, রাজার নামে সুপ্রীম কোর্টে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। তাহাতে রাজার উপর এক পরোয়ানা বাহির হইল, এবং তিন লক্ষ টাকার জামীন চাহা গেল। সেই পরোয়ানা এড়াইবার নিমিত্ত, রাজা অন্তর্হিত হওয়াতে, উহা জারী না হইয়া ফিরিয়া আসিল। তদনন্তর, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করিবার জন্য, আর এক পরোয়ানা বাহির হইল। সরিফ সাহেব, ঐ ব্যাপারের সমাধা করিবার নিমিত্ত, এক জন সারজন ও বাটি জন অস্ত্রধারী পুরুষ পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিলেন, সুপ্রীম কোর্টের লোকেরা আসিয়া আমার লোক জনকে প্রহার ও আঘাত করিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে, জিনিস পত্র লুঠ করিয়াছে, দেবালয় অপবিত্র করিয়াছে, দেবতার অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া লইয়াছে, খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে, এবং রাইয়তদিগকে খাজনা দিতে মানা করিয়াছে।

গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর কৌন্সিলের বৈঠকে এই নির্দ্ধার্য্য করিলেন, অতঃপর সতর্ক হওয়া উচিত, এমন সকল বিষয়েও ক্ষান্ত থাকিলে, রাজশাসনের এক কালে লোপাপত্তি হয়; অনন্তর, রাজাকে সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মেদিনীপুরের সেনাপতিকে এই আজ্ঞাপত্র লিখিলেন, তুমি সরিফের লোক সকল আটক করিবে। এই আজ্ঞা পঁহুছিতে অধিক বিলম্ব হওয়ায়, তাহাদের দৌরাত্ম্য ও রাজার বাটীলুঠের নিবারণ হইতে পারিল না। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার কালে সকলে কয়েদ হইল।

সেই সময়ে গবর্ণর জেনেরল এরূপ আদেশও করিলেন যে, যে সমুদয় জমীদার, তালুকদার ও চৌধুরী ব্রিটিস সব্‌জেক্ট অথবা বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারা যেন সুপ্রীম কোর্টের আজ্ঞাপ্রতিপালন না করেন। আর, প্রদেশীয় সেনাধ্যক্ষদিগকে নিষেধ করিলেন, আপনারা সৈন্য দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের সাহায্য করিবেন না।

সারজন ও তাঁহাদের সঙ্গী লোকদিগের কয়েদ হইবার সংবাদ সুপ্রীম কোর্টে পঁহুছিবা মাত্র, জজেরা, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রথমতঃ কোম্পানির উকীলকে তুমি সংবাদ দিয়াছ, তাহাতেই আমাদের লোক সকল কয়েদ হইল, এই বলিয়া জেলখানায় পুরিয়া চাবি দিয়া রাখিলেন। পরিশেষে, গবর্ণর জেনেরল ও কৌন্সিলের মেম্বরদিগের নামেও এই বলিয়া সমন করিলেন যে, আপনারা কাশীনাথ বাবুর মোকদ্দমা উপলক্ষে, সুপ্রীম কোর্টের লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া, কোর্টের হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কিন্তু হেষ্টিংস সাহেব স্পষ্ট উত্তর দিলেন, আমরা, আপন পদের ক্ষমতা অনুসারে, যে কর্ম্ম করিয়াছি, সে বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের হুকুম মান্য করিব না। এই ব্যাপার ১৭৮০ সালের মার্চ্চ মাসে ঘটে।

এই সময়ে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইঙ্গরেজ ও স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সুপ্রীম কোর্টের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রার্থনায়, পার্লিমেণ্টে এক আবেদনপত্র পাঠাইলেন। এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা হইয়া, নূতন আইন জারী হইল। তাহাতে, সুপ্রীম কোর্টের জজেরা, সমস্ত দেশের উপর কর্তৃত্ব চালাইবার নিমিত্ত, যে ঔদ্ধত্য করিতেন তাহা রহিত হইয়া গেল।

এই আইন জারী হইবার পূর্ব্বেই, হেষ্টিংস সাহেব জজদিগের বদনে মধুদান করিয়া, সুপ্রীম কোর্টকে ঠাণ্ডা করিয়াছিলেন। তিনি চীফ জষ্টিস সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, মাসিক ৫০০০ টাকা বেতন দিয়া, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজ করেন, এবং আফিসের ভাড়া বলিয়া, মাসে ৬০০ টাকা দিতে আরম্ভ করেন, আর, এক জন ছোট জজকে, চুঁচুড়ায় এক নূতন কর্ম্ম দিয়া, বড় মানুষ করিয়া দেন। ইহার পর কিছু কাল, সুপ্রীম কোর্টের কোনও অত্যাচার শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এই সময়ে, হেষ্টিংস সাহেব, দেশীয় বিচারালয়ের অনেক সুধারা করিলেন; দেওয়ানী মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্ত, নানা জিলাতে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত করিলেন প্রবিন্সল কোর্টে কেবল রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যের ভার রাখিলেন। চীফ জষ্টিস, সদর দেওয়ানী আদালতের কর্ম্মে বসিয়া, জিলা আদালতের কর্মনির্বাহার্থে কতকগুলি আইন প্রস্তুত করিলেন। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, নব্বইটি আইন প্রস্তুত হয়। ঐ মূল অবলম্বন করিয়াই, কিয়ৎ কাল পরে, লার্ড কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী আইন প্রস্তুত করেন।

সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবের সদর দেওয়ানীতে কর্ম্মস্বীকারের সংবাদ ইংলণ্ডে পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, অত্যন্ত অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, ঐ বিষয় অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, হেষ্টিংস, কেবল শান্তিরক্ষার্থেই, তদ্বিষয়ে সম্মত হইয়াছেন। রাজমন্ত্রীরাও, সদর দেওয়ানীতে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া, সর ইলাইজা ইম্পি সাহেবকে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তিনি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সর গিলবর্ট এলিয়ট সাহেব তাঁহার অভিযোক্তা নিযুক্ত হইলেন। ইনিই কিছু কাল পরে, লার্ড মিণ্টো নামে, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়াছিলেন।

১৭৮০ সালের ১৯এ জানুয়ারি কলিকাতায় এক সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে উহা কখনও দৃষ্ট হয় নাই।

হেষ্টিংস সাহেব, ইহার পর চারি বৎসর, বাঙ্গালার কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া, বারানসী ও অযোধ্যার রাজকার্য্যের বন্দোবস্ত, মহীসূরের রাজা হায়দর আলির সহিত যুদ্ধ, ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশে সন্ধিস্থাপন, ইত্যাদি কার্য্যেই অধিকাংশ ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি অযোধ্যা ও বারাণসীতে যে সমস্ত ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সে সমুদয় প্রচারিত হওয়াতে, ইংলণ্ডে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধ্যক্ষগণের সম্মতি না হওয়াতে, তিনি স্বপদেই থাকিলেন। হেষ্টিংস, ১৭৮৪ সালের শেষ ভাগে, আর এক বার অযোধ্যাযাত্রা করিলেন। ১৭৮৫ সালের আরম্ভে, তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি আপন পদের উত্তরাধিকারী মেকফর্সন সাহেবের

হস্তে ট্রেজরি ও ফোর্ট উইলিয়মের চাবি সমর্পণ করিলেন, এবং জাহাজে আরোহন করিয়া জুন মাসে, ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

১৭৮৪ সালে, এই দেশের পরম হিতকারী ক্লীবলণ্ড সাহেবের মৃত্যু হয়। তিনি, অতি অল্প বয়সে, সিবিল কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আইসেন। পঁহুছিবার পরেই, ভাগলপুরে অঞ্চলের সমস্ত রাজকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রদেশের দক্ষিণ অংশে এক পর্বতশ্রেণী আছে, তাহার অধিত্যকাতে অসভ্য পুলিন্দজাতিরা বাস করিত। সন্নিকৃষ্ট জাতিরা সর্বদাই তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। তাহারাও, সময়ে সময়ে পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অত্যাচারীদিগের সর্বস্বলুণ্ঠন করিত। ক্লীবলণ্ড, তাহাদের অবস্থার সংশোধন বিষয়ে, নিরতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন। এবং যাহাতে তাহারা সুখী হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার এই প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছিল। ক্রমে তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, পার্ব্বতীয় অসভ্য পুলিন্দজাতিরাও, সভ্য জাতির ন্যায়, শান্তস্বভাব হইয়া উঠিল।

আবাদ না থাকাতে, ঐ প্রদেশের জলবায়ু অতিশয় পীড়াকর ছিল। তাহাতে ক্লীবলণ্ড সাহেব, শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া, স্বাস্থ্যলাভের প্রত্যাশায়, সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার উনত্রিশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল। ডিরেক্টরেরা তদীয় সদ্‌গুণে এমন প্রীত ছিলেন যে, তাঁহার স্মরণার্থে সমাধিস্তম্ভনির্মাণের আদেশপ্রদান করিলেন। তিনি যে অসভ্য অকিঞ্চন পার্ব্বতীয়দিগকে সভ্য করিয়াছিলেন, তাহারাও অনুমতি লইয়া, তদীয় গুণগ্রামের চিরস্মরণীয়তাসম্পাদনার্থে, এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত করিল। এতদ্দেশীয় লোকেরা, ইহার পূর্ব্বে, আর কখনও, কোনও য়ুরোপীয়ের স্মরণার্থে, কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত করেন নাই।

১৭৮৩ সালে, সর উইলিয়ম জোন্স, সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়া, এতদ্দেশে আগমন করেন। তিনি, বিদ্যানুশীলন দ্বারা, স্বদেশে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে, তিনি এতদ্দেশের আচার, ব্যবহার, পুরাবৃত্ত, ও ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিতে পারিবেন। তিনি, এ দেশে আসিয়াই, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পড়াইবার নিমিত্ত পণ্ডিত পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তৎকালীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছজাতিকে পবিত্র সংস্কৃত ভাষা অথবা শাস্ত্রীয় বিষয়ে উপদেশ দিতে সম্মত হইতেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর, একজন উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ বৈদ্য, মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতনে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইতে সম্মত হইলেন। সর উইলিয়ম জোন্স, স্বল্প দিনেই, উক্ত ভাষায় এমন ব্যুৎপন্ন

হইয়া উঠিলেন যে, অনায়াসে, ইঙ্গরেজীতে শকুন্তলা নাটকের ও মনুসংহিতার অনুবাদ করিতে পারিলেন।

তিনি, ১৭৮৪ সালে, ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি নামক এক সভা স্থাপিত করিলেন। যে সকল লোক, এ বিষয়ে, তাঁহার ন্যায়, একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাহারা এই সোসাইটির মেম্বর হইলেন। হেষ্টিংস সাহেব এই সভার প্রথম অধিপতি হয়েন, এবং প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে, সভার সভ্যগণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। সর উইলিয়ম জোন্সের তুল্য সর্বগুণাকর ইঙ্গরেজ এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আইসেন নাই। তিনি, এতদ্দেশে, দশ বৎসর বাস করিয়া, উনপঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমে, পরলোকযাত্রা করেন।

১৭৮৩ সালে কোম্পানির কার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী পার্লিমেণ্টের গোচর হইলে, প্রধান আমাত্য ফক্স সাহেব, ভারতবর্ষীয় রাজ্যশাসন বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী স্বীকৃত হইলে, ভারতবর্ষে কোম্পানির কোনও সংস্রব থাকিত না। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রধান অমাত্য ফক্স সাহেব পদচ্যুত হইলেন। উইলিয়ম পিট সাহেব, তাঁহার পরিবর্ত্তে, প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম চব্বিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তিনি, রাজকার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে, অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় রাজশাসনের এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ঐ প্রণালী, পার্লিমেণ্টে ও রাজসমীপে, উভয়ত্রই স্বীকৃত হইল।

এ পর্য্যন্ত ডিরেক্টরেরাই এতদ্দেশীয় সমস্ত কার্য্যের নির্বাহ করিতেন; রাজমন্ত্রীরা কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু ১৭৮৪ সালে, পিট সাহেবের প্রণালী প্রচলিত হইলে, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত, বোর্ড অব কণ্ট্রোল নামে এক সমাজ স্থাপিত হইল। রাজা স্বয়ং এই বোর্ডের সমুদয় মেম্বর নিযুক্ত করিতেন। কোম্পানির বাণিজ্য ভিন্ন, ভারতবর্ষীয় সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের হস্তার্পণের অধিকার হইল।

অষ্টম অধ্যায়

হেষ্টিংস সাহেব মেকফর্সন সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া যান। ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রস্থানসংবাদ অবগত হইবা মাত্র, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে, গবর্ণর জেনেরল ও কমাণ্ডর ইন চীফ, পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কর্ণওয়ালিস

পুরুষানুক্রমে বড় মানুষের সন্তান, ঐশ্বর্য্যশালী, ও অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন; এবং, পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রধান প্রধান কর্ম্ম করিয়া, সকল বিষয়েই বিশেষরূপ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

তিনি, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে, ভারতবর্ষে পঁহুছিলেন। যে সকল বিবাদ উপস্থিত থাকাতে, হেষ্টিংস সাহেবের শাসন অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিসের নামের ও প্রবল প্রতাপে, সে সমুদয়ের সত্বর নিষ্পত্তি হইল। তিনি, সাত বৎসর, নির্ব্বিবাদে, রাজশাসন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; অনন্তর, মহীসুরের অধিপতি হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহার গর্ব খর্ব্ব করিলেন; পরিশেষে, সুলতানের প্রার্থনায়, তাহার রাজ্যের অনেক অংশ ও যুদ্ধের সমুদয় ব্যয় লইয়া, সন্ধিস্থাপন করিলেন।

লার্ড কর্ণওয়ালিস, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব বিষয়ে, যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা দ্বারাই ভারতবর্ষে তাঁহার নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে। ডিরেক্টরেরা দেখিলেন, রাজস্ব-সংগ্রহ বিষয়ে নিত্য নূতন বন্দোবস্ত করাতে, দেশের পক্ষে অনেক অপকার হইতেছে। তাঁহারা বোধ করিলেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল, আমরা দেওয়ানী পাইয়াছি, এত দিনে আমাদের যুরোপীয় কর্ম্মচারীরা, অবশ্যই ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন, রাজা ও প্রজা উভয়েরই হানিকর না হয়, এমন কোনও দীর্ঘকালস্থায়ী ন্যায্য বন্দোবস্ত করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল, চির কালের নিমিত্ত একবিধ রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু লার্ড কর্ণওয়ালিস দেখিলেন, তৎকাল পর্য্যন্ত, এ বিষয়ের কিছুই নিশ্চিত জানিতে পারা যায় নাই; অতএব, অগত্যা, পূর্ব্বপ্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্তই আপাততঃ বজায় রাখিলেন।

ঐ সময়ে, তিনি, কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, এই অভিপ্রায়ে, কালেক্টর সাহেব-দিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহারা ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর লিখিবেন, তদ্দ্বারা ভূমির রাজস্ব বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। তাঁহারা যে বিজ্ঞাপনী দিলেন, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর; অতি অকিঞ্চিৎকর বটে; কিন্তু, তৎকালে, তদপেক্ষায় উত্তম পাইবার কোনও আশা ছিল না। অতএব কর্ণওয়ালিস, আপাততঃ দশ বৎসরের নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিয়া, এই ঘোষণা করিলেন, যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন, তবে ইহাই চির-স্থায়ী করা যাইবেক। অনন্তর, বিখ্যাত সিবিল সরবেণ্ট জন শোর সাহেবের প্রতি, রাজস্ব বিষয়ে, এক নূতন প্রণালী প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হইল। তিনি উক্ত বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ ও নিপুণ ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ে তাঁহার নিজের মত ছিল না; তথাপি তিনি ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই দশসালা বন্দোবস্তে ইহাই

নির্দ্ধারিত হইল, এ পর্য্যন্ত যে সকল জমীদার কেবল রাজস্বসংগ্রহ করিতেছেন; অতঃপর, তাঁহারাই ভূমির স্বামী হইবেন; প্রজারা তাঁহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবেক।

দেশীয় কর্ম্মচারীরা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রায় সমুদায় পুরাতন কাগজপত্র নষ্ট করিয়াছিল; অবশিষ্ট যাহা পাওয়া গেল, সমুদয়ের পরীক্ষা করিয়া, এবং ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসরে যাহা আদায় হইয়াছিল, তাহা গড় ধরিয়া, কর নির্দ্ধারিত করা গেল। গবর্ণমেণ্ট এরূপও ঘোষণা করিয়া দিলেন, নিষ্কর ভূমির সহিত এ বন্দোবস্তের কোনও সম্পর্ক নাই; কিন্তু আদালতে ঐ সকল ভূমির দলীলের পরীক্ষা করা যাইবেক; যে সকল ভূমির দলীল অকৃত্রিম হইবেক, সে সমুদয় বাহাল থাকিবেক; আর কৃত্রিম বোধ হইলে, তাহা বাতিল করিয়া, ভূমি সকল বাজেয়াপ্ত করা যাইবেক।

এই সমুদয় প্রণালী ডিরেক্টরদিগের সমাজে সমর্পিত হইলে, তাহারা তাহাতে সম্মত হইলেন এবং ঐ বন্দোবস্তই নির্দ্ধারিত ও চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত, কর্ণওয়ালিস সাহেবকে অনুমতি দিলেন। তদনুসারে, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ্চ, এই বিজ্ঞাপন দেওয়া গেল যে, বাঙ্গালা ও বিহারের রাজস্ব ৩১০৮৯১৫০ টাকা, ও বারাণসীর রাজস্ব ৪০০০৬১৫ টাকা, চির কালের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়াতে, বাঙ্গালা দেশের যে সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এরূপ না হইয়া যদি, পূর্ব্বের ন্যায়, রাজস্ব বিষয়ে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তের প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে, এ দেশের কখনই মঙ্গল হইত না। কিন্তু ইহাতে দুই অমঙ্গল ঘটিয়াছে, প্রথম এই যে, ভূমি ও ভূমির মূল্য নিশ্চিত না জানিয়া, বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাতে কোনও কোনও ভূমিতে অত্যন্ত অধিক, কোনও কোনও ভূমিতে অতি সামান্য, কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে; দ্বিতীয় এই যে, সমুদয় ভূমি যখন বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া গেল, তখন যে সকল প্রজারা, আবাদ করিয়া, চির কাল, ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিল, নূতন ভূমধিকারীদিগের স্বেচ্ছাচার হইতে তাহাদের পরিত্রাণের কোনও বিশিষ্ট উপায় নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই।

১৭৯৩ সালে, বাঙ্গালার শাসন নিমিত্ত আইন প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যে যে আইন প্রচলিত করা গিয়াছিল, লার্ড কর্ণওয়ালিস সে সমুদয়ের একত্র সঙ্কলন করিলেন, এবং সংশোধন ও অনেক নূতন আইনের যোগ করিয়া, তাহা এক গ্রন্থের আকারে প্রচারিত করিলেন। ইহাই উত্তরকালীন যাবতীয় আইনের মূলস্বরূপ। ১৭৯৩ সালের আইন সকল এরূপ সহজ, ও তাহাতে এরূপ গুণবত্তা প্রকাশিত হইয়াছে যে তৎপ্রণেতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। ঐ সমুদয় আইন দেশীয় কতিপয় ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।

তৎকালে ফরষ্টর সাহেব সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম বাঙ্গালা জানিতেন; তিনি, বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সমুদয় আইনের অনুবাদ করেন। এই সাহেব, কিঞ্চিৎ কাল পরে, বাঙ্গালা ভাষায়, সর্ব্বপ্রথম, এক অভিধান প্রস্তুত করেন। পারসী ভাষায় সবিশেষ নিপুণ এডমনষ্টন সাহেব, ঐ ভাষাতে, আইনের তরজমা করেন। এই অনুবাদ এমন উত্তম হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট, সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দশ হাজার টাকা পারিতোষিক দেন। এই সমস্ত আইন অনুসারে, বিচারালয়ে যে সকল প্রথা প্রচলিত হয়, তাহা প্রায় চব্বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। পরে দেশীয় লোকদিগকে বিচার সংক্রান্ত উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করা নির্দ্ধারিত হওয়াতে, তাহার কোনও কোনও অংশ পরিবর্ত্তিত হয়।

লার্ড কর্ণওয়ালিস বিচারালয়ে পাঁচ সোপান স্থাপিত করেন। প্রথম, মুন্সেফ ও সদর আমীন; দ্বিতীয়, রেজিষ্টর; তৃতীয়, জিলা জজ; চতুর্থ, প্রবিন্সল কোর্ট; পঞ্চম, সদর দেওয়ানী আদালত। তিনি এই অভিপ্রায়ে সমুদয় সিবিল সরবেণ্টদিগের বেতনবৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, আর তাঁহারা উৎকোচগ্রহণের লোভ করিবেন না। কিন্তু বিচারালয়ের দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের বেতন পূর্ব্ববৎ অতি সামান্যই রহিল। উচ্চপদাভিষিক্ত য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীরা পূর্ব্বে কতিপয় শত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেন; কিন্তু, এক্ষণে তাঁহারা অনেক সহস্র টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে, দেশীয় লোকেরা উচ্চ উচ্চ বেতন পাইয়া আসিয়াছিলেন। ফৌজদার বৎসরে ষাটি সত্তর হাজার টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইতেন; এক এক সুবার নায়েব দেওয়ান বার্ষিক নয় লক্ষ টাকার ন্যূন বেতন পাইতেন না। কিন্তু, ১৭৯৩ সালে, দেশীয় লোকদিগের অত্যুচ্চ বেতন একশত টাকার অধিক ছিল না।

লার্ড কর্ণওয়ালিস রাজশাসন দৃঢ়ীভূত করিয়াছেন, এবং, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা দেশীয় লোকদিগের মঙ্গল করিয়াছেন। দেশীয় লোকেরা, তাঁহার দয়ালুতা ও বিজ্ঞতার নিমিত্ত, যে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার অসাধারণগুণদর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ইণ্ডিয়া হৌসে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন, এবং, ভারতবর্ষপরিত্যাগদিবস অবধি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহার বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

২৮এ অক্টোবর, সর জন শোর সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে অধিরূঢ় হইলেন। তিনি, সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, অতি অল্প বয়সে, ভারতবর্ষে আগমন করেন; কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রগাঢ় বিবেচনাশক্তি দ্বারা, বিখ্যাত হইয়া উঠেন। দশসালা বন্দোবস্তের সময়, তিনি রাজস্ব বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করেন। ঐ পাণ্ডুলেখ্যে এমন প্রগাঢ় বিদ্যা ও দূরদর্শিতা প্রদর্শিত হয় যে,

উহা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী পিট সাহেবের সম্মুখে উপনীত হইলে, তিনি তদ্দর্শনে সাতিশয় চমকৃত হন, এবং ডিরেক্টরদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পরামর্শ পূর্ব্বক স্থির করেন যে, লার্ড কর্ণওয়ালিসের পরে, ইঁহাকেই গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিতে হইবেক।

তাঁহার নিয়োগের পর বৎসর, অতি প্রসিদ্ধ বিদ্বাবান্, সুপ্রীম কোর্টের অপক্ষপাতী জজ, সর উইলিয়ম জোন্স, আটচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, কালগ্রাসে পতিত হন। সর জন শোর সাহেবের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। শোর সাহেব, তদীয় জীবনবৃত্তান্তের সঙ্কলন করিয়া, এক উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রস্তুত ও প্রচারিত করেন।

১৭৯৫ সালে, নবাব মুবারিক উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্র নাজির উলমূলুক মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কিন্তু, তৎকালে, মুরশিদাবাদের নবাব নিযুক্ত করা অতি সামান্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক, পিতা যেরূপ মাসহারা পাইতেন, পুত্রও সেইরূপ পাইতে লাগিলেন।

সর জন শোর সাহেব, নির্ব্বিরোধে, পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া কর্ম্মপরিত্যাগের প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অধিকারকালে, বাঙ্গালা দেশে লিখনোপযুক্ত কোনও ব্যাপার ঘটে নাই। কিন্তু, তদীয় শাসনকাল শেষ হইবার সময়ে, এক ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যরা অসন্তোষের চিহ্ন দর্শাইতে লাগিল। ঐ সময়ে, মহীসূরের অধিপতি টিপু সুলতান, সৈন্য দ্বারা আনুকূল্য পাইবার প্রার্থনায়, ফরাসিদিগের নিকট বারংবার আবেদন করিতে লাগিলেন। গত যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে যেরূপ খর্ব্ব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি, এক নিমিষের নিমিত্তও, ভুলিতে পারেন নাই, অহোরাত্র, কেবল বৈরনির্যাতনের উপায়চিন্তা করিতেন। তিনি এমন আশা করিয়াছিলেন, ফরাসিদিগের সাহায্য লইয়া ইঙ্গরেজদিগকে এক বারে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিবেন। ডিরেক্টরেরা, এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, স্থির করিলেন যে, এমন সময়ে কোনও বিচক্ষণ ক্ষমতাপন্ন লোককে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান উচিত। অনন্তর, তাঁহারা লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্ব্বার ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভারগ্রহণার্থ অনুরোধ করিলেন; এবং তিনিও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

কিন্তু, আসিবার সমুদয় আয়োজন হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি আয়র্লণ্ডে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন। ডিরেক্টরেরা, বিলম্ব না করিয়া, লার্ড ওয়েলেসলিকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ইঁহারই নামান্তর লার্ড মর্নিঙ্গটন।

এই লার্ড বাহাদুর লার্ড কর্ণওয়ালিস মহোদয়ের ভ্রাতার নিকট শিক্ষা পাইয়াছিলেন; এবং, সবিশেষ অনুরাগ ও পরিশ্রম সহকারে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি, ১৭৯৮ সালের ১৮ই মে কলিকাতায় পঁহুছিলেন। গোলযোগের সময়ে, যেরূপ দূরদৃষ্টি, পরাক্রম, ও বিজ্ঞতা সহকারে কার্য্য করা আবশ্যক, সে সমুদায়ই তাহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষীয় শাসনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিবা মাত্র, ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যবিষয়ক সমস্ত আশঙ্কা একেবারে অন্তর্হিত হইল।

তিনি ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, টাকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; সৈন্য সকল একে অকর্ম্মণ্য, তাহাতে আবার অসন্তুষ্ট হইয়া আছে, উত্তরে সিন্ধিয়া, দক্ষিণে টিপু সুলতান, পূর্ণ শত্রু হইয়া, বিভীষিকা দর্শাইতেছেন; ফরাসিদিগের, দিন দিন, ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব বড়িতেছে। তিনি, অতি ত্বরায়, সৈন্য সকল সম্যক্ কর্ম্মণ্য করিয়া তুলিলেন; যে সকল ফরাসিসেনাপতি, বহু সৈন্য সহিত, হায়দরাবাদে বাস করিতেছিলেন, তাহাদিগকে দূরীভূত করিলেন; আর তাহারা যে সকল সৈন্যের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সমুদয়ের শ্রেণীভঙ্গ করিয়া দিলেন, তাহাদের পরিবর্ত্তে, সেই স্থানে ইঙ্গরেজী সেনা স্থাপিত করিলেন, এবং এক বারেই টিপুর সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিলেন। সমুদয় শত্রু মধ্যে, তিনিই অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মান্দ্রাজের কৌন্সিলের সাহেবেরা, লার্ড ওয়েলেসলির মতের পোষকতা না করিয়া, বরং তাহার প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি, অবিলম্বে, মান্দ্রাজে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের তাদৃশ ব্যবহারের নিমিত্ত যথোচিত তিরস্কার করিয়া, স্বয়ং সমস্ত বিষয়ের নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং, সত্বর সৈন্যসংগ্রহ করিয়া, ১৭৯৯ খৃঃ অব্দের ২৭এ মার্চ্চ, টিপু সুলতানকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন, মে মাসের চতুর্থ দিবসে ইঙ্গরেজদিগের হস্তগত হইল। এই যুদ্ধে টিপু প্রাণত্যাগ করিলেন। হায়দর-পরিবারের রাজ্যাধিকার শেষ হইল। ডিরেক্টরেরা, এই সংগ্রামের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া, গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরকে বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকার পেনশন প্রদান করিলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি, সিবিল সরবেণ্টদিগকে দেশীয় ভাষায় নিতান্ত অজ্ঞ দেখিয়া, ১৮০০ খৃঃ অব্দে, কলিকাতায় কালেজ অব ফোর্ট উইলিয়ম নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। সিবিলেরা ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় পঁহুছিলে, তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে হইত। তাঁহারা যাবৎ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতেন, তাবৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিতেন না। এই বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে; কতিপয় পুস্তক সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইল। এই বিদ্যালয়ের সংস্থাপনসংবাদ ডিরেক্টরদিগের নিকটে পঁহুছিলে, তাঁহারা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে বলিয়া, সকল বিষয়ের সংক্ষেপ করিতে আজ্ঞাপ্রদান করিলেন।

১৮০৩ খৃঃ অব্দে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুরকে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই দুই পরাক্রান্ত রাজা, অল্প দিনেই, পরাজিত ও খর্ব্বীকৃত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অনেক অংশ ইঙ্গরেজদিগের সাম্রাজ্যে যোজিত হইল। সেপ্টেম্বর মাসে, ইঙ্গরেজেরা মুসলমানদিগের প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর প্রথম অধিকার করিলেন। পূর্ব্বে, মহারাষ্ট্রীয়েরা দিল্লীশ্বরের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ইঙ্গরেজেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুশক্তি রহিল না। তিনি কেবল বার্ষিক পনর লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে নাগপুরের রাজার সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, লার্ড ওয়েলেসলি বাহাদুর, অবিলম্বে, উড়িষ্যায় সৈন্যপ্রেরণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়াতে, ১৮০৩ খৃঃ অব্দে, সেপ্টেম্বরের অষ্টাদশ দিবসে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিল। তদবধি সমুদয় উড়িষ্যা দেশ পুনরায় বাঙ্গালারাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইল। ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে, আলিবর্দ্দি খাঁ, আপন অধিকারের শেষ বৎসরে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে এই দেশ সমর্পণ করেন। ইঙ্গরেজেরা, পুরীর পুরোহিতদিগের প্রতি, অতিশয় দয়া ও সমাদর প্রদর্শন করিলেন এবং পুরী সংক্রান্ত আয় ব্যয় প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপারই, পূর্ব্ববৎ, তাঁহাদিগকে আপন বিবেচনা অনুসারে সম্পন্ন করিতে কহিলেন। কিন্তু, তিন বৎসর পরে, ইঙ্গরেজেরা, করবৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে, মন্দিরের অধ্যক্ষতাগ্রহণ, ও নিজের লোক দ্বারা করসংগ্রহ করিতে আরম্ভ, করিলেন। ঐ সংগৃহীত ধনের কিয়দংশ মাত্র দেবসেবায় নিয়োজিত হইত, অবশিষ্ট সমুদয় কোম্পানির ধনাগারে প্রবেশ করিত।

বহুকাল অবধি ব্যবহার ছিল, পিতা মাতা, গঙ্গাসাগরে গিয়া, শিশু সন্তান সাগরজলে নিক্ষেপ করিতেন। তাঁহারা এই কর্ম্ম ধর্ম্মবোধে করিতেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার কোনও বিধি নাই। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, এই নৃশংস ব্যবহার একেবারে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত, ১৮০২ সালের ২০এ আগষ্ট, এক আইন জারী করিলেন, ও তাহার পোষকতার নিমিত্ত, গঙ্গাসাগরে এক দল সিপাই পাঠাইয়া দিলেন। তদবধি এই নৃশংস ব্যবহার এক বারে রহিত হইয়া গিয়াছে।

লার্ড ওয়েলেসলি এই মহারাজ্যের প্রায় তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করেন, এবং, রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া, পনর কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা স্থিত করেন। কিন্তু, তিনি নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাতে, রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ঋণেরও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ডিরেক্টরেরা, তাঁহার এরূপ যুদ্ধবিষয়ক অনুরাগ দর্শনে, যৎপরোনাস্তি অসন্তোষপ্রকাশ করিলেন, এবং যাহাতে শান্তিসংস্থাপন পূর্ব্বক রাজশাসন সম্পন্ন হয়, এমন কোনও উপায় অবলম্বন করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ ব্যগ্র হইলেন।

লার্ড ওয়েলেসলি দেখিলেন, আর তাঁহার উপর ডিরেক্টরদিগের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নাই। এজন্য, তিনি, তাঁহাদের লিখিত পত্রের উত্তর লিখিয়া, কর্ম্মপরিত্যাগ করিলেন; এবং, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের শেষে, ইংলণ্ডগমনার্থ জাহাজে আরোহণ করিলেন।

ডিরেক্টরেরা, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও, শান্তিস্থাপন ও ব্যয়লাঘব করা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবকে পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং জাহাজে আরোহণ করিয়া, ১৮০৫ খৃঃ অব্দের ৩০এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, কালবিলম্ব না করিয়া, ভারতবর্ষীয় ভূপতিদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার নিমিত্ত, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি পশ্চিম অভিমুখে যত গমন করিতে লাগিলেন, ততই শারীরিক দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন; পরিশেষে, গাজীপুরে উপস্থিত হইয়া, ঐ বৎসরের ৫ই অক্টোবর, কলেবরপরিত্যাগ করিলেন। ইংলণ্ডে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পঁহুছিলে, ডিরেক্টরেরা, তাঁহার উপর আপনাদের অনুরাগ দর্শাইবার নিমিত্ত, তাঁহার পুত্রকে চারি লক্ষ টাকা উপহার দিলেন।

কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর সর জর্জ বার্লো সাহেব গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে এই উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রীরা কহিলেন এই পদে লোক নিযুক্ত করা আমাদের অধিকার। এই বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। পরিশেষে, লার্ড মিণ্টোকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করাতে, সে সমুদয়ের মীমাংসা হইয়া গেল। সর জর্জ বার্লো সাহেবের অধিকারকালে, গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রযাত্রী-দিগের নিকট মাশুল আদায়ের, ও মন্দিরের অধ্যক্ষতার, ভার স্বহস্তে লইয়াছিলেন। যাত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির নিমিত্ত, নানা উপায় করা হইয়াছিল। ইহাতে রাজস্বের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়। তৎকালে এই যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের অধিক প্রবল থাকে।

লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, ১৮০৭ খৃঃ অব্দের ৩১এ জুলাই, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি, ১৮১৩ খৃঃ অব্দের শেষ পর্য্যন্ত, রাজশাসন সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই সময় মধ্যে, বাঙ্গালা দেশে রাজকার্য্যের কোনও বিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই; কেবল পক্কোত্তরা মাশুল বিষয়ে, পূর্ব্ব অপেক্ষা কঠিন নিয়মে, নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছিল। লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে, এই নিয়ম রহিত করিয়া যান, পরে ১৮০১ খৃঃ অব্দে, পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হয়। এই রূপে রাজস্বের বৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু বাণিজ্যের বিস্তর ব্যাঘাত জন্মিতে, ও প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার হইতে, লাগিল।

১৮১০ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা, ফরাসিদিগকে পরাজিত করিয়া, বর্বোঁ ও মরিশস নামক দুই উপদ্বীপ অধিকার করিলেন, এবং তৎপর বৎসর, ওলন্দাজদিগকে পরাজিত করিয়া, জাবা নামক সমৃদ্ধ উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, কোম্পানি বাহাদুর যে চার্টর অর্থাৎ সনন্দ লইয়াছিলেন, তাহার মিয়াদ পূর্ণ হওয়াতে, ১৮১৩ খৃঃ অব্দে, নূতন চার্টর গৃহীত হইল। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজকার্য্য সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মের পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। দুই শত বৎসরের অধিক কাল অবধি, ইংলণ্ডের মধ্যে কেবল কোম্পানি বাহাদুরের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু, এক্ষণে কোম্পানি বাহাদুর ভারতবর্ষের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যেশ্বরের বাণিজ্য করা উচিত নহে, এই বিবেচনায়, নূতন বন্দোবস্তের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের কেবল রাজ্যশাসনের ভার রহিল; আর, অন্যান্য বণিকদিগের বাণিজ্যে অধিকার হইল। পূর্ব্বে, কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে, ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি প্রাপ্তি বিষয়ে, যে ক্লেশ পাইতে হইত, তাহা এক বারে নিবারিত হইল। এক্ষণে, ডিরেক্টরেরা যাহাদিগকে অনুমতি দিতে চাহিতেন না, তাহারা, বোর্ড অব কণ্টোল নামক সভাতে আবেদন করিয়া, কৃতকার্য্য হইতে লাগিল।

১৮১৩ খৃঃ অব্দের ৪ঠা অক্টোবর, লার্ড মিণ্টো বাহাদুর, লার্ড ময়রা বাহাদুরের হস্তে ভারতবর্ষীয় রাজশাসনের ভারসমর্পণ করিয়া, ইংলণ্ডযাত্রা করিলেন, কিন্তু, আপন আলয়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পরিশেষে, লার্ড ময়রা বাহাদুরের নাম মারকুইস অব হেষ্টিংস হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়

লার্ড হেষ্টিংস, গবর্ণমেণ্টের ভারগ্রহণ করিয়া, দেখিলেন, নেপালীয়েরা, ক্রমে ক্রমে, ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত দেশ আক্রমণ করিয়া আসিতেছেন। সিংহাসনারূঢ় রাজপরিবার, এক শত বৎসরের মধ্যে, নেপালে আধিপত্যস্থাপন করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজ্যের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। লার্ড মিণ্টো বাহাদুরের অধিকারকালে, নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। লার্ড হেষ্টিংস দেখিলেন, নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনি, প্রথমতঃ, সন্ধিরক্ষার্থে যথোচিত চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, নেপালেশ্বরের অসহনীয় প্রগল্‌ভতা দর্শনে, পরিশেষে, ১৮১৪ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। প্রথম যুদ্ধে কোনও ফলোদয় হইল না; কিন্তু, ১৮১৫ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি অক্টরলোনি বাহাদুর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। তখন, আপন রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ পণ দিয়া নেপালাধিপতিকে সন্ধিক্রয় করিতে হইল।

ভারতবর্ষের মধ্যভাগে পিণ্ডারী নামে প্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক অশ্বারোহ দস্যু বাস করিত। অনেক বৎসর অবধি, ঐ অঞ্চলের দেশলুণ্ঠন তাহাদের ব্যবসায় হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে, তাহারা ইঙ্গরেজদিগের অধিকারমধ্যে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের অনেক রাজা তাহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতেন। তাহারা, পাঁচ শত ক্রোশের অধিক দেশ ব্যাপিয়া, লুঠ করিত। তাহাদের নিবারণের নিমিত্ত, ইঙ্গরেজদিগকে এক দল সৈন্য রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতে প্রতি বৎসর যে খরচ পড়িতে লাগিল, তাহা অত্যন্ত অধিক বোধ হওয়াতে, পরিশেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত ও পরামর্শসিদ্ধ স্থির হইল যে, সর্ব্বদা এরূপ করা অপেক্ষা, এক বার এক মহোদ্যোগ করিয়া, তাহাদিগকে নির্মূল করা আবশ্যক।

অনন্তর লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, ডিরেক্টর সমাজের অনুমতি লইয়া, তিন রাজধানী হইতে বহুসংখ্যক সৈন্যের সংগ্রহ করিতে আদেশপ্রদান করিলেন। সংগৃহীত সৈন্য, এই দুর্বৃত্ত দস্যুদিগের বাসস্থান রুদ্ধ করিয়া, একে একে, তাহাদের সকল দলকেই উচ্ছিন্ন করিল।

ইঙ্গরেজদের সেনা, পিণ্ডারীদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া. যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুক্ত আছে, এমন সময়ে, পেশোয়া, হোলকার ও নাগপুরের রাজা, ইঁহারা সকলে, এক কালে, একপরামর্শ হইয়া, এই আশয়ে ইঙ্গরেজদিগের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া উঠিলেন যে, সকলেই একবিধ যত্ন করিলে, ইঙ্গরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূর করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই পরাজিত হইলেন। নাগপুরের রাজা ও পেশোয়া সিংহাসনচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের রাজ্যের অধিকাংশ ইঙ্গরেজদিগের অধিকারভুক্ত হইল। উল্লিখিত ব্যাপারের নির্ব্বাহকালে লার্ড হেষ্টিংসের পয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রম; তথাপি, তাদৃশ গুরুতর কার্য্যের নির্ব্বাহ বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা ও উৎসাহের আবশ্যকতা, তাহা তিনি সম্পূর্ণ রূপে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। পিণ্ডারী ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরাক্রম এক বারে লুপ্ত হইল, এবং ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিলেন।

লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের অধিকারের পূর্ব্বে, প্রজাদিগকে বিদ্যাদান করিবার কোনও অনুষ্ঠান হয় নাই। প্রজারা অজ্ঞানকূপে পতিত থাকিলে, কোনও কালে, রাজ্যভঙ্গের আশঙ্কা থাকে না; এই নিমিত্ত, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করা রাজনীতির বিরুদ্ধ বলিয়াই পূর্ব্বে বিবেচিত হইত। কিন্তু লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর, এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া, কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা, প্রজাদের মঙ্গলের নিমিত্তই, ভারতবর্ষে রাজ্যাধিকার স্থাপিত করিয়াছেন; অতএব, সর্ব্ব প্রযত্নে, প্রজার সভ্যতাসম্পাদন ইঙ্গরেজজাতির অবশ্যকর্ত্তব্য। অনন্তর, তদীয় আদেশ অনুসারে, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

১৮২৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে, হেষ্টিংস ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি, নয় বৎসর কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া, কোম্পানির রাজ্য ও রাজস্বের বিলক্ষণ বৃদ্ধি ও ঋণের পরিশোধ করেন। ইহার পূর্ব্বে, ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্যের

এরূপ সমৃদ্ধি কদাপি দৃষ্ট হয় নাই। ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ, এবং, সমস্ত ব্যয়ের সমাধা করিয়া, বৎসরে প্রায় দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইতে লাগিল।

অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন রাজমন্ত্রী জর্জ ক্যানিঙ ভারতবর্ষীয় রাজকার্য্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুর কর্ম্মপরিত্যাগ করিলে, তিনিই গবর্ণর জেনেরলের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তাঁহার আসিবার সমুদয় উদ্যোগ হইয়াছে, এমন সময়ে অন্য এক রাজমন্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে, ইংলণ্ডে এক অতি প্রধান পদ শূন্য হইল, এবং ঐ পদে তিনিই নিযুক্ত হইলেন। তখন ডিরেক্টরেরা লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরকে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। এই মহোদয়, দশ বৎসর পূর্ব্বে, ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া, চীনদেশের রাজধানী পেকিন নগরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি, ১৮২৩ খৃঃ অব্দের ১লা আগষ্ট, কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইলেন। লার্ড হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রস্থান অবধি, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরের উপস্থিতি পর্য্যন্ত, কয়েক মাস, কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর জন আদম সাহেব গবর্ণর জেনেরলের কার্য্যনির্ব্বাহ করেন। তাঁহার অধিকারকালে, বিশেষ কার্য্যের মধ্যে, কেবল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উচ্ছেদ হইয়াছিল।

লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, কলিকাতায় পহুছিয়া, দেখিলেন, ব্রহ্মদেশীয়েরা অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঙ্গরেজেরা যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে অধিকার স্থাপন করেন, ব্রহ্ম দেশের তৎকালীন রাজাও, প্রায় সেই সময়েই, তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি মণিপুর ও আসাম অনায়াসে হস্তগত করেন; এবং সেই গর্ব্বে উদ্ধত হইয়া, মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে, বাঙ্গালা দেশও হস্তগত করিবেন। তিনি, ইঙ্গরেজদের সহিত সন্ধিসত্বেও, সন্ধির নিয়মলঙ্ঘন করিয়া, কোম্পানির অধিকারভুক্ত কাচার ও আরাকান দেশে স্বীয় সৈন্য পাঠাইয়া দেন। আরাকার উপকূলে, টিকনাফ নদীর শিরোভাগে, শাপুরী নামে যে উপদ্বীপ আছে, ব্রহ্মেশ্বর তাহা আক্রমণ করিয়া, তথায় ইঙ্গরেজদিগের যে অল্পসংখ্যক রক্ষক ছিল, তাহাদের প্রাণবধ করেন। আরায় দূতপ্রেরণ করিয়া, এরূপ অনুষ্ঠানের হেতুজিজ্ঞাসা করাতে, তিনি সাতিশয় গর্ব্বিত বাক্যে এই উত্তর দেন, ঐ উপদ্বীপ আমার অধিকারে থাকিবেক, ইহার অন্যথা হইলে, আমি বাঙ্গালা আক্রমণ করিব।

এই সমস্ত অত্যাচার দেখিয়া, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ৬ই মে, ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিলেন। ইঙ্গরেজেরা, ১১ই মে, ব্রহ্মরাজ্যে সৈন্য উত্তীর্ণ করিয়া, রেঙ্গুনের বন্দর অধিকার করিলেন। তৎপরেই, আসাম, আরাকান, ও মরন্তুই নামক উপকূল তাঁহাদের হস্তগত হইল। ইঙ্গরেজদিগের সেনা, ক্রমে ক্রমে, আরা

রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল; এবং, প্রয়াণকালে, বহুতর গ্রাম, নগর অধিকার পূর্ব্বক, ব্রহ্মরাজের সেনাদিগকে পদে পদে পরাজিত করিতে লাগিল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের আরম্ভে, ইঙ্গরেজদিগের সেনা অমরপুরের প্রত্যাসন্ন হইলে, রাজা, নিজ রাজধানীর রক্ষার্থে, ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত পণেই, সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, এক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ঐ সন্ধিপত্র যান্দাবুসন্ধিপত্র নামে প্রসিদ্ধ। তদ্দ্বারা ব্রহ্মাধিপতি ইঙ্গরেজদিগকে মণিপুর, আসাম, আরাকান, ও সমুদয় মার্ত্তাবান উপকূল ছাড়িয়া দিলেন; এবং যুদ্ধের ব্যয় ধরিয়া দিবার নিমিত্ত, এক কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

যৎকালে ব্রহ্মদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইতেছিল, ঐ সময়ে ভরতপুরের অধিপতি দুর্জ্জনশালের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়। তিনি, আপন ভ্রাতা মাধু সিংহের সহিত পরামর্শ করিয়া, নিজ পিতৃব্যপুত্র অপ্রাপ্তব্যবহার বলবন্ত সিংহের হস্ত হইতে রাজ্যাধিকার-গ্রহণ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন। সর চার্লস মেটকাফ সাহেব, দুর্জ্জনশালকে বুঝাইবার জন্য, বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোনও ফলোদয় হইল না। তখন স্পষ্ট বোধ হইল, শস্ত্রগ্রহণ ব্যতিরেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হইবেক না। বিশেষতঃ এই স্থান অধিকার করা ইঙ্গরেজেরা অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজদিগের সেনাপতি, লার্ড লেক, ঐ স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অধিক সেনা ও অনেক সেনাপতির প্রাণবিনাশ হয়। ইঙ্গরেজেরা, এ পর্য্যন্ত, যত দুর্গের অবরোধ করেন, তন্মধ্যে কেবল ভরতপুরের দুর্গই অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহাতে, সমস্ত ভারতবর্ষ মধ্যে, এই জনরব হইয়াছিল, ইঙ্গরেজেরা এই দুর্গ কখনই অধিকার করিতে পারিবেন না। উহার চতুর্দ্দিকে, অতি প্রশস্ত মৃণ্ময় প্রাচীরের পাদদেশে, এক বৃহৎ পরিখা ছিল।

তৎকালে অনেক সৈন্য ব্রহ্মদেশীয় যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিলেও, বিংশতি সহস্র সৈন্য ও এক শত কামান ভরতপুরের সম্মুখে অবিলম্বে নীত হইল। ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোক, প্রগাঢ় ঔৎসুক্য সহকারে, এই ব্যাপারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ২৩এ ডিসেম্বর, যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৮২৬ খৃঃ অব্দের ১৮ই জানুয়ারি, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, লার্ড কম্বরমীর বাহাদুর, ঐ স্থান অধিকার করিলেন। দুর্জ্জনশাল ইঙ্গরেজদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে, তাঁহারা তাঁহাকে এলাহাবাদের দুর্গে রুদ্ধ করিলেন।

১৮২৭ খৃঃ অব্দে, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, পশ্চিম অঞ্চলে গমন করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। বাদশাহের সহিত, কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য বিষয়ে, কথোপকথন উপস্থিত হওয়াতে, গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর স্পষ্ট বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, ইঙ্গরেজেরা আর এখন তৈমুরবংশীয়দিগের অধীন নহেন; রাজসিংহাসন এক্ষণে তাঁহাদের

হইয়াছে। দিল্লীর রাজপরিবার, এই কথা শুনিয়া, বিষাদসমুদ্রে মগ্ন হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট, অশেষ প্রকারে, অবমানিত হইয়াছিলাম বটে; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশাহনামের অন্যথা হয় নাই এক্ষণে, রাজ্যাধিকার চিরকালের নিমিত্ত হস্তবহির্ভূত হইল। ইঙ্গরেজদের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষবাসী সমুদয় লোক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন।

লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুর, উইলিয়ম বটরওয়ার্থ বেলি সাহেবের হস্তে গবর্ণমেণ্টের ভারার্পণ করিয়া, ১৮২৮ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাসে, ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তাঁহার কর্ম্মপরিত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত হইলে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, উক্ত পদের নিমিত্ত, ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, তিনি মান্দ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরেরা, কোনও কারণ বশতঃ উদ্ধত হইয়া, অন্যায় করিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক্ষণে তাঁহারা, উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া, ১৮২৭ সালে, গবর্ণর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, তৎকালে ইংলণ্ডে, এই প্রধান পদের নিমিত্ত, তত্তুল্য উপযুক্ত ব্যক্তি অতি অল্প পাওয়া যাইত।

লার্ড বেণ্টিক বাহাদুর, ১৮২৮ সালের ৪ঠা জুলাই, কলিকাতায় পঁহুছিলেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে লার্ড হেষ্টিংসের অধিকার কালে, ভারতবর্ষের ধনাগার ধনে পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু, এই সময়ে, তাহা এক বারে শূন্য হইয়াছিল। আয় অপেক্ষা ব্যয় অনেক অধিক। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিঃসন্দেহ ব্যয়ের লাঘব করিব। তিনি, কলিকাতায় পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই, রাজস্ব বিষয়ে দুই কমিটি স্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের উপর এই ভার হইল যে, সিবিল ও মিলিটারি বিষয়ে যে ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার পরীক্ষা করিবেন, এবং তন্মধ্যে কি কমান যাইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবেন।

তাঁহারা যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে, সমুদয় কর্ম্মস্থানে, ব্যয়ের লাঘব করা গেল। এরূপ কর্ম্ম করিলে, কাজে কাজেই, অপ্রিয় হইতে হয়। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ব্যয়লাঘব করিয়া, কোর্টের যে আদেশ প্রতিপালন করিলেন, তাহাতে যাহাদের ক্ষতি হইল, তাহারা তাঁহাকে বিস্তর গালি দিয়াছিল। ফলতঃ, যে রাজকর্ম্মচারীকে রাজ্যের ব্যয়লাঘব করিবার ভারগ্রহণ করিতে হয়, তিনি কখনই, তদানীন্তন লোকের নিকট, সুখ্যাতিলাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সকলেই, তাঁহার বিপক্ষ হইয়া, চারিদিকে কোলাহল করিতে লাগিল। তিনি, তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত না হইয়া, কেবল ব্যয়লাঘব ও ঋণপরিশোধের উপায় দেখিতে লাগিলেন।

অনেক বৎসর অবধি, গবর্ণমেণ্ট সহগমননিবারণার্থে সবিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন, এবং কত স্ত্রী সহমৃতা হয়, এবং দেশীয় লোকদিগেরই বা তদ্বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায়, ইহার নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, অনেক অনুসন্ধানও হইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অনেকেই কহিয়াছিলেন, দেশীয় লোকদিগের এ বিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ আছে; ইহা রহিত করিলে অনর্থ ঘটিতে পারে। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, কলিকাতায় পঁহুছিয়া, এই বিষয়ে বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, ইহা অনায়াসে রহিত করা যাইতে পারে। কৌন্সিলের সমুদয় সাহেবেরা তাঁহার মতে সম্মত হইলেন। তদনন্তর, ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, এক আইন জারী হইল; তদনুসারে, ইঙ্গরেজদিগের অধিকার মধ্যে, এই নৃশংস ব্যাপার একে বারে রহিত হইয়া গেল।

কতকগুলি ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি, এই হিতানুষ্ঠানকে অহিত জ্ঞান করিলেন, এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া, গবর্ণর জেনেরেল বাহাদুরের নিকট এই প্রার্থনায় আবেদন করিলেন যে, ঐ আইন রদ করা যায়। লার্ড উইলিয়ম, এই ধর্ম্ম রহিত করিবার বহুবিধ প্রবল যুক্তির প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। সেই সময়ে, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরকে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন; তাহার মর্ম্ম এই, আমরা শ্রীযুতের এই দয়ার কার্য্যে অনুগৃহীত হইয়া, ধন্যবাদ করিতেছি।

যাঁহারা সহগমনের পক্ষ ছিলেন, তাঁহারা, অবিলম্বে, কলিকাতায় এক ধর্ম্মসভার স্থাপন ও চাঁদা করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলেন, এবং এই বিধি পুনঃ স্থাপিত হয়, এই প্রার্থনায়, ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট দরখাস্ত দিবার নিমিত্ত, এক জন ইঙ্গরেজ উকীলকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাকার রাজমন্ত্রীরা, সহগমনের অনুকূল যুক্তি সকল শ্রবণগোচর করিয়া, পরিশেষে নিবারণপক্ষই দৃঢ় করিলেন। বহু কাল অতীত হইল, সহমরণ রহিত হইয়াছে; এই দীর্ঘ কাল মধ্যে প্রজাদের অসন্তোষের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ, এক্ষণে এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রায় সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন। যদি ইহা ইতিহাস-গ্রন্থে উল্লিখিত না থাকে, তাহা হইলে, উত্তরকালীন লোকেরা, এরূপ নৃশংস ব্যবহার কোনও কালে প্রচলিত ছিল, এ বিষয়ে, বোধ হয়, প্রত্যয় করিবেক না।

১৮৩১ সালে, বিচারালয়ের রীতির অনেক পরিবর্ত্ত আরব্ধ হইল। বাঙ্গালিরা, এ পর্য্যন্ত, অতি সামান্য বেতনে নিযুক্ত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করিতেন। লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়াইবার নিমিত্ত, তাঁহাদিগকে উচ্চ বেতনে উচ্চ পদে নিযুক্ত করিতে মনন করিলেন। এই বৎসরে, মুন্সেফ ও সদর আমীন-দিগের বেতন ও ক্ষমতার বৃদ্ধি হইল; এবং, উচ্চতর বেতনে, অতি সম্ভ্রান্ত প্রধান সদর

আমীনী পদ নূতন সংস্থাপিত হইল। দেওয়ানী বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগের যথেষ্ট ক্ষমতা হইল। রেজিষ্টরের পদ ও প্রবিন্সল কোর্ট উঠিয়া গেল; কেবল দেশীয় বিচারকের ও জিলাজজের পদ, এবং সদরদেওয়ানী আদালত, বজায় থাকিল। ফলিতার্থ এই যে, মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণ ও তাহার নিষ্পত্তি করণের ভার দেশীয় বিচারকদিগের হস্তে অর্পিত হইল; আর, জিলার জজদিগের উপর কেবল আপীল শুনিবার ভার রহিল।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ফৌজদারী আদালতেও, অনেক সুরীতি স্থাপন করেন। পূর্ব্বে, দায়রার সাহেবেরা ছয় মাসে একবার আদালত করিতেন; কিয়ৎ কাল পরে, কমিসনর সাহেবেরা তিন মাসে এক বার। এক্ষণে এই হুকুম হইল, সিবিল ও সেশন জজেরা, প্রতি ম সে, এক এক বার বৈঠক করিবেন। কয়েদী আসামী ও সাক্ষীদিগকে যে অধিক দিন ক্লেশ পাইতে হইত, তাহার অনেক নিবারণ হইল। ফলতঃ, কার্য্যদক্ষ লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বাহাদুরের অধিকারকালে, যে নানা সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, সে সমুদয়েরই প্রধান উদ্দেশ্য এই, দেশীয় লোকদিগের মান সম্ভ্রম বাড়ে ও সুশৃঙ্খল রূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হয়।

১৮৩১ খৃঃ অব্দে, রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক সম্ভ্রান্ত কর্ম্ম করিয়াছিলেন; সংস্কৃত, আরবী, পারসী, উর্দ্দু, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, ইঙ্গরেজী, ফরাসি, এই নয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও বিলক্ষণ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, এবং স্বদেশীয় লোকদিগকে, দেব দেবীর আরাধনা হইতে বিরত করিয়া, বেদান্ত-প্রতিপাদিত পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তির সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তদীয় বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিতেন। রামমোহন রায় এ দেশের এক জন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লার্ড আমহর্ষ্ট বাহাদুরের অধিকারকালে, তৈমূরবংশীয়-দিগের সাম্রাজ্যনিবন্ধন প্রাধান্য রহিত হয়। সম্রাট, অপহারিত মর্য্যাদার উদ্ধারবাসনায়, ইংলণ্ডে আপীল করিবার নিশ্চয় করিয়া, রাজা রামমোহন রায়কে উকীল স্থির করেন। পূর্ব্ব কালে, সমুদ্রযাত্রাস্বীকারে, ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা ও অধর্ম্ম হইত না; ইদানীন্তন সময়ে, কোনও ব্যক্তি জাহাজে গমন করিলে, তাহাকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু, রাজা রামমোহন রায়, অসঙ্কুচিত চিত্তে, জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক, ইংলণ্ডে গমন করেন। তিনি, তথায় উপস্থিত হইয়া, যার পর নাই সমাদর প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার এই যাত্রার প্রয়োজন সিদ্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডেশ্বর, ত্রিশ বৎসরের বৃত্তিভোগী তৈমূরবংশীয়দিগের আধিপত্যের পুনঃস্থাপন বিষয়ে, সম্মত হইলেন না। কিন্তু, তাঁহাদের যে বৃত্তি নিরূপিত ছিল, রামমোহন রায় তাহার আর তিন লক্ষ টাকা বৃদ্ধির অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি, স্বদেশী-

প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই, দেহযাত্রাসংবরণ পূর্ব্বক, ব্রিষ্টল নগরের সন্নিকৃষ্ট সমাধিক্ষেত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছেন।

১৮৩২ সাল অতিশয় দুর্ঘটনার বৎসর। যে সকল সওদাগরের হৌস, ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর, চলিয়া আসিতেছিল, এই বৎসরে সে সকল দেউলিয়া হইতে লাগিল। সর্ব্বপ্রথমে পামর কোম্পানির হৌস, ১৮৩০ সালে, দেউলিয়া হয়। আর পাঁচটার তৎপরে তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত কর্ম্ম চলিয়াছিল; পরিশেষে, তাহারাও দেউলিয়া হইল। এই ব্যাপার ঘটাতে, সর্ব্বসাধারণ লোকের ষোল কোটি টাকা ক্ষতি হয়। তন্মধ্যে, দেউলিয়া-দিগের অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে, দুই কোটি টাকাও আদায় হয় নাই।

পূর্ব্ব মিয়াদ অতীত হইলে, ১৮৩৩ সালে, কোম্পানি বাহাদুর পুনর্ব্বার, বিংশতি বৎসরের নিমিত্ত, সনন্দ পাইলেন। এই উপলক্ষে, এতদ্দেশীয় রাজ্যশাসনের অনেক নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইল। কোম্পানিকে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে, ও সমুদায় কুঠী বেচিয়া ফেলিতে, হইল। তৎপূর্ব্ব বিশ বৎসর, চীনদেশীয় বাণিজ্যই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল; এক্ষণে, তাহাও ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলতঃ, দুই শত তেত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত, তাঁহারা যে বণিগ্বৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে একবারে নিঃসম্বন্ধ হইয়া, রাজশাসন কার্যেই ব্যাপৃত হইতে হইল। কলিকাতায় এক বিধিদায়িনী সভার সংস্থাপনের অনুমতি হইল। এই নিয়ম হইল, তাহাতে কৌন্সিলের নিয়মিত মেম্বরেরা, ও কোম্পানির কর্ম্মচারী ভিন্ন আর একজন মেম্বর, বৈঠক করিবেন। এই নূতন সভার কর্ত্তব্য এই নিদ্ধারিত হইল, যখন যেরূপ আবশ্যক হইবেক, ভারতবর্ষে তখন তদনুরূপ আইন প্রচলিত করিবেন, এবং সুপ্রীম কোর্টের উপর কর্তৃত্ব ও তথাকার বন্দোবস্ত করিবেন। আর, সমুদয় দেশের জন্য এক আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, লা কমিশন নামে এক সভা স্থাপিত হইল। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর, সমুদয় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান অধিপতি হইলেন; অন্যান্য রাজধানী তাঁহার অধীন হইল। বাঙ্গালার রাজধানী বিরক্ত হইয়া, কলিকাতা ও আগরা, দুই স্বতন্ত্র রাজধানী হইল।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, প্রজাগণের বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হইয়া, ইংরেজীশিক্ষায় সবিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৮১৩ সালে, পার্লিমেণ্টের অনুমতি হয়, প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা, রাজস্ব হইতে, প্রতি বৎসর, লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবেক। এই টাকা, প্রায় সমুদায়ই, সংস্কৃত ও আরবী বিদ্যার অনুশীলনে ব্যয়িত হইত লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, ইঙ্গরেজী ভাষার অনুশীলনে তদপেক্ষা অধিক উপকার বিবেচনা করিয়া, উক্ত উভয় বিষয়ের ব্যয়সংক্ষেপ, ও স্থানে স্থানে ইঙ্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপন, করিবার অনুমতি দিলেন। তদবধি, এতদ্দেশে, ইঙ্গরেজী ভাষার বিশিষ্টরূপ অনুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, দেশীয় লোকদিগকে য়ুরোপীও চিকিৎসা বিদ্যা শিখাই-বার নিমিত্ত, কলিকাতায়, মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, দেশের সাতিশয় মঙ্গলবিধান করিয়াছেন। চিকিৎসা বিষয়ে নিপুণ হইবার নিমিত্ত ছাত্রদিগের যে যে বিদ্যার শিক্ষা আবশ্যক, সে সমুদয়ে পৃথক পৃথক অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন।

সকল ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিবেক, এই অভিপ্রায়ে, লার্ড উইলিয়ম বেন্টিকের অধিকার সময়ে, সেবিংস বেঙ্ক স্থাপিত হয়। যদর্থে উহা স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণ রূপে তাহা সফল হইয়াছে।

লার্ড বেন্টিক বাহাদুর পঞ্চোত্তরা মাস্থল বিষয়েও মনোযোগ দিয়াছিলেন। বহু কাল অবধি এই রীতি ছিল, দেশের একস্থান হইতে স্থানান্তরে কোনও দ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে, মাস্থল দিতে হইত; তদনুসারে, কি জলপথ কি স্থলপথ, সর্ব্বত্র এক এক পরমিট স্থাপিত হয়। তথায়, দ্রব্য সকল আটকাইয়া তদারক করিবার নিমিত্ত, অনেক কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। পরমিটের কর্ম্মচারীরা যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের মাস্থল এক টাকা আদায় করিত, সেখানে আপনারা নিজে অন্ততঃ দুই টাকা লইত। ফলতঃ, তাহারা প্রজার উপর এমন দারুণ অত্যাচার করিত যে, এ বিষয়ে অধিকৃত এক জন বিচক্ষণ য়ুরোপীয়, যথার্থ বিবেচনা পূর্ব্বক, এই ব্যাপারকে অভিসম্পাত নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন।

ইঙ্গরেজেরা যখন মুসলমানদের হস্ত হইতে রাজশাসনের ভারগ্রহণ করেন, তখন এই ব্যাপার প্রচলিত ছিল; এবং তাঁহারাও নিজে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, বিচক্ষণ লার্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর, এই ব্যাপারকে দেশের বিশেষ ক্ষতিকর বোধ করিয়া, ১৭৮৮ সালে, একবারে রহিত করেন, এবং দেশের মধ্যে যেখানে যত পরমিটঘর ছিল, সমুদয় উঠাইয়া দেন। ইহার তের বৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট করসংগ্রহের নূতন নূতন পন্থা বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়া, পুনর্ব্বার এই মাস্থলের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। এক্ষণে, লার্ড উইলিয়ম বেণ্টক, সি ই ট্রিবিলিয়ন সাহেবকে, এই বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিলেন, পরে, এই মাস্থল উঠাইবার সদুপায় স্থির করিবার নিমিত্ত, একটি কমিটি স্থাপিত করিলেন। এই ব্যাপার, উক্ত লাট বাহাদুরের অধিকারকালে, রহিত হয় নাই বটে; কিন্তু তিনি, ইহার প্রথম উদ্যোগী বলিয়া, অশেষ প্রকারে প্রশংসা-ভাজন হইতে পারেন।

লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক, আপন অধিকারের প্রারম্ভ অবধি, এতদ্দেশে, সমুদ্রে ও নদীতে বাষ্পনাবিককর্ম প্রচলিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ যত্নবান ছিলেন। যাহাতে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের সংবাদ, মাসে মাসে, উভয়ত্র পহুছিতে পারে, তিনি, তাহার যথোচিত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডিরেক্টরেরা এ বিষয়ে বিস্তর বাধা দিয়াছিলেন। তিনি, বোম্বাই হইতে সুয়েজ পর্য্যন্ত পুলিন্দা লইয়া যাইবার নিমিত্ত, বাষ্পনৌকা নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তন্নিমিত্ত তাঁহারা যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করেন। যাহা হউক, লার্ড বেন্টিক, বাঙ্গালা ও পশ্চিমাঞ্চলের নদ নদীতে, লৌহনির্ম্মিত বাষ্পজাহাজ চালাইবার বিষয়ে, তাঁহাদিগকে সম্মত করিলেন। এই বিষয়, য়ুরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক-দিগের পক্ষে, বিলক্ষণ উপকারক হইয়াছে।

১৮৩৫ সালের মার্চ্চ মাসে, লার্ড উইলিয়ম বেন্টিক বাহাদুরের অধিকার সমাপ্ত হয়। তাঁহার অধিকারকালে, ভিন্নদেশীয় নরপতিগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন কোনও উদ্বেগ ছিল না। এক দিবসের জন্যেও, সন্ধি ও শান্তির ব্যাঘাত ঘটে নাই। তাঁহার অধিকার কাল কেবল প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল।

———